কাকাবাবু সমগ্র ৬
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু সমগ্র ৬

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহের অংশুলা চক্রবর্তী-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
আগুন পাখির রহস্য
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা রহস্য
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ
কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু আর বাঘের গল্প
কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী
কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া
কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু
কাকাবাবু ও বজ্র লামা
কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার
কাকাবাবু ও মরণফাঁদ
কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল
কাকাবাবু ও সিন্দুক-রহস্য
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি
কাকাবাবু সমগ্র (১-৫)
কাকাবাবু হেরে গেলেন?
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান
কাকাবাবুর চোখে জল
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
জোজো অদৃশ্য
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
দশটি কিশোর উপন্যাস
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মা, আমার মা
মিশর রহস্য
রাজবাড়ির রহস্য
সন্তু কোথায় কাকাবাবু কোথায়
সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

সূচি

কাকাবাবু ও সিন্দুক রহস্য ১১
কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া ১১১
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ ১৯৯
কাকাবাবুর চোখে জল ৩০৩
কাকাবাবু আর বাঘের গল্প ৩৭৭
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে ৪৫৩

গ্রন্থপরিচয় ৫৪৫

কাকাবাবু সমগ্র ৬
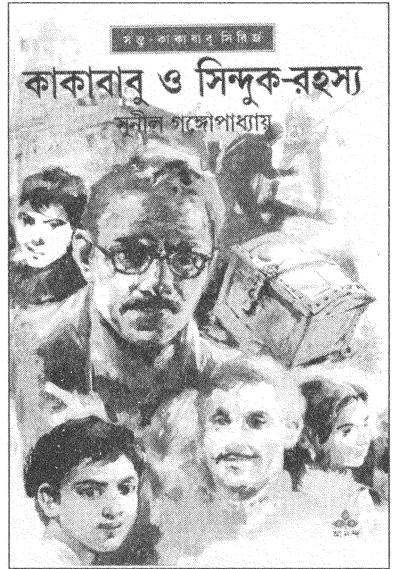
কাকাবাবু ও
সিন্দুক-রহস্য

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "জোজো একাই সব গল্প বলবে? আমরা বুঝি গল্প জানি না?" জোজো বলল, "আমি তো গল্প বলি না! সব সত্যি ঘটনা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই যে বললি, একটা গোরিলা নারকোল গাছে উঠে নারকোল ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোর দিকে ছুড়ে মেরেছিল, সেটা গল্প নয়? আমরা শুনেছি, গল্পের গোরু গাছে ওঠে, আর তুই একটা গোরিলাকে গাছে তুলে দিলি? তাও অস্ট্রেলিয়ায়? আমরা তো ভাই ভূগোল বইয়ে পড়েছি, শুধু আফ্রিকাতেই গোরিলারা থাকে।"

জোজো বলল, "ভূগোল বইয়ে সব কিছু ঠিক ঠিক লেখা থাকে? আমেরিকায় কি সিংহ পাওয়া যায়?"

সন্তু বলল, "না।"

জোজো বলল, "আমেরিকায় একটা স্টেটে, খোলা জায়গায়, খাঁচায় না, চিড়িয়াখানাতেও না, খোলা জায়গায় সিংহ ঘুরে বেড়ায়। কত লোক দেখেছে, এটা কি গল্প? কাকাবাবু, আপনি তো আমেরিকায় গেছেন কয়েকবার, আপনি দেখেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখিনি। তবে শুনেছি। সাফারি পার্কে সিংহ ছাড়া থাকে ঠিকই। নিউ জার্সিতে এরকম একটা সাফারি পার্ক আছে। এক দেশের জন্তু-জানোয়ার অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তো বটেই, নইলে আর চিড়িয়াখানাগুলো চলছে কী করে?

সন্তু তবু বলল, "জোজো অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের মধ্যে গোরিলা দেখেছে!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি তো! ইট্স আ ফ্যাক্ট! আর-একবার, ভুটানের

রাজা আমার বাবাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, সেখানে এক রাত্তিরবেলা...”

তাকে থামিয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, “আমরাও এমন সব সত্যি ঘটনা জানি, যা একেবারে গল্পের মতন। আমি যদি বলি, একবার এক বাঘ, ছোটখাটো না, মস্ত বড় বাঘ আমার বুকের উপর দুটো থাবা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তুমি বিশ্বাস করবে?”

জোজো খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “সার্কাসের বাঘ নিশ্চয়ই। ওগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে, তাই কামড়ায় না।”

কাকাবাবু বললেন, “না, সার্কাসের বাঘ নয়।”

জোজো বলল, “তা হলে কারও পোষা বাঘ!”

সন্তু বলল, “বাঘ আবার পোষ মানে নাকি?”

জোজো বলল, “পোষ মানাতে জানলেই পোষ মানে! আমার পিসেমশাইয়েরই তো তিনটে পোষা বাঘ আছে, তার মধ্যে একটার গায়ের রং সাদা। আমার পিসেমশাই কে জানিস? রেওয়ার রাজা। রেওয়া কোথায় তা জানিস না বোধহয়। মধ্যপ্রদেশে। সেখানকার জঙ্গলেই প্রথম সাদা বাঘ পাওয়া গিয়েছিল!”

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, “নাঃ, জোজোর সঙ্গে পারা যাবে না! এর আগে তোমার সাতজন পিসেমশাইয়ের কথা শুনেছি।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, তুমি তোমার বাঘের গল্পটা বলো!”

এই সময় ট্রেনের গতি কমে এল।

অন্যদিক থেকে একজন খুব রোগা চেহারার যাত্রী জিজ্ঞেস করল, “এটা কোন স্টেশন?”

কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করে বললেন, “কিছুই তো ভাল করে দেখা যায় না। সন্ধে হয়ে গেছে।”

রোগা যাত্রীটি বিরক্তভাবে বলে উঠল, “আজকাল এই হয়েছে এক ঝমেলা। ট্রেনের জানলা খোলা যায় না, কাচগুলোও ঝাপসা আর ময়লা, বাইরেটা দেখার উপায় নেই। আগে আমরা কী সুন্দর খোলা জানলায় মাথা রেখে বাইরের গাছপালা, পাহাড়, নদী দেখতে দেখতে যেতাম।”

রেলের কামরায় যাত্রীদের মধ্যে সবসময় দু'রকম মতের লোক থাকে। কেউ কোনও বিষয়ে কিছু বললে অন্য একজন প্রতিবাদ করবেই।

অন্যদিক থেকে কুস্তিগিরের মতন চেহারার একজন যাত্রী বলে উঠল, “কে বলল, ট্রেনের জানলা খোলা যায় না? এ সি কামরার বদলে সাধারণ

সেকেন্ড ক্লাসে গেলেই হয়। সেখানে ইচ্ছেমতন জানলা খোলা যায়!"

রোগা যাত্রীটি বলল, "না মশাই, আজকাল ইচ্ছেমতন অনেক কিছুই করা যায় না! সেকেন্ড ক্লাসেও জানলা খুলতে গেলেই পাশের লোকটি বলবে, 'জানলা খুলবেন না, খুলবেন না! রোদ আসবে, হাওয়া আসবে, বৃষ্টি আসবে, ধুলোবালি আসবে!' আজকাল লোকের স্বাস্থ্যবাতিক এত বেড়েছে!"

কামরার মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছেন একজন সাধুবাবা। গেরুয়া কাপড় পরা আর মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তিনি সর্বক্ষণ চোখ বুজে রয়েছেন, এখনও চোখ বোজা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেশনের নাম কে জানতে চাইলেন?"

রোগা লোকটি বলল, "আমি। দেখি দরজার কাছে গিয়ে।"

সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নামতে চান কোথায়?"

রোগা লোকটি বলল, "বারিপদা।"

সাধুবাবা বললেন, "আপনি তৈরি হয়ে নিন, সামনেই বারিপদা আসছে।"

সন্তু ফিসফিস করে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সাধুবাবা কি চোখ বুজে ধ্যানে সব দেখতে পেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতেও পারে। কিংবা উনি হয়তো এই রুটে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাতে সব স্টেশনের নাম আর সময়টা মুখস্থ হয়ে যায়। ট্রেনের হকাররাও এরকম না দেখেই বলে দিতে পারে।"

জোজো বলল, "আমরা কোথায় নামব?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের বাদামপাহাড় পর্যন্ত টিকিট। এখানেও নামা যায়। থাক, এ জায়গাটায় খুব ভিড়। বাদামপাহাড় বেশ নিরিবিলি। ওখানে আমাদের নিতে আসবে একজন।"

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, "আমরা শেষ পর্যন্ত যেখানে যাচ্ছি, সেই জায়গাটার নাম ঘিসিং?"

কাকাবাবু বললেন, "ঘিসিং নয়, খিচিং।"

জোজো বুঝতে না পেরে বলল, "কিচিং?"

সন্তু বলল, "শুনতে পেলি না? খিচিং! খিচিং!"

জোজো বলল, "এরকম অদ্ভুত জায়গার নাম আগে কখনও শুনিনি!"

কাকাবাবু বললেন, "এ দেশের কত জায়গার বিচিত্র সব নাম আছে। আমরা আর কতটুকু দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কত দেশ ঘুরেছেন, তবু

তিনি লিখেছেন, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী...।' এই খিচিংও কিন্তু একসময় রাজধানী ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের।"

চোখ বুজে থাকা সন্ন্যাসীটি বললেন, "মহাশয়েরা খিচিং যাবেন? বেশ, বেশ, আমারও গন্তব্য সেখানেই।"

এবারেও তিনি কথা বলার সময় চোখ খুললেন না। যদিও কথাটা বললেন বাংলায়, তবু উচ্চারণে একটু টান শুনে মনে হয়, বাঙালি নন। এই ট্রেন যাবে সম্বলপুর পর্যন্ত, কামরার মধ্যে ওড়িশার মানুষই বেশি।

জোজো সাধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বুঝি চোখ বুজে দেখতে পান?"

সাধু বললেন, "অনেক কিছুই দেখতে পাই। কেন পাই জানো? আমি মাসের মধ্যে পনেরো দিন সবসময় চোখ বুজে থাকি। আর বাকি পনেরো দিন চোখ খোলা রাখি।"

জোজো বলল, "পনেরো দিন সবসময় চোখ বুজে থাকেন? একবারও খোলেন না?"

সাধু বললেন, "না। সেই পনেরোদিন একেবারে অন্ধের মতন থাকি।"

জোজো বলল, "কেন?"

সাধু বললেন, "তাতে মনের মধ্যে বেশ একখানা আয়না তৈরি হয়। যত দিন যাচ্ছে, ততই সেই আয়নাটা পরিষ্কার হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, এ-কথাটা বেশ সুন্দর।"

সাধু এবার কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পায়ে বুঝি অসুখ আছে? কোনও কিছুর সাহায্য নিয়ে হাঁটতে হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমি খোঁড়া মানুষ। ক্রাচ নিয়ে হাঁটি। আপনি চোখ বুজে সেটাও দেখতে পেয়েছেন?"

সাধু একটু হেসে বললেন, "সবকিছু তো দেখার দরকার হয় না। আপনি একটু আগে বাথরুমে গেলেন, তখন খটখট শব্দ হচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "খটখট শব্দ শুনে বোঝা যেতে পারে যে, আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছি। কিন্তু আমি যে বাথরুমেই গিয়েছিলাম, তা আপনি বুঝলেন কী করে?"

সাধু বললেন, "চলন্ত ট্রেনে বয়স্ক লোকেরা নিজের জায়গা ছেড়ে আর কোথায় যান? বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করে অবশ্য।"

সন্তু চাপা গলায় বলল, "শার্লক হোম্‌স!"

সাধুটি সেটাও শুনতে পেয়ে বললেন, "আমি শার্লক হোম্‌সের অনেক গল্প পড়েছি একসময়। একটা গল্পের নাম 'দ্য হাউন্ড অফ বাস্কারভিল', তাই না?"

ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই বোঝা গেল, ইনি বেশ ভালই লেখাপড়া জানেন।

সন্তু বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি যদি কিছু মনে না করেন।"

সাধু বললেন, "তোমার মনে যা এসেছে, বলে ফেলো!"

সন্তু বলল, "আপনি সাধু হয়েছেন কেন?"

সাধু একটু সময় নিয়ে বললেন, "আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন পরে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেব।"

সন্তু বলল, "পাঁচদিন পর? আপনার সঙ্গে তখন দেখা হবে কোথায়? আমরা তো খিচিং-এ মাত্র তিনদিন থাকব।"

সাধু বললেন, "হবে, হবে, ঠিকই দেখা হবে।"

ট্রেন এসে থামল বারিপদা স্টেশনে। কিছু লোক নামল এখানে। কিছু যাত্রী উঠে এল হুড়মুড়িয়ে। নানারকম হকার শুরু করে দিল চেঁচামেচি। এর মধ্যে কথা বলা যায় না।

কাকাবাবু বড় এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ফেললেন। সন্তু আর জোজো তা থেকে বাদাম তুলে নিতে লাগল, খোসাগুলো মেঝেতে না ফেলে জড়ো করতে লাগল একটা খবরের কাগজ পেতে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে একটা চোখের ইঙ্গিত করলেন।

অর্থাৎ তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, সাধুবাবা বাদাম খাবেন কিনা।

সন্তু বলল, "স্যার, আপনি কি চিনেবাদাম খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ও কী, স্যার আবার কী? সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে নেই।"

জোজো বলল, "বলতে হয় মহারাজ, তাই না?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করার আগেই সাধুটি বললেন, "আমি বাদাম খেতে ভালইবাসি। কিন্তু আজ আমার উপবাস। তোমাদের কল্যাণ হোক।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি নিরম্বু উপবাস?"

সাধু মাথা নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "নিরম্বু মানে কী?"

কাকাবাবু বললেন, "অম্বু মানে জল। নিঃ অম্বু, তার মানে জল খাওয়াও চলবে না।"

জোজো বলল, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে অনেক সাধু আসেন, হিমালয় পাহাড় থেকে। একজনের নাম গাঠিয়াবাবা, তিনি টানা সাতদিন না খেয়ে থাকেন। এককোঁটা জলও খান না। একবার হয়েছে কী, তিনি ভগবানের গান গাইতে গাইতে কাঁদছেন, কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে এসে তাঁর মুখে ঢুকে গেছে! তাতেই তো জল খাওয়া হয়ে গেল! সেইজন্য তিনি তখন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। আর-একজন সাধু..."

তাকে বাধা দিয়ে সন্তু বলল, "তুই একটু চুপ কর তো! কাকাবাবু, তুমি যে বাঘের গল্পটা বলছিলে—"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা পরে বলব।"

সন্তু বলল, "পরে না, এখনই বলো।"

কাকাবাবু বললেন, "গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তোরা খৈরি বলে কোনও বাঘের নাম শুনেছিস?"

জোজো আর সন্তু দু'দিকে মাথা নেড়ে বোঝাল যে, নাম শোনেনি।

কাকাবাবু বললেন, "তোরা জানবি কী করে। অনেক বছর আগের কথা। এখানে যোশিপুর নামে জায়গায় একটা ফরেস্ট বাংলো আছে। সেখানে খৈরি নামে একটা পোষা বাঘ ছিল।"

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "দেখলি, দেখলি, বাঘ পোষ মানে কি না!"

কাকাবাবু বললেন, "এ-বাঘটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষ মানেনি। খৈরি নামে একটা ছোট্ট নদী আছে, তার কাছে এক ফরেস্ট অফিসার একটা বাচ্চা বাঘ পেয়েছিলেন, তার মা কাছাকাছি ছিল না। তিনি বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে এনে বাংলোতে রাখলেন। তার নাম দিলেন খৈরি। দিন দিন সেটা বড় হতে লাগল। দিকে দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল, কারণ একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পোষ মানাবার চেষ্টা হচ্ছে, এটাই তো আশ্চর্য ঘটনা।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "বাঘটা কত বড়?"

কাকাবাবু বললেন, "ছোট্ট অবস্থায় কুড়িয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু আমি

যখন দেখি, ততদিনে সেটা মস্ত বড় হয়ে গেছে। সাধারণ বাঘের চেয়েও বড়। কেন জানিস? বনের বাঘকে তো প্রচুর পরিশ্রম করে শিকার খুঁজতে হয়, হরিণের পেছনে দৌড়োতে হয় মাইলের পর মাইল। কিন্তু খৈরিকে সেসব কিছুই করতে হয় না, তাকে রোজ খেতে দেওয়া হয় দশ কিলো মাংস। সে দিব্যি বসে বসে খায়। আর মোটা হয়।"

জোজো বলল, "কীসের মাংস? মানুষের?"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ! মানুষের মাংস পাওয়া যাবে কোথায়? সব বাঘ মানুষের মাংস খায়ও না। ওকে দেওয়া হত মোষের মাংস। সেই খেয়ে খেয়ে বাঘটা বেশ মোটা আর থলথলে হয়ে গিয়েছিল। ওকে রাখা হয়েছিল বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে। সেখানে অনেকটা বাগান আছে, সবই তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। বাঘটা তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বাঁধা থাকে না?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওই বাংলোর মধ্যে যেখানে খুশি যেতে পারে, এমনকী ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে।"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি একা গিয়েছিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে ছিল নরেন্দ্র ভার্মা। তার মানে, আমি যে সত্যি ঘটনা বলছি, তার সাক্ষী আছে। নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি। আমরা দু'জনে যাচ্ছিলাম সিমলিপাল ফরেস্টে, রাত্তিরটা ওই বাংলোয় থাকতে হবে। বাংলোটার ঠিক সামনেই একটা গোলমতন বসার জায়গা। ফরেস্ট অফিসারের নাম সরোজ চৌধুরী, আমরা তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, একটু দূরে একটা গাছতলায় বাঘটাকে খাওয়ানো হচ্ছে।"

জোজো বলল, "খাওয়ানো হচ্ছে মানে? খাইয়ে দিতে হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো দেখলাম। একজন ভদ্রমহিলা বড় বড় মাংসের টুকরো ওর মুখের কাছে ধরছেন, আর বলছেন, 'খাও, লক্ষ্মীসোনা, আর-এক গেরাস খেয়ে নাও!' বাঘটা গরর-গরর শব্দ করছে, আর মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে দূরে। তখন ভদ্রমহিলা ডাকছেন, 'খৈরি, দুষ্টুমি করে না, এদিকে এসো, এখনও অর্ধেকটাও খাওয়া হয়নি, চলে এসো। এরপর একটা চকোলেট দেব!'"

জোজো হেসে ফেলল।

কাকাবাবুও হেসে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কিন্তু এর প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যি। ঠিক যেন দুরন্ত একটা বাচ্চা ছেলে, তাকে খাওয়ানো হচ্ছে

ভুলিয়ে-ভালিয়ে। আসলে, বাঘেরা একসঙ্গে অনেকটা খায় না। শিকার করে খানিকটা খেয়ে চলে যায়। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার ফিরে আসে, আবার খায়। একবার বাঘটা চলে এল আমাদের কাছে। কোনও বাড়ির পোষা কুকুর যেমন নতুন লোকজন দেখলে কাছে এসে গন্ধ শোঁকে, এই বাঘটাও সেরকম করতে লাগল। কিন্তু এটা তো কুকুর নয়, বাঘ। যতই পোষা হোক বা না হোক, অত কাছাকাছি একটা বাঘ দেখলে তো ভয় লাগবেই।"

জোজো বলল, "এক-একটা কুকুর দেখলেও আমার ভয় লাগে। একবার কাশ্মীরে একটা কুকুর প্রায় বাঘের মতনই বড়, হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে..."

সন্তু বলল, "এই জোজো, তুই চুপ কর। তোর গল্প পরে শুনব। এখন কাকাবাবুকে বলতে দে!"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমি গল্প বলি না। সব ফ্যাক্ট!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা হাত-পা গুটিয়ে সিঁটিয়ে বসে আছি দেখে সরোজবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না। ও কাউকে কামড়ায় না। কাছে এলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিন!' কিন্তু আমার সে সাহস হল না! নরেন্দ্রকে তো জানিস, খুব সাহসী, আর ডাকাবুকো মানুষ, সে একবার ডান হাতটা তুলতেই বাঘটা তার কনুইটা মুখে ভরে ফেলল।"

সন্তু বলল, "অ্যাঁ? কামড়ে দিল?"

কাকাবাবু বললেন, "কনুইটা মুখে ভরে দিল বাঘটা। কিন্তু দাঁত বসায়নি! যে-কোনও মুহূর্তে হাতটা কেটে নিতে পারে।"

সন্তু বলল, "নরেনকাকা কী করলেন তখন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগে অনেকবার শুনেছি যে, খুব ভয় পেলে নাকি মানুষের চুল খাড়া হয়ে যায়। সেই প্রথম দেখলাম স্বচক্ষে। নরেন্দ্রর সব চুল খাড়া হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"আমি চেঁচিয়ে সরোজবাবুকে বললাম, 'ও মশাই, বাঘটাকে সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন!'

"সরোজবাবু বললেন, 'জোর করে ওকে সরানো যায় না! নড়বেন না, একদম নড়বেন না। ও কিছু করবে না।'

"আমি তবু বললাম, 'আপনার কাছে ডেকে নিন! ও যদি আমার বন্ধুকে কামড়ায়!'

"আমি বোধহয় খুব জোরে চেঁচিয়েছিলাম, তাই বাঘটা নরেন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল আমার কাছে। ফোঁস ফোঁস করে খানিকটা গন্ধ শুঁকে সরে গেল। তারপর অন্য যে চেয়ারগুলো ফাঁকা ছিল, সেগুলোরও গন্ধ শুঁকতে লাগল।

"বাঘটা নরেন্দ্রকে পুরো কামড়ায়নি বটে, কিন্তু একটা দাঁত ফুটে গেছে, একটু একটু রক্তও বেরোচ্ছে। দু'-এক মিনিটের মধ্যে একটু সামলে নিয়ে নরেন্দ্র বলল, 'রাজা, আমরা কিছুতেই এখানে রাত্রে থাকব না। চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।'

"কিন্তু বাঘটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কাছাকাছি। ওর পাশ দিয়ে যাব কী করে? তবু, আমি কিছু না ভেবে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা আমার কাছে চলে এসে মাথা দিয়ে আমার বগলে একটি ঢুসো মারল।

"এমনিতেই দারুণ গরম ছিল। তার উপরে ভয়ের চোটে দরদরিয়ে ঘাম বেরিয়ে আমার জামা একেবারে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে!

"সরোজবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না। ও ঘামের গন্ধ ভালবাসে। খৈরি, খৈরি কাম হিয়ার!'

"আমি ভাবলাম, রোজ রোজ মোষের মাংস বোধহয় ওর একঘেয়ে লাগছে। তাই আজ একটু মানুষের মাংস খেতে চাইছে। এখনও মন ঠিক করতে পারছে না। ও আমার বগলের কাছে আর-একবার ঠুসো মারতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দু'পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুটো থাবা রাখল আমার বুকের উপরে। আমার ঠিক মুখের সামনে ওর বিরাট হাঁড়ির মতন মুখ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। জীবনে এত ভয়ই পাইনি কখনও, ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। যে-কোনও মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনার সব চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো উঠেছিল। নিজের চুল তো নিজে দেখা যায় না!"

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আর দু'-এক মুহূর্ত দেরি হলে নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। বাঘটা সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করল, তাতেই বৃষ্টির মতন তার থুতু আর লালা এসে লাগল আমার মুখে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে যে-মহিলাটি বাঘটিকে মাংস খাওয়াচ্ছিলেন,

তিনি এসে বাঘটার কাঁধে চাপড় মেরে বলতে লাগলেন, 'খৈরি, খৈরি, দুষ্টুমি করে না, এসো, খেয়ে নেবে এসো—।' তখন বাঘটা আমাকে ছেড়ে সুড়সুড় করে চলে গেল তাঁর সঙ্গে!"

একটু থেমে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে কাকাবাবু বললেন, "বাবা, সেই ঘটনা মনে পড়লে এখনও আমার বুক কাঁপে। তা হলে বুঝলে তো, জোজোকুমার, আমাদের জীবনেও অনেক সত্যিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে। বাঘের থাবার ছাপকে বলে পাগ মার্ক, আমার বুকের উপর পাগ মার্ক পড়েছিল! সে রাত্তিরে আর আমরা সেখানে থাকিনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "শেষ পর্যন্ত বাঘটার কী হল?"

কাকাবাবু বললেন, "শেষ পর্যন্ত খৈরি পোষ মানেনি। ক্রমশ ওর শিকার করার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। বাংলোর একটা পোষা কুকুরকে মেরে ফেলল একদিন। ওখানে যারা গার্ড ছিল, তাদের কয়েকজনকে থাবা মেরে আহত করল। তখন ঠিক করা হল, ওকে জঙ্গলে ছেড়ে আসা হবে। পরের ব্যাপারটা বেশ দুঃখের। জঙ্গলে ছেড়ে আসা হল খৈরিকে। কিন্তু জঙ্গলের অন্য বাঘরা ওকে আপন করে নিতে চাইল না। মানুষের কাছাকাছি বেশিদিন থাকলে বাঘের গায়েও নাকি মানুষ মানুষ গন্ধ হয়ে যায়। তাই একদিন কয়েকটা বাঘ মিলে মেরে ফেলল খৈরিকে।"

ট্রেনটা বাদামপাহাড় স্টেশনে পৌঁছোল ঠিক সন্ধের মুখে।

কাকাবাবুদের সঙ্গে সেই সাধুবাবাও নামলেন এখানে। এখনও চক্ষু বোজা। সেই অবস্থাতেও ট্রেন থেকে নামতে কোনও অসুবিধে হল না। দিব্যি হেঁটে চললেন গেটের দিকে।

বিনয়ভূষণ মহাপাত্র নামে একজন পুলিশ অফিসারের স্টেশনে অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু সেরকম কাউকে দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো এসে পৌঁছোতে পারেনি। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে দেখা যাক।"

প্ল্যাটফর্মে বেশি লোকজন নেই। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সি মানুষ এঁদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। কাকাবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে সে বলল, "আপনি রাজা রায়চৌধুরী, না?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

লোকটি বলল, "আপনি এখানে এসেছেন, সাবধানে থাকবেন। আপনার বিপদ হতে পারে, সাবধানে থাকবেন।"

তারপরই সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "সন্তু, ওই লোকটাকে ধরে দাঁড় করা তো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

সন্তু আর জোজো দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটির দু'পাশে।

ক্রাচ বগলে নিয়ে ওদের কাছে এলেন কাকাবাবু।

ধুতি পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? আপনি হঠাৎ আমাকে ভয় দেখালেন কেন?"

লোকটি বলল, "ভয় দেখাইনি তো! আপনাকে শুধু একটু সাবধান করতে চাইলাম। আমি একজন সাধারণ মানুষ।"

কাকাবাবু বললেন, "গায়ে পড়ে সাবধান করতেই বা গেলেন কেন?"

লোকটি বলল, "বাঃ, মানুষ মানুষকে সাহায্য করে না?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক, আমার কী বিপদ হতে পারে, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন!"

লোকটি বলল, "না, তা জানি না। তবে, আপনি তো বিখ্যাত লোক। আপনার যেমন অনেক ভক্ত আছে, তেমনই বেশ কিছু শত্রুও আছে। তাই আপনাকে এখানে দেখে মনে হল, যদি শত্রুরা আপনার আসবার কথা টের পায়... আমি চলি, আমাকে বাস ধরতে হবে!"

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বের করে বলল, "কিছু মনে করবেন না, আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?"

লোকটি একটু দ্বিধা করে বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের কাকাবাবুর সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলে দাও। ছবিটা আমি বাঁধিয়ে রাখব।"

ক্যামেরা ফোকাস করতে করতে সন্তু বলল, "কিন্তু ছবিটা আপনাকে দেব কী করে?"

লোকটি বলল, "সে আমি ঠিক জোগাড় করে নেব। আশাকরি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

ছবি তোলা হয়ে গেলে সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে

আর-একটা কথা বলে যাই। আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছেন, তা সফল হবে না!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "যে কাজের জন্য এসেছি মানে? আমি তো কোনও কাজে আসিনি। এমনিই বেড়াতে এসেছি।"

লোকটি এবারে শুধু হাসল। তারপর হাত জোড় করে বলল, "আচ্ছা চলি, নমস্কার!"

সে গেটের দিকে চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য! একজন সাধুবাবা বলল, পাঁচদিন পর আবার দেখা হবে। এই লোকটিও বলল, আবার দেখা হবে! এখানে থাকব মোটে তিনদিন, তারপর চলে যাব সম্বলপুর।"

জোজো বলল, "আমার মনে হয়, এই লোকটি জ্যোতিষী।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করে বুঝলি?"

জোজো বলল, "উনি সব কথা বলছিলেন কাকাবাবুর কপালের দিকে তাকিয়ে। কোনও কোনও জ্যোতিষী মানুষের কপাল দেখেই তার মনের কথা বলে দিতে পারে। আমার বাবা একবার দিল্লি এয়ারপোর্টে বসে ছিলেন, একসময় দেখতে পেলেন সদলবলে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী। রাজীব গাঁধীর কপালের দিকে তাকিয়েই বাবা চমকে উঠলেন। অমনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রাজীব, রাজীব, এক মিনিট দাঁড়াও।' ওইভাবে অবশ্য ডাকা উচিত হয়নি। অত লোকজনের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী তো। রাজীব সেই ডাক শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালেন, তারপর কাছে এসে বাবাকে প্রণাম করলেন পায়ে হাত দিয়ে। ছেলেবেলায় ওঁর মায়ের হাত ধরে তো অনেকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমার মায়ের হাতের রান্না চিঁড়ের পোলাও খেয়ে বলেছেন, 'আর-একটু দিন!' বাবা ওঁকে সেদিন জিজ্ঞেস করলেন—"

জোজোর গল্প শেষ হল না, পুলিশের পোশাক-পরা একজন লোক হাজির হলেন দৌড়োতে দৌড়োতে। তাঁর সঙ্গে একজন সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "মাপ করবেন স্যার, আমাদের পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল। আসলে এই ট্রেনটা কোনওদিন ঠিক সময়ে আসে না। অন্তত দেড়-দু'ঘণ্টা লেট হয়, আজই এসে পড়েছে ঠিক সময়। আমাদের আবার দেরি হল, রাস্তায় হাতি এসে পড়ে অনেকটা সময় নষ্ট করে দিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম বিনয়ভূষণ মহাপাত্র, আর এর নাম গুরুপদ রায়।"

কাকাবাবু বললেন, "এই যে আমার ভাইপো সন্তু আর ওর বন্ধু জোজো। চলুন এবার যাওয়া যাক!"

বিনয়ভূষণ বললেন, "আগে একটু চা-টা খেয়ে বিশ্রাম নেবেন, না এক্ষুনি রওনা হবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ট্রেনে এসেছি, পরিশ্রম তো হয়নি কিছু। বিশ্রাম নেওয়ার দরকার নেই। খিচিং পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "জিপ এনেছি। ঘণ্টাদুয়েকের রাস্তা, তবে আবার যদি হাতি এসে পড়ে, তা হলেই মুশকিল।"

সন্তু বলল, "হাতি এসে পড়লে তো ভালই। বেশ হাতি দেখা যাবে! ছবি তুলতে পারব?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "হাতির পাল এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতে পারে। খুব কাছে তো যাওয়া যাবে না। মেজাজ খারাপ থাকলে জিপগাড়ি উলটে দেয়।"

জোজো বলল, "হাতি তো এমনিতে খুব শান্ত প্রাণী। তাদের মেজাজ খারাপ হয় কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গল থেকে হাতিরা যখন বেরিয়ে আসে, মাঝে মাঝে তারা খিদের চোটে কোনও ফসলের খেতে ঢুকে পড়ে। তাতে প্রচুর ফসলের ক্ষতি হয়। হাতিরা যত খায়, তার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। সেইজন্য ফসল যারা চাষ করে, সেই চাষিরা খেপে যায়। হাতি তাড়াবার জন্য তারা বড় বড় জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারে। সেই মশালের আগুনে আহত হলে হাতিরাও খেপে ওঠে। তখন সামনে যা পায়, তাই ধ্বংস করে।"

জোজো বলল, "ইস, হাতিদের গায়ে মশাল ছুড়ে মারে? ভেরি ব্যাড। ওদের খিদে পেলে তো ওরা ফসল খাবেই!"

সন্তু বলল, "বা রে, চাষিরা কি হাতিদের খাওয়াবার জন্য ফসল ফলায়? ওই ফসল বিক্রি করে তাদের সারা বছর চলে। ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তারাই বা খাবে কী?"

জোজো বলল, "একেই বলে হর্নস অফ আ ডায়লেমা। আচ্ছা কাকাবাবু, যদি আপনাকে বিচার করতে বলা হয়, হাতিরা যদি খিদের সময় ফসল খেয়ে ফেলে, তারা তো জানে না কার খেত কিংবা কারা চাষ করেছে, খিদে পেয়েছে তাই খেয়েছে। আর ওদিকে চাষিরা তাদের ফসল নষ্ট হচ্ছে দেখে রাগের চোটে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারে। তা হলে কারা বেশি দোষী? হাতিরা, না চাষিরা?"

কাকাবাবু বললেন, "আসল অপরাধী হচ্ছে, যারা বেআইনিভাবে জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে গাছ বিক্রি করার লোভে। জঙ্গল কমে যাচ্ছে, জঙ্গলে খাবার কমে যাচ্ছে বলেই তো হাতিরা বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই অপরাধীদের ধরা যায় না।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "ঠিক বলেছেন স্যার! আগেকার তুলনায় এদিকে কত জঙ্গল কমে গেছে। জঙ্গল-কাটা ফাঁকা জমিতে শুরু হচ্ছে চাষ। হাতিরা তা বুঝবে কী করে? তাই তারা ফসলের খেতে ঢুকে পড়ে।"

এর মধ্যে সবাই মিলে উঠে পড়েছে একটা জিপগাড়িতে।

থানার ড্রাইভার অসুস্থ বলে আসেনি, গাড়ি চালাচ্ছে গুরুপদ রায়। তার মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের কালো, মনে হয় যেন কখনও আগুনের ঝাপটা লেগেছিল। সে এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি।

বিনয়ভূষণের ফরসা গোলগাল মুখ, মাথার অর্ধেকটা টাক। মাঝে মাঝে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন আর খালি হাতটাই বের করে আনছেন।

কাকাবাবু বসেছেন সামনে। ড্রাইভারের পাশের সিটে। পিছনে বাকি তিনজন। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো, অনবরত লাফাচ্ছে জিপ।

তবে আকাশটা এখন দেখার মতন। দিনের শেষে বিদায় নিচ্ছেন দিনমণি। পশ্চিমের আকাশ ঠিক লাল নয়, সোনার মতন ঝকঝকে। কিছু কিছু মেঘের খানিকটা লাল, খানিকটা কালো হয়ে এসেছে। এক-এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে সেই লাল রং পেরিয়ে কালোর দিকে।

দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাহাড়। এক-এক জায়গায় পাহাড়ের চূড়া মিশে গেছে মেঘের সঙ্গে।

বিনয়ভূষণ আর-একবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু যদি মনে না করেন। আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি? আপনি সিনিয়র অফিসার, আপনার অনুমতি না নিয়ে তো খাওয়া যায় না!"

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, খান। আমি এখন আর অফিসার নই, আসলে আমি সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারি না। একটার বেশি খাবেন না।"

বিনয়ভূষণ বিগলিতভাবে বললেন, "না, না, স্যার, একটার বেশি নয়। জানলার বাইরে ধোঁয়া ছাড়ছি।"

সন্তু অন্যদিকের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দু'দিকের

গাছপালা অন্ধকারে ঝুপসি হয়ে এসেছে। হঠাৎ মনে হয় যেন চুপ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে একপাল হাতি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে বাঘ আছে?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "ঠিক এখানে নেই, তবে সিমলিপাল জঙ্গলে অনেক বাঘ আছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা ছিটকে এদিকেও চলে আসে। গত মাসেও একজোড়া এসেছিল, কয়েকটা গোরু মেরেছে।"

সন্তু বলল, "সিমলিপাল জঙ্গলে এখান থেকে যাওয়া যায় না?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "হ্যাঁ, যাবে না কেন? আমি নিয়ে যেতে পারি। জঙ্গলের মধ্যে ভারী সুন্দর সুন্দর সব জায়গা আছে। চাহালা, নওয়ালা, বহেরি পানি, জেরান্ডা, গুরগুরিয়া, জেনাবিল, যেখানে যেতে চাও।"

সন্তু বলল, "গুরগুরিয়া নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওখানেই যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের এদিককার ফরেস্ট বাংলো যোশিপুরে একসময় একটা পোষা বাঘ ছিল, খৈরি। তার কথা আপনার মনে আছে?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? বছর কুড়ি আগেকার কথা। তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি। দু'-একবার দেখেছি বাঘটাকে। সেটার শেষ পর্যন্ত কী হল জানেন তো! বাঘটা এমনিতে শান্তই ছিল। ফরেস্ট অফিসার সরোজবাবু সেটাকে অনেকটা পোষ মানিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু বাঘ বলে কথা, অতি পাজি প্রাণী। অতবড় হাতি পর্যন্ত পোষ মানে, সিংহও পোষ মানে, কিন্তু বাঘ কিছুতেই মানুষের কথা শুনে চলতে রাজি নয়। একদিন হল কী, কলকাতা থেকে দু'জন বাঙালিবাবু এসেছিলেন ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। সেইদিনই খৈরি বাঘটার মেজাজ বিগড়ে গেল! প্রথমে এক ভদ্রলোকের কনুই খেয়ে ফেলল আধখানা। অন্য ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়েছিলেন, অমনি বাঘটা তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে প্রথমে জামাটা ছিঁড়ে দিল ফালা ফালা করে, তারপর ভদ্রলোকের বুকের উপর দুই থাবা রেখে কামড়ে দিল নাকে। কোনওরকমে বাঘটার গলায় শিকল বেঁধে তারপরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে আসা হল জঙ্গলে।"

কাকাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সন্তু আর জোজোর ঠোঁটেও হাসির ঢেউ।

বিনয়ভূষণ একটু আহতভাবে বললেন, "আপনি স্যার আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?"

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, "না, না, বিশ্বাস করব না কেন? তবে, আমিই সেই বাঙালিবাবু। অনেকদিন কেটে গেছে তো, তাই গল্পটা অনেক রং চড়ানো হয়ে গেছে। খৈরি আমার বুকের উপর দুই থাবা রেখে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু মোটেই আমার নাক কামড়ে দেয়নি। এই দেখুন, আমার নাক ঠিকই আছে। আমার জামাটাও ফালা ফালা করেনি, সে জামাটা এখনও রেখে দিয়েছি আমি। আর আমার বন্ধুর আধখানা কনুইও খেয়ে নেয়নি, শুধু একটা দাঁত ফুটিয়েছিল। আমার বন্ধু সেই হাতে এখনও টেনিস খেলে।"

সন্তু বলল, "তার পরেও তো বাঘটা ওখানে কিছুদিন ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের জন্যই ওকে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি। আরও বোধহয় মাস ছয়েক ছিল। কিন্তু আর কয়েকজনকে আক্রমণ করার পর বোঝা গিয়েছিল, ওকে আর রাখা যাবে না।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "বাঘটাঘ দূর থেকে দেখাই ভাল। সিমলিপালে ওয়াচ টাওয়ারের ভাল ব্যবস্থা আছে।"

জোজো বলল, "আমি বাঘ দেখতেও চাই না, হাতি দেখতেও চাই না। আমি এই ক'টা দিন শুধু খাব আর ঘুমোব। এই রাস্তায় কোনও কচুরি-শিঙাড়ার দোকান নেই? ওড়িশার কচুরি বিখ্যাত।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "একটা ছোটমতন শহর পড়বে মাইলকুড়ি দূরে। সেখানে দু'-একটা দোকান আছে।"

এখন দু'পাশে মিশমিশে অন্ধকার।

শুধু হেডলাইটের আলোতে দেখা যায় সামনেটা। মনে হয় রাস্তার দু'ধারে ঘন জঙ্গল।

গুরুপদ এতসব কথার মধ্যে একটা মন্তব্যও করেনি। গাড়ি চালাচ্ছে বেশ জোরে।

সে বোবা কি না পরীক্ষা করার জন্য কাকাবাবু বললেন, "আপনি বড্ড জোরে চালাচ্ছেন ভাই। যদি রাস্তার উপর হাতিটাতি দাঁড়িয়ে থাকে, ব্রেক কষতে অসুবিধে হবে না?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি এ রাস্তাটা ভাল চেনা আছে?"

সে এবার যেন দয়া করে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বাড়ি কি এই জেলায়?"

এবারও সে বলল, "হুঁ।"

কাকাবাবু তার সঙ্গে আলাপ করার আশা ছেড়ে দিলেন।

বাইরে হাত বাড়িয়ে বললেন, "একটুও হাওয়া নেই। গুমোট হয়ে আছে। একটু পরেই বোধহয় বৃষ্টি হবে।"

সন্তু ভাবল, এই রে, এইবার কাকাবাবু তাঁর প্রিয় গানটা গাইতে শুরু করবেন। তিনি যেন আর অন্য গান জানেনই না। এ গানও তাঁর নিজের সুর দেওয়া।

শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ
টকটক থাকে না কো হলে পরে বিষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি!

কিন্তু সন্তুকে অবাক করে দিয়ে গানের বদলে কাকাবাবু বললেন, "আঠারোশো আটান্ন সালের জুন মাস। সেদিনও বোধহয় এরকমই গরম ছিল!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই দিনটায় কী হয়েছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "কী জানি! এমনিই মনে পড়ল।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "আপনাদের স্যার কী প্ল্যান? ক'দিন থাকবেন এখানে? আমাদের বস্ বলে দিয়েছেন, আপনি যে-ক'দিন থাকবেন, আপনার দেখাশুনো করার দায়িত্ব আমার। আপনারা যেখানে যেতে চাইবেন, আমি নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "এই রে! তা হলে তো খুব বিপদ! আমাদের মোটেই দেখাশুনো করতে হবে না। কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও'র নাম শুনেছেন তো? তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, দিনতিনেক থাকব। সন্তুরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চায়, ওঁর বাড়ির গাড়িই নিয়ে যাবে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও তো খুব অসুস্থ।"

কাকাবাবু বললেন, "তা জানি। সেইজন্যই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমার সঙ্গে অনেকদিনের চেনা। শুনুন বিনয়বাবু, আমি যে এখানে এসেছি, তা খুব বেশি লোককে জানাতে চাই না। পুলিশের গাড়িতে ঘুরলে তো সবারই কৌতূহল হবে। সুতরাং আমাদের পৌঁছে দেওয়ার পরই আপনার ছুটি। কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আমি অনেক বারণ করেছিলাম, তবু সে জোর করে আপনাদের খবর পাঠিয়েছে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "স্যার, আপনি এ-রাজ্যের অতিথি। আপনার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তা আমাদের দেখতে হবে অবশ্যই!"

কাকাবাবু বললেন, "ভঞ্জদেওদের বাড়িতে অতিথি হচ্ছি, ওঁরাই দেখাশুনো করবেন।"

সন্তু বলল, "যাঃ, হাতিটাতি তো কিছুই দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে দু'-একটা কুকুর।"

জোজো বলল, "আমি মোটেই হাতি দেখতে চাই না। আমার খিদে পেয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোকুমারের কাছ থেকে আর কোনও গল্প শুনতে পাচ্ছি না।"

সন্তু বলল, "খিদে পেলে জোজোর গল্প বন্ধ হয়ে যায়।"

গাড়ির চালক আবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠেছে জিপটা।

কাকাবাবু একটু বিরক্তভাবে বললেন, "আমাদের গুরুপদবাবুর মনে হচ্ছে বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে। খারাপ রাস্তায় জোরে গাড়ি চালানো আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

পিছন থেকে বিনয়ভূষণ বললেন, "ওহে গুরুপদ, স্যার বলছেন আস্তে চালাতে, তবু তুমি জোরে চালাচ্ছ কেন?"

গুরুপদ সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে পিছনে হেলান দিল।

বিনয়ভূষণ বললেন, "এ কী, থামালে কেন? থামাতে তো বলিনি, একটু আস্তে চালাতে বলেছি।"

গুরুপদ নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কথা বলেন না কেন?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "ও এইরকমই। একবার একটা খুব বড় অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল, তারপর থেকেই! মুশকিল হয়েছে কী, লাস্ট মোমেন্টে আমাদের থানার ড্রাইভার জানাল যে, আসতে পারবে না, তার খুব পেট খারাপ হয়েছে। বাইশ বার নাকি বাথরুম গেছে সারাদিনে। আমি নিজে গাড়ি চালাতে জানি না, তাই ওকে আনতে হল। নইলে আমার সঙ্গে অন্য একজন সাব-ইনস্পেক্টরের আসার কথা ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা কি এখানে থেমেই থাকব?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "না, না, এসব জায়গা মোটেই ভাল না। ও ভাই গুরুপদ, প্লিজ চলো, তোমাকে আমরা খারাপ কথা তো কিছু বলিনি, শুধু একটু আস্তে চালাবার অনুরোধ করেছি। চলো, চলো।"

গুরুপদ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। একটু পরেই স্পিড বাড়াতে লাগল। আবার আগের মতন।

এক-একজন বোধহয় আস্তে গাড়ি চালাতে জানেই না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পর হঠাৎ গুরুপদ হেডলাইট অফ করে দিল। গাড়ি ছুটল সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে। আকাশেও কোনও আলো নেই।

বিনয়ভূষণ বললেন, "এ কী, এ কী করলে? হেডলাইট খারাপ হয়ে গেল?"

কোনও উত্তর নেই।

কাকাবাবু আদেশের সুরে বললেন, "আপনি গাড়ি থামান! আপনার আর চালাবার দরকার নেই।"

লোকটি তবু কোনও কথা বলল না, গাড়িও থামাল না।

একটু পরেই গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল কিছুর সঙ্গে। কাকাবাবু ছিটকে পড়ে গেলেন বাইরে।

পিছনের সিটের তিনজন একবার লাফিয়ে উঠে আবার পড়ল ধপাস করে।

জোজো চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ, উঃ, আমার হাত ভেঙে গেছে! আমার মাথা ফেটে গেছে!"

জিপটা কিন্তু উলটে যায়নি। সেটা ধাক্কা মেরেছে একটা মোটা গাছে।

সন্তু কাকাবাবুকে বাইরে পড়ে যেতে দেখেছে। তাই একটু ধাতস্থ হয়েই সে লাফিয়ে বাইরে নেমে কাকাবাবুকে খুঁজতে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, "কাকাবাবু!"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছেন। সন্তুর ডাক শুনে বললেন, "এই যে, এখানে আমি!"

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আন্দাজে সন্তু কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "তোমার কোথায় লেগেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়া, এক-এক করে মিলিয়ে নিই।"

মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "চটচট করছে না, রক্তটক্ত বেরোয়নি, তার মানে মাথা ফাটেনি। চোখ দুটো ঠিক আছে, নাক ঠিক আছে, দাঁত, একটা দাঁত নড়ে গেছে মনে হচ্ছে। হাত দুটোও তো ঠিক আছে দেখছি। শুধু বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যথা। ও কিছু না, সামান্য!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "পা?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে একটু ধর, উঠে দাঁড়াই, তারপর বুঝব!"

দাঁড়িয়ে দুটো পা একবার করে মাটিতে ঠুকে বললেন, "ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। ডান পা-টা ভাঙলেই হয়েছিল আর কী! সারা জীবনের মতন পঙ্গু!"

ততক্ষণে অন্যরাও এসে পড়েছে সেখানে।

জোজো প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আপনার কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু হয়নি, খুব জোর বেঁচে গেছি!"

জোজো বলল, "আমার মাথা ফেটে গেছে আর হাত ভেঙে গেছে।"

সন্তু জোজোর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "রক্ত নেই। তুই ধাক্কা খেয়েছিস। মাথা ফাটেনি। কোন হাত ভেঙেছে বললি?"

জোজো বাঁ হাতটা এগিয়ে দিতে সন্তু সে হাতটা ধরে একটা টান মারল। জোজো চেঁচিয়ে উঠল, "উ উ উ, লাগছে,লাগছে, খুব লাগছে!"

কাকাবাবু বললেন, "কবজিটা মচকে যেতে পারে। যাই হোক, এক্স-রে করে দেখতে হবে।"

বিনয়ভূষণ আর সন্তুরও তেমন কিছু আঘাত লাগেনি। তবে সন্তুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, সেকথা সে কাউকে বলল না।

কাকাবাবু বললেন, "ড্রাইভারের কী অবস্থা? তারই বেশি চোট লাগার কথা। তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্যাখো তো গাড়ির মধ্যে।"

বিনয়ভূষণ আর সন্তু অন্ধকারের মধ্যে হাত দিয়ে দেখল, ড্রাইভারের সিটটা খালি।

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আমারই মতন ছিটকে বাইরে পড়ে গেছে। সন্তু, আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টর্চটা বের কর।"

টর্চ জ্বেলে দেখা গেল, ওপাশেও ড্রাইভার নেই।

বিনয়ভূষণ অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, "গুরুপদ, গুরুপদ!"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

টর্চের আলোয় আশপাশের অনেকটা জায়গা খুঁজেও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না গুরুপদর।

চিন্তিতভাবে বিনয়ভূষণ বললেন, "সে তো আর বেশি দূরে পড়ে যেতে পারে না। গেল কোথায়?"

জোজো বলল, "এখন কী হবে? আমরা কী করে যাব?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "মহাবিপদে পড়া গেল! এখানে বেশিক্ষণ থাকা মোটেই উচিত নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-রাস্তায় আর কোনও গাড়িও তো চলছে না।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "সন্ধের পর এসব দিকে গাড়ি চলে না। শুধু দু'-একটা ট্রাক যায়। কিন্তু হাতি আসার কথা রটে গেলে তারাও কোথাও থেমে যায়।"

জোজো বলল, "ওই তো একটা গাড়ি আসছে!"

সত্যি দেখা গেল, এতক্ষণ বাদে উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি আসছে তীব্র হেডলাইট জ্বেলে।

বিনয়ভূষণ বললেন, "এটা যদি পুলিশের গাড়ি হয়, বেঁচে যাব। অন্য গাড়ি হলে বিশেষ লাভ নেই।"

সন্তু আর জোজো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলতে লাগল, "স্টপ, স্টপ। হেল্প, হেল্প!"

সে-গাড়ির চালক কাছে এসে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেটা একটা স্টেশন ওয়াগন। ভিতরে কতজন যাত্রী তা বোঝা গেল না।

হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়িটা একেবারে কাছে এসে গেল, বোঝাই গেল সেটা থামবে না।

সন্তু আর জোজো দৌড়ে সরে গেল পাশের দিকে।

বিনয়ভূষণ বললেন, "জানতাম, গাড়িটা থামবে না। এই অঞ্চলে ডাকাতির ভয় আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু-জোজোর বয়সি ছেলেরাও ডাকাত হয়? কী জানি, আজকাল হতেও পারে। যাই হোক, হাতির সঙ্গে যোগ হল ডাকাত। সাপটাপ?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "হ্যাঁ স্যার, অনেক সাপ আছে।"

জোজো বলল, "ওরে বাবা! সাপ! আমি গাড়িতে উঠে বসছি।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "গুরুপদকে না পাওয়া গেলে গাড়িটা চালাবে কে?"

তিনি আরও কয়েকবার গুরুপদর নাম ধরে ডাকলেন, টর্চের আলোও ঘুরিয়ে দেখলেন চতুর্দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "আগে দেখা যাক, গাড়িটা ঠিক আছে কি না।"
বিনয়ভূষণ বললেন, "কিন্তু চালাবে কে? আমি তো পারি না।"
কাকাবাবু বললেন, "সে না হয় আমিই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি খোঁড়া মানুষ হলেও গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয় না।"
তিনি ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে চাবি ঘোরালেন।
প্রথম কয়েকবার বিদঘুটে শব্দ হল। যেন গাড়িটাও বলতে চাইছে, 'আমার মাথা ফেটে গেছে। হাত ভেঙে গেছে!'
আসলে তেমন কিছু হয়নি। হঠাৎ ইঞ্জিন গরগর করে উঠল। কাকাবাবু ব্যাক করে গাড়িটাকে রাস্তায় তুলে আনলেন।
তারপর বললেন, "সবাই উঠে পড়ো।"
বিনয়ভূষণ বসলেন সামনে, বাকি দু'জন পিছনে।
কাকাবাবু বললেন, "কী করব, এখন যাব? গুরুপদকে ফেলে রেখে? যদি কোথাও সে অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে?"
বিনয়ভূষণ বললেন, "আর কোথায় থাকবে বলুন! অনেকখানি জায়গা তো খুঁজে দেখা হল। সেরকম ঝোপঝাড়ও নেই, শুধু বড় বড় গাছ।"
গাড়ি চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু হেডলাইট জ্বালালেন। ঠিকই জ্বলে উঠল। শুধু একদিকের কাচ ভেঙে গেছে।
বিনয়ভূষণ বললেন, "একী, হেডলাইট তো ঠিকই আছে। তখন নিভে গেল কী করে?"
কাকাবাবু বললেন, "নিভিয়ে দিলেই নিভে যায়।"
জোজো বলল, "কাকাবাবু, একটা কথা বলব? আমার মনে হয়, গাড়ির ড্রাইভার ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেন্টের একটু আগে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। তারপর দূরে সরে গেছে। তাই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"
কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তোমার অনুমানটাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সে এরকম করল?"
খিচিং পৌঁছোতে রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল।
ভঞ্জদেওদের বাড়িটি এককালে এক মস্ত বড় প্রাসাদ ছিল, এখন একেবারে ভগ্নদশা। অনেকখানি অংশ ব্যবহারই হয় না, ছাদ ভেঙে পড়েছে, গাছপালা গজিয়ে গেছে। শুধু সামনের দিকের কিছু অংশ সারিয়ে নতুন রং করা হয়েছে বোঝা যায়।
গাড়িটা এ-বাড়ির সামনেই রইল। বিনয়ভূষণ হেঁটেই চলে গেলেন থানায়।

গেটের গাছে রয়েছে এক দরোয়ান, সে একেবারে বুড়ো থুত্থুড়ে, মাথায় আবার একটা ঢাউস পাগড়ি, হাতে একটা বর্শা। তার গোঁফ, দাড়ি এমনকী ভুরু পর্যন্ত তুলোর মতন সাদা।

সে কাকাবাবুদের নিয়ে গেল ভিতরের চাতালে।

সেখানে দুটি চেয়ারে বসে আছে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে আর একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। ছেলেটি ধুতি আর হাফ-হাতা সাদা গেঞ্জি পরা, আর মেয়েটি পরে আছে একটা চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। সেটা অনেকটা আলুথালু, ঠিক মতন এখনও শাড়ি পরতে শেখেনি বোঝা যায়।

ছেলেটি কাকাবাবুকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন, আসুন!"

তারা দু'জনেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু সন্তুদের বললেন, "এ হচ্ছে প্রবীর, এখানকার ছোট রাজকুমার। আর এ তোমার বোন?"

প্রবীর বলল, "হ্যাঁ, আমার বোন কমলিকা। কাকাবাবু, আমাকে রাজকুমার বলে লজ্জা দেবেন না। রাজত্ব বা জমিদারি কিছুই নেই, দেখছেন তো বাড়ির অবস্থা! আমরা সাধারণ মানুষ।"

কমলিকা বলল, "আমাকে কেউ রাজকুমারী বললে শুনতে ভালই লাগবে। কিন্তু কেউ বলে না। দরোয়ানজি বলে 'খোকি', আর রান্নার মাসি বলে 'ছুটকি'!"

কাকাবাবু, সন্তু আর জোজোর সঙ্গে পরিচয় করাতে যেতেই কমলিকা বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, দেখি আমি চিনতে পারি কি না। ওদের সব গল্পই তো আমি পড়েছি!"

তারপর সে সন্তুর গা ছুঁয়ে বলল, "এই হচ্ছে সন্তু, আর ও জোজো।"

জোজো বলে উঠল, "হল না, হল না! আমি সন্তু আর ও জোজো!"

কমলিকা বলল, "এ জোজো? মুখ দেখে তো মনে হয় না, এ বানিয়ে বানিয়ে এত গল্প বলতে পারে!"

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, "আমি মোটেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি না। সব সত্যি ঘটনা। সব ফ্যাক্ট! আমার বাবা একবার ইংল্যান্ডের রানিকে বলেছিলেন, 'আপনি নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজবেন। তাতে আপনার হাসিটা মিষ্টি দেখাবে।' রানি এলিজাবেথ তাঁর আত্মজীবনীতেও একথা লিখেছেন।"

কাকাবাবু মিটিমিটি হাসছেন। এবার বললেন, "চলো, আগে হাতমুখ ধুয়ে নেওয়া যাক। সারা গায়ে প্রচণ্ড ধুলো।"

প্রবীর বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপরে চলুন। বাবা আপনাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। আপনাদের অনেক দেরি হল। উনি ওষুধ খেয়ে ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। কাল কথা বলবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আর ওঁকে ডিসটার্ব করতে হবে না। আমাদের পৌঁছোতে খুবই দেরি হয়ে গেল।"

প্রবীর বলল, "আমাদের এক কাকা শুধু থাকেন এ বাড়িতে। তাঁর নাম রুদ্রশেখর। তিনিও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল উনি বাংরিপোসি গেছেন। দু'-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। আমরা তো দিনতিনেক থাকছি!"

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, "রাস্তা খারাপ ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "রাস্তা তো খারাপ ছিলই, তার চেয়েও বড় কথা, এক ড্রাইভারের পেট খারাপ, আর-এক ড্রাইভার অদৃশ্য।"

প্রবীর ভুরু তুলে বলল, "অদৃশ্য? তার মানে?"

কাকাবাবু বললেন, "এই সত্য ঘটনাটি জোজো পরে বলবে। এখন একটু চা খাওয়া দরকার।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখা গেল, একটা চওড়া বারান্দার একদিকের ভাঙা অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। একটা কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে টিমটিম করে।

সন্তু জোজোকে বলল, "এই সন্তু, দেখিস, যেন ভুল করে বারান্দার ওদিকটায় চলে যাস না। ধপাস করে নীচে পড়ে যাবি।"

জোজো বলল, "তুই-ই তো ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াস, জোজো!"

প্রবীর বলল, "ওখানে একটা দড়ি বাঁধা আছে।"

একটা ঘরের দরজা খুলে সে বলল, "এই আপনাদের ঘর। আপনাদের একটু অসুবিধে হবে। বাথরুমটা একতলায়। আগেকার দিনে তো ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম থাকত না। দোতলায় যে একটা মাত্র বাথরুম ছিল, সেটা ভেঙে পড়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "সে ঠিক আছে। ঘরটা তো দেখছি প্রকাণ্ড!"

প্রবীর বলল, "আপনারা বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।"

ঘরটি সত্যিই প্রকাণ্ড। মাঝখানে একটি পুরনো আমলের খাট পাতা, যাকে বলে পালঙ্ক। তাতে অন্তত পাঁচজন মানুষ শুতে পারে। একপাশে রয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল। তার আয়নাটা অবশ্য ফাটা। আর একদিকে

কয়েকটা বেতের চেয়ার। একটা আলমারি ভরতি বাঁধাই করা মোটা মোটা বই।

এত বড় ঘরে একটি মাত্র জানলা।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, এরা এত ভাল বাংলা শিখল কী করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা তো কলকাতায় থাকে। প্রবীর পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওর বোনও পড়ে কোনও ইসকুলে। এখানে কেউ থাকে না। সেইজন্যই তো বাড়িটার এই অবস্থা। এই খিচিং ছিল একসময় ময়ূরভঞ্জ রাজাদের রাজধানী। এখন কেওনঝড় এদিককার বড় শহর। প্রবীরের বাবা রাজা ছিলেন না, তবে রাজবংশেরই লোক। ওঁকে কেউ 'রাজাবাবু' বা 'মহারাজ' বললে উনি খুব চটে যান।"

জোজো বলল, "ভাঙা বাড়ি হলে কী হয়, একখানা যা দরোয়ান রয়েছে, দশজন ডাকাত এলেও সামলে দেবে!"

কাকাবাবু হেসে ফেললেন।

সন্তু বলল, "কাল সকালে ওর একটা ছবি তুলতে হবে! সান্টা ক্লজ সাজলে ওকে দারুণ মানাবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, তুমি আর সন্তু যে উলটো নামের খেলা শুরু করলে, সেটা কি আগে ভেবে রেখেছিলে?"

জোজো বলল, "না। হঠাৎ মনে হল!"

তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এলিজাবেথের গল্পটা সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে ফেললি!"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। তবে ওটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, ফ্যাক্ট!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তোরও তো দেখছি উদ্ভাবনী শক্তি কম নয়। দেখি, তোরা কতক্ষণ এই খেলা চালাতে পারিস! জোজো তো একটা কুকুর দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে! সন্তু আবার কুকুর ভালবাসে।"

জোজো বলল, "আমি কুকুর দেখলে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু সিংহ কিংবা গোরিলা দেখলে ভয় পাই না।"

কাকাবাবু বললেন, "দুঃখের বিষয়, ও দুটোর কোনওটাই এখানে নেই। তাই পরীক্ষা করে দেখা যাবে না।"

একটু বাদে বারান্দায় একটা ঘরর ঘরর শব্দ হল।

সন্তু দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, একটা ট্রলি ঠেলে ঠেলে আনছে কমলিকা।

তার উপর চায়ের পট, তিনটি কাপ, এক প্লেট সন্দেশ, এক প্লেট বিস্কুট আর এক প্লেট চানাচুর সাজানো।

ট্রলিটা নিয়ে ঘরে ঢোকার পর সে সন্তুকে বলল, "ইয়ে, আমি কিন্তু দাদাটাদা বলতে পারব না।, তোমাদের নাম ধরে ডাকতে পারি তো?"

সন্তু বলল, "তা পারো। কিন্তু আমার নাম ইয়ে নয়। কী বলো তো?"

কমলিকা বলল, "তুমি তো জোজো। আর ও সন্তু।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তোমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকব। তুমি এসব নিজে নিয়ে এলে? আর কেউ নেই?"

কমলিকা বলল, "রান্নার মাসি আছে। আর-একজন কাজের লোক জগোদাদা। কিন্তু আমাদের বাড়ির নিয়ম, বাড়িতে অতিথি এলে কাজের লোকের বদলে বাড়ির মেয়েদের নিজের হাতে খাবার দিতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল নিয়ম তো। তোমাকে কলকাতার বাড়িতে কখনও শাড়ি পরতে দেখিনি।"

কমলিকা বলল, "সেটাও এ-বাড়ির নিয়ম। এখানে সবসময় ছেলেদের শাড়ি আর মেয়েদের ধুতি পরে থাকতে হয়!"

সন্তু আর জোজো হো হো করে হেসে উঠল।

কমলিকা লজ্জা না পেয়ে বলল, "ভুল বলেছি, না? ছেলেরা ধুতি আর মেয়েরা শাড়ি। মেয়েরাও ধুতি পরে। যখন খুব বুড়ি হয় কিংবা উইডো হয়। উইডোর বাংলা কী?"

সে সন্তুর দিকে তাকাতেই সন্তু জোজোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "সন্তু বাংলা ভাল জানে!"

জোজো বলল, "উইডো হচ্ছে বিধবা। দ্য লেডি হু হ্যাজ লস্ট হার হাজব্যান্ড!। পুরুষরা কিন্তু কখনও শাড়ি পরে না।"

কমলিকা কাকাবাবুর হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বলল, "সন্দেশ খান। আর এই যেগুলো বিস্কুট মনে হচ্ছে, এগুলো আসলে নিমকি। এরকম গোল গোল নিমকি কলকাতায় পাওয়া যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু চা চেয়েছি, তুমি এত খাবার নিয়ে এলে? রাত্তিরে আর কিছু খেতে দেবে না বুঝি?"

কমলিকা বলল, "সে অনেক দেরি হবে। এই তো পোলাও রান্না শুরু হল।"

কাকাবাবু জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খাও, খিদে পেয়েছে বলছিলে!"

জোজো বলল, "আমার মোটেই যখন-তখন খিদে পায় না। ওই জোজো বলেছিল।"

কমলিকা ওদের দু'জনের কাছে মিষ্টির প্লেট নিয়ে গিয়ে বলল, "খাও। কাল তোমাদের কিচকেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে যাব। আজ মন্দিরে কী হয়েছে জানো? বলো তো কী হয়েছে?"

জোজো বলল, "নরবলি দেওয়া হয়েছে।"

সন্তু বলল, "মূর্তির চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে!"

কমলিকা বলল, "হল না। পাশের পুকুরটা বুজে গিয়েছিল, তাই ডিগ করা হচ্ছিল ক'দিন ধরে। ডিগের বাংলা কী?"

জোজো বলল, "খোঁড়াখুঁড়ি। অত তোমাকে সব কথার বাংলা জানতে হবে না। আমরা বুঝতে পারলেই হল। তারপর?"

কমলিকা বলল, "আজ মাটির তলা থেকে একটা মানুষের মাথার খুলি আর সাতটা লোহার সিন্দুক পাওয়া গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সাতটা লোহার সিন্দুক?"

কমলিকা বলল, "না, না, একটা লোহার সিন্দুক আর সাতটা মাথার খুলি। সেই সিন্দুকটা খোলা যায়নি। ভিতরে কী আছে, কেউ জানে না।"

জোজো বলল, "গুপ্তধন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সিন্দুকটা কোথায়?"

কমলিকা বলল, "এ-বাড়িতেই রাখা হয়েছে। কাল বাবার সামনে সেটা হাতুড়ি মেরে ভাঙা হবে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আর সাতটা মাথার খুলি? সেগুলো কোথায় রাখা হয়েছে? এ-বাড়িতেই?"

কমলিকা বলল, "ভ্যাট! বাড়িতে কেউ ওসব রাখে? তা হলে তোমরা ভূতের ভয় পেতে না? সেগুলো আছে মন্দিরে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুঝি ভূতের ভয় পাও না?"

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, "আমি কোনও কিছুতেই ভয় পাই না। শুধু..."

জোজো বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলছি। মাকড়সা? তাই না?"

কমলিকা মাথা নেড়ে বলল, "টিকটিকি!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি নীচের বাথরুমে যাব, হাত-মুখ ধুতে হবে। সিন্দুকটাও একবার দেখব, সেটা কোথায় রাখা আছে?"

সবাই নেমে এল একতলায়। প্রবীরও যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

নীচে অনেক ছোট ছোট ঘর। আগেকার দিনে কর্মচারী আর পাহারাদাররা থাকত। এখন সবই খালি, দেওয়ালগুলোর প্লাস্টার খসে গিয়ে হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। দরজাও ভাঙা।"

একটা ঘরে সিন্দুকটা রাখা আছে, সে ঘরে আলো নেই।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগলেন। সিন্দুকটা বেশ বড় আর চৌকো ধরনের। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে। কিন্তু কোথাও ফুটোটুটো হয়নি। সামনের দিকে ঝুলছে দুটো পেল্লায় আকারের পেতলের তালা।

সিন্দুকের চারটে পায়ার একটা ভাঙা, তাই একদিকে হেলে আছে। অন্য পায়াগুলো বাঘ কিংবা সিংহের পায়ের মতন।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "ভাল করে টর্চটা ধর তো!"

তিনি একটা রুমাল বের করে উপর দিকটায় ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে সেখানে একটা ছবি ফুটে উঠল। অস্পষ্ট হলেও চেনা যায়, গণেশের ছবি। তার তলায় কিছু লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, "মনে হচ্ছে সংস্কৃত লেখা। কাল সকালে ভাল করে দেখতে হবে।"

প্রবীর বলল, "এটা পাওয়া গেছে পাঁচদিন আগে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঁচদিন! কমলিকা যে বলল, আজই!"

প্রবীর বলল, "আজ তোলা হয়েছে। দেখা গিয়েছিল পাঁচদিন আগে। মাটির মধ্যে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, তোলাই যাচ্ছিল না। একবার তো খানিকটা তোলার পর ধপাস করে পড়ে গিয়ে আবার গেঁথে গেল অনেকটা। আজ দশ-বারোজন লোক তুলেছে অতি কষ্টে।"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "পাঁচদিন আগে? তার মানে, অনেক লোক এটার কথা জেনে গেছে।"

প্রবীর বলল, "হ্যাঁ, আশপাশের গ্রামের লোক ছুটে এসেছে দেখার জন্য। আজও প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। এইসব সিন্দুকটিন্দুক দেখলেই লোকে ভাবে, ভিতরে অনেক হিরে-জহরত, চুনি-পান্না আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো ভাবতেই পারে।"

কমলিকা বলল, "যদি পান্না থাকে, তা হলে আমি একটা নেব। আমি কখনও পান্না দেখিনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "পান্না কী রঙের হয় জানো?"

কমলিকা বলল, "বোধহয় নীল, তাই না?"

সন্তু বলল, "সবুজ। আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"

কাকাবাবু বললেন, "হিরে-জহরতের বাক্স অনেক ছোট হয়। এত বড় সিন্দুক ভরাতে গেলে তো সাত রাজার ধন লাগবে! আমার মনে হয়, এইসব সিন্দুকে দলিলটলিল, জমিদারির কাগজপত্র রাখা হত।"

জোজো বলল, "হয়তো সিন্দুকে কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হত গয়নার বাক্স।"

প্রবীর বলল, "কাল খুললেই দেখা যাবে। এর মধ্যে যদি দামি জিনিস কিছু থাকে, তা কিছুই আমরা পাব না, বাবা বলে দিয়েছেন। বাবাকে তো জানেন, কোনও জিনিসের প্রতি লোভ নেই। বাবা আগেই বলে রেখেছেন, দামি কিছু পাওয়া গেলে থানায় জমা দিতে হবে। সব গুপ্তধনই গভর্নমেন্টের প্রপার্টি।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে সিন্দুকটাই থানায় জমা রাখা উচিত ছিল।"

প্রবীর বলল, "আমরা তো কিছু বলিনি, মন্দিরের পুরুতরাই এটা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে কী জানেন, বেশিরভাগ মানুষই পুলিশদের বিশ্বাস করে না। পুলিশের মধ্যে তো অনেক চোর থাকে। এখানকার সবাই জানে, বাবা হান্ড্রেড পারসেন্ট সৎ মানুষ।"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমিও জানি। এই একতলায় রাত্তিরে কে থাকে?"

প্রবীর বলল, "এ আমাদের দরোয়ান নটবর সিংহ। বুড়ো হয়েছে, কিন্তু বাবা ওকে কিছুতেই চাকরি ছাড়াবেন না। ও-ও কিছু কাজ না করে মাইনে নেবে না। পাহারা দেবেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সারারাত জাগে?"

প্রবীর বলল, "সেটা কি ওর বয়সে সম্ভব? এ-বাড়িতে চুরি করার মতন তো কিছু নেই আর। দামি জিনিস সব কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের আর-একটা বাড়ি আছে ভুবনেশ্বরে। রুদ্রকাকা ওখানে থাকেন, এখানেও থাকেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, এখন তো আর কিছু করা যাবে না। দেখা যাক, কাল সকালে কী হয়!"

রাত্তিরের খাওয়া দাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক রকমের রান্না, তার মধ্যে আছে পোলাও, কোপ্তা, পায়েস। গুরুভোজন যাকে বলে।

তারপর খানিকক্ষণ গল্প হল খাওয়ার ঘরে বসেই। তার মধ্যে হঠাৎ টিক টিক করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠতেই কমলিকা ভয়ে জড়িয়ে ধরল তার দাদাকে।

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, "দেখেছেন তো, কী ভিতু এই মেয়েটা! প্রত্যেক দিন শোওয়ার আগে সারাঘর আমাকে খুঁজে দেখতে হয়, একটাও টিকটিকি আছে কিনা। পুরনো বাড়ি। টিকটিকি তো থাকবেই।"

কমলিকা বলল, "এইজন্যই আমি এখানে আসতে চাই না। কলকাতাই ভাল।"

সন্তু বলল, "কলকাতা শহর বুঝি টিকটিকি শূন্য?"

প্রবীর বলল, "আমি তো জানি, পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে টিকটিকি নেই। এরা খুব প্রাচীন প্রাণী।"

কাকাবাবু হাই তুলে বললেন, "এবার শুয়ে পড়া যাক!"

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ওই এক খাটে শুতে পারবেন? আর-একটা ঘরেও ব্যবস্থা করা আছে। তবে সে ঘরের একটা জানলার একটা পাল্লা ভাঙা।"

জোজো বলল, "না, না, আমরা এক খাটেই শোব। এত বড় খাট, ফুটবল খেলা যায়!"

কাকাবাবু আর সন্তু দু'পাশে, মাঝখানে জোজো। আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমরা এখানে কেন এসেছি?"

কাকাবাবু বললেন, "পুকুরের মধ্যে একটা তালাবন্ধ সিন্দুক, সাতটা মাথার খুলি, এসব কিছুই আগে জানতাম না। সুতরাং ওইসব রহস্য সমাধানে আসিনি। ওসব নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাই না। এসেছি বেড়াতে। কাছাকাছি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। প্রবীরের বাবা নেমন্তন্ন করেছেন অনেকবার। ভদ্রলোক খুব অসুস্থ। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না, তাই এবারেই দেখা করতে আসা।"

সন্তু বলল, "আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আঠারোশো আটান্ন সালের জুন মাসে কী হয়েছিল? তুমি হঠাৎ বলে উঠলে...?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই মনে রেখেছিস দেখছি। আটান্নর এক বছর আগে, আঠারোশো সাতান্ন সালে কী হয়েছিল জানিস?"

জোজো বলল, "সিপাই বিদ্রোহ!"

কাকাবাবু বললেন, "সাহেবরা বলত, সিপয় মিউটিনি, তার থেকে বাংলায় লেখা হত সিপাই বিদ্রোহ। পরে অনেকে বলেছে, ওটাই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। সিপাইরাই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করেছিল বটে, পরে অনেকেই যোগ দেয়।"

সন্তু বলল, "শুরু হয়েছিল তো আমাদের ব্যারাকপুরে। মঙ্গল পাণ্ডে..."

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানি লছমিবাই, বিঠুরের নানাসাহেব, দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। এঁদের মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রথমেই মেরে ফেলা হয়, ঝাঁসির রানি লছমিবাই আত্মহত্যা করেন। লোকে বলে তিনি ঝাঁসির দুর্গ থেকে ঘোড়াসুদ্ধ নীচে লাফিয়ে পড়েছিলেন। তাঁতিয়া টোপি অনেকদিন পর ধরা পড়েন, তাঁকে একটা কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহাদুর শাহকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। কিন্তু নানাসাহেবের কী হল? সেটা আমাদের ইতিহাসের একটা রহস্য। নানাসাহেবের আর কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি।"

জোজো বলল, "ওসামা বিন লাদেনের মতন!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে আছে, তা তো বেশিদিন হয়নি। এখনও ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নানাসাহেব তো অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যায়নি।

সন্তু বলল, "আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতন অনেকটা।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, নেতাজিও এতদিন বেঁচে থাকতে পারেন না। কিন্তু কোথায় কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা আজও রহস্যময়। তাইহোকু বিমানবন্দরে প্লেনে আগুন লেগে গেল, না তিনি জাপানে চলে গেলেন, কিংবা রাশিয়ানদের হাতে বন্দি হলেন, না ইংরেজরা গোপনে মেরে ফেলল, তা জানা গেল না। যুদ্ধ শেষের পর তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।"

সন্তু আবার বলল, "নানাসাহেব কোথায় লুকিয়েছিলেন, তুমি বুঝি তা জানতে পেরেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। খোঁজাখুঁজি করছি।"

জোজো বলল, "নানাসাহেব কি এই ঘিসিং-এ এসে লুকিয়েছিলেন? এমন হতে পারে?"

সন্তু বলল, "ঘিচিং নয়, খিচিং।"

কাকাবাবু বললেন, "হতেও পারে। তিনি কোনও-না-কোনও স্বাধীন

রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন অবশ্যই। ইংরেজরা তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে কম খোঁজাখুঁজি করেনি! এইসব অঞ্চলে তখন ইংরেজ শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাস্তাঘাটও ছিল দুর্গম। এরকম জায়গায় লুকিয়ে থাকা সম্ভব। অনেকের ধারণা, নানাসাহেব বাকি জীবনটা ছদ্মবেশে নেপালে কাটিয়েছেন। কিন্তু আমি নেপালে গিয়ে অনেক খোঁজ করেছি, সেরকম কোনও প্রমাণ মেলেনি।"

সন্তু বলল, "এসব তো বহু বছর আগেকার কথা। তুমি এখন খোঁজ করছ কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনিই, কৌতূহল। নেতাজির মৃত্যু নিয়ে তো এখনও তদন্ত চলছে। আমার বন্ধু সাধন রায় সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে একটা নতুন বই লিখছেন। তাঁকে আমি একটু সাহায্য করতে চাই! অনেক কথা হয়েছে। এবার ঘুমো।"

জোজো বলল, "লোহার সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে, তা জানার জন্য খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল সকালে প্রথম কাজ হবে আমাদের ড্রাইভার গুরুপদর খোঁজ করা।"

এইসময় হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। সারাদিন অসহ্য গরমের পর জানলা দিয়ে এল ঠান্ডা হাওয়া। সেইসঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট।

প্রথম প্রথম ভালই লাগল, তারপর বিছানা ভিজতে শুরু করায় জানলাটা বন্ধ করতেই হল। তারপর আবার গরম।

সকালবেলা প্রথম ঘুম ভাঙল সন্তুর, নীচে চেঁচামেচি শুনে।

সন্তু খাট থেকে নেমে জানলাটা খুলে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল, বাড়ির সামনের দিকটায় আর রাস্তায় বেশ জল জমে আছে। বৃষ্টি হয়েছে সারারাত। গাছপালাগুলো স্নান করে সেজেগুজে আছে।

নীচে তিন-চারজন লোক কথাবার্তা বলছে উত্তেজিতভাবে। আর-একজন কেউ কাঁদছে।

সন্তু অন্যদের না জাগিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অন্য ঘরগুলোর দরজা বন্ধ, দোতলায় আর কারও ঘুম ভাঙেনি বোধহয়।

নীচে এসে দেখল, গোরু নিয়ে হাজির হয়েছে গয়লা আর কাপড়ের বস্তা কাঁধে একজন ধোপা। জগোদাদা আদ্ধেক দাঁত মেজেছে, আঙুলে ছাই লাগা। আর হাউ হাউ করে কাঁদছে বৃদ্ধ দরোয়ান নটবর সিংহ।

সন্তু ওদের কাছে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ঘটনাটা জেনে গেল।

লোহার সিন্দুকটা চুরি গেছে। যারা চুরি করতে এসেছিল, তারা নটবর সিংহের হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখেছিল। সকালবেলা প্রথমে গয়লা এসে ওই অবস্থায় নটবর সিংহকে দেখে খুলে দিয়েছে বাঁধন।

সন্তু ভিতরে গিয়ে সিন্দুকের ঘরটা দেখে এল।

অতবড় সিন্দুকটা ঘষটে ঘষটে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, মেঝেতে দাগ পড়ে গেছে। আর কোনও চিহ্ন নেই।

সন্তু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, কাকাবাবু উঠে বসেছেন।

সন্তু কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, "কী, সিন্দুকটা চোরে নিয়ে গেছে তো?"

সন্তু মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরেই আমার এ-কথা মনে হয়েছিল। হাজার হাজার লোক এসে দেখেছে সিন্দুকটা। অনেকেরই ধারণা, ওর মধ্যে গুপ্তধন আছে। চোরেদের তো লোভ হবেই।"

সন্তু বলল, "এখন কী হবে?"

কাকাবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "কী আর হবে? আমাদের কি সারারাত ধরে ওটা পাহারা দেওয়ার কথা ছিল? আমরা তো সেজন্য এখানে আসিনি!"

সন্তু বলল, "সিন্দুকটার মধ্যে কী ছিল, তা জানাই গেল না।"

কাকাবাবু পালঙ্ক থেকে নেমে বললেন, "এখন যে একটু চা দরকার। কাল বেড টি-র কথা বলতে ভুলে গেছি। প্রবীরদের কাউকে দেখতে পেলি?"

সন্তু বলল, "না। জগোদাদা রয়েছে নীচে। আর কেউ জাগেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। তাতে খুব সুবিধে হয়েছে চোরদের। সবাই জানলা বন্ধ করে শুয়েছে, কেউ কোনও সাড়াশব্দ পায়নি।"

একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এল কমলিকা।

চোখ বড় বড় করে বলল, "কাকাবাবু, কী হয়েছে জানেন? যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কী হয়েছে?"

কমলিকা বলল, "নীচে চলুন, দেখবেন চলুন!"

কাকাবাবু বললেন, "কী দেখব?"

কমলিকা বলল, "লোহার সিন্দুকটা নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "না থাকলে আর নীচে গিয়ে দেখব কী করে?"

কমলিকা বলল, "সেটা চুরি হয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "চুরি হয়ে গেলে তো দেখা যাবে না ঠিকই!"

কমলিকা বলল, "বাঃ, কে চুরি করল আপনি দেখবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কী করে চোরকে দেখব? সে কি আমার জন্য বসে আছে?"

কাকাবাবুর ঠান্ডা ব্যবহারে কমলিকা বেশ নিরাশ হল। সে ভেবেছিল, চুরির খবর শুনেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে নেমে যাবেন।

কাকাবাবু আবার বললেন, "সেই যে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নাটকে একটা গান আছে:

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই
যে করেই হোক, চোর চাই
হোক না সে যে-কোনো লোক
চোর চাই
নইলে মোদের যাবে মান..."

বেসুরো গলায় গুনগুনিয়ে এইটুকু গান গেয়ে কাকাবাবু বললেন, "ওহে রাজকুমারী, চোর ধরা তো পুলিশের কাজ। আমি পুলিশও নই, আমি ডিটেকটিভও নই। তোমার বাবা নেমন্তন্ন করেছেন বলে এসেছি এখানে।"

কমলিকা তখন সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই জোজো, তুমি এতদিন কাকাবাবুর সঙ্গে থেকে কিছু শেখোনি?"

সন্তু বলল, "পটৌডির নবাবের বেগমসাহেবার যখন হিরের নেকলেস চুরি গেল, তখন কাকাবাবু ছিলেন বিদেশে, আমরা ভোপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আমিই তো বলেছিলাম, নেকলেসটা কোনও সাধারণ চোর চুরি করেনি, নিয়েছে একটা বাঁদর। ওখানে খুব বাঁদরের উৎপাত। ঠিক

একটা বাঁদরের গলা থেকে পাওয়া গেল!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে সন্তুর কথা শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "নেকলেসটা হিরের ছিল, না মুক্তোর? বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!"

সন্তু কমলিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "পটৌডির বেগমসাহেবা কে জানো তো? শর্মিলা ঠাকুর!"

কমলিকা বলল, "সত্যি?"

সন্তু বলল, "সত্যি না তো কী? ফ্যাক্ট!"

কাকাবাবু বললেন, "রাজকুমারী, কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল বলে কি আমরা সকালে চা পাব না? আমার ঘুম ভাঙলেই খুব চায়ের তেষ্টা পায়।"

কমলিকা বলল, "আমি এক্ষুনি চায়ের ব্যবস্থা করছি।"

সে বেরিয়ে যেতেই কাকাবাবু হাসতে হাসতে সন্তুকে বললেন, "তুই যে জোজোকেও টেক্কা দিচ্ছিস রে সন্তু! বাঁদরের গলায় শর্মিলা ঠাকুরের নেকলেস? তবে এইসব গল্প জোজোকেই বেশি মানায়। এবার তোরা নাম বদলের খেলটা শেষ করে দে। আমিই ভুল করে তোকে 'সন্তু' বলে ডেকে ফেলব!"

জোজো এখনও ঘুমোচ্ছে। সন্তু তার গায়ে হাত রেখে ডাকল, "কী রে, এখনও উঠবি না?"

জোজো চোখ পিটপিট করে বলল, "আমি আগেই জেগে গেছি। সব শুনছি! সন্তুটা কী গুলবাজ দেখলেন? আমিই তো ওকে ভোপালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও কি ভোপালের নবাবকে চিনত? পটৌডি তো আমাদের বাড়িতে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকবার এসেছে। বাঁদরটা যখন মুক্তোর মালাটা চুরি করল, তখন আমিই তো, মানে বাঁদরটাকে ধরাই যাচ্ছিল না। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে পালাচ্ছিল, আমিই তো হিপনোটাইজ করে বাঁদরটাকে মাটিতে নামিয়ে আনলাম, সন্তু সে-কথা বললই না!"

সন্তু বলল, "এবার থেকে তুই একাই সব বলবি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোরা দুই বন্ধুতে চেষ্টা করে দ্যাখ না, যদি এই সিন্দুক-রহস্য কিছু সমাধান করতে পারিস। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা।"

সন্তু বলল, "নানাসাহেব!"

একটু বাদেই কমলিকা চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা ঘুম থেকে উঠেছেন?"

কমলিকা বলল, "হ্যাঁ, এইমাত্র। আপনাদের কিন্তু ঠিক ন'টার সময় ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর আমি একবার মন্দিরটা দেখতে যাব।"

পরপর দু'কাপ চা খেয়ে কাকাবাবু টয়লেটের জন্য নামলেন নীচের তলায়।

বাড়ির সদর দরজার সামনে এখন আরও অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে। তক্ষুনি সাইকেল চেপে এসে পড়লেন বিনয়ভূষণ মহাপাত্র।

বিনয়ভূষণ বললেন, "নমস্কার, রায়চৌধুরীবাবু। শরীরটরির সব ঠিক আছে তো?"

কাকাবাবু প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, "সব ঠিক আছে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "কী কাণ্ড বলুন দেখি, আপনি এখানে উপস্থিত থাকতেও সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি তো কাল আমায় এই সিন্দুকটার কথা কিছু বলেননি!"

বিনয়ভূষণ ভুরু তুলে বললেন, "সে কী! আমি তো ধরেই নিয়েছি, আপনি সব জানেন। আপনার সাহায্য নেওয়ার জন্যই কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও আপনাকে এখানে আনিয়েছেন। নইলে এত ছোট জায়গায় কেউ কি বেড়াতে আসে?"

কাকাবাবু একটু বিরক্তভাবে বললেন, "আমি এই সিন্দুকটার কথা কিছুই জানতাম না। সিন্দুক পাহারা দেওয়া আমার কাজ নয়।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "চলুন স্যার, ভিতরে গিয়ে দেখি চোরেরা অত ভারী জিনিসটা কীভাবে সরাল।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি গিয়ে দেখুন। তাতেই হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের গাড়ি যে চালাচ্ছিল, গুরুপদ রায়, তার কী খবর?"

বিনয়ভূষণ বললেন, "সে সারারাত বাড়ি ফেরেনি। আজ সকালেও তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি, তার কোনও খবর নেই, তবে ও মাঝে মাঝেই এরকম করে। কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায়! আমাদের থানার ড্রাইভার ভাল হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে এসেছি, জিপটা ফেরত নিয়ে যাবে।"

একজন লোক জিপগাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

লোকটি কাকাবাবুর কথা আগেই শুনেছিল বোধহয়, তাই সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "প্রণাম নেবেন স্যার, আমি কাল যেতে পারিনি, মাপ করবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার তো শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন কেমন আছেন?"

ড্রাইভার বলল, "একদম ভাল হয়ে গেছি। আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, কাল চব্বিশ বার ইয়েতে যেতে হয়েছিল, প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম, বাড়ির লোক ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। ডাক্তারবাবু একটামাত্র ওষুধ দিলেন, তাই খেয়েই সব বন্ধ হয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, খুব ভাল ডাক্তার তো!"

ড্রাইভার বলল, "ডাক্তারবাবু কী বললেন জানেন? বললেন, 'এই ওষুধটা খেয়ে যদি তোমার ইয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে বুঝবে, তোমার ফুড পয়জনিং হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই। আর যদি না কমে, তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' কমে গেল, তাই হাসপাতালে যেতে হল না।"

কাকাবাবু বললেন, "এক ওষুধেই কমে গেল? ফুড পয়জনিং, বাড়িতে আর কারও কিছু হয়নি?"

ড্রাইভার বলল, "সেইটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার স্যার। আমার বাড়িতে অনেক লোক, সবাই একই খাবার খেয়েছি। ডাল, ভাত আর ঝিঙে-পোস্ত। আমরা মাছ-মাংস খাই না, বাড়িতে আসেই না। আমার মা রান্না করেন। আমার মায়ের রান্নার সুখ্যাতি আছে। বাড়ির আর কারও কিছুই হয়নি। শুধু আমারই একার..."

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে কিছুই খাননি?"

ড্রাইভার বলল, "না স্যার। আমার দোকানের খাবার খাওয়ার অভ্যেস নেই। বাড়িতেই খাই। তবে, মাঝে মাঝে চা খাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল কোন দোকানে চা খেয়েছিলেন?"

ড্রাইভার বলল, "হ্যাঁ, আমাদের থানার কাছেই একটা ছোট চায়ের দোকান, শুধু এক কাপ চা খেয়েছিলাম। বিস্কুট টিস্কুটও কিছু খাইনি। চা খেলে কি ফুড পয়জনিং হয়? কত লোকই তো এ-দোকানে চা খায়।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই দোকানে সে-সময় আপনার চেনাশুনো কেউ ছিল?"

ড্রাইভার বলল, "হ্যাঁ, ছিল কয়েকজন!"

কাকাবাবু বললেন, "গুরুপদ ছিল?"

ড্রাইভার খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "গুরুপদ? হ্যাঁ স্যার, সে দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে, আমাকে রাস্তায় দেখে ডেকে বলল, "এসো, এক কাপ চা খেয়ে যাও?"'

কাকাবাবু বিনয়ভূষণের দিকে ফিরে বললেন, "এবার বুঝলেন, কেন কাল আমাদের গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?"

কাকাবাবু ড্রাইভারের পেটখারাপ নিয়ে এত খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছেন দেখে বিনয়ভূষণ বেশ অবাকই হচ্ছিলেন। এখন বললেন, "ও কিন্তু সব সত্যি কথা বলছে স্যার। সত্যিই ওর আর কাল বাড়ি থেকে বেরোনোর মতন অবস্থা ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি কথা বলছে বলেই তো আসল কারণটা বোঝা গেল। গুরুপদ ওকে ডেকে নিয়ে গেছে চায়ের দোকানে। তারপর ওর চায়ের সঙ্গে অনেকখানি জোলাপ মিশিয়ে দিয়েছে। যাতে ওকে বারবার বাথরুমে যেতে হয়, আর গাড়ি চালাতে না পারে। আপনারা বাধ্য হয়ে তখন গুরুপদকে নিলেন।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "ও নিজেই এসেছিল থানায়। মাঝে মাঝে আমরা ওকে কিছু কিছু কাজ দিই। ও যে গ্যারাজে কাজ করে, সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া নিতে হয়। কাল থানায় এসে বলল, 'স্যার, অনেকদিন আমায় কোনও কাজ দেননি।' আমি ভাবলাম, ভালই হল, ও গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর গুরুপদ ইচ্ছে করে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল, তার আগে লাফিয়ে নেমে পড়ল নিজে। আমাদের হয়তো একেবারে মেরে ফেলতে চায়নি। খানিকটা আহত টাহত হতে পারি। আসল ব্যাপার হল, ও ভেবেছিল, বিনয়ভূষণ গাড়ি চালাতে জানেন না, আমিও খোঁড়া মানুষ, গাড়ি ড্রাইভ করতে পারব না, গাড়িটাও আর স্টার্ট না নিতে পারে। অর্থাৎ রাত্তিরের মধ্যে আমরা এখানে পৌঁছোতে পারব না। সেটাই গুরুপদর উদ্দেশ্য ছিল।"

বিনয়ভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? এতে ওর লাভ কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ওর পিছনে অন্য কেউ আছে। বা কোনও দল। তারা ঠিক করেছিল, আমাদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে লোহার সিন্দুকটা রাজবাড়ি থেকে চুরি করবে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "আমারও ধারণা ছিল, আপনি সিন্দুকটা দেখার জন্যই এখানে আসছেন। কিন্তু স্যার, আপনি গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলেন,

তাও তো চুরি হয়ে গেল সিন্দুক। ওর ভিতরে কত ধন-সম্পদ আছে কে জানে!”

কাকাবাবু বললেন, “আমি তো সিন্দুকটা পাহারা দেওয়ার জন্য আসিনি। ওটার কথা জানতামই না।”

বিনয়ভূষণ বললেন, “সিন্দুকটা থানায় জমা দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে আর এই ঝামেলা হত না।”

কাকাবাবু বললেন, “হুঁ। পুকুর খোঁড়ার সময় সিন্দুকটা দেখা গিয়েছিল পাঁচদিন আগে, সেটা ওখানে ফেলে রাখা হয়েছিল কেন এই ক'দিন?”

বিনয়ভূষণ বললেন, “জিনিসটা খুব ভারী, কাদার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তোলা খুব শক্ত ছিল। তা ছাড়া মাঝখানে একটা লক্ষ্মীপুজো পড়েছিল বলে দু'দিন কোনও কাজ হয়নি। লক্ষ্মীপুজোর মেলা হয়।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, আপনি আপনার কাজ করুন। আমি যাচ্ছি ভিতরে।”

বিনয়ভূষণ বললেন, “কিছু দরকার লাগলে বলবেন স্যার।”

এইসময় আর-একটা জিপগাড়ি এসে থামল।

জিন্‌স আর কোমরে গোঁজা লাল রঙের ফুলহাতা শার্ট-পরা একজন লম্বামতন লোক সেই জিপ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল এদিকে।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে বলল, “নমস্কার! আপনি নিশ্চয়ই কাকাবাবু, মানে রাজা রায়চৌধুরী? আপনার সঙ্গে ক্রাচ দেখে বুঝেছি।”

কাকাবাবুও নমস্কার করে বললেন, “আপনি নিশ্চয়ই রুদ্রকুমার ভঞ্জদেও?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ। আপনি কী করে বুঝলেন?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমার শার্লক হোম্‌সের মতন ক্ষমতা নেই। তবে আপনার গলায় একটা সোনার হার রয়েছে, কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেওর গলাতেও ঠিক এইরকম হার দেখেছি। আপনাদের পরিবারের লোকদের বোধহয় এরকম হার পরা নিয়ম, তাই না?”

রুদ্রকুমার বলল, “ঠিক ধরেছেন। একুশ বছর বয়স হলেই এই হার পরতে হয়। এখানকার মন্দিরের হেড পুরুতমশাই পরিয়ে দেন। আপনারা তো কাল রাত্তিরে এসেছেন, পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?”

কাকাবাবু বলল, “না, সেরকম কিছু না।”

রুদ্রকুমার বলল, “দাদা বলেছিলেন, আপনারা আসবেন, কাছাকাছি

জায়গাগুলো ঘুরে দেখবেন, তাই জিপটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ড্রাইভার আছে, যেখানে যেতে চাইবেন, নিয়ে যাবে।”

এবার বিনয়ভূষণ বললেন, “ছোটবাবু, সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেছে, শুনেছেন?”

রুদ্রকুমার দারুণ অবাক হয়ে বলল, “অ্যাঁ? সিন্দুকটা... যেটা পুকুরের মধ্যে ছিল? কবে তোলা হল?”

বিনয়ভূষণ বললেন, “কালই তুলতে পারা গিয়েছিল!”

রুদ্রকুমার খুবই বিরক্তভাবে বলল, “একরাতেই চুরি হয়ে গেল! থানা থেকে? আপনারা আছেন কী করতে? যত সব অপদার্থ!”

বিনয়ভূষণ বললেন, “আজ্ঞে, থানা থেকে চুরি হয়নি। এ-বাড়িতেই রাখা হয়েছিল।”

“কেন?”

“মন্দিরের পুরুতরা বলল, এ-বাড়িতেই, সবার সামনে তালা ভেঙে দেখা হবে।”

রুদ্রকুমার বলল, “এ-বাড়িতে রাখার কোনও মানে হয়? কে পাহারা দেবে? এই নটবর সিংহ? আপনারা পুলিশ পোস্টিং করেননি কেন?”

বিনয়ভূষণ খানিকটা চুপসে গিয়ে বললেন, “সেরকম কেউ বলেনি। মানে, আমাদের উপর কোনও অর্ডার ছিল না।”

রুদ্রকুমার বলল, “অতবড় সিন্দুকটা নিল কী করে? চোরেরা কি লরিটরি এনেছিল?”

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে বলল, “এই যে মাটিতে দাগ, ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে গেছে। মিস্টার রায়চৌধুরী, দেখুন, দেখুন।”

কাকাবাবু কোনওরকম আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়।

রুদ্রকুমার আর-একটু এগিয়ে বলল, “এই যে ভিতর থেকে নিয়ে এসেছে, সিমেন্টের উপরেও দাগ, তারপর বাড়ির বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে!”

তারপর রুদ্রকুমার কাকাবাবুর কাছে ফিরে এসে বলল, “ইস, ছি ছি ছি, সিন্দুকটার মধ্যে কী ছিল, তা জানাই গেল না! হয়তো খুব দরকারি কোনও দলিলপত্র ছিল! এ তো চুরি নয়, ডাকাতি!”

কাকাবাবু বললেন, “সিন্দুকটার মধ্যে অনেক কিছুই থাকতে পারে।

ডাকাতরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তালা ভেঙে ফেলেছে! এখন সেই ডাকাতদের ধরা পুলিশের কাজ।"

বিনয়ভূষণের দিকে ফিরে কাকাবাবু বললেন, "আমি এখন ভিতরে যাচ্ছি। আমাদের কালকের ড্রাইভার গুরুপদর কোনও খোঁজ পেলে আমাকে জানাবেন।"

ঠিক ন'টার সময় সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে হল।

টেবিলের উপর প্লেট নেই, তার বদলে টুকরো টুকরো কলাপাতা। তার উপর পাকা কলা, সবেদা, আম আর পাকা পেঁপে। আর রয়েছে নানারকমের মিষ্টি।

কমলিকা খাবার তুলে দিতে দিতে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এরপর চা না কফি?"

কাকাবাবু বললেন, "কফি। সকালে উঠে প্রথমবার চা খাই। তারপর সারাদিন কফি।"

কমলিকা জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "এই সন্তু, তুমি চা খাও নাকি?"

জোজো বলল, "খাব না কেন? আমিও খাই, জোজোও খাও।"

কমলিকা বলল, "আমি চা খাই না। দাদাও খায় না। বাজে অভ্যেস।"

প্রবীর বলল, "আমি অবশ্য আমাদের কলেজের সামনে কফি হাউজে গিয়ে মাঝে মাঝে কফি খাই। বন্ধুরা জোর করে।"

এই সময় জগোদাদা একটা হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল, তাতে বসে আছেন কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও। তাঁর কোলের উপর একটা চাদর পাতা। মুখখানা একেবারে শুকনো। মনে হয় খুবই অসুস্থ।

তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

কিরণচন্দ্র আস্তে আস্তে বললেন, "বসুন, সবাই বসুন। রায়চৌধুরীদাদা, রাত্রে ঠিক ঘুম হয়েছিল তো?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এই অবস্থা হল কবে? আর হাঁটতেই পারেন না?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "না, পায়ে একেবারে জোর নেই। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস! আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে বেশ ছোট?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "আমার যে মনের জোরটাও কমে গেছে! থাক সেসব

কথা। আপনারা বেড়াতে এলেন, এর মধ্যে কী ঝঞ্ঝাট শুরু হল বলুন তো! একটা সিন্দুক নাকি চুরি হয়েছে, তার ফলে যখন-তখন পুলিশ আসছে। পুলিশদের তো আর নিষেধ করা যায় না। ও সিন্দুকটা আমাদের বাড়িতে রাখারই বা কী দরকার ছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকের ধারণা হয়েছে, ওই সিন্দুকটার খবর পেয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি!"

কিরণচন্দ্র একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল তো একমাস আগে। আপনাকে ওসব সিন্দুক ফিন্দুক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ভাইপোদের নিয়ে এসেছেন, একটু চারদিক বেড়িয়ে টেড়িয়ে দেখুন। বেড়াবার অনেক জায়গা আছে।"

তারপর তিনি প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর ছোটকাকা ফিরেছে শুনলাম। সে কোথায়? ব্রেকফাস্ট খেতে এল না?"

প্রবীর বলল, "ছোটকাকা একটু আগে ফিরেছে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল!"

কিরণচন্দ্র বললেন, "এখন ঘুমোচ্ছে? সে কী!"

কমলিকা বলল, "ছোটকাকা মাঝে মাঝেই সকালবেলা ঘুমোয়, আর রাত্তিরবেলা জেগে থাকে।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "সে কী!"

কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করেছে আমার ছোটভাই? ও কিন্তু কলকাতায় যেতে চায় না, এই ভাঙা বাড়িতে থাকাই পছন্দ করে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। রুদ্রকুমারের সঙ্গে আমার দু'-একটা কথা হয়েছে।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "আপনি যে ইতিহাস নিয়ে চর্চা করছিলেন, তার কতটা এগোল?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু কিছু সূত্র পেয়েছি। আপনাদের এই জায়গাটারও তো অনেক ইতিহাস আছে।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "তা তো আছেই। তবে অনেক কিছুই লিখে রাখা হয়নি, হারিয়ে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি একটা হিসেবের খাতার কথা আমাকে বলেছিলেন।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "হ্যাঁ। কিছুদিন আগে আমি কয়েকখানা হিসেবের খাতা খুঁজে পেয়েছি। খুব পুরনো। তাতে লেখা আছে আমাদের রাজবাড়ির প্রতিদিনের হিসেব। অনেক লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে, আতশ কাচ দিয়ে কষ্ট করে পড়া যায়।"

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল।

সন্তু বলল, "আতশ কাচ হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্রাস।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেইসব হিসেব কি ওড়িয়া ভাষায় লেখা?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "প্রথম চারখানা খাতা বাংলায় লেখা। তখন এখানে বাংলা ভাষা চালু ছিল। পরেরগুলো ওড়িয়া ভাষায়। মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা। তাতে অনেক মজার মজার খবর পাওয়া যায়। যেমন হাতির বিয়েতে কত খরচ হয়েছিল। বাঘ মারার জন্য একজন সাহেব শিকারিকে ডেকে আনা হয়েছিল, তার জন্য খরচ। সে শিকারির সঙ্গে এসেছিল একজন মেমসাহেব। এই অঞ্চলের মানুষ তার আগে কোনও মেমসাহেব দেখেনি। সেই মেমসাহেব ডাবের জল ছাড়া অন্য জল খেতই না! তার জন্য শত শত ডাব আনানো হয়েছিল বাংলা মুল্লুক থেকে। এখানে তো ডাব পাওয়া যায় না! কয়েকটা যুদ্ধের কথাও আছে। কিছু কিছু ব্যাপার অবশ্য বুঝতেও পারিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "প্রথম খাতাটা কত পুরনো?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "তারিখ লেখা আছে, প্রথমটা শুরু হচ্ছে এইট্টিন ফিফ্‌টি ওয়ান থেকে। প্রথম বছরেই আছে হাতির বিয়ের কথা। রাজার নিজস্ব একটা হাতি ছিল, আর রানিরও ছিল এক হস্তিনী। খুব ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল দু'জনের, তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল সাত হাজার টাকা। এখনকার দিনে সাত লাখ টাকার সমান।"

প্রবীর বলল, "বাবা, আমি খাতাগুলো পড়তে চাই। ওর থেকে গল্প লিখব।"

কমলিকা বলল, "আমিও পড়ব।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা তো পড়বেই। তোমাদের বাড়ির জিনিস। আগে আমি একবার পড়ে নিতে পারি কি?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "হ্যাঁ, রায়চৌধুরীদাই আগে পড়বেন। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে আমার আতশ কাচটাও দিয়ে দেব। আমি এবার যাই? কিছুক্ষণ কথা বললেই ক্লান্ত লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বিশ্রাম নিন। আমাদেরও তো খাওয়া শেষ হয়ে গেছে!"

মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা। লম্বাটে ধরনের, লাল কাপড় দিয়ে বাঁধানো।

কাকাবাবু খাতাগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "আগেকার দিনে এই ধরনের খাতাকে বলা হত খেরোর খাতা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, ওরকম নাম ছিল কেন? খেরো মানে কি হিসেব?"

কাকাবাবু বললেন, "না। এই লাল রঙের মোটা কাপড়কে বলে খেরো। এই কাপড় দিয়ে বাঁধালে খাতাগুলো মজবুত হয়। দেড়শো বছরের বেশি টিকে আছে।"

নিজে একটা খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, "জোজো আর সন্তু, তোরাও দেখ তো, এইট্টিন ফিফ্‌টি সেভেন আর ফিফ্‌টি এইটের হিসেব কোন খাতায় আছে?"

জোজো একটা খাতা নিয়ে বলল, "এ তো ওড়িয়া ভাষা, পড়ব কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ওগুলো বাদ দাও। প্রথম দিকেরগুলোই আমাদের দরকার।"

সন্তু বলল, "আমার কাছে এই খাতাটায় আঠারোশো চুয়ান্ন সাল থেকে শুরু হয়েছে... আর শেষ হয়েছে আঠারোশো উনষাটের জুন মাসে।"

কাকাবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "ওই খাতাটাই আমার দরকার।"

অনেক লেখার কালি এমনই অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও পড়া যায় না। কোনও কোনও পাতা পোকায় খেয়েছে। তবু কাকাবাবু কষ্ট করে পড়তে লাগলেন।

অধিকাংশই জিনিসপত্র কেনার হিসেব। নতুন পালকি ক্রয়, ঠাকুরের গয়না, বাবুদের ইংলিশ জুতো, চাল, ডাল, তিনজোড়া বন্দুক, আঠাশখানা তরবারি। একদিনের হিসেবে লেখা আছে, সাপের বিষে রাজকুমারের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ। ওঝা মহাশয়কে পুরস্কার একান্ন টাকা ও শাল।

কাকাবাবু পড়া থামিয়ে বললেন, "এটা কী ব্যাপার বুঝতে পারলি?

অনেক সাপেরই বিষ থাকে না। সেই সাপ কামড়ালেও মানুষ বেঁচে যায়। অনেকেই তো প্রথমে বুঝতে পারে না, সাপটার বিষ আছে কি না! তখন ওঝাকে ডাকে। ওঝা এসে লাফালাফি করে, মন্ত্রতন্ত্র পড়ে, তারপর সেই লোকটি বেঁচে উঠলেই ওঝার কৃতিত্ব হয়। রাজকুমারকেও নিশ্চয়ই সেরকম একটা ঢোঁড়া সাপ কামড়েছিল।"

সন্তু বলল, "আর যখন সত্যিই বিষাক্ত সাপে কামড়ায়, তখন তো বাঁচানো যায় না। সেইসময় ওঝা কী বলে?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন ওঝামশাই কপাল চাপড়ে বলেন, 'অনেক চেষ্টা তো করলাম। কিন্তু নিয়তি তো খণ্ডানো যায় না, ওর এইসময় মৃত্যুযোগ ছিল। আয়ু ফুরিয়ে গেছে।'"

খাওয়ার টেবিলে জোজো কোনও কথা বলতে পারেনি। বেশিক্ষণ চুপ করে থাকলে ওর পেট ফুলে যায়।

সে এবার গম্ভীরভাবে বলল, "খুব বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও মানুষকে বাঁচানো যায়। একবার গারফিল্ড সোবার্সকে সাপে কামড়েছিল। সুন্দরবনে।"

সন্তু বলল, "সোবার্স সুন্দরবনে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন বুঝি?"

জোজো বলল, "না, কলকাতায় টেস্ট খেলতে এসেছিলেন, তারপর বেড়াতে গেলেন সুন্দরবনে। সেখানে কালকেউটে সাপে কামড়েছিল। বাঁ পায়ে।"

সন্তু বলল, "সোবার্স খেলা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের জন্মের আগে। তুই দেখলি কী করে?"

জোজো বলল, "আমি দেখেছি তো বলিনি। শুনেছি। আমার মামার কাছে। মামার সঙ্গেই তো সোবার্স বেড়াতে গিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, বাধা দিচ্ছিস কেন? জোজোকে গল্পটা বলতে দে না!"

জোজো বলল, "এটা গল্প নয়। ফ্যাক্ট! কালকেউটে সাপে কামড়ালে ঠিক ছ'ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। মহা মুশকিল। কাছাকাছি কোনও ডাক্তার নেই, আমার বাবাকেও ডেকে নিয়ে যাবার সময় নেই। তা ছাড়া, আমার বাবা তখন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে ডেকে আনা খুব মুশকিল তো বটেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর? সোবার্স তো এখনও বেঁচে আছেন। কী করে বাঁচলেন?"

জোজো বলল, "সোবার্সকে সাপে কামড়েছিল নদীর ঘাটে। সেখানে বিরাট ভিড় জমে গেল। অনেকরকম লোক। ছোট, বড়, মাঝারি। ইয়ে, কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। আমার মামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কারও নাম নীলকণ্ঠ? কিংবা নীলকণ্ঠ নামের কাউকে চেনো?' সেখানে নীলকণ্ঠ নামের কেউ নেই, কিন্তু পাশের গ্রামের একজন নৌকোর মাঝি আছে ওই নামে। মামা বললেন, 'শিগগির সেই মাঝিকে তোমরা কেউ ডেকে আনো। আসতে না চাইলে জোর করে ধরে আনবে!'"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সোবার্স সাহেবের তখন কী অবস্থা? তিনি কথা বলতে পারছেন?"

জোজো বলল, "না, না, তিমি ঘুমিয়ে পড়ছেন, আর আমার মামা তাঁর গালে চড় মেরে মেরে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে গেল নীলকণ্ঠ মাঝি। মামা তাকে বললেন, 'একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পারো এই বিখ্যাত মানুষটাকে, না হলে আমাদের দেশের খুব বদনাম হয়ে যাবে!' লোকটি বলল, 'আমি তো ওঝা নই। মন্তরও জানি না।' মামা বললেন, 'মন্তরটন্তরের দরকার নেই। বাটি থেকে চুমুক দিয়ে যেমন লোকে দুধ খায়, তুমিও সেইরকম সাপে কামড়ানো জায়গাটায় চুমুক দিয়ে বিষ টেনে আনো। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও বিপদ হবে না।' সেই মাঝি সোবার্সের ডান পায়ে সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে দু'বার চুমুকের মতন টানল। ব্যস, সোবার্স অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'একী, এত ভিড় কেন? আমাকে কি বাঘে অ্যাটাক করেছিল?'"

কাকাবাবু বললেন, "এটা দারুণ গল্প। মানে ফ্যাক্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখ দিয়ে যারা বিষ টানতে যায়, তারা নিজেরাই মরে যায়। মুখের মধ্যে কোথাও যদি একটু ঘা থাকে, কিংবা গালে কোনও কাটাটাটা থাকে, তা হলেই সেই বিষ রক্তে মিশে গিয়ে দু'জনেরই মৃত্যু হবে। কিন্তু যার নাম নীলকণ্ঠ, তার কোনও ভয় নেই, সে তো সব বিষ হজম করে ফেলতে পারে।"

সন্তু বলল, "সোবার্সের বাঁ পায়ে সাপ কামড়েছিল, লোকটি মুখ লাগাল ডান পায়ে। তাতেই কাজ হয়ে গেল!"

জোজো সেকথা গ্রাহ্য না করে বলল, "আর-একবার থাইল্যান্ডের রানিকে সাপে কামড়েছিল...।"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, আর সাপের গল্প নয়। অনেক পাতা পড়তে হবে!"

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, এক মিনিট! হ্যাঁরে জোজো, তুই যে কাল বলছিলি, দিল্লির এয়ারপোর্টে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধীকে দেখে তোর বাবা কী যেন বললেন, তারপর কী হল রে?”

জোজো বলল, “বাকিটা বলিনি বুঝি? কতটা বলেছিলুম রে।”

সন্তু বলল, “তোর বাবা, ‘এই রাজীব, শোনো, শোনো’ বলে ডাকলেন, তাই শুনে রাজীব গাঁধী কাছে এসে প্রণাম করলেন তোর বাবার পায়ে হাত দিয়ে...”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, বাবা রাজীব গাঁধীর কপালের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলেন। উনি তখন সাউথ ইন্ডিয়ায় যাচ্ছিলেন। বাবা বললেন, ‘রাজীব, তোমার পক্ষে এই সময়টা ভাল নয়, এখন সাউথ ইন্ডিয়ায় যেয়ো না, বাড়ি ফিরে যাও, তিনদিন বাড়ি থেকে বেরোবে না, অচেনা কারও সঙ্গে কথাও বলবে না। তা হলেই ফাঁড়া কেটে যাবে।’ রাজীব গাঁধী বললেন, ‘তার তো উপায় নেই, ইলেকশন মিটিং আছে, এখন আর ক্যানসেল করা যাবে না।’ বাবার কথা না শুনে প্লেনে উঠে গেলেন, তারপর কী হল, তা সবাই জানে। বোমার ঘায়ে টুকরো টুকরো।”

সন্তু বলল, “তোর বাবার কথা শুনে চললে রাজীব গাঁধী বেঁচে থাকতেন আজও, আবার হতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী।”

কাকাবাবু আবার পড়া শুরু করেছেন। থেমে গেলেন এক জায়গায়। ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা মুছে ভাল করে পড়ার চেষ্টা করলেন দু’-তিনবার।

তারপর জোজোকে বললেন, “দ্যাখো তো কী লেখা আছে, ঠিক পড়া যাচ্ছে না।”

জোজো বলল, “লেখা আছে ধূধূ পথ। খাওয়া বাবদ খরচ সাত টাকা। ধুধু পথ দিয়ে কেউ খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল?”

কাকাবাবু বললেন, “এবার সন্তু পড়ে দ্যাখ তো!”

সন্তু আতশ কাচ চোখে দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, ধুধু পথই লেখা আছে। তবে বানান ভুল করেছে। উপরে দুটো চন্দ্রবিন্দু আছে। ধুধুঁ পঁথ।”

কাকাবাবু বললেন, “ধুধু পথ না হয়ে ওটা যদি কারও নাম হয়? খানিকটা ভুল করেছে।”

সন্তু বলল, “ধুধুঁ পঁথ কারও নাম হতে পারে নাকি?”

কাকাবাবু বললেন, “ধুন্ধু পন্থ হতে পারে না? নানাসাহেবের নাম ধুন্ধুপন্থ। তারিখটাও মিলে গেছে, একুশে জুন, এইট্টিন ফিফ্‌টি এইট!”

সন্তু বলল, "তা হলে সত্যিই নানাসাহেব এখানে এসেছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হতেও পারে। এখানেও পুরোপুরি জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে এ-পর্যন্ত জানা গেছে, ইংরেজদের কাছে যাতে ধরা দিতে না হয়, সেজন্য নানাসাহেব প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। কিন্তু নেপালের রাজা তাঁকে আশ্রয় দিতে চাননি। ইংরেজদের ভয়ে তাঁকে নেপাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। এরপর নানাসাহেব গোপনে গোপনে ঘুরলেন বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে। কোনও রাজাই তাঁকে রাখতে রাজি হলেন না। সকলেরই ভয়, নানাসাহেবকে ধরার জন্য ইংরেজরা খবর পেলেই তাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। সিপাহি বিদ্রোহের পর বড় ভয়ংকর, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ইংরেজরা। তারপর তিনি খুব সম্ভবত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে পড়েছিলেন এই ময়ূরভঞ্জে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "উনি একা ছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না উনিও তো একজন রাজা। বারোজন খুব বিশ্বাসী সহচর নিয়ে ঘুরছিলেন। আর কানপুর ছেড়ে পালাবার আগে বেশ কিছু ধনরত্নও সঙ্গে নিয়েছিলেন।"

জোজো বলল, "বারোজন লোক? এখানে যে খাওয়ার খরচ লেখা আছে মোট সাত টাকা? কী খেয়েছিল?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তখনকার দিনে সাত টাকা মোটেই কম নয়। অনেক কিছু কেনা যেত। অনেক লোকের এক মাসের মাইনেই হত দশ-বারো টাকা। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাবা চাকরি করে পেতেন দশ টাকা। এই হিসেবে দেখছি, পরপর তিনদিন ওদের খাওয়ার খরচ লেখা আছে। তারপর নেই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তার মানে কী, তিনদিন পর ওঁরা চলে গেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তা না-ও হতে পারে। প্রথম তিনদিন ছিলেন রাজার অতিথি। তারপর হয়তো আলাদা কোনও বাড়িতে ছিলেন, নিজেরাই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

জোজো বলল, "না-ও হতে পারে। এ-রাজ্যের রাজাও ধুন্ধুমারকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

সন্তু বলল, "ধুন্ধুমার নয়, ধুন্ধুপন্থ।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও অসম্ভব নয়। আরও খোঁজ করতে হবে। শুধু এইটুকু অন্তত জানা গেল, এ-রাজ্যের রাজা পুরো দলটিকে তিনদিন খাইয়েছিলেন।"

এইসময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কমলিকা।

সে বলল, "এই, তোমরা বেড়াতে যাবে না? সবসময় ঘরে বসে থাকবে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চলো, একবার মন্দিরটা দেখে আসি। আমরা তো তৈরিই আছি।"

কমলিকা বলল, "মন্দির দেখব, তারপর তোমাদের দিব্যগড়ে নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেখানে কী আছে?"

কমলিকা বলল, "একটা বেশ ভাঙা দুর্গ, তার ভিতরে একটা পুকুর, সেখানে এখনো পদ্মফুল ফোটে।"

সবাই মিলে চেপে বসা হল জিপটায়।

এর ড্রাইভারের নাম গৌরাঙ্গ, বয়স বেশ কম, প্যান্ট-শার্ট পরা। নাম গৌরাঙ্গ হলেও তার গায়ের রং কিন্তু ফরসা নয়।

বাড়ির গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ। বন্দুক দুটো দেখেই বোঝা যায়, বহুকাল এ-বন্দুকে গুলি চালানো হয়নি। নলে মরচে ধরে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, "একেই বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! কাল রাতে কেউ পাহারা দেয়নি, এখন সিন্দুকটা চুরি যাওয়ার পর পুলিশ বসেছে। এখন কী পাহারা দেবে?"

প্রবীর বলল, "যারা চুরি করেছে, তারা এতক্ষণে তালাটালা ভেঙে ভিতরের সবকিছু নিয়ে নিয়েছে।"

কিচকেশ্বরী মন্দিরটা খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া গেল। সেখানে বেশ ভিড়, বাইরে থেকে অনেক টুরিস্ট এই মন্দির দেখতে আসে। কয়েকখানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে।

মূল মন্দিরটার চারপাশে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির। সেখানেও ঘুরছে অনেক লোক। কয়েকটা দোকান রয়েছে পাথরের জিনিসপত্রের।

কাকাবাবু বললেন, "আমি ওই ভিড়ের মধ্যে যাব না। আমার অত মন্দির দেখার সাধ নেই। তোমরা দেখে এসো। পুকুরটা কোথায়? যেটা খোঁড়া হচ্ছে!"

প্রবীর বলল, "সেটা আছে ওপাশে। একটু হেঁটে যেতে হবে।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি মানুষের মাথার খুলিগুলো দেখবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "সেগুলোই বা দেখে কী করব? সব মানুষের মাথার খুলিই তো একরকম।"

জোজো বলল, "কী আশ্চর্য, জ্যান্ত মানুষ কত আলাদা রকমের হয়, কিন্তু মড়ার খুলিগুলো কেন একরকম?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, সব মানুষই আসলে একইরকম। একই জাতি। শুধু চামড়া আর গায়ের রঙের জন্য আলাদা মনে হয়। একজন সাদা সাহেবের মাথার খুলি আর একজন কালো মানুষের মাথার খুলিতে কোনও তফাত নেই!"

প্রবীর বলল, "ছেলে আর মেয়েদের মাথার খুলিতেও কোনও তফাত নেই। শুধু একটু ছোট-বড় হতে পারে। সে তো ছেলেদের চেহারাও ছোট-বড় হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ছেলে মেয়েদের আলাদা করে চিনতে পারা যায়, কিন্তু কালো লোক, সাদা লোকের তফাত বোঝার কোনও উপায় নেই।"

কমলিকা বলল, "অ্যাডাম আর ইভের থেকেই তো মানুষ জাতটার জন্ম, ওরা তো ফরসা ছিল। তা হলে এত কালো মানুষ এল কী করে?"

সন্তু বলল, "কে বলল, অ্যাডাম-ইভ ফরসা ছিল?"

কমলিকা বলল, "বাঃ, কত ছবিতে দেখেছি!"

সন্তু বলল, "সেগুলো কি ক্যামেরায় তোলা ছবি, না আঁকা ছবি?"

কমলিকা বলল, "বাঃ, তখন বুঝি ক্যামেরা ছিল?"

সন্তু বলল, "আঁকা ছবি তো ইচ্ছেমতন রং দিয়ে আঁকা যায়। বাইবেলের ছবি সাহেবরা এঁকেছে, তাই সবাইকে ফরসা করে দিয়েছে।"

প্রবীর বলল, "ঠিক বলেছ, যিশুখ্রিস্টও সাহেবদের মতন ফরসা ছিলেন না। উনি তো মিড্‌ল ইস্টের লোক।"

সন্তু বলল, "অ্যাডাম-ইভের কাহিনি তো গল্প। আমি ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছি, সায়েন্টিস্টরা বলেছেন, পৃথিবীর প্রথম মেয়েটি জন্মেছিল আফ্রিকায়। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। সে-ই আমাদের সকলের মা। তার নাম দেওয়া হয়েছে আফ্রিকান ইভ!"

কাকাবাবু এদের আলোচনা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানে। কত সহজে স্পষ্ট কথা বলে!

এবার তিনি সন্তুকে বললেন, "যা, তাড়াতাড়ি মন্দির টন্দির দেখে আয়। আমি বসছি।"

ওরা নেমে যাবার পর কাকাবাবু ড্রাইভার গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিও দেখতে যাবে নাকি? যেতে পারো।"

গৌরাঙ্গ বলল, "না স্যার, আমি কতবার দেখেছি। রাজবাড়িতে কোনও অতিথি এলে তো আমাকেই দেখাতে আনতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তুমি গুরুপদ রায়কে চেনে?"

গৌরাঙ্গ বলল, "কোন গুরুপদ? মুখপোড়া গুরুপদ? মোটর গ্যারাজে কাজ করে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। গাড়িও চালায়। ওর মুখখানা ওইভাবে পুড়ল কী করে?"

গৌরাঙ্গ বলল, "তা কে জানে! ও মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায়, দু'মাস-তিন মাস ফেরে না। একবার ফিরল, ওইরকম কালো পোড়া-মুখ নিয়ে। কেউ জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে অ্যাকসিডেন্ট। আর কিছু না। একবার ও এক জায়গায় ডাকাতির দায়ে ধরা পড়েছিল। হয়তো নিজে ডাকাতি করেনি, দলের লোকদের চিনত। সেবার তো আমাদের বাবুই ওকে বাঁচিয়ে দিলেন।"

"তোমাদের কোন বাবু? কিরণচন্দ্র..."

"আজ্ঞে না। তিনি তো এখানে প্রায় থাকেনই না। ছোটবাবু। উনি অনেক মানুষের উপকার করেন!"

"আচ্ছা, তোমাদের এই ছোটবাবু কি যাত্রা-থিয়েটার করেন?"

গৌরাঙ্গ চমকে উঠে বলল, "আপনি স্যার কী করে জানলেন? হঠাৎ কেন জিজ্ঞেস করলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনিই। কেন যেন মনে হল।"

গৌরাঙ্গ বলল, "হ্যাঁ, স্যার, এখানে মাঝে মাঝেই থিয়েটার হয়। ছোটবাবুকে ছাড়া চলেই না। রাজা-মহারাজার পার্টে ওঁকে খুব ভাল মানায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো মানাবেই। এখন রাজত্ব নেই বটে, তবু তো রাজবংশের সন্তান।"

গল্প করতে করতে খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর ফিরে এল সন্তুরা।

কমলিকা বলল, "মাথার খুলিগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছে। দেখলে আর ভূত-ভূত মনে হয় না।"

সন্তু বলল, "কপালে আবার চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছে।"

জোজো বলল, "আমি একজন পুরুতঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আগে কি এই মন্দিরে হিউম্যান স্যাক্রিফাইস, মানে নরবলি হত?' তিনি খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, না, না!' আসলে নরবলি হত।"

কমলিকা বলল, "তুমি কী করে জানলে?"

জোজো বলল, "পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, একটা খুলি আমায় ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের বলি দিয়েছে। মুন্ডু কেটে জলে ফেলে দিয়েছে!'"

কমলিকা বলল, "ওঃ, সন্তুটা কী গুল মারে!"

সন্তু বলল, "সত্যি, সন্তুকে নিয়ে আর পারা যায় না। আমাকে নকল করতে চায়, কিন্তু জানে না কিছুই!"

প্রবীর বলল, "চলুন, তা হলে পুকুরটার কাছে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু জিপ থেকে নেমে পড়লেন।

মন্দিরগুলোর পিছন দিক দিয়ে খানিকটা হাঁটতে হল।

পুকুরটা বেশ বড়। বাঁধানো ঘাট আছে, কিন্তু জল প্রায় নেই। মাঝখানে থিকথিকে কাদা। কিছু লোক আজ মাটি খোঁড়ার কাজ করছে।

কমলিকা বলল, "ওই যে দেখছেন এক জায়গায় একটা বাঁশ পোঁতা, ওইখানে সিন্দুকটা পাওয়া গেছে। সেই সিন্দুকের মধ্যে সাতটা মানুষের মুন্ডু!"

প্রবীর বলল, "আবার তুই উলটোপালটা বকছিস? সিন্দুকটা তো খোলাই যায়নি। মুন্ডুগুলো ভিতরে থাকবে কী করে?"

কমলিকা বলল, "সরি, সরি!"

কাকাবাবু ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "সন্তু, দ্যাখ তো, এখানে একটা পাথরের ফলকে কী লেখা আছে? উপরে শ্যাওলা জমে গেছে।"

সন্তু একটা রুমাল ঘষে ঘষে শ্যাওলা খানিকটা তুলে ফেলল। পাশে দাঁড়িয়ে জোজো বলল, "কী সব লেখা আছে হিন্দিতে।"

সন্তু বলল, "হিন্দি না, সংস্কৃত। অনেক অনুস্বর বিসর্গ আছে। সব পড়া যাচ্ছে না। মাতৃ... উৎসর্গ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও তারিখ লেখা আছে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, সন বারোশো দশ।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে কেউ তার মায়ের নামে এই পুকুরটা উৎসর্গ করেছিল। আগেকার দিনে লোকে মনে করত, পুকুর কাটালে পুণ্য

হয়। ঠিকই মনে করত। কত লোক ব্যবহার করতে পারত সেই পুকুর। এটা বেশ পুরনো। কমলিকা বলো তো, এটা বাংলা কত সন?"

কমলিকা জানে না। প্রবীর, জোজোও বলতে পারল না। সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, "চোদ্দোশো এগারো।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে পুকুরটার বয়স কত?"

কমলিকা বলল, "নাইনটি নাইন।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি দেখছি অঙ্কে খুব ভাল। চট করে বলে দিলে।"

সন্তু আর জোজো হাসছে দেখে কমলিকা বলল, "ভুল হয়েছে, তাই না? আসলে তো আমি ভাল ছবি আঁকতে পারি, তাই অঙ্ক জানি না।"

জোজো বলল, "আমি তো ইংরেজিতে ফার্স্ট হই, তাই আমি সাঁতার জানি না।"

সন্তু বলল, "আমি তো শিঙাড়া খেতে ভালবাসি, তাই আমাকে মশা কামড়ায়।"

কমলিকা বলল, "এই, আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে! এমন মজা দেখাব!"

প্রবীর বলল, "তোমরা আমার বোনকে আর রাগিয়ো না, তা হলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে!"

কমলিকা বলল, "মোটেই আমি ভ্যাঁ করে কাঁদি না। আমি উঁউঁ করে কাঁদি।"

কাকাবাবু হাসছিলেন ওদের কথা শুনে। এবার বললেন, "ওই পাশের বাড়িটা কী বলো তো? ওখানেও ভিড় দেখছি।"

প্রবীর বলল, "ওটা একটা খুব পুরনো ভাঙা বাড়ি। কেউ থাকে না। আমার জন্ম থেকেই এরকম দেখছি। লোকে বলে ভূতের বাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই লোকগুলো কি ভিড় করে ভূত দেখতে যাচ্ছে নাকি? এই দিনেরবেলা!"

প্রবীর বলল, "ওই বাড়িটায় একটা সুড়ঙ্গ আছে। ভিতরে গেলে গা ছমছম করে। বাচ্চা বয়সে আমরা ওর মধ্যে খেলতে যেতাম। তবে বেশি দূর যাওয়া যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে অনেক জমিদার বাড়িতে কিংবা রাজবাড়িতে এরকম সুড়ঙ্গ থাকত। শত্রুসৈন্য কিংবা ডাকাতের দল আক্রমণ করলে ওখানে লুকিয়ে থাকা যেত কিংবা পালিয়েও যাওয়া যেত অন্য দিক দিয়ে।"

কথা বলতে বলতে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন সেই বাড়িটার দিকে।

সেখানে একজন লোক মোম বিক্রি করছে। অনেক লোক কিনছে একটা করে লাল রঙের মোম। যে-লোকটি বিক্রি করছে তার পিছনে একটা চৌকো টিনের সাইন বোর্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'আব্দুল লতিফ'স ফেমাস ক্যান্ডেল শপ। ইচ রুপিজ ফাইভ।' লোকটির চেহারা বেশ সুন্দর, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা।

কাকাবাবুদের দেখে লোকটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আসুন স্যার। মোম নিন। সুড়ঙ্গ দেখে আসুন। ভেরি থ্রিলিং! ভেরি ডার্ক। হয়তো ভূতেরও দেখা পেতে পারেন!"

কাকুবাবু সন্তুদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, দেখতে যাবি নাকি?"

সন্তু বলল, "নাঃ! অনেক সুড়ঙ্গ দেখেছি! আর দিনেরবেলা ভূত দেখার কোনও মজা নেই!"

কাকাবাবু আব্দুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই সুড়ঙ্গে কি শুধু ভূতই আছে? পেতনি নেই, শাঁকচুন্নি নেই?"

আব্দুল বলল, "মেয়ে-ভূতের কথা বলছেন তো? তাও আছে গোটাচারেক!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নিজে ওর ভিতরে গেছ? তুমি ভূত দেখেছ কখনও?"

আব্দুল এদিক-ওদিক চাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আপনি তো ভালই জানেন স্যার, ভূত বলে কিছু নেই। ওসব গাঁজাখুরি গল্প। আমি বেকার, চাকরি-বাকরি পাইনি, তাই মোম বিক্রি করে চালাচ্ছি! ভূতটূতের কথা বললে, বিক্রি ভাল হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো ভালই।"

প্রবীর বলল, "আব্দুলদা থিয়েটারে খুব ভাল পার্ট করেন। আমার ছোটকাকার থিয়েটারের দল আছে। আগেরবার এসে আমি একটা থিয়েটার দেখেছিলাম, কী যেন নামটা... হ্যাঁ, 'রাজা চলি গিলা বনবাস'। তাতে আব্দুলদা সেনাপতি কীর্তি সিংহর পার্ট করেছিল। তাই না আব্দুলদা?"

আব্দুল কাকাবাবুকে বলল, "সামনের শনিবার আবার প্লে আছে। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি থাকবেন তো? দেখে যান না!"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "তুমি আমার নাম জানলে কী করে?"

আব্দুল বলল, "স্যার! আপনি সিন্দুকটা উদ্ধার করার জন্য কলকাতা

থেকে এখানে আসছেন, তা তো সবাই জানে!"

কাকাবাবু প্রবীরের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো? আমি আমি যে এখানে আসব, তা আগে থেকে কে রটিয়ে দিয়েছে? আর সিন্দুকটার সঙ্গেই বা আমার নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন?"

প্রবীর বলল, "কে রটিয়েছে, তা তো আমি জানি না। আমি কাউকে বলিনি। মানে, বলার কথা মনেই আসেনি। কমলিকা—"

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব কথা বলতে আমার বয়েই গেছে!"

প্রবীর বলল, "আমি তো জানি, আপনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন। কোনও কাজের জন্য আসেননি!"

সন্তু বলল, "কাল রেল স্টেশনেই একটা লোক বলেছিল..."

জোজো বলল, "সে লোকটা জ্যোতিষী!"

সন্তু বলল, "আর-একজন চোখ-বোজা সাধু, সেও মনে হল জানে।"

কাকাবাবু বললেন, "উঃ, এখানটায় দারুণ রোদ। আর দাঁড়াতে পারছি না।"

জোজো বলল, "এবার ফিরে যাওয়া যাক। খিদে পেয়ে গেছে!"

কমলিকা বলল, "তোমরা দিব্যগড় যাবে না? আগে দিব্যগড় দেখে নাও!"

জোজো বলল, "খালি পেটে কোনও দুর্গ দেখতে নেই, মহাভারতে লেখা আছে!"

সন্তু বলল, "মহাভারতে না, বাইবেলে!"

কমলিকা আর আপত্তি করল না। চোখ কুঁচকে একটু ভেবে বলল, "খাওয়ার পরে যাওয়াই ভাল। খেতে দেরি হলে বাবা আপত্তি করবেন। চলুন বাড়ি ফিরে যাই।"

দুপুরে দারুণ খাওয়াদাওয়া হল।

এরকম ভাঙা বাড়ি। সারা বছর প্রায় কেউই থাকে না, তবু যত্নের কোনও ত্রুটি নেই। তিনরকম মাছ কী করে জোগাড় হল, তাই-ই বা কে জানে? এখানে এত ভাল রাবড়ি পাওয়া যায়!

কমলিকা খুব যত্ন করে খাওয়াল।

তারপরই সে বলল, "কাকাবাবু এবার চলুন, দুর্গ দেখতে যাই। কিংবা রোদ্দুরের মধ্যে আপনার যেতে কষ্ট হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ! এত খাওয়ালে, এরপর একটু বিশ্রাম

না নিলে কি চলতে পারে? এখন একটু বিছানায় শুয়ে গড়াব। আমার পা দুটোকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়।"

কমলিকা বলল, "তা হলে সন্তু আর জোজো চলুক!"

জোজো বলল, "রোদ্দুরের মধ্যে দুর্গ দেখার বারণ আছে উপনিষদে।"

কমলিকা চোখ পাকিয়ে বলল, "আবার বাজে কথা! আমি বুঝি বুঝি না? ওসব কিছু লেখা নেই। চলো, চলো..."

সন্তু জোজোকে বলল, "ঠিক আছে, চল রে সন্তু, ঘুরেই আসি!"

কমলিকা প্রায় জোর করেই ওদের দু'জনকে নিয়ে গেল বেড়াতে।

কাকাবাবু ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

সেই হিসেবের খাতাটা পড়তে লাগলেন মন দিয়ে।

সন্তু আর জোজো কমলিকার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "প্রবীর যাবে না?"

কমলিকা বলল, "না। বাবা দাদাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছেন কিছু জিনিসপত্র কিনে আনার জন্য।"

জোজো বলল, "জিপগাড়িটাও তো নেই, তা হলে আমরা যাব কীসে?"

কমলিকা বলল, "হেঁটেই যাব। খুব বেশি দূর তো নয়!"

জোজো বলল, "এই রোদ্দুরের মধ্যে আমি বেশি হাঁটতে পারব না।"

কমলিকা বলল, "আহা-হা! একেবারে মোমের শরীর। আমি হাঁটতে পারি, আর তুমি পারো না। তাও তো এখানে শাড়ি পরে হাঁটতে হয়। সালোয়ার কামিজ পরলে দৌড়োতাম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি জিন্‌স পরো না?"

কমলিকা বলল, "কলকাতায় জিন্‌স পরেই তো নাচের ক্লাসে যাই!"

জোজো বলল, "তুমি নাচ শিখছ? ধেই ধেই, না তাতা থই থই?"

কমলিকা বলল, "ও আবার কী! আমি শিখছি মণিপুরী।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে না গিয়ে, ওরা ডান দিকে হাঁটতে লাগল বাগানের মধ্য দিয়ে। এককালে বাগান ছিল, এখন প্রায় কিছুই নেই। অযত্নে সব নষ্ট হয়ে গেছে। বড় বড় ঘাস আর জংলি গাছ, তার মধ্য দিয়ে সব পায়ে হাঁটা-পথ।

সন্তু বলল, "এককালে এই বাড়িটা কত সুন্দর ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারেই ভেঙে পড়বে!"

জোজো বলল, "সারিয়ে টারিয়ে নিলে এখনও সুন্দর করা যায়।"

সন্তু বলল, "এত বড় বাড়ি মেরামত করতে কত টাকা লাগবে, ভাবতে পারিস?"

কমলিকা বলল, "আমাদের অত টাকাই নেই! যাও বা একটা সিন্দুক পাওয়া গেল, সেটার মধ্যে যদি অনেক সোনার টাকা আর মণি-মুক্তো থাকত, তাও সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেল। অবশ্য সিন্দুকটা থাকলেই বা কী হত? বাবা বলেছিলেন, 'ও সিন্দুক থেকে একটা পয়সাও নেওয়া চলবে না। সব গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হবে।'"

বাগানটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সামনে একটা পুকুর। ডান দিকে একটা সুরকির রাস্তা।

সেই রাস্তা ধরে বাড়িটার পিছন দিকে এসে পড়া গেল।

সেখানে কিছু বড় বড় গাছ, অনেকটা জঙ্গলের মতন। জঙ্গলের ফাঁকে একটা ভাঙা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে কমলিকা বলল, "ওই তো সেই দুর্গ!"

সন্তু বলল, "এত কাছে?"

জোজো বলল, "ধ্যাৎ! ওটা আবার দুর্গ নাকি? একটা ভাঙাচোরা বাড়ি!"

কমলিকা বলল, "ইয়েস স্যার, ওটাই দুর্গ। ছোট হলে কী হয়, বড় বড় কামান আছে।"

জোজো বলল, "ওই পচা দুর্গ দেখার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। যাব না। আমি সারা পৃথিবীর কত দুর্গ দেখেছি!"

কমলিকা বলল, "এই দুর্গটার মধ্যে একটা খুব সুন্দর ছোট্ট পুকুর আছে। তাতে পদ্মফুল ফোটে। সেরকম কোথাও দেখেছ?"

জোজো বলল, "কত! হাঙ্গারিতে একটা দুর্গের মধ্যে পুকুর নয়, আছে আস্ত একটা লেক। তাতে সারা বছর ফুটে থাকে ওয়াটার লিলি। আর তার মধ্যে আছে তিনটে পোষা কুমির।"

কমলিকা চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

জোজো বলল, "সত্যি না তো কী, ফ্যাক্ট! নিজের চোখে দেখেছি!"

কমলিকা বলল, "এই পুকুরটার মধ্যেও একটা দারুণ জিনিস আছে। গেলেই দেখতে পাবে!"

সন্তু বলল, "কী? তিমি মাছ?"

কমলিকা বলল, "ভ্যাট। পুকুরে বুঝি তিমি মাছ থাকে? এ-পুকুরটার মাঝখানে আছে একটা পাথরের পিলার। সেটাতে যদি একটা ঢিল ছুড়ে লাগাতে পারো, দেখবে ঠিক সা-রে-গা-মা-র মতন সুর শোনা যাচ্ছে!"

জোজো বলল, "ধ্যাৎ। এ মেয়েটা এমন কাঁচা গুল মারে যে শুনলেই বোঝা যায়, মিথ্যে কথা। সন্তু, তুই যাবি তো যা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

সন্তু বলল, "চল, জোজো, মেয়েটা এত করে বলছে। একবার ঘুরে আসি। বেশি সময় লাগবে না!"

কমলিকা বলল, "কে সন্তু? কে জোজো?"

সন্তু বলল, "আমরা নাম বদলের খেলা খেলছি। আমি আসলে জোজো, এখন থেকে সন্তু হয়ে যাচ্ছি। আর সন্তু হচ্ছে জোজো! তাই না রে জোজো?"

জোজো বলল, "তার মানে, তুমি আমাকে সন্তু ডাকতে পারো, জোজো ডাকতে পারো। হোয়াটস ইন আ নেম!"

এই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সামান্য টাক, চোখে চশমা। তার হাতে একটা লোহার হাতুড়ি।

জোজো বলল, "লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে?"

সন্তু বলল, "আরে, এই তো সেই ট্রেনের চোখ-বোজা সাধু। চেহারা আর পোশাক টোশাক একেবারে পালটে ফেলেছে।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তো!"

লোকটি ওদের দেখতে পেয়েছে। কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল, "কলকাতার অতিথি। বলেছিলুম না আবার দেখা হবে! তোমাদের কাকাবাবু কোথায়?"

সন্তু খুবই অবাক হয়ে গেছে। সে উত্তর না দিয়ে বলল, "আপনার চোখ খোলা!"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, মাসে পনেরো দিন আমার চোখ খোলা থাকে। আজ থেকে সেটা শুরু।"

কমলিকা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

লোকটি বলল, "আমি একজন সাধু। এই দু'জনের সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়েছিল। মানে, ওরা আমাকে দেখেছিল।"

কমলিকা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে কী করছেন?"

লোকটি বলল, "সাধুরা তো কিছু করে না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমিও তাই করছি।"

"আপনার হাতে ওটা কী?"

"হাতুড়ি। সব সময় সঙ্গে রাখি। যদি হঠাৎ সামনে একটা বাঘ এসে পড়ে। মন্তর দিয়ে তো বাঘকে বশ করা যায় না। তাই এটা দিয়ে ভয় দেখাই। তোমরাও এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। দু'-একদিন আগে একটা বাঘ পড়েছিল এদিকে।"

লোকটি চলে গেল সুরকির রাস্তার দিকে।

কমলিকা বলল, "এই সব জায়গাটাই আমাদের। বাইরের লোক যখন-তখন ঢুকে পড়ে। কী আর করা যাবে। পাহারা দেওয়ার তো লোক নেই।"

আর-একটু হাঁটতেই ভাঙা দুর্গটা পুরোপুরি দেখা গেল। সেটা একেবারেই ভাঙা। উপরের দিকে বটগাছ গজিয়ে গেছে। শক্ত শিকড় দিয়ে যেন মড়মড়িয়ে ভাঙছে বাড়িটার হাড়-পাঁজরা।

সামনে পড়ে আছে একটা লম্বা কামান।

কমলিকা বলল, "দেখলে দেখলে, এটা দুর্গ ছিল কি না?"

জোজো মুখ বিকৃত করে বলল, "এটা একেবারে যা-তা কামান। মরচে ধরা। আমি দলমাদল কামান দেখেছি! বোঝাই তো যাচ্ছে, এখানে দেখার কিছু নেই। চল, সন্তু।"

কমলিকা বলল, "ভিতরের পুকুরটা দেখবে না?"

জোজো বলল, "সেটা দেখতেই হবে?"

কমলিকা জোর দিয়ে বল, "হ্যাঁ, দেখতেই হবে। তুমি কে, জোজো না সন্তু?"

জোজো বলল, "আমি এখন জোজো। আগে সন্তু ছিলাম। আবার সন্তু হয়ে যেতেও পারি।"

সন্তু বলল, "চল, বলছে যখন, দেখে আসি পুকুরটা!"

ভাঙাচোরা পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওরা চলে এল দুর্গটার মধ্যে।

সন্তু বলল, "আমার মনে হয়, আগে এখানে এই দুর্গ-কাম-বাড়িটাই ছিল। কোনও কারণে এটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সামনের বড় বাড়িটা তৈরি হয়েছিল, সেটাও এখন ভাঙা।"

জোজো বলল, "এ আর বেশিদিন থাকবে না। কই, পুকুর কোথায়?"

সন্তু বলল, "এই পুকুর!"

সে হেসে ফেলল।

পুকুরের বদলে একটা বড় চৌবাচ্চাই বলা উচিত। দশ-বারো হাত চওড়া, সেরকমই লম্বা। জল দেখাই যায় না প্রায়, পানায় ঢেকে গেছে।

সন্তু বলল, "এই পুকুরে রাজকন্যারা চান করত, তাই না? তাও বোধহয় একশো-দেড়শো বছর আগে!"

জোজো বলল, "কোথায় তোমার পদ্মফুল, রাজকুমারী? একটাও তো দেখতে পাচ্ছি না।"

কমলিকা বলল, "তাই তো, নেই তো!"

সন্তু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, "আহা, পদ্মফুল তো সারা বছর ফোটে না! বসন্তকাল এসে দেখা যাবে!"

জোজো বলল, "আর সেই সা-রে-গা-মা গান গাওয়া পিলারটা?"

কমলিকা বলল, "সেটা বোধহয় জলে ডুবে গেছে!"

সন্তু বলল, "যথেষ্ট হয়েছে! এই রোদ্দুরে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। পাথরগুলো পর্যন্ত তেতে গেছে। চল, সন্তু চল, ফিরে যাই!"

কমলিকা বলল, "আহা, এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার কী হয়েছে? ওই তো বাইরের গাছতলায় বেশ ছায়া রয়েছে। ওইখানটায় বসবে চলো না।"

জোজো বলল, "বসে কী করব?"

কমলিকা বলল, "আমরা গল্প করব।"

সন্তু বলল, "বাড়িতে গিয়েও তো গল্প করা যায়! এখানে সত্যি খুব গরম।"

কমলিকা বলল, "ধুৎ, বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ বুঝি ভাল লাগে? ওখানে ছায়ায় বসলে বেশ আরাম লাগে। এসো, একটুখানি বসেই দ্যাখো!"

জোজো বলল, "তুমি গল্প শোনাবে? কীসের গল্প?"

কমলিকা বলল, "অনেক গল্প আছে। গান শোনাতেও পারি। এসো, এসো, প্লিজ।"

সন্তু বলল, "চল, জোজো। বেশিক্ষণ না কিন্তু বড়জোর দুটো গান শুনব।

দুর্গটার বাইরে কয়েকটা বড় বড় গাছের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ছায়া পড়েছে ঠিকই।

ঘাসের উপর একটা গোল চাটাই পাতা। সেটাও অনেকদিনের পুরনো।

কমলিকা বলল, "তোমরা ওটায় গিয়ে বসো। আমি একটু আসছি।"

সন্তু আর জোজো দাঁড়াল চাটাইটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল!

আনন্দের চোটে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল কমলিকা।

কাকাবাবু অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসেবের খাতাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

বিকেলের দিকে তাঁর ঘুম ভাঙল। জানলার বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। সন্তু আর জোজো ফেরেনি। তিনি ভাবলেন, এই রোদ্দুরে কোথায় ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!

তিনি খাট থেকে নেমে দরজাটা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালেন।

বারান্দার এক কোণে দেখা গেল কমলিকাকে।

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কফি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কফির তেষ্টা পেয়েছে। তুমি ঠিক বুঝেছ তো!"

একটু পরেই কমলিকা ট্রে-তে করে কফির পট, কাপ আর বিস্কুট নিয়ে এল।

কাকাবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল বানিয়েছ।"

কমলিকা বলল, "বিস্কুট নিন।"

কাকাবাবু বললেন, "দুপুরে এত খাইয়েছ, এখন আর কিছু খেতে পারব না। আজ বোধহয় আর বৃষ্টি হবে না।"

কমলিকা বলল, "আকাশে একটুও মেঘ নেই। তবে, এখানে মেঘ না থাকলেও হঠাৎ ঝড় আসে। জঙ্গলের দিক থেকে। একবার ঝড়ের সময় তিনটে হরিণ চলে এসেছিল এ-বাড়ির সামনে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হল? হরিণগুলোকে কেউ মারেনি তো?"

কমলিকা বলল, "না, না, আমার বাবা কোনও জীবজন্তু মারতে দেন না। কেউ গাছ কাটলেও রেগে যান খুব। বাবা যদি এখানে না থাকতেন, তা হলে ছোটকাকা অন্তত একটা হরিণ মারতই ঠিক। মাংস খাওয়ার জন্য।

ছোটটাকা তো শিকারি। একবার নাকি একটা জিরাফ মেরেছিল সিমপলিপাল জঙ্গলে।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "জিরাফ! এই জঙ্গলে জিরাফ আসবে কোথা থেকে?"

কমলিকা বলল, "তা হলে বোধহয় জেব্রা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশে জেব্রাও নেই। বুনো গাধা আছে কোথাও কোথাও!"

কমলিকা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাধা। না, না, গাধাও নয়, কুকুর।

কাকাবাবু বললেন, "হঠাৎ কুকুর মারতে যাবেন কেন?"

কমলিকা বলল, "এমনি কুকুর নয়, জঙ্গলের কুকুর!"

কাকাবাবু বললেন, "জংলি কুকুর খুব হিংস্র হয় বটে, ইংরেজিতে যাদের বলে ওয়াল্ড ডগস! তাদের মারা তো খুবই শক্ত। তোমার কাকা তা হলে খুব ভাল শিকারি।"

কমলিকা বলল, "ছোটকাকা একবার সাপের মাংস খেয়েছিল। মস্তবড় একটা কেউটে সাপকে আগে পিটিয়ে মারল। তারপর বলল, এটাকে রান্না করে খাব।' আমাদের রান্নার মাসি রান্না করতে রাজি হল না, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ছোটকাকা তখন নিজেই রান্না করল। আর কেউ যায়নি অবশ্য।"

কাকাবাবু বললেন, "চিন দেশের লোকেরাও তো সাপ খায়। সাপের মাথাটা কেটে ফেললে, সারা গায়ে তো বিষ থাকে না, বিষ থাকে শুধু দাঁতে।"

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে কমলিকা বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো তো অনেকবার অনেকরকম বিপদে পড়েছে, তাই না? ওরা নিজে নিজেই উদ্ধার পেয়েছে, না আপনি সবসময় সাহায্য করেন?"

কাকাবাবু বললেন, "নিজে নিজেই অনেকবার বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার সাহায্যের দরকারই হয়নি। বরং আমাকেই ওরা সাহায্য করে।"

কমলিকা বলল, "যদি একটা নদীর মধ্যে পড়ে যায়? খুব স্রোত?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। জোজো জানে না বটে, সন্তু ওকে পিঠে নিয়ে চলে আসতে পারে। সন্তু ভাল ক্যারাটে জানে। গাছে উঠতে পারে। আর জোজো ওর মুখের কথা দিয়ে অন্যদের মাত করে দেয়।"

কমলিকা বলল, "যদি মরুভূমিতে হারিয়ে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সেরকম কখনও হয়নি বটে। কিন্তু একবার আমরা ইজিপ্টে উটের পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে একটা পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম।"

কমলিকা আবার বলল, "যদি কোনও গর্তে পড়ে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সেরকম তো কতবার হয়েছে। একবার একটা বিরাট সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গেছি, সেখানে একটা সাপ ছিল, সেটা বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা উদ্ধার করার সময়।"

কমলিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে খুব সরলভাবে বলল, "তা হলে আমি যে ওদের বাঘের ফাঁদে ফেলে দিলাম, সেখান থেকে এখনও উঠতে আসতে পারল না কেন?"

কাকাবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "কোথায় ফেলে দিয়ে এলে?"

কমলিকা বলল, "বাঘের ফাঁদে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আবার কী?"

কমলিকা বলল, "সেটা দুর্গটার কাছেই। একটা গর্ত। উপরে চাটাই চাপা দেওয়া থাকে, কেউ বুঝতে পারে না। ওটা বাঘ ধরার জন্য।"

কাবাবু বললেন, "সেখানে তুমি ওদের ইচ্ছে করে ফেলে দিলে?"

কমলিকা বলল, "না, না, ওর মধ্যে বাঘ নেই কিন্তু। এমনি গর্ত। সন্তু আর জোজো ওখান থেকে উঠে আসতে পারে কি না দেখছিলাম। কিন্তু এখনও তো এল না। ভেবেছিলাম এই কথাটা আপনাকে বলব না। কিন্তু আমি তো মিথ্যে কথা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না। মজা করছিলাম ওদের নিয়ে। আমি আর দাদা আরও কয়েকজন ওখানে কতবার লুকিয়েছি। ভিতরে খাঁজ কাটা আছে, মানুষ উঠে আসতে পারে, বাঘ পারে না!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওদের ফেলে দেওয়ার আগে দেখেছিলে, গর্তটার মধ্যে কিছু আছে কি না?"

কমলিকা বলল, "তা কী করে দেখব? আমি তো কাছে যাইনি।"

কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটি বগলে নিলেন।

তারপর বললেন, "শিগগির চলো তো, কোথায় তুমি ওদের ফাঁদে ফেলেছ, আমাকে দেখিয়ে দাও!"

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, "এমা, ছি, ছি, ওরা বুঝি নিজেরা উদ্ধার হতে পারে না? সব সময় আপনার সাহায্য লাগে?"

কাকাবাবু বললেন, "আর দেরি না করে, চলো এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে! কত দূরে?"

কমলিকা বলল, "খুব কাছে। গাড়িও লাগবে না।"

কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে গিয়ে ক্রাচ পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। কোনওরকমে দেওয়াল ধরে সামলে নিলেন।

বাড়ির বাইরে আসার পর কমলিকা বলল, 'আপনি আমাকে একবার গর্তটার মধ্যে ফেলে দিন। দেখবেন, আমি নিজে নিজে কী করে ঠিক উঠে আসব।"

জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে কাকাবাবু বললেন, "ওই গর্তে কখনও বাঘ পড়েছিল?"

কমলিকা বলল, "বাবা বলেন, অনেকদিন আগে এদিকে বাঘ আসত। এখন আর আসে না। তবে, আমরা যখন কলকাতায় ছিলাম, দু'মাস আগে একটা বাঘ এসে ওই ফাঁদে পড়েছিল, ছোটকাকা বলেছে। সে বাঘটাকে কিন্তু আর কেউ দেখেনি। ছোটকাকা নিজেই বাঘটাকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু জগোদাদা আমাদের চুপিচুপি বলেছে, মোটেই বাঘ ধরা পড়েনি, ওটা ছোটকাকা আমাদের বলেছে ভয় দেখানোর জন্য। জানেন, চোটকাকা বাঘের ডাক ডাকতে পারে?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি?"

কমলিকা বলল, "হ্যাঁ। একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে উম উম শব্দ করলে ঠিক বাঘের ডাকের মতন শোনায়। একবার ওইরকম ডেকে সবাইকে ভয় দেখিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তোমার ছোটকাকার তো অনেক গুণ! ভাল থিয়েটারও করেন শুনেছি।"

বাগানের দিকটা পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকবার সময় কমলিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

তারপর মুখটা অন্ধকার করে বলল, "সন্তু আর জোজোর সত্যি যদি কোনও বিপদ হয়, তা হলে আমাকে বকবেন না তো? আমি কিন্তু মজা করার জন্যই ওদের ফেলে দিয়েছিলাম।"

কাকাবাবু বললন, "না রাজকুমারী, তোমাকে বকব না। তবে, এরকম মজা করা উচিত নয়। আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে হাত-পা-ও ভাঙতে পারে।"

কমলিকা বলল, "না। তলাটা নরম। খুব নরম মাটি। আমি কতবার পড়েছি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব না।"

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আকাশে জমেছে কালো মেঘ। আজ আবার বৃষ্টি হতে পারে। তাই এখন অসহ্য গুমোট। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

রাজবাড়ির পিছন দিকে আসার পর আঙুল দেখিয়ে কমলিকা বলল, "ওই দেখুন। সেই দুর্গ।"

গাছের ফাঁক দিয়ে ভাঙা বাড়িটা দেখতে পেয়ে কাকাবাবু বললেন, "এত কাছে?"

তাঁর কপাল কুঁচকে গেল।

আপনমনে বললেন, "এখানে বাঘ ধরার ফাঁদ?"

কমলিকা বলল, "আর-একটু কাছে চলুন দেখতে পাবেন।"

আগের রাত্তিরের অত বৃষ্টির জন্য এখানকার মাটি কাদা কাদা হয়ে আছে, কাকাবাবুর ক্রাচ বসে যাচ্ছে।

ভাঙা দুর্গটা ঘুরে সেই বড় বড় গাছপালায় ঘেরা জায়গাটায় এসে পৌঁছোলেন ওঁরা। সেই গোল চাটাইটা একইভাবে পাতা আছে।

কমলিকা বলল, "আমি সন্তু আর জোজোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওই চাটাইটার উপর দাঁড়ালেই, ভুস! একেবারে নীচে চলে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চাটাইটা সুদ্ধ নীচে চলে যায়?"

কমলিকা বলল, "না, না, চাটাইটা একপাশে হেলে পড়ে যায়। তখন গড়িয়ে পড়ে যেতে হয়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর চাটাইটা কি একপাশে হেলেই থাকে? না কাউকে ঠিক করে দিতে হয়?"

কমলিকা বলল, "তা আমি জানি না। আগে তো গর্তটা এরকম ঢাকা থাকত না। গাছের ডালটাল থাকত। এখন যাতে কেউ ওখানে না পড়ে যায়, সেইজন্য ঢাকা দেওয়া থাকে।

কাকাবাবু আর-একটু এগোতেই কমলিকা বলল, "সাবধান, সাবধান!"

কাকাবাবু সেকথা না শুনে কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে এক টানে চাটাইটা সরিয়ে দিলেন।

গর্তের মুখটা চৌকো ধরনের।

ভিতরটা আবছা মতন, তলা পর্যন্ত দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, "টর্চটা আনলে ভাল হত।"

তারপর তিনি জোরে ডাকলেন, "জোজো, সন্তু!"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কমলিকা কিছু না বলে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিল গর্তটার মধ্যে।

তারপর তলা থেকে হাসতে হাসতে বলল, "এই দেখুন কাকাবাবু, আমার পা ভাঙেনি, কিছুই হয়নি। সন্তু আর জোজো কিন্তু এখানে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানে কোনও দরজা কিংবা গর্তটর্ত আছে। অন্যদিকে যাওয়ার জন্য?"

কমলিকা বলল, "না তো! কোনওদিনও ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "তবু, ভাল করে হাত বুলিয়ে দ্যাখো তো!"

কমলিকা বলল, "এই তো দেখছি। না, আর কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখন উঠবে কী করে? আমার একটা ক্রাচ ঝুলিয়ে দিচ্ছি, তাই ধরে ধরে উঠতে পারবে?"

কমলিকা বলল, "তার দরকার হবে না। দেখুন না!"

একটু পরেই গর্তটার গা বেয়ে বেয়ে উঠে এল কমলিকা। প্রথমে দেখা গেল তার সুন্দর মুখখানি। খুশিতে ঝলমল করছে সেই মুখ।

বলল, "সন্তু আর জোজো ওখানে নেই। তার মানে, ওদের কোনও বিপদ হয়নি! আমার কোনও দোষ নেই, দোষ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত সহজে উঠে এলে, ওরা তো পারবেই!"

কমলিকা বলল, "ছোট ছোট খাঁজ কাটা আছে। মানুষ উঠতে পারে, কোনও জন্তু-জানোয়ার পারবে না। অবশ্য বাবা বলেছেন, মানুষও একটা জন্তু, কিন্তু মানুষ দুটো হাত ব্যবহার করতে পারে। অন্য কোনও জন্তু তা পারে না।"

কমলিকার সাদা শাড়িতে বেশ খানিকটা কাদা লেগে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে উঠে সন্তু-জোজোরা বাড়ি না ফিরে কোথায় গেল? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।"

কমলিকা বলল, "কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে? খিদে পেলেই ফিরে আসবে সুড়সুড় করে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওদের সঙ্গে মজা করার জন্য গর্তে ফেলে

দিয়েছিলে, এবার ওরাও তোমার সঙ্গে মজা করার জন্য প্রতিশোধ নেবে। কী করবে কে জানে। তুমি সাবধানে থেকো।''

কমলিকা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "ওরা আমার কচু করবে! আমাকে বিপদে ফেলা অত সোজা নয়!"

গর্তে পড়ে যাওয়ার পর সন্তু আর জোজো দু'জনেই প্রথমটা হকচকিয়ে গেল।

সন্তু বলল, "এটা কী ব্যাপার হল রে জোজো?"

জোজো বলল, "উঃ উঃ, আমার খুব লেগেছে। আমার পা ভেঙে গেছে বোধহয়!"

সন্তু বলল, "যাঃ, তোর যখন-তখন পা ভাঙে। এখানে তো নরম মাটি দেখছি। আমার কিচ্ছু হয়নি।"'

জোজো বলল, "পা ভাঙেনি বোধহয়। কিন্তু কীসে যেন খোঁচা লাগল, সাপে কামড়াল নাকি?"

সন্তু বলল, "সাপ আবার কোথায়? এখানে কিচ্ছু নেই। সাপ থাকলে ফোঁসফোঁসানি শোনা যেত!"

জোজো বলল, "ওই দুষ্টু মেয়েটা আমাদের ইচ্ছে করে এখানে ফেলে দিয়েছে। ও নিশ্চয়ই শত্রুদের দলের।"

সন্তু বলল, "শত্রু আবার কে? আমরা কি কারও কোনও ক্ষতি করেছি?"

জোজো বলল, "এখন কী হবে? আমরা এই গর্তের মধ্যে না খেয়ে মরব।"

সন্তু বলল, "দাঁড়া না, দেখা যাক কী করা যায়।"

গর্তটার দেওয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে সন্তু খাঁজ কাটা দিকটা পেয়ে গেল। সেদিকটা ধরে ধরে একটুখানি উঠে সন্তু বলল, "এই তো উপরে ওঠার ব্যবস্থা আছে। চলে আয় জোজো।"

জোজো বলল, "তুই এদিকে আয়। এখানে বেরোনোর রাস্তা।"

সন্তু সেখানে এসে দেখল, দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁকা। সেখান দিয়ে একটা গোল সুড়ঙ্গের মতন দেখা যাচ্ছে।

সন্তু বলল, “ওদিকে একটা দিকে দেওয়াল ধরে ধরে খাঁজে পা দিয়ে উপরে ওঠা। এদিকটায় ভিতরের দিকে যাওয়া যেতে পারে। কোন দিকে যাবি?”

জোজো বলল, “চল, উপরে উঠে যাই। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে।”

সন্তু বলল, “আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে, এই ভিতরের দিকটায় কী আছে দেখে আসি।”

জোজো বলল, “কী দরকার ওসব ঝঞ্ঝাট করে? অচেনা সুড়ঙ্গ টুড়ঙ্গের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।”

সন্তু বলল, “রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে: অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে/ অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে...।”

জোজো বলল, “ওসব গানের মধ্যে শুনতেই ভাল লাগে। যদি ওই সুড়ঙ্গটার মধ্যে অজগর সাপ থাকে?”

সন্তু ততক্ষণে সুড়ঙ্গটার মধ্যে মাথা গলাতে গলাতে বলল, “অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমি আমি খাব পেড়ে। যেখানে সেখানে মোটেই অজগর সাপ থাকে না।”

জোজো বলল, “আমার ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি উপরে উঠে গিয়ে ওই দুষ্টু মেয়েটার চুল টেনে দিতে।”

সন্তু বলল, “সে তো পরেও করা যেতে পারে। আগে এদিকটা দেখে নিই। আয়, ভিতরে চলে আয়।”

সুড়ঙ্গটা বেশ সরু, দু'দিকের দেওয়ালে হাত দিয়ে, মাথা নিচু করে কোনওরকমে একজন একজন করে এগোতে পারে।

কয়েক পা এগোনোর পর সন্তু বলল, “এই সুড়ঙ্গটা কীসের বুঝতে পারছিস? আজ দুপুরে একটা পুকুর পাড়ের ভাঙা বাড়িতে যে সুড়ঙ্গটা দেখেছিলাম, বোধহয় সেইরকম। কমলিকাদের বাড়ি থেকে এটা একটা পালানোর রাস্তা। কিংবা একসময় ওই ভাঙা দুর্গটা থেকেও এই পথে ও-বাড়িতে যাওয়া যেত।”

জোজো বলল, “তার মানে, তুই বলছিস, এইভাবে যেতে যেতে আমরা কমলিকাদের বাড়ির একতলায় পৌঁছে যাব? উঃ, উঃ!”

সন্তু বলল, “কী হল?”

জোজো বলল, “মাথা ঠুকে গেল! এত কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কী রে সন্তু? উপর দিয়েই তো সোজা যাওয়া যেত।”

সন্তু বলল, "আমাদের ধারণাটা ঠিক কি না, তা মিলিয়ে দেখতে হবে না? আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। একটু আগে আমরা যে চোখ-বোজা সাধুবাবাকে দেখলাম, আজ একেবারে চোখ-খোলা, পোশাকও অন্যরকম, সে এই সুড়ঙ্গ থেকেই ওপাশে বেরিয়েছে!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, ওকে আচমকা দেখা গিয়েছিল, যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল, ওরকম ফিলিং হয়েছিল। কিন্তু এই বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গে সাধুবাবা কী করবে? তপস্যা করবে?"

সন্তু বলল, "কিছু চুরি করার মতলব থাকতে পারে। সাধু সেজে অনেকে পাকা চোরও তো হয়। ওর হাতে একটা হাতুড়ি ছিল লক্ষ করিসনি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি তো হাতুড়িটা। বলল, বাঘ মারার জন্য সঙ্গে রেখেছে। হাতুড়ি দিয়ে কেউ বাঘ মারতে পারে, এমন কথা জন্মে শুনিনি। মনে হয়েছিল, ঠাট্টা করছে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সন্তু, তোর ধারণা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও সাধুবেশে পাকা চোরটি কমলিকাদের রাজবাড়ি থেকে কী চুরি করবে? প্রায় কিছুই তো নেই। তা ছাড়া, তখন ওর কাছে হাতুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না।"

সন্তু বলল, "চুরি করতে এসে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়েছে? হয়তো পরে জানা যাবে।"

জোজো বলল, "লোকটি কিন্তু ইংরেজি টিংরেজি জানে। বলেছিল, হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস পড়েছে।"

সন্তু বলল, "ইংরেজি জানলে বুঝি চোর হতে পারে না? খবরের কাগজে দেখিস না, বড় বড় লোক কত টাকা চুরি করে!"

জোজো বলল, "আর কতক্ষণ যাব রে? এ যে ফুরোচ্ছেই না। কমলিকাদের বাড়ি তো এতটা দূর নয়!"

সন্তু বলল, "উপর দিয়ে গেলে কিছুই মনে হত না। এখানে এত কষ্ট করে যেতে হচ্ছে তো, তাই এত দূর মনে হচ্ছে। আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ আসিনি।"

জোজো বলল, "আমার হাত ছড়ে যাচ্ছে। আমি একটু বিশ্রাম নেব।"

দেওয়াল ছেড়ে সে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

সন্তু থেমে গিয়ে বলল, "সুড়ঙ্গটা মনে হচ্ছে একটু একটু চওড়া হচ্ছে। এবার আর দু'দিকের দেওয়াল ধরতে হবে না।"

জোজো বলল, "তোর যত উদ্ভট শখ! গর্তটা থেকে উপরে ওঠার ব্যবস্থা

আছে যখন, তখন কষ্ট করে এদিকে আসার কী দরকার ছিল? চল। বরং ফিরে যাই।”

সন্তু বলল, “আবার অতটা ফিরে যাব? এখন সুড়ঙ্গটা চওড়া হচ্ছে, এখন আর এগোতে তত কষ্ট হবে না। চল, উঠে পড়।”

আবার খানিকটা এগোতেই সুড়ঙ্গটা অনেক চওড়া হয়ে গেল, প্রায় একটা ঘরের মতন। সামনের দিকে এক জায়গায় মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু কিছু বলতে যেতেই হঠাৎ ঝুপ করে কী যেন উপর থেকে পড়ল গায়ের উপর।

জোজো চিৎকার করে উঠল, “সাপ! সাপ! ওরে বাবা রে!”

সন্তু প্রথমে খুব চমকে উঠেছিল। তারও সাপের কথাই মনে হয়েছিল, কিন্তু হাত দিয়ে দেখল, সাপ নয়, অনেকখানি দড়ি।

তারপর সেই দড়ি আঁট হয়ে জড়িয়ে গেল সারা গায়ে।

সন্তু বলল, “আমরা জালে আটকা পড়েছি।”

জোজো চেঁচিয়ে উঠল, “এই, এই, কে জাল ফেলল? কে? খুলে দাও। আমার গলায় আটকে যাচ্ছে। খুলে দাও।”

সন্তু বলল, “হাত তুলতে পারছিস তো? হাত দিয়ে গলার কাছটা আলগা করে রাখ।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “এটা কী ব্যাপার হল রে সন্তু? কে জাল ফেলল?”

সন্তু বলল, “দেখা যাক। ঘাবড়াসনি। কেউ-না-কেউ আসবে নিশ্চয়ই।”

জোজো বলল, “ঘাবড়াব কেন? এই সামান্য দড়ির জাল দিয়ে তোকে-আমাকে কে আটকাবে? তবে কিনা আমার পিঠের ডান দিকটা চুলকোচ্ছে, আমি ডান হাতটা নড়াতে পারছি না!”

সন্তু বলল, “এদিকে সরে আয়, দেখি যদি চুলকে দিতে পারি।”

ঠিক তখনই একটু দূরে একটা মশাল জ্বলে উঠল।

সেই মশালটা হাতে নিয়ে একজন লোক এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

জোজো বলল, “একটা গন্ধ পাচ্ছিস সন্তু? একে বলে বিপদের গন্ধ।”

সন্তু বলল, “না, ওটা আগুনের গন্ধ। বদ্ধ জায়গায় আগুন জ্বললে এরকম একটা গন্ধ হয়।”

জোজো বলল, "লোকটা থপথপ করে আসছে। আমাদের মারবে নাকি?"

সন্তু বলল, "হঠাৎ মারতে যাবে কেন? আমরা কিছু দোষ করেছি?"

যে লোকটি মশাল ধরে আছে, তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একেবারে কাছে আসার পর বোঝা গেল, সে বেশ একজন তাগড়া জোয়ান লোক, মুখখানা এমনই কালো যে, মনে হয়, আলকাতরার পোঁচ দেওয়া।

সন্তু খুব অবাক হয়ে বলে উঠল, "আরে, এ যে আমাদের সেই কালকের ড্রাইভার!"

জোজো বলল, "ইয়েস। পলাতক গুরুপদ রায়। ইনি এখানে লুকিয়ে আছেন!"

লোকটি কাছে এসে একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্তু বলল, "নমস্কার ড্রাইভারবাবু, কাল অ্যাক্সিডেন্টের পর আপনি কোথায় চলে গেলেন?"

লোকটি চুপ।

সন্তু আবার বলল, "আপনার কোথাও চোট লাগেনি তো? আমরা চিন্তা করছিলাম আপনার জন্য।"

লোকটি এবারও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, "ইনি কথা খরচ করতে চান না।"

সন্তু বলল, "ড্রাইভারবাবু, দেখুন তো, কোথা থেকে একটা জাল এসে আমাদের বেঁধে ফেলল! এটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ার ধরার জন্য। একটু খুলে দিন না প্লিজ।"

জোজো বলল, "কাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনি খুব ভাল ড্রাইভার। অত স্পিডে চালাচ্ছিলেন, কিন্তু একটুও হাত কাঁপেনি।"

লোকটি এবার জালের উপরের দিকে হাত রাখল।

জোজো বলল, "দিচ্ছে, দিচ্ছে, খুলে দিচ্ছে। গুরুপদবাবু খুব ভাল লোক।"

কিন্তু খোলার বদলে জালটা আরও আঁট হয়ে গেল।

জোজো বলল, "উলটো দিকে, উলটো দিকে ঘোরান, তা হলে আলগা হয়ে যাবে।"

সে-কথায় কর্ণপাত না করে লোকটি একটু সরে গেল। তারপর মশালটা আটকে দিল দেওয়ালের একটা হুকে। পিছন ফিরে চলে গেল জোরে জোরে হেঁটে।

জোজো বলল, "যাঃ বাবা! কোনও কথাই শুনল না?"

সন্তু বলল, "হয়তো কানে শুনতেই পায় না। কালা!"

জোজো বলল, "কিংবা বোবা। বোবা হলে তো কালা হবেই। কিন্তু লোকটা মিটমিটে শয়তান। দেখলি না, চোখ দুটো কেমন কুটিলের মতন।"

সন্তু বলল, "আচ্ছা, ওর নাম গুরুপদ না গুরুচরণ? আমার মনে হচ্ছে, গুরুচরণ। নাম ভুল বললে অনেকে রেগে যায়।"

জোজো বলল, "গুরুপদ আর গুরুচরণে কোনও তফাত আছে? কোনটা গুরুতর? এমনও হতে পারে, ওর নাম নিবারণচন্দ্র।"

সন্তু একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করে বলল, "আগে তবু ভাল ছিল। ও এসে আরও আঁট করে দিয়ে গেল, কোনও হাতই তুলতে পারছি না।"

জোজো বলল, "এ তো দেখছি পাটের দড়ি। আমরা ছিঁড়তে পারব না? বেশ পুরনোও হয়ে গেছে। একবার আমরা লোহার জাল কেটে বেরিয়েছি, এই দড়ি তো কোন ছার!"

সন্তু বলল, "আমরা মানে?"

জোজো বলল, "তুই আর আমি। সিঙ্গাপুরে!"

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি তো কখনও লোহার জাল কেটে বেরোইনি। আর সিঙ্গাপুরেও যাইনি।"

জোজো হা হা করে হেসে বলল, "তুই সব ভুলে যাস। আমি ঠিক মনে রাখি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কতক্ষণে জালটা ছেঁড়া হবে। আমি বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে চাই না। আর-একটু পরেই তো খিদে পেয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "আমি কিন্তু পারছি না রে জোজো। অন্য কারও সাহায্য দরকার। আর তো কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

জোজো বলল, "আমাদের এইভাবে জালে বেঁধে রেখে চলে গেল! লোকটা অতি নিমকহারাম।

এই সময় কিচ কিচ করে শব্দ হল। শব্দটা এদিকেই আসছে।

জোজো এতক্ষণ হালকা গলায় কথা বলছিল। এবার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "ওটা কীসের শব্দ রে?"

সন্তু বলল, "বোঝাই তো যাচ্ছে, ইঁদুর।"

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা ধেড়ে ইঁদুর। প্রায় খরগোশের মতন সাইজ!

জোজো বলল, "ওরে বাবা রে! এত্ত বড়! এখানে ইঁদুর এল কী করে?"

সন্তু বলল, “ইঁদুর কোথায় নেই। বোধহয় মঙ্গল গ্রহেও আছে। ইঁদুর দেখে অত ভয় পাওয়ার কী আছে? ইংদুর তো মানুষকে কামড়ায় না।”

জোজো বলল, “আমি জানি, এক ধরনের ইঁদুর মানুষের মাংস খায়।”

প্রথমটার পিছু পিছু আরও তিনটে ইঁদুর বেরিয়ে এল। তারপর আরও চারটে।

একেবারে জালটার কাছে এসে ওদের দু’জনের দিকে একটা ইঁদুর তাকিয়ে রইল জুলজুল করে। তার চোখ দুটো যেন দুটি আগুনের ফুলকি।

সন্তু ফিসফিস করে বলল, “জোজো, একদম নড়বি না, চুপ করে থাক।”

প্রথম ইঁদুরটা স্প্রিং-এর মতন এক লাফ দিয়ে উঠে জোজোর সামনের দড়ি কামড়ে ধরল।

জোজো দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে!”

সে ঝটাপটি করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল ইঁদুরটাকে।

তখন সব ক’টা ইঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়ল দড়ির জালের উপর।

মশালটাও নিভে গেল এই সময়।

কাকাবাবু বসে আছেন রাজবাড়ির সামনে বাগানে। নটবর সিংহ তাঁকে একটা চেয়ার এনে দিয়েছে।

আকাশে গুমগুম শব্দ হচ্ছে মেঘের। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু বৃষ্টি আসার নাম নেই।

হাওয়া বইছে বেশ জোরে। সেই হাওয়ায় ভেসে আসছে বনজঙ্গলের গন্ধ।

কাকাবাবু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। এখন রাত পৌনে ন’টা। সন্তু আর জোজো এখনও ফিরল না।

কাকাবাবুর দুশ্চিন্তা করা স্বভাব নয়।

গর্তটার মধ্যে পড়ে গিয়ে সন্তু আর জোজো আহত হয়নি, এইটুকু জানাই তো যথেষ্ট। ওরা উপরে উঠে কোথাও গেছে। ওরা নিজেদের দায়িত্ব নিতে পারে। তবু তিনি ঘড়ি দেখছেন ঠিকই।

কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেওর জ্বর আবার বেড়েছে। কমলিকা বসে আছে তাঁর

পাশে। কাকাবাবু বারবার বলে দিয়েছেন, তাঁর জন্য মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। কমলিকা এখন তার বাবার কাছেই থাকুক।

প্রবীর গেছে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

মাঝে মাঝে একা থাকতে ভালই লাগে কাকাবাবুর। অনেকরকম আকাশ পাতাল চিন্তা করা যায়।

সন্তু আর জোজোকে যে গর্তটায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটার কথাই মনে পড়ছে বারবার।

কমলিকা বলেছিল, ওই গর্তটার নাম 'বাঘের ফাঁদ'। কাকাবাবুর সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। বাড়ির অত কাছে তো বাঘের জন্য ফাঁদ পাতা হয় না, সেরকম ফাঁদ পাততে হয় জঙ্গলের মধ্যে। বাড়ির অত কাছাকাছি বাঘ আসবে কেন? মানুষ যেমন বাঘ দেখে ভয় পায়, বাঘও তো মানুষকে দেখে ভয় পায়। খুব হিংস্র, মানুষখেকো বাঘও মানুষকে সামনাসামনি আক্রমণ করতে আসে না। লুকিয়ে লুকিয়ে পিছন দিক থেকে এসে ধরে। আর অধিকাংশ বাঘই মানুষখেকো নয়, তারা মানুষ দেখলে দূরে সরে যায়।

তা হলে ওই গর্তটা কীসের?

তাঁর ক্রমশ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, ওটা একটা সুড়ঙ্গের বাইরের দিকের মুখ। দুপুরে একটা বাড়িতে সুড়ঙ্গ দেখা গিয়েছিল। এই রাজবাড়িতেও ওরকম পালানোর সুড়ঙ্গ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু কমলিকা যে বলল, ওই গর্তটা দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায় না। ও মিথ্যে বলেনি। নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে ভিতরের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব সুড়ঙ্গ এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। মুখটা খোলা রাখলে, সাপটাপ, অন্য জন্তু-জানোয়ার বা চোরেরা ঢুকে পড়তে পারে।

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। ন'টা পাঁচ। খাবারের সময় হয়ে গেল, জোজো তো কখনও এত দেরি করে না। খিদেয় ছটফট করে। হয়তো কোনও দোকানে টোকানে কিছু খেয়ে নিয়েছে।

রাজবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একজন লম্বা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। জিন্স আর টি-শার্ট পরা, ঠোঁটে সিগারেট। হাতে একটা মোবাইল ফোন।

কাকাবাবু চিনতে পারলেন, এ-বাড়ির ছোট রাজকুমার রুদ্রকুমার ভঞ্জদেও।

কাছে এসে সে বলল, "নমস্কার, নমস্কার রায়চৌধুরীবাবু, কেমন আছেন?

সারাদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। সেজন্য আমি লজ্জিত। দাদা অসুস্থ, আমারই উচিত ছিল আপনাদের দেখাশুনো করার। কিন্তু এমন ঘুম পেয়ে গেল, সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। কমলিকা আর প্রবীর আমাদের যথেষ্ট দেখাশুনো করেছে।"

রুদ্রকুমার জিজ্ঞেস করল, "কিছু ঘুরেটুরে দেখলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মন্দিরের ওদিকটায় গিয়েছিলাম। যা গরম ছিল আজ, আর কোথাও যাওয়া হয়নি।"

রুদ্রকুমার বলল, "যা বলেছেন, বিচ্ছিরি গরম চলছে কয়েকদিন ধরে। বছরের এই সময়টায় এরকম হয়। তারপর নিয়মিত বৃষ্টি হয়ে গেলে ওয়েদারটা এত চমৎকার হয়ে যায়, তখন আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল যদি গরমটা কম থাকে, তা হলে জঙ্গলের দিকে যাব ভাবছি।"

রুদ্রকুমার বলল, "যেতে ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন। আমি নিজে আপনাদের নিয়ে যাব। আমার চেয়ে জঙ্গল কেউ ভাল চেনে না। মাঝে মাঝে আমি একা একা জঙ্গলে চলে যাই। কোনও গাছতলায় চুপ করে বসে থাকি। কতরকম পাখির ডাক শুনি। সামনে দিয়ে হরিণের পাল চলে যায়, বুনো শুয়োর, খরগোশ। ময়ূরও আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাঘটাঘ দেখতে পান না?"

রুদ্রকুমার বলল, "নাঃ! বাঘ এখন অনেক কমে গেছে। খুব কমই দেখা যায়। আপনার ভাইপো আর তার বন্ধু গেল কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "গেছে কোথাও বেড়াতে।"

রুদ্রকুমার বলল, "এখানে অবশ্য তেমন ভয়টয় কিছু নেই। চোর-ডাকাতের উপদ্রবও প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, কাল রাত্তিরে অত বড় ডাকাতি কী করে হল, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। অমন ভারী সিন্দুকটা নিয়ে চলে গেল, নিশ্চয়ই ট্রাক নিয়ে এসেছিল। এরকম আগে কখনও ঘটেনি। কী লজ্জার ব্যাপার বলুন তো! আমাদের বাড়ি থেকেই জিনিসটা চলে গেল। তাও আপনি থাকতে থাকতে। দাদা আপনার উপর খুব ভরসা করেছিলেন। বারবার বলেছিলেন, আপনি এলেই সিন্দুকের রহস্যভেদ হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু একটুখানি বিরক্তভাবে বললেন, "সবাই এই একই কথা বলছে কেন, বুঝতে পারছি না। আপনার দাদা আমাকে সিন্দুকটার কথা ঘুণাক্ষরেও

জানাননি। সিন্দুকের রহস্যভেদ করার জন্যও এখানে আসিনি। আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একটা চেয়ার আনতে বলুন না।”

রুদ্রকুমার বলল, “না, আমার চেয়ার লাগবে না। আপনি সম্মাননীয় অতিথি, আপনি দেশবিদেশে কত রহস্যের সমাধান করেছেন। সবাই ভাবছে, আপনি চেষ্টা করলে কি সিন্দুকটা উদ্ধার করতে পারতেন না?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি সিন্দুকটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চাইনি। তবে, ইচ্ছে করলে অবশ্যই সেটা উদ্ধার করতে পারতাম। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।”

রুদ্রকুমার দারুণ অবাক হওয়ার ভান করে, খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, “আপনি ইচ্ছে করলে পারতেন? তা হলে একটু ইচ্ছে করুন না প্লিজ! আমাদের খুব উপকার হয়।”

ঠাট্টার সুরটা লক্ষ করে কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, “সিন্দুকটা কোথায় আছে, তাও আমি জানি!”

রুদ্রকুমার এবার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে বলল, “তাও জানেন সত্যি? কোথায় আছে? ডাকাতদের আস্তানাটা আপনি চিনে ফেলেছেন?”

কাকাবাবু বললেন, “ডাকাতদের আস্তানায় যাওয়ার দরকার হয়নি। কেউ কেউ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। একটা ক্রাইম করার পর ভাবে, আমার এই নিখুঁত প্ল্যান কেউ বুঝতে পারবে না। তাই সে চুপচাপ না থেকে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। তাই ধরা পড়ে যায়।”

রুদ্রকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, “সিন্দুকটা কোথায় আছে বলুন না!”

কাকাবাবু বললেন, “এ-বাড়িতেই আছে। বাইরে কোথাও যায়নি। কাল রাতে ট্রাক নিয়ে কোনও ডাকাতের দল আসেনি।”

রুদ্রকুমার এবার হেসে ফেলে বলল, “এটা আপনি কী বলছেন? আপনি যত বড়ই রহস্যসন্ধানী হন না কেন, আপনার এ-কথাটা বিশ্বাস করা যায় না। এ-বাড়িতেই সিন্দুকটা কী করে থাকবে? পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। আমরাও খুঁজেছি। সিন্দুকটা বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনি খুব ভাল থিয়েটার করেন, তাই না। আপনার থিয়েটারের দল আছে শুনলাম!”

রুদ্রকুমার বলল, “হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?”

কাকাবাবু বললেন, "ভাল অভিনয়ের নিয়ম হচ্ছে, স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করার সময় সব কিছুই বেশি বেশি করতে হয়। বেশি জোরে হাসতে হয়। বেশি জোরে কাঁদতে হয়। অনেকখানি ভুরু তুলতে হয় অবাক হলে। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে, সামনাসামনি অন্য কারও সামনে ওরকম সবকিছু বেশি করলেই লোকে সন্দেহ করে।"

রুদ্রকুমার বলল, "হঠাৎ একথা বলছেন কেন? আমাকে অভিনয় শেখাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না। আমি শেখাব কেন? আজ সকালে আপনি আমার সামনে স্টেজের অভিনয় করছিলেন। সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেছে শুনে এমন অবাক হলেন যে, বোঝা গেল, ওটা অভিনয়। অর্থাৎ ওই চুরির কথা আপনি আগেই জানতেন। জিপগাড়ি থেকে নেমে এমন ব্যস্ততার ভান করলেন, যেন অনেক দূর থেকে আসছেন, বোঝা গেল সেটা অভিনয়। অর্থাৎ রাত্তিরে আপনি এ-বাড়িতেই ছিলেন। সারারাত জাগতে হয়েছিল। সিন্দুকটা টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দাগটা বারবার আমাকে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু আমি আগেই দেখে নিয়েছি, ওই দাগ কেউ হাত দিয়ে করেছে। আপনিই রটিয়ে দিয়েছেন যে, বাইরে থেকে কেউ এসে ট্রাকে করে সিন্দুকটা নিয়ে গেছে।"

রুদ্রকুমার বলল, "আপনি তো অভিনয়ের খুব সমঝদার দেখছি। আপনার একটা কথাও মেলেনি। সিন্দুকটার গতিবিধি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আপনার মতে যদি সিন্দুকটা এ-বাড়িতেই থেকে থাকে, তা হলে কোথায় আছে, আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন? তা হলে বুঝব আপনার মুরোদ।"

কাকাবাবু এবার চওড়া করে হাসলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্রকুমারের বাহুতে চাপড় মেরে বললেন, "ছোটকুমার, আপনি আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। রাজা রায়চৌধুরীকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে আপনি খুব ভুল করছেন।"

রুদ্রকুমার তবু তেরিয়াভাবে বলল, "আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। সিন্দুকটা দেখিয়ে দিতে পারলে আপনাকে দশ হাজার টাকা দেব।"

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, "আমার নিজের অনেক টাকা আছে। দশ হাজার তো নস্যি! আমি অন্যের কাছ থেকে টাকা নিই না। চলুন, সিন্দুকটা

কোথায় দেখা যাক। এখন আমার নিজেরও একটু একটু আগ্রহ হচ্ছে জানার জন্য, সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন বাড়ির দিকে। দরজার কাছে একটা টুলে বসে নটবর সিংহ ঘুমোচ্ছে যথারীতি।

একতলায় যে-ঘরটায় সিন্দুকটা ছিল, কাকাবাবু সোজা চলে এলেন সেখানে। সারাদিন দু'জন পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল এই ঘরের বাইরে, তারা চলে গেছে সন্ধের পর। এখন ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

একটা আলো জ্বলছে টিমটিম করে।

কাকাবাবু রুদ্রকুমারকে বললেন, "এইখানে অত বড় সিন্দুকটা ছিল তো? কাল রাত্তিরে আমি নিজের চোখে দেখে গেছি। আজ সকালে, কারও ঘুম ভাঙার আগেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই যে সিন্দুকটা টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘষটানো দাগ। এই দাগটা আসল। দাগটা চলে গেছে ঘরের বাইরে।"

কাকাবাবু চলে এলেন ঘরের বাইরে।

মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "দাগটা চলে গেছে বাইরের গেটের দিকে। ঘরের ভিতরের দাগ আর বাইরের দাগটা একরকম নয়। ভাল করে দেখুন। পুলিশ ভাল করে নজর করলেই বুঝতে পারত।"

ডান দিকে খানিকটা সরে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এদিকেও একটা ঘষটানির দাগ ছিল, কেউ সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পুরোপুরি মুছতে পারেনি, এখনও একটু একটু বোঝা যায়। তার মানে, এখান থেকেই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, সিন্দুকটা গেছে বাড়ির বাইরে, আসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভিতরের দিকে। এটা যে আপনারই কাজ, তার প্রমাণ, আপনি আমাকে বাইরের নকল দাগটা দেখাতে চাইছিলেন বারবার।"

প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে কাকাবাবু সেই অস্পষ্ট দাগটার উপর ফেলে ফেলে এগোতে লাগলেন ডান দিকে।

দাগটা ঢুকে গেছে আর-একখানা ঘরে। সে-ঘরটাও একদম ফাঁকা।

রুদ্রকুমার বলল, "তারপর কী হল? এ ঘর থেকে আবার সিন্দুকটা অদৃশ্য হয়ে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "বারবার অত বড় জিনিসটা অদৃশ্য হবে কেন? এই ঘরে নিয়ে আসার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।"

কাকাবাবু টর্চের পিছন দিকটা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে ঠুকতে লাগলেন।

বেশি ঠুকতে হল না, একটা দেওয়ালের প্রায় আধখানা জুড়ে ঠকঠকের বদলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ আওয়াজ হতে লাগল। অর্থাৎ সেটা ফাঁপা।

কাকাবাবু রুদ্রকুমারের দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, "এইখানে আছে সুড়ঙ্গের রাস্তা। সে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে ভাঙা দুর্গটার কাছে। ওদিকের মুখটার নাম 'বাঘের ফাঁদ', তাই না? এ দেওয়ালটা কি আপনি সরাবেন, না আমাকেই সরাতে হবে?"

রুদ্রকুমার খুবই অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু দেওয়ালটার দু'দিকে কিছুটা ঠেলাঠেলি করতেই সেটা হঠাৎ স্লাইডিং দরজার মতন একপাশে সরে গেল। এ দেওয়ালটা আসলে কাঠের, বাইরের দিকে প্লাস্টার করা।

ওপাশে বেশ চওড়া সুড়ঙ্গ, অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট আলো।

ভিতরে পা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আসুন, ছোট রাজকুমার। আপনার বাড়িতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবার দেখা যাক, সিন্দুকটা খুলে কী কী পাওয়া গেছে!"

রুদ্রকুমারও সুড়ঙ্গের মধ্যে এসে বলল, "সত্যি, আপনার যে এতখানি ক্ষমতা, তা আমার ধারণা ছিল না। সত্যি আশ্চর্য! আপনি ছাড়া এখানকার পুলিশ টুলিস কারও সাধ্য ছিল না এ ব্যাপারটা বোঝার।'

সামনের দিকে এগোতে এগোতে কাকাবাবু বললেন, "আপনার দাদা অত্যন্ত সৎ লোক, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, সিন্দুকটার মধ্যে যদি ধনরত্ন, সোনাদানা কিছু থাকে, তা কেউ নিতে পারবে না, সব জমা দেওয়া হবে গভর্নমেন্টের কাছে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু আপনার লোভ হয়েছিল। আপনি ওসব ছাড়তে রাজি নন। তাই এই প্ল্যানটা করলেন। সিন্দুকটা রাখা হল আপনাদের বাড়িতে। সেটা খোলার আগেই চুরি হয়ে গেল। ডাকাতরা নিয়ে গেল ট্রাকে চাপিয়ে। ব্যস, আপনার উপরে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

রুদ্রকুমার বলল, "দেখুন, দাদা যেমন অসুস্থ, কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন। তখন এই বাড়ির মালিক হব আমি। এই ভাঙা বাড়ি ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই! আমি কলকাতায় থাকতে চাই না। এই বাড়ি সারাতে অনেক অনেক টাকা লাগবে। সে টাকা পাব কোথায়? হঠাৎ যদি একটা গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটা কেউ ছাড়ে? আমি দাদার মতন অমন ধার্মিক নই!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সিন্দুক খুলে কী পেলেন?"

রুদ্রকুমার বলল, "সেটা এখনও কোলা যায়নি!"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ! এখনও খোলা যায়নি? দুটো তালা ভাঙা গেল না?"

রুদ্রকুমার বলল, "তালা ভাঙা গেছে, তবু খুলছে না। মনে হচ্ছে মন্ত্র দিয়ে আটকানো। আপনার তো এত বুদ্ধি, দেখুন না, আপনি যদি খুলে দিতে পারেন, তা হলে ভিতরের জিনিসের ওয়ান ফোর্থ আপনার হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বললাম না, আমি অন্যের জিনিস কখনও নিই না। আর সিন্দুক টিন্দুক খোলার ক্ষমতাও আমার নেই। তবু একবার দেখি গিয়ে।"

সুড়ঙ্গটা এখন বেশ চওড়া তো বটেই, এক এক জায়গায়, দু'দিকে আরও বেড়ে গিয়ে ঘরের মতন হয়ে গেছে। এখানে কোনও মানুষ বা অনেকে মিলে কয়েকদিন থাকতেও পারে।"

সেরকমই একটা চওড়া জায়গায় দুটো হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। সিন্দুকটা রয়েছে মাঝখানে। সেটাকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। একটু দূর থেকে তাদের ছায়ামূর্তির মতন দেখাচ্ছিল, কাছে এসে তাদের এক-এক জনকে চিনতে পেরে কাকাবাবু চমকে চমকে উঠতে লাগলেন।

প্রথমেই একজন হাত তুলে বলল, "নমস্কার, নমস্কার রায়চৌধুরীবাবু। ভাল আছেন তো?"

এ লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাদামপাহাড় স্টেশনে। যেচে এসে কথা বলেছিল। যাকে দেখে জোজোর মনে হয়েছিল, জ্যোতিষী।

আর-একজন বলল, "চিনতে পারছেন তো স্যার। আমি আব্দুল লতিফ। ভূতের সুড়ঙ্গের কাছে মোম বিক্রি করি।"

আর-একজন সেই ট্রেনের কামরার চোখ-বোজা সাধু। এখন অবশ্য দিব্যি চোখ-খোলা। সে একটা হাতুড়ি দিয়ে সিন্দুকটা পিটছে। সেও নমস্কার করল।

একটি মেয়েও রয়েছে সেখানে, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, তার হাতে একটা ছুরি। কাকাবাবুর মনে হল, একেও খুব সম্ভবত তিনি দেখেছেন আজ দুপুরে মন্দিরের কাছে।

রুদ্রকুমার বলল, "এদের ডাকাতের দল বলে ভাববেন না। আমিই একমাত্র ডাকাত। এরা থিয়েটার পার্টির লোক। আমাকে সাহায্য করছে। দেখুন না, সিন্দুকটা এখনও খোলা যায়নি। তালা দুটো ভাঙা হয়েছে, কিন্তু

অনেক বছর জলের তলায় থেকে ডালাটা এমন জ্যাম হয়ে গেছে যে খুলছে না কিছুতেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ছুরি দিয়ে চাড় দিয়ে দেখা হয়েছে?"

আব্দুল বলল, "সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আগুন দিয়ে গালিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "অনেক সময় লাথি মারলে কাজ হয়।"

রুদ্রকুমার ঠিক শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী মারলে?"

কাকাবাবু বললেন, "একবার আমার একটা রেডিয়ো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই সারানো যায় না, মেকানিকও কিছু করতে পারল না! আমি তখন রেগেমেগে রেডিয়োটায় এক লাথি কষালুম। অমনি সেটা চলতে শুরু করল।"

রুদ্রকুমার সঙ্গে সঙ্গে লাথি মারল সিন্দুকে।

কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, "এত বড় লোহার সিন্দুক, একজনের লাথিতে কিছু হবে না। সবাই মিলে মারুন।"

এবার সবাই সিন্দুকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে দমাদ্দম করে লাথি মারতে লাগল।

চার-পাঁচবারের পর সিন্দুকের ডালাটা সত্যি সত্যি একটু উঁচু হয়ে উঠল।

সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে।

আব্দুল ডালাটা টেনে তোলার চেষ্টা করতে সেটা ভেঙেই গেল একেবারে।

আব্দুল বলল, "স্যার, আপনি কি ম্যাজিক জানেন?"

রুদ্রকুমার বলল, "দাঁড়াও, কেউ ভিতরে হাত দেবে না। আগে আমি দেখব।"

সবাই তবু ঝুঁকে পড়ল, কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একটু দূরে।

সিন্দুকটা বেশ বোঝাই করা, উপরটা অয়েল ক্লথ দিয়ে মোড়া।

সেটা সরানোর পর দেখা গেল নীল রঙের অয়েল ক্লথ মোড়া কয়েকটা প্যাকেট দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দড়ি ছিঁড়ে একটা প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে ভাঁজ করা সব কাগজ।

রুদ্রকুমার অধৈর্য হয়ে কাগজগুলো না দেখেই একপাশে ফেলে দিয়ে আর-একটা প্যাকেট খুলল।

কাকাবাবু সেই কাগজগুলো তুলে নিলেন।

পরপর সাতখানা প্যাকেট ভরতি শুধু কাগজ। প্রত্যেকটা খুলে খুলে ফেলে দেওয়ার পর রুদ্রকুমার সিন্দুকটার প্রায় তলা থেকে টেনে তুলল একটা মুক্তোর মালা!

খুশির চোটে সে বলে উঠল, "হুররে!"

সে আর-একটা ওইরকম মালা বের করতেই সবাই প্রায় নাচতে শুরু করে দিল।

এরপর আরও অনেক জিনিস বেরোতে লাগল সেই সিন্দুক থেকে. নানারকম গয়না, হিরে-মুক্তো, একটা সোনার জাঁতি, সোনার দোয়াত-কলম, চুনি-পান্না বসানো কয়েকটা কৌটো, তার মধ্যে মোহর।

কাকাবাবু সেসব কিছুই দেখছেন না, তিনি একটা হ্যাজাকের কাছে গিয়ে এক মনে কাগজগুলো পড়ছেন। সংস্কৃত ভাষায় কালো কালি দিয়ে লেখা, অক্ষরগুলো কিছু কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে। কষ্ট করে পড়তে হচ্ছে, তবু কাকাবাবুর মুখে অন্যরকম আনন্দ ফুটে উঠেছে।

সিন্দুক থেকে সব কিছু বের করবার পর রুদ্রকুমার বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের একটুখানি সাহায্য করেছেন। আপনাকে একটা উপহার দেওয়া উচিত। আপনি এর থেকে আপনার পছন্দ মতন যে-কোনও একটা মালা তুলে নিন।"

কাকাবাবু তার দিকে এক দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, "এর কোনও কিছু নেওয়ার অধিকার আমার নেই। আপনাদেরও নেই। এসব কার সম্পত্তি তা স্পষ্টভাবে এইসব কাগজে লেখা আছে।"

রুদ্রকুমার ভুরু নাচিয়ে বলল, "তাই নাকি? কার সম্পত্তি?"

কাকাবাবু বললেন, "ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের।"

রুদ্রকুমার বলল, "সে আবার কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বোধহয় ভাল করে ইতিহাস পড়া নেই। পলাশির যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছিল। তাদের একজন প্রধান নেতা ছিলেন এই কানপুরের ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। ইংরেজদের অস্ত্রশক্তি বেশি ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তারাই জিতে যায়। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়েন। কিন্তু নানাসাহেব কিছুতেই ধরা দেননি। তিনি কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, তা এ-পর্যন্ত কেউ জানত না। এখন জানা গেল। তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই রাজ্যে।"

রুদ্রকুমার মুখ বিকৃত করে বলল, “ধুর, ওসব বাজে ইতিহাস কে শুনতে চায়? এবার তা হলে...”

চোখ-বোজা সাধুটি বলল, “রাজকুমার একটু দাঁড়ান না। বাকি গল্পটা শুনে তো নিই। তারপর কী হল?”

কাকাবাবু বললেন, “ওঁদের থাকার জন্য একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত পুকুরটার ধারে যে বাড়িটাকে এখন বলে ভূতের বাড়ি, সেখানে। সে বাড়িতে ওঁরা ছিলেন প্রায় দেড় মাস। সেসব কথা লেখা আছে। তারপর কিছু একটা হয়। নানাসাহেবের কাছে অনেক ধনরত্ন আছে, এরকম অনেকেই ধারণা করেছিল। একরাতে ডাকাতের দল সেই বাড়ি আক্রমণ করে, ডাকাত না হয়ে এখানকার রাজার সৈন্যরাও হতে পারে। নানাসাহেবের অতি বিশ্বাসী সঙ্গীরা প্রাণপণ লড়াই করে সেই আক্রমণকারীদের রুখে দেয়, তাদের মধ্যে সাতজনই মারা যায়। অবশ্য, সেই অবসরে বাকি তিনজনের সঙ্গে নানাসাহেব পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যান। এত বড় ভারী সিন্দুকটা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয় বলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন পুকুরের জলে। হয়তো ভেবেছিলেন, কোনও এক সময় আরও দলবল নিয়ে ফিরে এসে সিন্দুকটা উদ্ধার করবেন। তা আর আসতে পারেননি।”

রুদ্রকুমার বলল, “এসব তো কবেকার কথা। এখন তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে চায়! এই কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি এখন আমার।”

কাকাবাবু বললেন, “ওগুলোর দাম কয়েক কোটি টাকা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি। ঐতিহাসিক জিনিস হিসেবে ওগুলো অমূল্য। ওই সবই মিউজিয়ামে থাকবে।”

রুদ্রকুমার হা হা করে হেসে উঠে বলল, “মিউজিয়ামে থাকবে? লোকটা বলে কী? মাথা খারাপ নাকি? এই সম্পত্তি পেয়ে আমি ছেড়ে দেব? এসব বিক্রি করে সেই টাকায় আমি এখানকার রাজা হব।”

আব্দুল বলল, “আমাদের থিয়েটার পার্টিটা, ভালভাবে গড়া যাবে।”

মেয়েটি বলল, “কিন্তু কুমারসাহেব, এ-লোকটি বাইরে গিয়ে যদি পুলিশকে সব কিছু বলে দেয়? আজ সন্ধেবেলা ভুবনেশ্বর থেকে একজন পুলিশের বড়কর্তা এসেছেন শুনেছি।”

রুদ্রকুমার বলল, “সে-কথা কি আর আমি ভাবিনি? ওকে বাইরে যেতে দিচ্ছে কে? ওকে মেরে এইখানে পুঁতে রাখলে কেউ কিছুই টের পাবে না।”

লম্বা লোকটি বলল, “পুলিশ কিন্তু এই সুড়ঙ্গের মধ্যেও খোঁজ করতে

পারে। এখানে কোনও প্রমাণ রাখা ঠিক হবে না। অন্য কিছু ভেবে দেখতে হবে।"

রুদ্রকুমার চেঁচিয়ে ডাকল, "গুরুপদ! এই গুরুপদ! ব্যাটা এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?"

একটু দূরে সত্যিই মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল একজন লোক। ডাক শুনে সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল।

রুদ্রকুমার তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই বুড়োর সঙ্গে যে ছেলে দুটো এসেছিল, তাদের বেঁধে রেখেছিস তো?"

লোকটি নাক দিয়ে ঘোঁতমতন শব্দ করল।

লম্বা লোকটি বলল, "হ্যাঁ, জালে বাঁধা আছে। সাধুচরণ ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গর্তের মুখটা ঠিক মতন বন্ধ করে যায়নি, তাই ছেলে দুটো বাঘের ফাঁদে নেমে ঠিক ফাঁকটা দেখে ঢুকে পড়েছিল।"

সাধু সাজা লোকটি বলল, "তখন যে বড় হাতুড়ি আনতে গেলাম। তাড়াহুড়োতে খেয়াল করিনি।"

রুদ্রকুমার বলল, "গুরুপদ, এই খোঁড়া লোকটাকে বেঁধে ফেল।"

কাকাবাবু বললেন, "এই সেই গুরুপদ। আমাদের ড্রাইভার। গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে এ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। আমাদের অনেক বিপদ হতে পারত। একে সেজন্য শাস্তি পেতে হবে।"

রুদ্রকুমার আবার অট্টহাস্য করে বলল, "কে শাস্তি দেবে? তুমি? তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, রায়চৌধুরী!"

গুরুপদ কাকাবাবুকে ধরার জন্য দু'হাত বাড়াতেই তিনি প্রচণ্ড এক ঘুসি কষালেন তার মুখে।

সে ছিটকে পড়ে গেল দেওয়ালের কাছে।

রুদ্রকুমার বলল, "হুঁ, তোমার হাতে বেশ জোর আছে দেখছি! ওকে মারলে কী হবে, আমিই তো ওকে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের জঙ্গলে ফেলে আসতে। আমাকে মারো দেখি। আমি এ জেলার বক্সিং চ্যাম্পিয়ন।"

সে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর মুখ লক্ষ করে ঘুসি চালাল দু'বার। কাকাবাবু দু'বারই ঠিক সময় মাথা সরিয়ে নিলেন, তাঁর লাগল না। তারপর নিজে আচমকা একটা ঘুসি কষালেন রুদ্রকুমারের পেটে।

সে দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে আবার উঠে দেওয়ালে ঝোলানো একটা তলোয়ারের খাপ খুলে বলল, "এবার?"

কাকাবাবু বললেন, "দেওয়ালে আর-একটা তলোয়ার আছে দেখছি। ওটা আমাকে দাও। তারপর দ্যাখো, তুমি কতক্ষণ আমার সামনে দাঁড়াতে পারো। তোমার ওই মুঠো করে ধরা দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি তলোয়ার চালানো ভাল করে শেখোনি।"

রুদ্রকুমার ভেংচি কেটে বলল, "আর-একটা তলোয়ার তোমাকে দেব? এ কি খেলা হচ্ছে নাকি! তুমি এক্ষুনি খতম হয়ে যাবে। তা বুঝতে পারছ না?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি একটা কাপুরুষ। রাজবংশের লোক হলে কী হবে, তুমি এটা জানো না যে, তলোয়ার হাতে নিলে অন্য পক্ষকে লড়াইয়ের সুযোগ দিতে হয়। ঠিক আছে, মারো দেখি, আমাকে কীভাবে মারবে?"

কাকাবাবু ডান হাত দিয়ে একটা ক্রাচ উঁচু করে তুলে ধরলেন।

রুদ্রকুমার এলোপাতাড়ি তলোয়ার চালাতে চালাতে এগোনোর চেষ্টা করল। কয়েকবার আটকে আটকে একবার কাকাবাবু এমন জোরে তার হাতে ক্রাচ দিয়ে মারলেন যে, তলোয়ারটা ছিটকে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই শেখোনি।"

লম্বা লোকটি দেওয়াল থেকে খুলে নিল অন্য তলোয়ারটা। আব্দুল মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল আগেরটা। সেটা এনে দিল রুদ্রকুমারকে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার দু'জন। ঠিক আছে।"

তিনি ক্রাচ দুটোই মাটিতে ফেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দুটো হাতই খালি।

রুদ্রকুমার হঠাৎ খুব ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, ও এবার পকেটে হাত দেবে। আমার বন্দুকটা কোথায়, বন্দুকটা নিয়ে আয়, শিগ্‌গির শিগগির..."

কাকাবাবু চোখের নিমেষে পকেট থেকে বের করে ফেলেছেন রিভলভার।

ঠান্ডা গলায় বললেন, "না, তোমার বন্দুকটা আর আনা চলবে না। যে যেখানে আছ, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, কেউ নড়বে না।"

লম্বা লোকটি তখনও তলোয়ার উঁচিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "এটা যে খেলনা পিস্তল নয় আর আমার হাতের টিপ কত ভাল, সেটা তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

তিনি একবার গুলি চালালেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে তার প্রচণ্ড শব্দ হল।

গুলিটা লেগেছে লম্বা লোকটির ডান হাতের মুঠোয়, তলোয়ারটা ঝনঝন করে পড়ে গেল মাটিতে। লোকটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে, সেইজন্য তোমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে। নানাসাহেবের সব জিনিসপত্র যাবে সরকারের কাছে। সবাই একদিকে পাশাপাশি দাঁড়াও।

কেউ নড়ছে না দেখে কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আবার গুলি করতে হবে নাকি? সব সরে যাও একদিকে!"

এবার সবাই হুড়োহুড়ি করে রুদ্রকুমারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শুধু ড্রাইভার গুরুপদ তখনও মাটিতে বসে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "ওঠো, ওঠো, যাও ওদিকে। তোমাকে দেখেই আমার রাগ হচ্ছে। দেরি করলে গুলি চালিয়ে দিতে পারি। জঙ্গলে তোমার জন্য আমাদের হাত-পা ভাঙতে পারত। তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে!"

গুরুপদ এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ওদের পাশে।

এই দলে যে একটি মাত্র মেয়ে, সে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

কাকাবাবু তাকেও ধমক দিয়ে বললেন, "কান্নার কী আছে! তুমিও আমাকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলে। যাও, ওদের পাশে যাও!"

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "না, না। আমি ওকথা বলিনি। আমি কোনও দোষ করিনি। আমি কিছুই জানি না!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা পরে হবে। যাও ওদিকে। তারপর সবাই মিলে লাইন করে ভিতরের দিকে চলো।"

মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, "না, না, আমি ওদের সঙ্গে যাব না। আমি আপনার কাছে থাকব। আপনি আমাকে বাঁচান।"

মেয়েটি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর বুকে। দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ ওইভাবে মেয়েটি বুকের উপর পড়ায় কাকাবাবু প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। পরেই বুঝলেন, এ-মেয়ের অন্য মতলব আছে। কান্নাটা ওর অভিনয়।

কিন্তু এক হাতে তিনি ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেন না। মেয়ে বলেই তার গায়ে গুলি চালাতেও পারলেন না কাকাবাবু। শুধু বলতে লাগলেন,

"সরো, সরো, এ কী করছ!"

মেয়েটি এবার খুব জোরে কামড়ে দিল কাকাবাবুর ডান হাত।

কাকাবাবু রিভলভারটা আর ধরে রাখতে পারলেন না। সেটা পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে। খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

রুদ্রকুমার রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "এবার?"

অন্যরা কাকাবাবুকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে চেপে বসেছে তাঁর বুকে। গুরুপদ ঘুসি মারছে তাঁর মুখে। কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন।

রুদ্রকুমার মেয়েটিকে বলল, "তুই দারুণ কাজ করেছিস রে চামেলি! লোকটা সত্যি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তোকে কিছু পুরস্কার দিতে হবে।"

মেয়েটি বলল, "আমায় দু'ছড়া মুক্তোর মালা দিতে হবে।"

রুদ্রকুমার বলল, "পাবি, পাবি। দু'খানা হিরেও দেব।"

তারপর সে তার দলের লোকদের বলল, "আর মারিস না। এবার ওকে বেঁধে ফেল। গুরুপদ, দড়ি নিয়ে আয়।"

গুরুপদ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল অনেকখানি মোটা দড়ি।

রুদ্রকুমার বলল, "ভাল করে বাঁধ। যেন আর কোনও কেরামতি না করতে পারে। শুনেছি, এই রায়চৌধুরী নাকি অনেক জায়গায় অনেকরকম বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। এবারেই ওর খেলা শেষ।"

কাকাবাবু জ্ঞান হারাননি। কোনও কথা বলছেন না। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা চোখেও লেগেছে খুব।

রুদ্রকুমার লম্বা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কী করব? এখানেই খতম করে দেব ওকে?"

সে বলল, "তা হলে লাশটা ফেলবেন কোথায়! এখানে রাখা যাবে না।"

রুদ্রকুমার বলল, "সেটা ঠিক কথা। এক কাজ করা যাক। ওকে গর্জনতলা নিয়ে যা কয়েকজন মিলে। ওখানে একটা বিরাট খাদ আছে জানিস তো? সেখানে ওকে ঠেলে ফেলে দিবি নীচে। অত উঁচু থেকে পড়লে কোনও মানুষের পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়। ঠেলে ফেলার আগে ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিবি। তা হলে মনে হবে অ্যাকসিডেন্ট। ছেলে দুটোও তো বাঁধা আছে।

তাদেরও নিয়ে যা। একইরকমভাবে ফেলে দিবি নীচে। পুলিশ বুঝবে ওরা নিজেরাই কোনওভাবে পড়ে গেছে। আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। আমার দাদাকে সেই কথা বুঝিয়ে দেব।"

লম্বা লোকটি বলল, "আপনি যাবেন তো সঙ্গে?"

রুদ্রকুমার বলল, "না, না, আমি কী করে যাব? এত সব জিনিসপত্র এখানে পড়ে থাকবে? তোরা কয়েকজন মিলে যা। তুই, সাধুচরণ, আর-একজন অন্তত।"

আব্দুল লতিফ বলল, "আমি এখানেই থাকতে চাই।"

রুদ্রকুমার বলল, "তা হলে গুরুপদ যাক। তিনজনই যথেষ্ট। এর হাত-পায়ের বাঁধন যখন খুলবি, তখন কিন্তু খুব সাবধান। এক কাজ করতে পারিস। একটা লোহার ডান্ডা কিংবা হাতুড়ি নিয়ে যা। বাঁধন খোলার আগেই হাতুড়ি মেরে ওর মাথাটা একেবারে ভেঙে দিবি। খাদের নীচে পড়লে মাথাটা তো এমনিতেই ছাতু হয়ে যাবে। ছেলে দুটোরও ওই একই ব্যবস্থা করিস। বাঁধন খোলার আগেই খতম করে দিলে একেবারে নিশ্চিন্ত।"

লম্বা লোকটি বলল, "গর্জনতলা তো অনেকটা দূরে। কী করে যাব?"

রুদ্রকুমার বলল, "গাড়িতে যাওয়া চলবে না। তা হলে ড্রাইভার সাক্ষী থাকবে। হেঁটেই চলে যা। ভাবিস না, তোদের সবাইকেই আমি ভাল মতন পুরস্কার দেব। আর দেরি করে লাভ নেই! এত রাত্তিরে বাইরে কেউ থাকবে না, তোদের কেউ দেখতেও পাবে না।"

দু'-তিনজন মিলে কাকাবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিল।

রুদ্রকুমার বলল, "গুডবাই, রায়চৌধুরী। কেন আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছিলে? তোমার কপালে এইরকম মৃত্যুই লেখা ছিল, বুঝলে তো!"

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো সঙ্গে দাও!"

রুদ্রকুমার হেসে বলল, "তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে আর ক্রাচ লাগবে না। এ দুটোর মধ্যে কোনও অস্ত্রটস্ত্র লুকোনো আছে কি না কে জানে? পরে ভাল করে পরীক্ষা করে আগুনে পুড়িয়ে দেব। কোনও প্রমাণ রাখব না।"

ওরা তিনজন কাকাবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

খানিকটা যাওয়ার পর রেলের কামরায় সেই চোখ-বোজা সাধুটি বলল, "তোমার ভাইপো না ভাগনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি সাধু হয়েছি কেন? বাবা-মা-ই আমার নাম রেখেছে সাধুচরণ। আমাদের নাটকে আমাকে

সাধুর পার্ট দেওয়া হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াই। সাধু সাজলে রেলের ভাড়াও লাগে না।"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের নাটকে সেই সাধু আবার ছদ্মবেশী এক খুনি।"

সাধুরচণ বলল, "সে পার্টটাও আমি ভালই করছি। কী বলো?"

লম্বা লোকটি বলল, "আমার নাম হরকুমার। কাল রেল স্টেশনে তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। সিন্দুকটা নিয়ে মাথা না ঘামালে তোমার এই অবস্থা হত না।"

কাকাবাবু এদের সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

সুড়ঙ্গটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। তলাটা এবড়োখেবড়ো। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে কাকাবাবুর। সামনে সামনে যাচ্ছে সাধুচরণ। তার হাতে একটা মশাল। পিছন থেকে দু'জন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে ঠেলতে ঠেলতে।

এক জায়গায় সাধুচরণ জিজ্ঞেস করল, "ছেলে দুটো কোথায় রে? এই গুরুপদ, আর কতটা দূরে?"

গুরুপদ বলল, "দূর নেই।"

কয়েক মিনিট যাওয়ার পর সুড়ঙ্গটা আবার চওড়া হয়ে গেল। প্রায় একটা গোল ঘরের মতন।

এখানে দেওয়ালের গায়ে অনেক গর্ত। ওদের পায়ের শব্দ পেতেই সেইসব গর্ত থেকে কিচকিচ করে উঠল কয়েকটা ইঁদুর।

সাধুচরণ বলল, "এখানেই তো থাকার কথা।"

হরকুমার বলল, "দড়ির জালটা তো এখানেই উপরে বাঁধা থাকে। গেল কোথায়?"

মশালটা নিয়ে একটু খুঁজতেই দেখা গেল এক জায়গায় জালটা ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় টুকরো টুকরো অবস্থা।

সাধুচরণ দারুণ হতাশভাবে বলল, "যাঃ, ছেলে দুটো পালিয়েছে?"

হরকুমার বলল, "জালটা অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। তাও তো বেশ মজবুত ছিল। ছিঁড়ল কী করে?"

সাধুচরণ বলল, "কী করে ছিঁড়ল, সে চিন্তা করে লাভ নেই। ছেলে দুটো পালিয়েছে, এটাই আসল কথা। এখন কী হবে? ছোটবাবুকে জানাতে গেলেই তো দারুণ চটে যাবে।"

হরকুমার বলল, "একেই তো দারুণ রগচটা। তার উপর হাতে রয়েছে পিস্তল। রেগেমেগে হয়তো গুলিই করে দেবে!"

সাধুচরণ বলল, "এই ব্যাটা গুরুপদরই তো পাহারা দেওয়ার কথা। শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল বোধহয়। এখন তুই যা, খবর দে ছোটকুমারকে। জিজ্ঞেস করে আয়, আমরা শুধু একেই নিয়ে যাব কিনা গর্জনতলায়।"

গুরুপদ ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে, দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, "না, না, না!"

সাধুচরণ বলল, "এ যাবে না। আমিও যেতে রাজি নই।"

হরকুমার বলল, "আমার একা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে এক কাজ করা যাক। এখন রায়চৌধুরীকে একাই গর্জনতলায় ফেলে আসা যাক। ছেলে দুটো তো সিন্দুকের মধ্যে কী আছে, তা জানে না, কোনওদিন জানতেও পারবে না। ওদের এখন না মারলেও চলবে। ওরা জানবে, ওদের কাকাবাবু অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। চল তা হলে!"

ওরা আবার কাকাবাবুকে ঠেলতে শুরু করল।

এরপর সুড়ঙ্গটা আবার খুব সরু হয়ে গেল। মাথা নিচু করে দেওয়াল ধরে ধরে এগোল। এক জায়গায় সাধুচরণ একটা দরজা খুলে ফেলল, তারপরেই বাঘের ফাঁদের সেই গর্ত।

সাধুচরণ হরকুমারকে বলল, "আগে তুই উপরে উঠে উঁকি মেরে দ্যাখ, বাইরে কেউ আছে কি না।"

হরকুমার খাঁজ দিয়ে উপরে গিয়ে বলল, "না, কেউ নেই। সব শুনশান।"

সাধুচরণ কাকাবাবুকে বলল, "ওঠো।"

পা বাঁধা অবস্থায় তবু লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা যায়, কিন্তু খাঁজ বেয়ে উঠবেন কী করে কাকাবাবু। হাতও বাঁধা।

গুরুপদ আর সাধুচরণ তাঁকে ঠেলে তুলল, উপর থেকে হরকুমার তাঁর কাঁধ ধরে টেনে নিল।

এখানটা এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ আর নির্জন। আকাশে রয়েছে জ্যোৎস্না, আকাশটা ঠিক যেন পাউডার মাখানো। বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে আলোছায়ার মধ্যে।

হরকুমার বলল, "গর্জনতলা অনেকটা দূর। এইরকমভাবে ও লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে? অসম্ভব।"

সাধুচরণ বলল, "পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতেই হবে। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাবে। দে, গুরুপদ, পা-টা খুলে দে।"

তারপর সে কাকাবাবুকে বলল, "খবরদার, তেড়িবেড়ি করতে যেয়ো না। দৌড়োতে তো পারবে না। পালানোর চেষ্টা করলেই এই হাতুড়ির ঘা মারব মাথায়!"

হরকুমার বলল, "এক কাজ কর না। এখানেই ওর মাথাটা ভেঙে দে। তারপর ওর দেহটা আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাব। সেটাই সুবিধে।"

সাধুচরণ বলল, "কাঁধে করে মড়া নিয়ে যাব? ওসব আমি পারব না। তা ছাড়া, ছোটকুমার যা বলেছে, তাই করতে হবে। চল, চল।"

ঠিক তক্ষুনি কাকাবাবু শুনতে পেলেন একটা পাখির ডাক। মনে হল যেন একটা দোয়েল পাখির শিস।

কী সুন্দর সেই সুর। ঠিক যেন অসহ্য গরমের পর এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস। মনটা জুড়িয়ে যায়।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হরকুমার বলল, "রাত্তিরবেলা পাখি ডাকছে?"

সাধুচরণ বলল, "এগো না। এখন পাখির ডাক শুনতে হবে না।"

কাকাবাবুর মুখে ছড়িয়ে গেছে হাসি।

তিনিও অবিকল সেই পাখির ডাকের মতন শিস দিতে লাগলেন।

এবারে সাধুচরণের কিছু একটা সন্দেহ হল। সে বলল, "কী ব্যাপার, কী ব্যাপার? এ লোকটা শিস দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে। মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব।"

সে হাতুড়িটা উঁচু করতেই কাকাবাবু এক পা তুলে তার পেটে মারলেন লাথি। সে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল।

ভাঙা দুর্গটির ভিতর থেকে একলাফে বেরিয়ে এল সন্তু। হাতে তার একটা লম্বা বন্দুক।

সন্তু চিৎকার করে বলল, "সাবধান, গুলি চালাব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর হাতের টিপ কিন্তু খুব ভাল।"

সন্তুর পিছন পিছন ছুটে এসেছে জোজো আর কমলিকা।

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন আগে খুলে দে জোজো।"

জোজো কাকাবাবুর কাছে এসে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ইস, একটা ছুরি থাকলে ভাল হত। যাক গে, অনেক দিন নখ

কাটিনি, বড় নখ থাকলে গিঁট খোলার সুবিধে হয়।"

কমলিকা কাছে এসে বলল, "কাকাবাবু, আপনার কোথাও লাগেনি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, এখন একটা চোখ দিয়ে খুব জল পড়ছে। তা বলে ভেবো না যেন আমি কাঁদছি! সন্তু বন্দুকটা পেল কোথায়?"

কমলিকা বলল, "আমাদের বাড়ির বন্দুক! সন্তু চাইল। আমার দাদা বন্দুক চালানো শেখেনি।"

বাঁধন মুক্ত হয়ে কাকাবাবু ওদের তিনজনের সামনে এসে বললেন, "তোমরা যারা আমার মুখে ঘুসি মেরেছ, তাদের প্রত্যেককে ওইরকম ঘুসি খেতে হবে। আমার গায়ে কেউ হাত তুললে তাকে আমি ক্ষমা করি না।"

রাজবাড়ির দিক থেকে ছুটে এল তিনজন পুলিশ, আগে আগে রয়েছে বিনয়ভূষণ মহাপাত্র।

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এখানে কী হয়েছে? স্যার, আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? আমাদের বড়সাহেব এসেছেন, ওদিকের সুড়ঙ্গের মুখটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "এই তিনজনকে বাঁধুন। আমি ওদিকে যাচ্ছি। এখান থেকে আর কেউ বেরোনোর চেষ্টা করলেই ধরবেন!"

কিরণচন্দ্র ভঞ্জদের জ্বর অনেকটা কমেছে। তবু শরীর খুব দুর্বল। কথা বললেন খুব আস্তে আস্তে। কাকাবাবুদের দেখে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "উঠবেন না, বসুন, বসুন!"

সন্তু আর জোজোও এসেছে কাকাবাবুর সঙ্গে।

কিরণচন্দ্র বললেন, "আমার আর এখানে থাকা হবে না। ছেলে বলছে, কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। আপনারা এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন। কমলিকা আপনাদের দেখাশুনো করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমাদেরও আজ চলে যেতে হবে। পুলিশের আই জি অখিল পট্টনায়ক এখানে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তিনি আমাদের ভুবনেশ্বর নিয়ে যেতে চান।"

কিরণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছিলেন, তার কিছু হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। নানাসাহেব যে তাঁর দলবল নিয়ে এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "ওই সিন্দুকটা বুঝি নানাসাহেবের?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

কিরণচন্দ্র বললেন, "কলকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব শুনব। ছি ছি, কী লজ্জার কথা বলুন তো! আমারই বাড়ি থেকে সিন্দুকটা চুরি হল, আর সেটা চুরি করল আমার নিজের ভাই? ছি ছি ছি। ওকে পুলিশে ধরেছে, বেশ করেছে! ওর শাস্তি পাওয়াই উচিত। অল্প বয়েস থেকেই ও খুব লোভী আর হিংসুটে।"

ভাঙা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, "অন্যের টাকাপয়সা দিয়ে এ-বাড়ি সারালেও কি আর আমাদের পুরনো কালের গৌরব ফিরবে? না, না, আর ফিরবে না। রাজবংশের দিন চলে গেছে!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বাড়িতেও যে একটা সুড়ঙ্গ আছে, তা আপনি জানতেন?"

কিরণচন্দ্র বললেন, "হ্যাঁ, জানতাম বটে। কিন্তু আমার বাবা বেঁচে থাকতেই দু'দিকের মুখ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গত তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ ওটা ব্যবহার করেনি। আমার এই ভাইটা, রুদ্র, ও আবার মুখ দুটো খুলে ফেলেছে নিশ্চয়ই। আমায় কখনও কিছু জানায়নি। রায়চৌধুরীদা, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব, আপনি আমাদের পরিবারের সম্মান বাঁচালেন। নানাসাহেবের সব জিনিস ঠিকঠাক পুলিশের কাছে জমা পড়েছে তো? রুদ্র কিছু সরাতে পারেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সবই জমা পড়েছে। শুধু পট্টনায়কের অনুমতি নিয়ে আমি একটা পান্নার মালা তুলে নিয়েছি। সেটা রাজকুমারী কমলিকার জন্য।"

কিরণচন্দ্র কিছু বলতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "না, না এ-নিয়ে আপনি কিছু আপত্তি করবেন না। এইটুকু একটা উপহার আমি দিতেই পারি!"

আর একটুক্ষণ কথা বলে কাকাবাবুরা চলে এলেন সেখান থেকে।

খাবার ঘরে কমলিকা ওদের জন্য অপেক্ষা করছে প্লেট সাজিয়ে। ওদের দেখেই বলল, "লুচি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে! সন্তু আর জোজো, তোমরা কী দিয়ে লুচি খাবে?"

সন্তু বলল, "বেগুনভাজা।"

জোজো বলল, "ক্ষীর।"

কমলিকা বলল, "ঠিক আছে, দুটোই পাবে!"

জোজো বলল, "আমি যদি আতার পায়েস চাইতুম, তা দিতে পারতে?"

কমলিকা বলল, "তা হলে একজন ম্যাজিশিয়ানকে ডেকে আনতে হত।"

জোজো বলল, "ডাকতে হবে কেন? আমিই তো ম্যাজিক জানি। দেখবে, দেখবে, তুমি যদি এখন একটা পান্নার মালা চাও, আমি এক্ষুনি কাকাবাবুর পকেট থেকে একটা লাল পাথরের মালা বের করে দেব!"

সন্তু বলল, "পারবি? আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তুই কিছুতেই পারবি না!"

জোজো বলল, "পারব না মানে? দ্যাখ, আগে একটা মন্ত্র পড়ে নিই!"

সন্তু বলল, "যতই মন্ত্র পড়িস, পান্নার মালা কিছুতেই লাল হবে না। আসলে পান্না হচ্ছে সবুজ!"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে সবুজ মালাটা বের করে কমলিকার গলায় পরিয়ে দিলেন।

কমলিকা লজ্জা পেয়ে বল, "না, না আমি এটা নেব না। অন্যের জিনিস নিলে আমার বাবা রাগ করবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "না, রাগ করবেন না। তোমার বাবাকে আমি বলে নিয়েছি।"

খাওয়া শুরু করার পর কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা সুড়ঙ্গটায় ঢোকার পর একটা জালে আটকা পড়েছিলি শুনেছি। সেখান থেকে উদ্ধার পেলি কী করে?"

জোজো বলল, "আমাদের আটকে রাখতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও জাল তৈরি হয়নি!"

সন্তু বলল, "তা ঠিক। কিন্তু তুই ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলি!"

জোজো বলল, "সে তো জালের জন্য নয়। ইঁদুরের জন্য। ওরে বাপ রে, অত বড় বড় ধেড়ে ইঁদুর আমি সাতজন্মে দেখিনি!"

সন্তু বলল, "সত্যি কথা বলতে কী, আমিও একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ইঁদুরগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমরা জালে আটকা পড়েছি, একগাদা ইঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। আমরা হাত-পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ইঁদুরগুলো সরাবার চেষ্টা করছি, ওরা যায় না। জাল কামড়ে ঝুলতে লাগল।

ওদের দাঁতের ধারে জালের দড়ি কেটে যেতে লাগল এক এক জায়গায়। তাতেই অনেকটা ফাঁক হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম আগে, তারপর টেনে বের করলাম জোজোকে। ইঁদুরগুলোকে লাথি মারতে মারতে লাগালাম দৌড়। শেষ গর্তটায় এসে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। ব্যস! তারপরেই মুক্তি!"

জোজো বলল, "আমার পায়ে দু'জায়গায় ইঁদুর কামড়েছে। যদি সেপটিক হয়, তাই দৌড়ে চলে এলাম কমলিকার কাছে ডেটল চাইতে।"

সন্তু বলল, "একটু পরেই দু'গাড়ি ভরতি পুলিশ এসে পড়ল। তাদের মধ্যে রয়েছেন আই জি অখিল পট্টনায়ক। ওঁকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি, উনিও আমায় দেখে চিনতে পারলেন। উনি এসেছেন সিন্দুকটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কাকাবাবু, তোমাকে কোথাও দেখা গেল না। তবে, নটবর সিংহ বলল, রুদ্রকুমারের সঙ্গে তুমি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ, আর বেরোওনি। অথচ বাড়ির মধ্যে কোথাও দু'জনকে পাওয়া গেল না। অখিল পট্টনায়ক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার মনে হল, নিশ্চয়ই তা হলে এই বাড়ির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকার কোনও রাস্তা আছে। কিন্তু ঢোকার জায়গাটা কোথায়, তা বোঝা যাচ্ছিল না কিছুতেই।"

জোজো বলল, "আমিই তো তখন বললাম সন্তুকে, পুলিশ এ দিকটা খুঁজুক। ততক্ষণ আমরা অন্য দিকটায় গিয়ে দেখি, ওখান থেকে কেউ বেরোচ্ছে কি না!"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জোজোই ঠিক বলেছিল। কমলিকাদের বন্দুকটা নিয়ে আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম। গর্তটার মধ্যেও নামতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ভিতরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে লুকিয়ে রইলাম ভাঙা দুর্গটায়। দেখতে চাইছিলাম, ওদের হাতে বেশি অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না!"

জোজো বলল, "সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানেন, কাকাবাবু। সন্তুর হাতে বন্দুকটা ছিল কিন্তু একটাও গুলি ছিল না। কমলিকা তাড়াহুড়োতে গুলি খুঁজে পায়নি।"

কমলিকা বলল, "গুলি নেই, তা খুঁজে পাব কী করে?"

সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তা হলে নানাসাহেব যে এখানে ছিলেন, তার সব প্রমাণ তুমি পেয়ে গেলে?"

কাকাবাবু বললেন, "সবটা পাওয়া যায়নি। নানাসাহেব যে এখানে ছিলেন, কিছুদিন থেকেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর, আমার যতদূর মনে

হয়, ডাকাতদের আক্রমণে ওঁর দলের কয়েকজন মারা যায়। বোধহয় তাদেরই মাথার খুলি পাওয়া গেছে পুকুরে। নানাসাহেব বাকি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পালানোর সময় সিন্দুকটা পুকুরে ফেলে যেতে বাধ্য হন।"

সন্তু বলল, "তারপর উনি কোথায় যেতে পারেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এবার সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। সেটাই আমার পরবর্তী কাজ হবে। চলো, আপাতত আমাদের ভুবনেশ্বর যেতে হবে। ওঠা যাক।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, তার আগে একবার গর্জনতলা নামের জায়গাটা দেখে গেলে হয় না? যেখানে আমাদের তিনজনকে মেরে ফেলার কথা ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ, সেই খাদের জায়গাটা একবার দেখে আসা যাক। কমলিকা, তুমি জায়গাটা দেখেছ?"

কমলিকা বলল, "না, নাম শুনেছি। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।"

একটু বাদে সবাই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

ওঁরা যখন গর্জনতালয় পৌঁছোলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে, আকাশ ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়।

এই খাদের নীচে পড়ে গেলে সত্যিই বাঁচার কোনও আশা নেই। কিন্তু এখন উঁকি মেরে দেখলে জায়গাটা মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। চতুর্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর নিবিড় বন।

কী যেন একটা রাত পাখি ডাকছে।

জোজো বলল, ওই রুদ্রকুমারকেই এখান থেকে ঠেলে ফেলা উচিত ছিল। সেটাই হত ওর ঠিক শাস্তি।

কাকাবাবু বললেন, ওসব চিন্তা আর কোরো না। এখন এ জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে, এখন খারাপ কথা ভাবতে নেই। খানিকটা রেলিং দিয়ে ঘিরে দিলে এ জায়গাটা চমৎকার পিকনিক স্পট হতে পারে। তোমরা কেউ একজন একটা গান গাও।

জোজো বলল, আমি গাইব?

সন্তু বলল, না, না, তুই চুপ কর। কমলিকা গাইবে।

কমলিকা বলল, আমি তো গান জানি না।

সন্তু বলল, অ্যাই, আমাদের বাঘের ফাঁদে ফেলার আগে তুমি যে বলেছিলে দুটো গান শোনাবে?

কমলিকা মুচকি হেসে বলল, সে তো মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

কাঁকাবাবু বললেন, মিথ্যে কথা বলেছিলে। খুব খারাপ! তুমি যে সন্তু আর জোজোকে বাঘের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে, ওরা কিন্তু তার কোনও শোধ নেয়নি। এখন যদি গান না গাও, তা হলে ওরা কিন্তু শোধ নিতে পারে।

কমলিকা দু'-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর গেয়ে উঠল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...
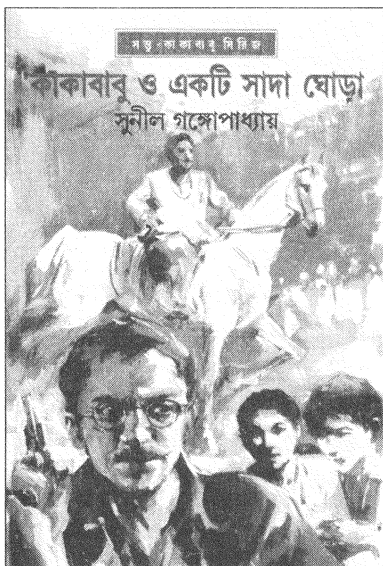
কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া

জোজো ভুরু কুঁচকে বলল, ‘‘এই বাড়িটায় এক হাজারটা ঘর আছে? যাঃ, বাজে কথা!’’ সন্তু বলল, ‘‘তুই গুনে দ্যাখ!’’জোজো বলল, ‘‘শুধু শুধু কষ্ট করে গুনতে যাব কেন? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। আমাদের কলকাতায় এক-একটা বিশাল বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ কত ঘর থাকে! বড়জোর আড়াইশো-তিনশো! এ-বাড়িটা মোটেই তেমন কিছু বড় নয়। মাত্র তিনতলা!’’

সন্তু একটা আখ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। খানিকটা ছিবড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ‘‘তুই বাড়ি বাড়ি কী বলছিস? এটা বাড়ি নয়, প্যালেস। রাজপ্রাসাদ। প্যালেসের সঙ্গে কখনও আজকালকার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর তুলনা হয়? তা ছাড়া, কোথাও বলা হয়নি যে, এখানে হাজারটা ঘর আছে। আসলে আছে এক হাজারটা দরজা। সেই জন্যই এর নাম হাজারদুয়ারি।’’

জোজো আখ ছাড়াতে পারে না। সে আখের টুকরোটা ধরে আছে লাঠির মতন। কাকাবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে।

জোজো আবার বলল, ‘‘এক হাজারটা দরজা মানেই তো এক হাজারটা ঘর থাকবে।’’

সন্তু বলল, ‘‘মোটেই তা নয়। অনেক ঘরের দুটো করে দরজাও থাকতে পারে। বাথরুমেরও একটা দরজা থাকে।’’

জোজো বলল, ‘দুর বোকা, তা হলে তো বাথরুমটাও একটা ঘর হল। সেটাও তো গুনতির মধ্যে পড়বে।’’

কাকাবাবু অন্য লোকটির সঙ্গে কথা শেষ করে এদিকে এসে বললেন, ‘‘কী ব্যাপার, বাথরুমের কী কথা হচ্ছে?’’

সন্তু বলল, ''বাথরুম নয়, আমরা ভাবছিলাম, এই প্যালেসে যদি এক হাজারটা দরজা থাকে, তা হলে ঘর আছে কতগুলো? ঘরও কি এক হাজার? বাথরুম টাথরুম সব নিয়ে?''

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, ''এই প্যালেসে এক হাজার দরজা আছে, আবার নেইও বটে।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''এটা একটা ধাঁধা?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, ধাঁধারই মতন। একটা সূত্র দিয়ে দিচ্ছি। দরজা আছে, কিন্তু কব্জাহীন, মানুষ ভুল করে, খোলে না কোনওদিন।''

জোজো কিছু বলার আগেই সন্তু বলল, ''আসল দরজা নয়, দরজার ছবি আঁকা।''

কাকাবাবু বললেন, ''ঠিক ধরেছিস। হাজারদুয়ারি নামটা সার্থক করার জন্য অনেক জায়গায় দেওয়ালে নিখুঁতভাবে দরজার ছবি আঁকা। দেখলে দরজা বলেই ভুল হয়।''

সন্তু বলল, ''আমি একটা ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি, ফরাসিদেশের একটা রাজপ্রাসাদে আছে চারশো ঘর। এই হাজারদুয়ারি কি তার চেয়েও বড়?''

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, ''নাঃ! ফরাসিদেশের সেই প্যালেস আমি দেখেছি। সেটার নাম শাম্‌বর প্যালেস। সেটা এর চেয়ে অনেক বড়। মজার কথা কী জানিস, সেই শাম্‌বর প্যালেসে বাথরুম ক'টা বলতে পারিস? মাত্র একটা। তাও নতুন তৈরি হয়েছে, এখনকার কেয়ারটেকারের জন্য। আগেকার দিনে বাড়ির মধ্যে বাথরুম রাখার চল ছিল না। সেটাকে মনে করা হত, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার! অবশ্য তখন তো পাম্প করে উপরে জল তোলাও যেত না!''

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ''এর চেয়ে কত বড় বড় প্যালেস আমি দেখেছি। হাঙ্গারির একটা প্যালেসে ঘর আছে এগারোশো বত্রিশটা। আর জর্জিয়ায় এক হাজার একান্ন!''

কাকাবাবু বললেন, ''সে যাই-ই হোক, আমাদের বাংলার মধ্যে এত বড় প্যালেস তো আর নেই। এটা দেখার জন্যই অনেকে মুর্শিদাবাদে আসে। ভিতরটাও দেখার মতন। আমি অনেকদিন আগে একবার এসেছি।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা কাকাবাবু, নবাব সিরাজদৌল্লা এত বড় একটা বাড়ি শুধু শুধু বানিয়েছিলেন কেন? ওঁর ফ্যামিলিতে কি অনেক লোক ছিল?''

সন্তু বলল, "তুই হিস্ট্রি একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছিস! সিরাজের আমলের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা তৈরি করেছেন হুমায়ুন।"

জোজো বলল, "হুমায়ুন মানে আকবরের বাবা?"

সন্তু বলল "ধ্যাত! আকবরের বাবা তো আগেকার লোক! এ অন্য হুমায়ুন। নবাব হুমায়ুন। এটা এমন কিছু পুরনোও নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া। শুধু হুমায়ুন বললে ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর বাংলার সিংহাসন দখল করে নেওয়ার পর ইংরেজরা তার অনেক ক্ষমতাই কেড়ে নেয়। তারপর থেকে যারা নবাব হয়েছে, তারা একেবারেই ইংরেজদের হাতের পুতুল। সেই রকমই এক নবাবের নাম নাজিম হুমায়ুনজা। দেশ শাসন করার কোনও ক্ষমতা নেই, বিশেষ কোনও কাজই নেই। তাই তিনি শুধু বিলাসিতায় টাকা ওড়াতেন। এইরকম রাজপ্রাসাদ বানানোও লোক দেখানো ব্যাপার।"

জোজো বলল, "আমরা এবার ভিতরে যাব না?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো। অনেক সিঁড়ি! সেই তো আমার পক্ষে মুশকিল। যাই হোক, আমি তো পুরোটা দেখব না। তোমরা দু'জন সব ক'টা ঘর ঘুরে দেখে এসো। উপরে খুব ভাল ভাল ছবি আছে। আমি শুধু অস্ত্রাগারটা আর-একবার দেখব ভাল করে।"

সামনের দিকে বিশাল চওড়া সিঁড়ি। সন্তু আর জোজো উঠে গেল লাফিয়ে লাফিয়ে। কাকাবাবুকে ক্র্যাচে ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠতে হয়। একটা খোঁড়া পা নিয়েও তাঁর অন্য জায়গায় বিশেষ অসুবিধে হয় না, শুধু সিঁড়ির কাছেই জব্দ।

কাকাবাবু প্রায় উঠে এসেছেন উপরে, উপর থেকে নামছে একটি দল। তাদের মধ্য থেকে একজন লম্বামতো লোক একেবারে কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আপনি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী না?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এক-একটা বড় ঘটনার পর কাকাবাবুর ছবি ছাপা হয় খবরের কাগজে। গত বছর নানাসাহেবের গুপ্তধন আবিষ্কারের জন্য দারুণ হইচই পড়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা কাকাবাবুর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল রবীন্দ্রসদনে। কাকাবাবু সংবর্ধনা টংবর্ধনা পছন্দ করেন না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কাকাবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন, কাকাবাবু

তাঁকে বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, সেই ছবি দেখানো হল সব ক'টা টিভি চ্যানেলে। ছাপা হল সব ক'টা কাগজের প্রথম পাতায়। সেই জন্যই এখন রাস্তায়ঘাটে লোকেরা কাকাবাবুকে দেখলেই চিনতে পারে।

এই লোকটি কাকাবাবুর চেয়েও বেশ খানিকটা লম্বা। মাথার লম্বা চুল পিছন দিকে গিঁট করে বাঁধা। চোখে কালো চশমা। পাজামার উপর একটা হলুদ সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, তাতে এক জায়গায় পানের পিকের একটু দাগ।

লোকটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, ''আমি আপনার বহুত ভকতো আছি, আপনার এক ডজন সে বেশি অ্যাডভেঞ্চার কহানি পড়েছি, আপকা কিতনা সাহস আর শক্তি। স্যার, আপনার পায়ের ধুলো একটু নিতে চাই।''

কাকাবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, ''না, না, তার দরকার নেই, দরকার নেই। এই তো হাতে হাত...''

লোকটি আগেই ঝুঁকে পড়েছে।

কাকাবাবু তার হাত ধরতে গিয়েও পারলেন না। লোকটি কাকাবাবুর পা ধরতে গিয়ে তাল সামলাতে পারল না, কাকাবাবুর গায়ের উপর পড়ে গেল।

সে উপরের সিঁড়িতে আর কাকাবাবু নীচে, তাই কাকাবাবু ওর শরীরের ওজন সামলাতে পারলেন না। পড়ে গেলেন পিছন দিকে।

তলার সিঁড়িতে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। তিনি আরও গড়িয়ে পড়ে যেতে পারতেন, সন্তু আর জোজো দৌড়ে এসে ধরে ফেলল তাঁকে।

লম্বা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''কেয়া হুয়া? কে আমাকে ঠেলা মারল?''

তার সঙ্গের লোকটি বলল, ''কে তোমাকে ঠেলা মারবে? তুমি ব্যালান্স রাখতে পারোনি।''

লম্বা লোকটি বলল, ''আরে ছি ছি ছি ছি। কী লোজ্জার কোথা! মিস্টার রায়চৌধুরী মাফ কিজিয়ে! আমি ক্ষোমা চাইছি!''

কাকাবাবুর বেশ লেগেছে। কিন্তু তিনি উঃ-আঃ করছেন না। কখনও নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করেন না। একটুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, সন্তু আর জোজো তাঁর প্যান্ট-শার্টের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগল।

লম্বা লোকটির ক্ষমা চাওয়া আর থামছেই না।

কাকাবাবু বললেন, ''আপনার লাগেনি তো? আমি ঠিক আছি। হঠাৎ পা পিছলে গেছে। এরকম অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে!''

লোকটি বলল, "তবু আমি হাজারবার মাফি মাঙছি। আপনার মতন রেসপেক্টেবল মানুষ, আর আমি আপনার এত অ্যাডমায়ারার..."

কাকাবাবু অস্বস্তি চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে!"

লোকটি পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, "যদি কখনও দোরকার লাগে, প্লিজ কল মি, আমি আপনাকে কখনও কিছু হেল্প করতে পারলে ধোন্য হোবো!"

কাকাবাবু কার্ডটা হাতে নিলেন কিন্তু পড়লেন না। লোকটির মুখ ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভাই, এখন আমরা ভিতরে যাব!"

ওদের ঘিরে খানিকটা ভিড় জমে গেছে। এর মধ্যে আবার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, অটোগ্রাফ!"

কাকাবাবু বললেন, "এই রে, এরপর যে হাজারদুয়ারি বন্ধ হয়ে যাবে।"

তাড়াতাড়ি ওদের কাগজে সই করে দিয়ে তিনি উঠতে লাগলেন উপরে।

একেবারে উপরে উঠে চারদিকটা একবার দেখে নেওয়ার পর কাকাবাবুদের আবার অন্য দিক দিয়ে নীচেই নামতে হল। কারণ, কাকাবাবু শুধু অস্ত্রাগারটা দেখবেন বলেছেন।

ভিতরে এসে তিনি জোজোকে বললেন, "আমি যখন প্রথমবার এখানে আসি, তখন তো আর খোঁড়া ছিলাম না, আর তোমাদেরই মতো বয়স। পুরো প্যালেসটা তো দেখেছিলাম বটেই, আর গঙ্গায় সাঁতার কেটেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে, মনে আছে।"

সন্তু বলল, "আমিও সাঁতার কাটব। জোজোটাকে এত করে সাঁতার শিখতে বলি—"

জোজো বলল, "এবারে শিখে নেব। তবে নদীফদিতে নয়, সুইমিং পুলে। সাঁতার শিখতে আর কতক্ষণ লাগে! আমার এক মামা সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "নরানাং মাতুলঃ ক্রম। তার মানে কী জানো, নর মানে মানুষ ঠিক তার মামার মতো হয়। তোমার মামা যখন অত বড় সাঁতারু, তুমিও পারবে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জোজো, তোর তিন জন মামাকে আমি চিনি। ইনি কোন জন রে?"

জোজো বলল, "ইনি আর-একজন। আমার মামাতো মামা!"

"মামাতো মামা মানে কী?"

"মায়ের নিজের ভাই নয়, মামাতো ভাই। তা হলে আমার মামাতো মামা হল না? এখন বহুদিন আর তিনি সাঁতার কাটেন না অবশ্য।"

"কেন?"

"একবার একটা হাঙর ওঁর ডান পা কেটে নিয়েছে। সেই থেকে উনি আর কখনও সমুদ্রের ধারে যান না। এমনকী, কোনও নদী, পুকুর, জলই দেখতে চান না। এখন থাকেন আল্‌প্‌স পাহাড়ের একটা গুহায়। সেখানে একটা ঝরনা পর্যন্ত নেই।"

"তা হলে তেষ্টা পেলে কী করেন?"

"বরফ আছে তো। চতুর্দিকে বরফ। সেই বরফ কড়মড় করে চিবিয়ে খান।"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "বাব্বাঃ! আল্‌প্‌স পাহাড়ে থাকেন? নাম কী তোমার সেই মামার?"

জোজো বলল, "আগে নাম ছিল বরুণ রায়। এখন আমরা বলি 'বরফমামা'।"

তারপরই প্রসঙ্গ বদলে সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, এক-একটা তলোয়ার কিংবা বর্শা এত বড় কেন? আগেকার মানুষরা কি অনেক লম্বা ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব অস্ত্র তো খুব আগেকার মানুষদের নয়। তা ছাড়া মানুষরা কখনওই এখনকার মানুষদের চোখে আকারে তেমন বড় ছিল না। চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার যেসব মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তা দেখেই বোঝা যায়।"

অস্ত্রাগারটিতে নানারকম অস্ত্র সাজানো। অনেক ঢাল-তরোয়াল, বন্দুক-পিস্তল।

কোনওটা আলিবর্দি খাঁ-র, কোনওটা মুর্শিদকুলি খাঁ-র। বিদেশের কিছু অস্ত্রও আছে।

সন্তু বলল, "মানুষ কেন এত অস্ত্র বানায়? শুধু মানুষ মারার জন্যই!"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে মানুষকে মারার তো আর কেউ নেই। রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব কিছু নেই। বাঘ সিংহ গরিলারাও মানুষের সঙ্গে পারে না। মানুষ যদি মানুষকে না মারত, তা হলে পৃথিবীটা কত শান্তির জায়গা, সুন্দর জায়গা হতে পারত!"

জোজো বলল, "তার বদলে এখন অ্যাটম বোমা বানাচ্ছে! এক-একখানা

বোমায় এক-একটা শহর খতম। কয়েকটা দেশের কাছে যত অ্যাটম বোমা আছে, সেগুলো সব একসঙ্গে ফাটালে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''একবার না, তিনবার।''

জোজো বলল, ''আমি এই পচা পৃথিবীতে থাকবই না। মঙ্গলগ্রহে চলে যাব। সব ঠিক হয়ে গেছে।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''সব ঠিক হয়ে গেছে?''

জোজো বলল, ''হ্যাঁ, পাঁচ বছরের মধ্যেই তো মঙ্গলগ্রহে বাড়ি-ঘর তৈরি হবে। আমাদের জন্য একটা বাড়ি বুক করা আছে।''

সন্তু বলল, ''আমি এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যাব না। যতই যা হোক, আমার নিজের দেশটাই ভাল।''

কাকাবাবু বললেন, ''ঠিক আছে জোজো, তুমি মঙ্গলগ্রহে বাড়ি করলে আমি আর সন্তু বেড়াতে যাব একবার। আপাতত এসো, এই জায়গাটা দ্যাখা শেষ করি। এই দ্যাখো, এটা সিরাজদ্দৌলার বর্শা!''

সন্তু বলল, ''এত বড় বর্শা। নিশ্চয়ই খুব ভারী। এটা নিয়ে সিরাজ যুদ্ধ করতে পারতেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''না না, এগুলো সাজিয়ে রাখা হত। সিরাজ যুদ্ধ করতে জানতেন কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। পলাশির যুদ্ধে উনি নিজে কিছুই করেননি। অনেককাল আগে, রাজা কিংবা রাজপুত্ররা নিজেরাও খুব ভাল লড়াই করতে জানতেন। আলেকজান্ডার কিংবা চেঙ্গিজ খান, এঁরা ছিলেন অসাধারণ সাহসী যোদ্ধা। তার পরের দিকে রাজা-বাদশারা নিজেরা বসে থাকতেন তাঁবুতে, যুদ্ধ করে মরত সাধারণ সৈন্যরা।''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু, এই ছুরিটা দেখুন। এটাকে এত যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে কেন?''

একটা ট্রে-তে লাল মখমল পাতা, তার উপরে রয়েছে একটা লম্বা ছুরি, হাতির দাঁতের হাতল। ছুরিটায় এখনও যেন লেগে আছে রক্ত।

কাকাবাবু সেটার সামনে এসে বললেন, ''এই ছুরিটার দারুণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এটা মহম্মদি বেগের ছুরি। বলতে গেলে এই ছুরিটার জন্যই আমাদের দেশটা পরাধীন হয়ে গিয়েছিল।''

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ''আহম্মদি বেগটা কে রে?''

সন্তু বলল, ''আহম্মদি না মহম্মদি। তুই ইতিহাস পড়িসনি?''

জোজো বলল, ''অত আমার নামধাম মনে থাকে না।''

কাকাবাবু বললেন, ''সব নাম মনে রাখা খুবই শক্ত। একটা মাত্র ঘটনা ছাড়া মহম্মদি বেগের আর কোনও উল্লেখই নেই। তবে, ইতিহাস বই পড়ার চেয়েও সিনেমা বা থিয়েটারে দেখলে নামটাম সব মনে থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় 'সিরাজদৌল্লা' নামে একটা নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটা আবার রেকর্ডও করা হয়েছিল। তখনকার দিনে তো টিভি ছিল না। সিডি কিংবা ক্যাসেট প্লেয়ারও ছিল না। শুধু ছিল রেডিয়ো আর গ্রামাফোন। রেডিয়োতে এই নাটকের রেকর্ড বাজানো হত প্রায়ই। পাড়ায় পাড়ায় পান-বিড়ির দোকানেও বাজত রেডিয়ো। শুনে শুনে নাটকটা আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নির্মলেন্দু লাহিড়ি নামে একজন অভিনেতা কাঁপাকাঁপা গলায় দারুণ অভিনয় করতেন সিরাজের। শেষ দৃশ্যে আমাদের চোখে জল এসে যেত। পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় তো ইংরেজের কাছে হেরে গেলেন সিরাজ। পালাতে বাধ্য হলেন ছদ্মবেশে। ধরাও পড়ে গেলেন ভগবানগোলা নামে একটা জায়গায়। পায়ের নবাবি জুতোটা নাকি বদলাতে ভুলে গিয়েছিলেন।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''নবাবি জুতো কীরকম হয়?''

কাকাবাবু বললেন, ''জুতোর উপর হিরে-জহরতও বসানো থাকত বোধহয়। নবাবরা তো নিজেরা কখনও জুতো পরতে জানতেন না। কেউ একজন জুতো পরিয়ে দিত, খুলেও নিত। পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় জুতো খোলার লোক পাওয়া যায়নি। সেই জুতো দেখেই তাঁকে চেনা গিয়েছিল। ধরা পড়ার পর তো সিরাজকে বন্দি করে আনা হল মুর্শিদাবাদে। নাটকটায় আছে, সেই সময় একদিন দারুণ একখানা বক্তৃতা দিয়ে সিরাজ লোক খ্যাপাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে লেকচার শুনে আমাদেরও রক্ত গরম হয়ে যেত। লোকেরাও খেপে উঠছিল। সেই সময় তারা যদি সিরাজকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তা হলে আবার ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত। তখনই মহম্মদি বেগের প্রবেশ। মিরজাফরের ছেলে মিরন, তারই এক চ্যালা এই মহম্মদি বেগ। সে চিৎকার করে বলল, 'সে সুযোগ আর তোমাকে দেব না শয়তান!' খোলা ছুরি বসিয়ে দিল সিরাজের বুকে। ব্যস শেষ, বেজে উঠল করুণ বাজনা।''

ঘটনাটা বলতে বলতে গলা চড়িয়ে কাকাবাবুও প্রায় অভিনয় করে ফেললেন, একটা ভিড় জমে গেল তাঁকে ঘিরে।

একটি স্কুলের ছাত্র জিজ্ঞেস করল, ''সিরাজ যদি পালাতে পারতেন, তা হলে কী হত?''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সিরাজ তো তখনও নবাব। তিনি আবার সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করতে পারতেন। ফরাসিদের সাহায্য নিতে পারতেন। আবার একটা যুদ্ধ হত, তাতে ইংরেজরা হেরেও যেতে পারত। বাংলার স্বাধীনতা হারাতে হত না। কিন্তু মহম্মদি বেগের একটা ছুরির আঘাতে সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেল। ওই একটা কুকীর্তি করার জন্য মহম্মদি বেগের নাম রয়ে গেল ইতিহাসে।’’

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, ‘‘মহম্মদি বেগ মারল কেন?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তার সম্পর্কে আর কিছু জানি না। মিরনের হুকুমে মারতে পারে। কিংবা সিরাজের উপরে তার নিজের কোনও রাগও ছিল হয়তো।’’

ছেলেটি সরল রাগের সঙ্গে বলল, ‘‘লোকটাকে একবার হাতের কাছে পেলে...’’

সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, ‘‘তোরা এবার অন্য ঘরগুলো দেখে আয়। আমি বাইরের সিঁড়িতে গিয়ে বসছি।’’

ফেব্রুয়ারি মাস। শীত এখনও শেষ হয়নি, দুপুরবেলার রোদও ভালই লাগে। কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পাশে রেখে বসলেন একেবারে উপরের সিঁড়িতে। আজ ছুটির দিন নয়, তবু এখানে যথেষ্ট ভিড়। কলকাতা থেকেও গাড়ি ভরতি ভরতি লোক আসছে হাজারদুয়ারি আর মুর্শিদাবাদ দেখতে।

কাকাবাবু একবার মাথার পিছনটায় হাত বুলোলেন। ফেটে যায়নি বটে, তবে বেশ লেগেছে, এখনও কিছুটা ব্যথা আছে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, খানিক আগে লোকটা তাঁকে প্রণাম করতে এসে তাল সামলাতে পারেনি! না ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল? হাত দিয়ে তাঁকে ঠেলেছিল ঠিকই, তবে সেটাও অনিচ্ছাকৃত হতে পারে! শুধু শুধু একটা লোক তাঁকে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করবে কেন? আবার বলাও যায় না। অনেক লোকেরই রাগ আছে তাঁর উপরে।

শার্টের পকেট থেকে তিনি সেই লোকটির দেওয়া কার্ডটা বের করে দেখলেন। লোকটির নাম রাকেশ শর্মা, তলায় লেখা ক্লথ মার্চেন্ট। ঠিকানা ভাগলপুর। একজন জামা-কাপড়ের ব্যবসায়ীর কেন রাগ থাকবে তাঁর ওপর?

একটু পরে নানারকম বাজনা বাজাতে বাজাতে এল একটা দল। তাদের

মধ্যে ঘোড়ায় চড়া দু'জন লোক। সামনের চত্বরে এসে সেই লোক দুটি ঘোড়া থেকে নামল। একজনের পোশাক সাহেবের মতন, আর-একজনের মাথায় পালক বসানো সাদা মুকুট। দু'জনেরই কোমরে তলোয়ার। সেই তলোয়ার খুলে ওরা ঠকাঠক করে লড়াই শুরু করে দিল, আর তাদের ঘিরে ঢাক ঢোল আর সানাই বাজাতে লাগল বাজনদাররা।

এরা বোধহয় কোনও যাত্রাপার্টি। কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, এরা দু'জন সেজেছে সিরাজদৌল্লা আর লর্ড ক্লাইভ। ওরা লড়াইয়ের অভিনয় করে দেখাচ্ছে! সিরাজের সঙ্গে ক্লাইভের এরকম লড়াই হওয়া দূরে থাক, কোনওদিন সামনাসামনি দেখা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। একটু পরেই এই নকল ক্লাইভ হেরে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

কাকাবাবু হাসলেন। এতদিন পর এরা ইতিহাসকে উলটে দিতে চাইছে।

হোটেলটির নাম 'রত্নমঞ্জুষা'। একেবারে নতুন। তেমন বড় নয়, দোতলা একতলা মিলিয়ে বারোটি ঘর। সামনে ও পিছনে অনেকখানি বাগান। সামনের বাগানে একটা ফোয়ারা রয়েছে, সন্ধের পর সেখানে অনেকরকম জলের ধারা বেরোয়। সব মিলিয়ে দেখতে বেশ সুন্দর।

কাকাবাবুর একটা মিটিং ছিল বহরমপুরে। সেখানে তাঁর জন্য সার্কিট হাউজের ঘর ঠিক করা ছিল। কিন্তু কাকাবাবু জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বহরমপুরের বদলে মুর্শিদাবাদ শহরে থাকবেন। এখানে এলে পুরনো দিনের ইতিহাসের অনেক কথা মনে পড়ে। সন্তু আর জোজো আগে কখনও মুর্শিদাবাদে আসেনি। ওদেরও দেখা হবে অনেক কিছু।

জিয়াগঞ্জে একটা পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে তিনখানা অষ্টধাতুর মূর্তি। পুরনো আমলের দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু ঠিক কত পুরনো আর কীসের মূর্তি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনজন ইতিহাসের পণ্ডিতকে ডাকা হয়েছে মূর্তিগুলো দেখাবার জন্য। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ দত্ত কাকাবাবুর খুব ভক্ত, তিনি কাকাবাবুকেও আনিয়েছেন। এইসব ব্যাপারে কাকাবাবুর মতামতের মূল্য আছে।

এই হোটেলে ঢোকার সময়েই জোজো জিজ্ঞেস করেছিল, "মঞ্জুষা মানে কী রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "তুই মঞ্জুষা মানে জানিস না? রত্ন মানে জানিস তো?"

জোজো বলল, "ভ্যাট, ইয়ারকি মারবি না। রত্ন মানে সবাই জানে। জুয়েল।"

সন্তু বলল, "যেমন তুই একখানা রত্ন! আর মঞ্জুষা মানে প্যাঁটরা।"

জোজো বলল, "প্যাঁটরা? সে আবার কী? কখনও শুনিনি!"

সন্তু বলল, "কখনও শুনিসনি? আলবাত শুনেছিস। লোকে বাক্স-প্যাঁটরা বলে না? অর্থাৎ রত্নটত্ন যেখানে রাখা হয়। সিন্দুকও বলতে পারিস।"

জোজো বলল, "হোটেলের নাম সিন্দুক? সর্বনাশ, ঘরগুলোতে আলো-হাওয়া নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "তা নয়। মানে হল, এই হোটেলে যারা থাকবে, তারা প্রত্যেকেই এক-একটা রত্ন। নামটা একটু অন্যরকম ঠিকই! মালিকের নাম জানিস? অয়স্কান্ত দাস। অয়স্কান্ত মানে জানিস?"

সন্তু চুপ।

জোজো বলল, "কী রে, বল! খুব তো তোর বাংলা নলেজ!"

সন্তু বলল, "এটা জানি না। না জানলে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক শব্দ শুধু ডিকশিনারিতেই থাকে, এমনিতে চল নেই। অয়স্কান্ত মানে চুম্বক। ম্যাগনেট। অয়স্ মানে হচ্ছে লোহা। লোহাকে যে টানে, সে অয়স্কান্ত।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, এবার আমি আপনার একটা ভুল ধরব? আপনি ডিকশিনারি বললেন কেন? উচ্চারণ তো ডিকশনারি!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক ধরেছ তো! ছেলেবেলা থেকে আমার এই ভুলটা হয়। উচ্চারণটা আমি বাংলা করে নিয়েছি। সাহেবরা বলে ডিকশন আরি!"

দোতলার ঘরের সামনে একটা গোল বারান্দা। সেখানে বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছে সন্ধেবেলা। চায়ের সঙ্গে এরা দিয়েছে গরম গরম খাস্তা কচুরি।

সন্তু বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, হাজারদুয়ারি দেখলাম, বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ওটা তো তেমন পুরনো নয়। সিরাজের আমলের কিছুই নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "নদীর ওপারে আছে খোশবাগ। সেখানে আছে আলিবর্দি আর সিরাজের সমাধি। কাল সকালে যাব। ওখানে গেলেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। সিরাজকে যে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর ভাবে মারা হয়েছিল,

সেই কথা মনে পড়ে।... এখানে আরও পুরনো আছে কাটরা মসজিদ।''

জোজো বলল, ''এই জায়গাটা একসময় বাংলার রাজধানী ছিল, এখন দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কেমন যেন মরামরা ভাব।''

কাকাবাবু বললেন, ''শুধু রাজধানী নয়, একসময় এই মুর্শিদাবাদ শহর যে কী বিরাট আর কত জমাট ছিল, তা এখন দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ শহর ছিল চব্বিশ মাইল লম্বা আর চোদ্দো মাইল চওড়া। আমাদের কলকাতার চেয়েও বড়। ইলেকট্রিক ছিল না। কিন্তু গঙ্গার দু'পারে জ্বলত মশালের আলো। কত সব বড় বড় বাড়ি। লর্ড ক্লাইভ যখন প্রথম মুর্শিদাবাদ শহরে আসে, তখন এখানকার সব বড় বড় বাড়ি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, এ তো লন্ডন শহরেরই মতো। তবে লন্ডনের চেয়েও এখানে বড়লোকদের সংখ্যা বেশি। ভেবে দ্যাখ, তখন লন্ডন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শহর। তার সঙ্গে বাংলার রাজধানীর তুলনা।''

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, ''এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেল কী করে?''

কাকাবাবু বললেন, ''মুর্শিদাবাদ কিন্তু খুব পুরনো শহর নয়। যেমন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছিল, খুব তাড়াতাড়ি এখানকার চেহারা পালটে যায়। আবার হঠাৎই এখানকার গৌরবের দিন শেষ হয়ে যায়। তখন বেড়ে ওঠে কলকাতা শহর। অনেক ধনী লোক আর বড় বড় ব্যবসায়ীর চলে যায় কলকাতা শহরে। শেষ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের গৌরবের দিন। তার আগে তো কলকাতার প্রায় কিছুই ছিল না।''

''তখন শুধু ঘোড়ার গাড়ি চলত?''

''ঘোড়ার গাড়ি, পালকি। অনেক লোক হেঁটেই যাতায়াত করত। মনে করো, কেউ এখান থেকে ঢাকায় যাবে। আটদিন-দশদিন ধরে হাঁটত। এখনও এখানে কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে যায়। তুই দেখিসনি সন্তু?''

''হ্যাঁ, দেখেছি।''

''এখনও তো বোধহয় একজন কেউ ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে ওই যে খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছে!''

এর মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়া ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল ঠিকই, কিন্তু কিছু দেখা গেল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''সেকালের নবাব পরিবারের বংশধররা কি এখনও মুর্শিদাবাদে থাকে?''

কাকাবাবু বললেন, ''না বোধহয়। তারা কে কোথায় সব হারিয়ে গেছে। এখন আর তাদের কেউ খোঁজও রাখে না।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না?''

সন্তু বলল, ''যাঃ, সিরাজকে তো খুন করা হয়েছিল মাত্র একুশ না বাইশ বছর বয়সে। ওইটুকু বয়সে কারও ছেলেমেয়ে হয়?''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''সেই সময় ছেলেদের আর মেয়েদের বিয়ে হত খুব কম বয়সে। সিরাজ তো ছিল আলিবর্দির আদুরে নাতি, অল্প বয়স থেকেই নানারকম পাকামি করতে শেখে। তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দেওয়া হয়। একটা নয়, সিরাজের দু'-তিনটে বউ ছিল। সবচেয়ে প্রিয় বেগম ছিল লুতফুন্নেসা। তার একটা মেয়েও জন্মেছিল।''

জোজো বলল, ''সেই মেয়েটা কোথায় গেল? তাকেও মেরে ফেলেছিল?''

কাকাবাবু বললেন, ''সবটা শুনতে চাও?''

জোজো বলল, ''ইয়েস।''

সন্তু বলল, ''আমাদের ইতিহাস বইয়ে তো একটুখানি লিখেছে মোটে। সিরাজের যে মেয়ে ছিল, তা জানতুমই না।''

কাকাবাবু বললেন, ''তেরো-চোদ্দো বছর বয়সেই সিরাজ বেশ বখাটে হয়ে গিয়েছিল। কারও কথা শুনত না। যা খুশি তাই করত, অনেক খারাপ কাজও করেছে। সেই জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করত না। আলিবর্দি অন্যদের বদলে এই বাচ্চা নাতিটাকেই যখন বাংলার সিংহাসনে বসাতে চাইলেন, তা-ও অনেকের পছন্দ হয়নি। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে সিরাজ হল নবাব। তখন কিন্তু তার স্বভাব অনেকটা বদলে গেল, বাংলার উন্নতির জন্য দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য শাসন করার চেষ্টা করল। ইংরেজরা নানা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, তাদেরও ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেচারি তো বেশি সময়ই পেল না, নানা ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাতে হল।''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''কতদিন তিনি নবাব ছিলেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''প্রায় পনেরো মাস।''

সন্তু বলল, ''আচ্ছা কাকাবাবু, অত দূর ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে এসে ইংরেজরা আমাদের দেশটা দখল করে নিল। আমাদের দেশের মানুষ কি যুদ্ধ করতে জানত না?''

কাকাবাবু বললেন, "জানবে না কেন? পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি মিরজাফর যদি তার সৈন্যদের নিয়ে একপাশে পুতুলের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে না থাকত, তা হলে ইংরেজরা হেরে ভূত হয়ে যেত! দলাদলি আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আমাদের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়!"

সন্তু বলল, "ইস, মিরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত, তা হলে সিরাজকে প্রাণ দিতে হত না!"

কাকাবাবু বললেন, "মিরজাফর একা কেন, জগৎশেঠরাও সমানভাবে দোষী। এই জগৎশেঠরা ছিল দারুণ ক্ষমতাবান, বলতে গেলে রাজ্যের সব টাকাপয়সা কন্ট্রোল করত তারাই। টাকাপয়সাই তো আসল ক্ষমতা। জগৎশেঠ সিরাজকে একেবারে পছন্দ করত না, সে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চেয়েছিল সিরাজকে সরিয়ে মিরজাফরকে সিংহাসনে বসাতে। মিরজাফরও সেই লোভে রাজি হয়ে গিয়েছিল।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "সিরাজের মেয়ের নাম কী? তার কী হল?"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, বলছি বলছি! সিরাজ তো মুর্শিদাবাদ থেকে পালাতে বাধ্য হল, তখন ভয়ে তার সঙ্গে আর কেউ যেতে চায়নি। শুধু বেগম লুতফা বলল, সে যাবেই যাবে, স্বামীকে ছাড়বে না। তাতে তার যা হয় হোক। এই লুতফা মেয়েটি ছিল খুবই ভাল। তার আসল নাম ছিল রাজ কানোয়ার। হিন্দু পরিবারে জন্ম। বাচ্চা বয়েসে কেউ তাকে লুঠ করে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী বানিয়ে ফেলে। ক্রীতদাসী হিসেবেই সে সিরাজের মায়ের কাছে আসে সেবা করতে। তখন তার নাম হয় লুতফুন্নেসা বা লুতফা।"

জোজো বলল, "আগেকার দিনের লোকেরা কী খারাপ ছিল! তারা গোরু-ছাগলের মতো মানুষও বিক্রি করত?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ। এখনও খারাপ লোক কম নেই। এখনও... যাই হোক। সেই লুতফাকে দেখতে ছিল অসাধারণ সুন্দরী, আর স্বভাবটাও খুব মধুর। তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে সিরাজ তাকে নিজের বেগম করে নিল। সিরাজের সৌভাগ্যের দিনে সে যেমন ছিল পাটরানি, দুর্ভাগ্যের দিনেও স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, কোলে তার শিশুকন্যা। কিছু দূর যাওয়ার পর বাচ্চা মেয়েটার তো খিদে পাবেই। বড়রা খিদে সহ্য করে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। কিন্তু বাচ্চারা পারবে কেন? বাচ্চাটা কাঁদতে লাগল। অথচ কোনও জায়গায় থামলেই বিপদ। কিন্তু বাচ্চার কান্না থামাতে না পারলে কোন মা-বাবা চুপ করে থাকতে পারে। নৌকো করে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা

গেল এক ফকিরের কুটির। সিরাজ ভাবল, ফকির মানুষ, নিশ্চয়ই দয়ালু হবে। তার নাম দানশাহ ফকির। ছদ্মবেশী বাংলার নবাব তার কাছে মেয়ের জন্য একটু দুধ আর খাবারটাবার ভিক্ষে চাইল। ফকির ঠিক চিনতে পারল নবাবকে। সে চুপিচুপি খবর দিয়ে দিল মিরজাফরের জামাই মিরকাশিমকে। তার সৈন্যরা এদের সবাইকে বন্দি করে নিয়ে গেল মুর্শিদাবাদে!''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''ওই ফকির নবাবকে ধরিয়েছিল কেন? তারও টাকার লোভ ছিল?''

কাকাবাবু বললেন, ''কী জানি! নানারকম গল্প শোনা যায় বটে, সেসব থাক, সৈন্যরা ওদের বন্দি করে নিয়ে এল মুর্শিদাবাদে। তারপর তো মহম্মদি বেগ ছুরি বসাল সিরাজের বুকে! শুধু তো একবার ছুরি বসায়নি, তলোয়ার দিয়েও কুপিয়ে কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল সিরাজের শরীর। সে শরীরটা একটা হাতির পিঠে শুইয়ে ঘোরানো হল সারা মুর্শিদাবাদ শহর। একসময় সেই ছিন্নভিন্ন শরীর নামিয়ে দেওয়া হল আমিনা বেগমের বাড়ির সামনে।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''আমিনা বেগম কি সিরাজের মা?''

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোকগুলো কী নিষ্ঠুর। মায়ের কাছে কেউ ছেলের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখাতে আনে? আমিনা বেগম আলুথালুভাবে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মৃতদেহের উপর। মিরনের চেলারা আমিনা বেগমকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। তারপর সিরাজের মৃতদেহ আবার তুলে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল মুর্শিদাবাদের প্রধান বাজারের কাছে। দেহটাকে সমাধি দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হল না, ভয়ে কেউ ধারেকাছেও এল না। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে থাকার পর একজন বুড়ো লোক সাহস করে এসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মৃতদেহ সমাধি দিতে নিয়ে গেল নদীর ওপারে খোশবাগে।''

সন্তু বলল, ''সিরাজের বেগম আর তার মেয়ের কী হল?''

কাকাবাবু বললেন, ''মিরনের ইচ্ছে ছিল সবাইকেই মেরে ফেলার। কিন্তু ততদিনে তো ইংরেজরা এসে পড়ে অনেক কিছু দেখাশোনা করছে। ইংরেজদের আর যত দোষই থাক, ওইভাবে মেয়েদের খুন করা পছন্দ করে না। সম্ভবত তাদের নির্দেশেই সিরাজের মা, সিরাজের মাসি ঘষেটি বেগম, সিরাজের দিদিমা আর লুতফা ও শিশুকন্যাটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। মিরন ঢাকার শাসনকর্তাকে চুপিচুপি নির্দেশ পাঠাল, ওখানে সবাইকে খতম করে দিতে হবে। ঢাকার শাসনকর্তা লোকটি খারাপ ছিল না, সে জানিয়ে

দিল, আমি এরকম পাপ কাজ করতে পারব না। তখন মিরন নিজের এক চেলাকে পাঠাল ঢাকায়। সেই লোকটা কে বল তো?''

জোজো বলল, ''আহম্মদি বেগ।''

সন্তু বলল, ''আবার আহম্মদি বলছিস? মহম্মদি বেগ!''

কাকাবাবু বললেন, ''ঠিক ওকে পাঠানো হয়েছিল কিনা সেকথা ইতিহাসে লেখা নেই। তবে আমরা ধরে নিচ্ছি, মহম্মদি বেগই হবে। মহম্মদি বেগ কাজ সারতে চাইল সকলের চোখের আড়ালে। ঢাকার পাশেই যে-নদী, তার নাম বুড়িগঙ্গা। একদিন আমিনা বেগম আর ঘষেটি বেগমকে এক নৌকোয় চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে গেল সেই নদীতে। মাঝখানে এসে দুই মহিলাকেই জোর করে ঠেলে ফেলে দিল জলে। সাঁতার জানতেন না, অসহায়ভাবে দু'জনে ডুবে মরলেন। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব শোরগোল পড়ে গেল ঢাকায়। মহম্মদি বেগ আর বাকিদের খুন করার সুযোগ পেল না, পালিয়ে এল মুর্শিদাবাদে। সিরাজের দিদিমা, লুতফা আর তার মেয়ে সাত বছর বন্দি হয়ে রইল ঢাকায়।''

জোজো বলল, ''মিরন লোকটা মেয়েদেরও খুন করতে চেয়েছিল কেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''ও চেয়েছিল, সিরাজকে একেবারে নির্বংশ করে দেবে। ওই ফ্যামিলিতে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। যাতে আর কেউ কখনও বাংলার সিংহাসনের দাবি করতে না পারে। ও তো ধরেই নিয়েছিল, বৃদ্ধ মিরজাফরের পর ও-ই নবাব হবে। তা হতে পারেনি অবশ্য। শোনা যায়, আমিনা বেগম অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে মিরন বজ্রাঘাতে মারা যায়। আর মিরজাফর সিরাজের সামনে কোরান ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল, সেই পাপে তার হাতে কুষ্ঠ রোগ হয়। এসব অনেক পরে বানানো গল্প। খুব সম্ভবত সত্যি নয়। একালে অভিশাপ টভিশাপ ফলে না। তা হলে তো কত লোককেই ওইভাবে শাস্তি দেওয়া যেত। পাপ করলেও কুষ্ঠ রোগ হয় না, কত পাপী চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।''

সন্তু বলল, ''কাকাবাবু, তুমি কিন্তু এখনও সিরাজের মেয়ের নাম বলোনি।''

কাকাবাবু বললেন, ''পরপর সব আসতে হবে তো। ঢাকায় বুড়ি দিদিমা আর ছোট মেয়েকে নিয়ে সাত বছর বন্দিনী হয়ে রইল লুতফা। তারপর যখন মিরজাফর, মিরন টিরন সকলে মারা গেছে, তখন ক্লাইভেরই দয়ায়

তাদের আবার ফিরিয়ে আনা হল ঢাকায়। মেয়ের তখন প্রায় দশ বছর বয়স, তার নাম উম্মত জহুরা। সিরাজদ্দৌল্লার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল, সবই তো লুটপাট হয়ে গেছে। ওদের খাওয়াপরার খরচ আসবে কোথা থেকে? ইংরেজ কোম্পানি তখন লুতফাকে একটা চাকরি দেয়। খোশবাগে যে আলিবর্দি ও সিরাজের সমাধিস্থান, সেই জায়গাটা দেখাশোনার কাজ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লুতফা ওই কাজ করে গেছে। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা সে স্বামীর সমাধির পাশে একটা দীপ জ্বেলে দিত। এই কাজের জন্য তার মাইনে ছিল তিনশো পাঁচ টাকা। আর মেয়ের জন্য মাসোহারা একশো টাকা। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয় লুতফা। কিন্তু সিরাজের মেয়ের ভাগ্যটাই খারাপ। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যায় তার স্বামী। এর মধ্যে উম্মত জহুরার পরপর চারটি মেয়ে জন্মে গিয়েছে। তাদের নামও শুনতে চাস?''

সন্তু বলল, ''হ্যাঁ।''

কাকাবাবু বললেন, ''শরফুন্নেসা, আসমতুন্নেসা, সাকিনা আর আমাতুলসার্দি। এই চারটে ছোট ছোট মেয়ের ভার মায়ের উপর চাপিয়ে উম্মত জহুরাও একদিন চোখ বুজল। সেই মেয়েরা একটু বড় হতে না-হতেই লুতফা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিল। দু'জনের বিয়ে হয়েও গেল। তৃতীয় মেয়ে সাকিনার বিয়ের সময় টাকাপয়সায় আর কুলোয় না। তখন লুতফা আবার কোম্পানির কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখল। সে চিঠির কোনও উত্তর আসেনি।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''সাকিনার বিয়ে হল না?''

কাকাবাবু বললেন, ''বিয়ে হয়েছিল হয়তো কোনওরকমে। আমি আর কিছু জানি না। কোনও বইয়ে আর ওদের কথা লেখেনি। সিরাজের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। চল, এবারে আমরা একটু গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি। অনেক ইতিহাসের কথা হয়েছে। এখন একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া দরকার।''

জোজো বলল, ''আজ হোটেলে পেঁয়াজকলি দিয়ে মাংস রান্না হবে বলেছে। খিদে বাড়াতে হবে।''

সন্তু বলল, ''তুই বুঝি রান্নাঘরে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছিস? কখন গেলি রে?''

জোজো বলল, ''রান্নাঘরে যেতে হবে কেন? নোটিশ বোর্ডে লিখে দিয়েছে আজকের মেনু, শুধু পেঁয়াজকলি দিয়ে কষা মাংস আর ভাপা ইলিশ। আমি দুটোই খাব!''

হোটেলের বাইরে সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবু বললেন, ‘‘চল, হেঁটেই যাই। গঙ্গা তো বেশি দূর নয়।’’

কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারেন না। তবু তিনি হাঁটার অভ্যেসটা রেখে দিয়েছেন। যদি বেশি সিঁড়িটিড়ি না থাকে কিংবা পাহাড়ি জায়গা না হয়, তা হলে তিনি অনায়াসে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারেন।

এখানে গঙ্গার ধারে টানা রাস্তা নেই। তবে মাঝেমাঝে কিছু বেড়াবার জায়গা আছে। মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা দেখে কাকাবাবু দাঁড়ালেন। নদীর দিকটা রেলিং দেওয়া, কয়েকটা বসবার বেঞ্চও আছে।

জোজো একঠোঙা চিনেবাদাম কিনে নিয়ে এল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ‘‘এই যে বললি খিদে বাড়াবি? বাদাম খেলে পেট ভরে যাবে না?’’

জোজো বলল, ‘‘বাদামে পেট ভরে না। আগেকার দিনে রাজা-মহারাজারা দুপুরে খেতে বসার আগে পেস্তা-বাদামের শরবত খেতেন। একবার উদয়পুরের মহারাজা আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, দুপুরবেলা খাবার টেবিলে গিয়ে বসতেই প্রথমে মস্ত বড় একটা শ্বেতপাথরের গেলাস ভরতি কী একটা শরবত এনে দিল। টেবিলটা জানিস তো, সোনার, আর থালা-বাটিটাটি সব রুপোর, শুধু গেলাসগুলো পাথরের। আমি ভাবছি, টেবিলে কত ভাল ভাল খাবার সাজানো রয়েছে, শুধু শুধু শরবত খেতে যাব কেন? তখন মহারাজ বললেন, ‘খাও খাও, জোজোমাস্টার, এ শরবত খেলে পেটে আগুন জ্বলবে।’ সত্যিই তাই রে, যেই শরবতটা শেষ করলাম, অমনিই পেটের মধ্যে দাউদাউ করে খিদের আগুন জ্বলে উঠল, বুঝলি!’’

সন্তু বলল, ‘‘কী করে বুঝব। আমাদের তো কখনও রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন জুটবে না!’’

কপকপ শব্দ শুনে সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একজন কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ঘোড়াটার রং সাদা, যে চালাচ্ছে সেও সাদা পোশাক পরে আছে। হাতে তার একটা ছপটি।

লোকজন সরে গেল, ঘোড়াটা ছুটে গেল তিরের বেগে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বাঃ, বেশ দেখতে লাগল। এইরকম একটা ঐতিহাসিক শহরে ঘোড়াই ভাল মানায়।’’

সন্তু বলল, ‘‘আমি ঘোড়ায় চড়াটা ভাল করে শিখব। একটু একটু জানি!’’

জোজো বলল, ''আমি বাবা ওসবের মধ্যে নেই। আমার ঘোড়ার চেয়ে মোটরসাইকেল বেশি ভাল লাগে।''

আজ আকাশে বেশ জ্যোৎস্না আছে। হাওয়া দিচ্ছে ফিনফিনে। নদীর বুকে একটা নৌকোয় ক্যাসেট প্লেয়ারে সিনেমার গান বাজছে।

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''আগে নৌকোর মাঝিরা নিজেরাই গান গাইত। এখন ক্যাসেট বাজে।''

জোজো বলল, ''আগে ক্যাসেট কিংবা রেকর্ড ছিল না। তাই মাঝিরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আজেবাজে গান গাইত।''

সন্তু বলল, ''আজেবাজে গান? তুই ভাটিয়ালি শুনিসনি?''

জোজো বলল, ''আমার ওসব গান ভাল লাগে না। অমি শুধু মডার্ন গান শুনি!''

সন্তু বলল, ''তুই আসলে গান কিছুই বুঝিস না।''

জোজো বলল, ''তুই একটা মডার্ন গান শুনবি? লেটেস্ট। প্যাঁ পোঁ পোঁ প্যাঁ প্যাঁ—''

ওদের দু'জনের এরকম খুনসুটির সময় কাকাবাবু মজা পেয়ে হাসতে থাকেন।

একটা টাকমাথা লোক কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার হাতে একটা সিগারেট।

সে বলল, ''আপনার কাছে দেশলাই আছে স্যার!''

কাকাবাবু বললেন, ''না, দুঃখিত। আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না!''

লোকটি কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠে বলল, ''ও আপনি, সরি, সরি স্যার!''

সে সরে গেল সামনে থেকে। পকেট থেকে বার করল একটা মোবাইল ফোন।

সন্তু বলল, ''তোমায় চিনতে পেরেছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই তো মুশকিল। এবার ভাবছি দাড়ি রাখব।''

জোজো বলল, ''দাড়িতে আরও বেশি চেনা যায়! বরং গোঁফটা কেটে ফেলুন!''

কাকাবাবু বললেন, '''গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা!' নাঃ, গোঁফ কামাচ্ছি না। কোনও কিছু চিন্তা করার সময় গোঁফে হাত বুলোলে বেশ সুবিধে হয়!''

একটু পরে কাকাবাবু বললেন, ‘‘‘চল, এবার ফেরা যাক। একটু শীতশীত লাগছে।’’

সন্তু বলল, ‘‘আর-একটু থাকি।’’

জোজো বলল, ‘‘না, না চল। এতক্ষণে মাংস রান্না হয়ে গেছে।’’

আবার শোনা গেল ঘোড়ার খুরের কপকপ শব্দ। সন্তু বলল, ‘‘আর-একটা ঘোড়া!’’

খানিকটা কাছে আসার পর দেখা গেল, এটা সেই আগের ঘোড়াটাই, সাদা রঙের, তার সওয়ারেরও সাদা পোশাক।

লোকজন সরে যেতেই ঘোড়াটা হঠাৎ কাকাবাবুদের দিকে মুখ ফেরাল।

প্রথমে মনে হল, সওয়ারটি বুঝি কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আসছে। কিন্তু ঘোড়াটার গতি কমল না। এগিয়ে আসছে খুব জোরে। কাকাবাবু বলে উঠলেন, ‘‘আরে!’’

ঘোড়াটা হুড়মুড়িয়ে এসে গায়ে পড়বে! কাকাবাবুদের সরে যাওয়ার উপায় নেই, পিছনে রেলিং। অনেক লোক চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

ঘোড়াটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘জোজো, সন্তু, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়!’’

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফায়ার করলেন দু’বার!

সেই আওয়াজে ঘোড়াটা থমকে গিয়ে, সামনের দু’পা উপরে তুলে চিঁ-হিঁ-হি-হি করে ডেকে উঠল।

আচমকা থেমে যাওয়ায় ঘোড়ার আরোহীও তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

বহু লোক ছুটে এল এদিকে। অনেকেরই ধারণা হল, কাকাবাবু বুঝি গুলি করেছেন ঘোড়াটাকে। তা কিন্তু নয়, কাকাবাবু গুলি করেছেন শূন্যে। তবে এখনও রিভলভারটা তাক করে রেখেছেন মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটির দিকে।

লোকটির বোধহয় বেশ লেগেছে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক ছুটে এসে সেই লোকটিকে তুলে ধরতে ধরতে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘‘আপনার কোথায় লেগেছে? বেশি লাগেনি তো?’’

লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে সকলেরই চমক লাগে।

এমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুব কম দ্যাখা যায়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স, নিখুঁত শরীরের গড়ন, দুধের মতো ফরসা রং, টানাটানা চোখ। কথায় বলে, ঠিক যেন রাজপুত্র। কিন্তু আজকাল তো রাজপুত্রটুত্র নেই, সিনেমার নায়কদের এরকম চেহারা হয়। ঠিক যেন ফিল্‌ম স্টার। সে পরে আছে সিল্কের কুর্তা শেরওয়ানি।

অন্য লোকটি তার পোশাকের ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে বলল, ''লাগেনি তো! আপনার লাগেনি তো?''

যুবকটির মুখে কেমন যেন গর্বিত ভাব। সে গম্ভীরভাবে বলল, ''না, লাগেনি। ঠিক আছে।''

সে কাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চাইল না।

কাকাবাবুই জিজ্ঞেস করলেন, ''কী ব্যাপার, ঘোড়াটাকে সামলাতে পারেননি?''

সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ''ঘোড়াটা হঠাৎ খেপে গিয়েছিল।''

ঘোড়াটা এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে ফ-র-র ফ-র-র করে নিশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে।''

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াটার গলায় আদরের চাপড় মারলেন। তিনি কুকুর আর ঘোড়া খুব ভালবাসেন। এইসব জন্তুও তো বুঝতে পারে, তাঁর ছোঁয়া পেলে এরা খুশি হয়। ঘোড়াটি দু'বার মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, ''এই তো ও বেশ শান্ত হয়ে গিয়েছে। চমৎকার ঘোড়াটি!''

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একজন পুলিশ। সে জিজ্ঞেস করল, ''এখানে গুলি চালাল কে?''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি।''

পুলিশটি কাকাবাবুর দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বলল, ''আপনার হাতে রিভলভার? দিন, ওটা আমাকে দিন।''

কাকাবাবু বললেন, ''না। আপনাকে কেন দেব?''

পুলিশটি এবার কড়া গলায় বলল, ''দেবেন না মানে? ওরকম অস্ত্র সঙ্গে রাখা বেআইনি, তা জানেন না?''

কাকাবাবু বললেন, ''লাইসেন্স থাকলে মোটেই বেআইনি নয়। আমার লাইসেন্স আছে। আত্মরক্ষার জন্য আমি সবসময় এটা সঙ্গে রাখি।''

পুলিশটি বলল, ''আপনি শুধু শুধু গুলি ছুড়েছেন, কার গায়ে লেগেছে?''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘শুধু শুধু গুলি ছুড়িনি। অবশ্য কারও গায়েও লাগেনি।’’

পুলিশটি বলল, ‘‘তবু আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।’’

জোজো ফস করে বলে উঠতে গেল, ‘‘এখানকার ডিস্ট্রিক্ট...’’

সন্তু তাড়াতাড়ি তার মুখ চাপা দিল। পুলিশের বড়কর্তা আমার বন্ধু, কিংবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমার ভক্ত, এই ধরনের কথা লোকজনের সামনে বলা কাকাবাবু একেবারেই পছন্দ করেন না।

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, ‘‘না, আমি এখন থানায় যাব না। হোটেলে ভাল ভাল রান্না হয়েছে। আমাদের খিদেও পেয়েছে। আমাদের হোটেলের নাম ‘রত্নমঞ্জুষা’। সেখানে আমার খোঁজ করবেন। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আমি এখানে টুরিস্ট হিসেবে এসেছি।’’

সিনেমা স্টারের মতো যুবকটি এর মধ্যে ঘোড়ায় চেপে বসেছে। ঘোড়াটা চলতে শুরু করল উলটো দিকে। ভিড় ফাঁক হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘চল সন্তু, আমরা হোটেলে ফিরি।’’

পুলিশটি ভ্যাবাচ্যাকার মতো দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকটা যাওয়ার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, ‘‘ওই লোকটা ঘোড়া চালিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল কেন? গুলির আওয়াজ না শুনলে ঘোড়াটা আপনার গায়ের উপর এসে পড়ত ঠিক।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হয়তো ইচ্ছে করে তেড়ে আসেনি। সামলাতে পারেনি বোধহয়। এমনও হতে পারে, নতুন ঘোড়া চালানো শিখছে।’’

জোজো বলল, ‘‘একই দিনে দু’বার অ্যাক্সিডেন্ট? হাজারদুয়ারির সামনে সেই লোকটা গায়ের উপর এসে পড়ল।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, একই দিনে দু’বার। একটু আশ্চর্য ব্যাপারই বটে!’’

সন্তু বলল, ‘‘ভিড়ের মধ্য থেকে যে-লোকটা এসে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া সিনেমার হিরোকে মাটি থেকে তুলল, তাকে আমি চিনতে পেরেছি। সে-ই একটু আগে কাকাবাবুর কাছে দেশলাই চাইতে এসে বলেছিল, ‘ও, আপনি!’’’

জোজো বলল, ‘‘ঠিক তো! সেই টাকমাথা লোকটা। কাকাবাবুকে চেনে। সিনেমার হিরোর সঙ্গেও ওর আগে থেকে পরিচয় আছে।’’

সন্তু বলল, ‘‘সত্যিই এখানে কোনও সিনেমার শুটিং হচ্ছে নাকি? ক্যামেরা তো দেখলাম না!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা জানি না। তবে আমরা তো এখানে কোনও

রহস্যের তদন্ত করতে আসিনি। বহরমপুরে আসার কাজটাও মিটে গেছে। এখন শুধু বেড়ানো। এখানে তো কারও সঙ্গে আমাদের শত্রুতা থাকার কথা নয়। এই সুন্দরমতো ছেলেটাকে আমি জীবনে আগে কখনও দেখিনি। ও শুধু শুধু আমার গায়ের উপর ঘোড়া চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন?''

জোজো বলল, ''ছেলেটাকে দেখতে সুন্দর হলেও বেশ অভদ্র! ওরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার জন্য ক্ষমাটমাও চাইল না।''

কাকাবাবু বললেন, ''হয়তো খুব লজ্জা পেয়েছে। তা ছাড়া লোকের সামনে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে মানসম্মান থাকে না। তাই মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। আর সত্যিকারের ফিল্‌ম স্টার যদি হয়, তারা তো বাইরের লোকের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না।''

জোজো বলল, ''অমিতাভ বচ্চন আর শাহরুখ খান, এদের চেয়ে বেশি নামকরা ফিল্‌ম স্টার তো এখন আর কেউ নেই। এরা দু'জনেই দেখা করতে এসেছিল আমার বাবার সঙ্গে। কয়েকটা মন্ত্রপড়া ফুল নেওয়ার জন্য। পুরো একবেলা কাটিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। অমিতাভ বচ্চন তো দিব্যি বাংলা বলতে পারে। একসময় কলকাতায় চাকরি করত তো। আমার দিদির ছোট ছেলেটার সঙ্গে লুডো খেলল আর খুব মজা করতে লাগল। আর শাহরুখ খান নারকোল কোরা দিয়ে চিড়েভাজা খেয়ে এত খুশি যে, তিন বাটি খেয়ে ফেলল!''

সন্তু বলল, ''আবার ঘোড়ার আওয়াজ! শোনো শোনো!''

খটাখট শব্দটা আসছে পিছন দিক থেকে। একসময় দেখা গেল, সেই সাদা ঘোড়া ও তার আরোহীকে।

জোজো বলল, ''চলুন, চলুন, আমরা একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ি।''

কাকাবাবু বললেন, ''তার দরকার হবে না। এবারে ঘোড়াটা আমাকে দেখতে পেলে কাছাকাছি এসে নিজেই থেমে যাবে!''

সকালবেলা প্রথমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এল তিনটি স্থানীয় ছেলেমেয়ে। এরা একটা ক্লাবের সদস্য, ওদের নাম রাজীব, নাসের আর এলা। নাসেরকে কাকাবাবুর একটু চেনাচেনা মনে হল। বোধহয় আগে কোথাও দেখেছেন।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছে। জোজো আর সন্তু জামা-প্যান্ট পরে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি। কাকাবাবুই এখনও আলস্য করছেন, রাত্তিরের পোশাক ছাড়েননি। আজ গঙ্গার ওপারে খোশবাগ দেখতে যাওয়ার কথা।

এলা বলল, ''কাকাবাবু, আজ বিকেলে আমাদের ক্লাবের একটা সাহিত্যসভা আছে। সেখানে আপনাকে বিশেষ অতিথি হতে হবে।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমরা আমাকে চিনলে কী করে? কী করে জানলে, আমরা এই হোটেলে আছি?''

নাসের বলল, ''আমি তো আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনি নানাসাহেবের সিন্দুক উদ্ধার করলেন, তখন আমরা কয়েকজন আপনার ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম। এখানে আপনার মতো বিখ্যাত কোনও লোক এলে সবাই জেনে যায়।''

এলা বলল, ''এই জেলার ডি এম ইন্দ্রজিৎ দত্ত। তিনি আজ আমাদের ফাংশনের প্রধান অতিথি। বহরমপুর থেকে আসছেন। তিনিই তো বললেন, আপনাকে ধরতে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তোমাদের সভায় কী হবে?''

রাজীব বলল, ''প্রথমে হবে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা। তারপর কবিতা আর গল্প পাঠ।''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''ওরে বাবা, সেখানে গিয়ে আমি কী করব? আমি বক্তৃতাও দিতে পারি না, গল্প-কবিতাও কখনও লিখিনি!''

নাসের বলল, ''আপনি দু'-চার কথা বললেই আমরা অনেক উৎসাহ পাব।''

কাকাবাবু বললেন, ''কত সব গুণিজন আসবেন। তাঁদের মধ্যে আমি বসলে কী মনে হবে জানো তো? হংস মধ্যে বকো যথা। সবাই হাঁস আর আমি একটা বক।''

এলা বলল, ''মোটেই তা নন। আপনি তো রাজা। কোনও কথা শুনব না, আপনাকে যেতেই হবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''না না। তোমরা বরং সন্তু আর জোজোকে নিয়ে যাও। ওরা ভবিষ্যতে লেখক হতেও পারে।''

জোজো বলল, ''আমি এখনও লিখতে শুরু করিনি। আর ঠিক দু'বছর পরে...তখন লিখব, সেটাই হবে বেস্ট। আর টুয়েন্টি-টুয়েন্টিতে পাব নোবেল প্রাইজ।''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আর মাত্র পনেরো বছর বাদে? তা হলে আর দেরি করলে হবে না জোজো। এখনই শুরু করো।’’

রাজীব সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুমিও লেখো নাকি ভাই?’’

সন্তু লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলল, ‘‘না না! আমি শুধু পড়ি।’’

জোজো বলল, ‘‘সন্তু সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, দারুণ সাইকেল চালায়, রিভলভারও চালাতে পারে। ক্যারাটে জানে। যাদের এত গুণ থাকে, তারা লিখতে টিখতে পারে না। আমি ওসব কিছুই পারি না। তাই আমি লেখক হব।’’

সকলে হেসে উঠল।

এই সময় বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরা একজন। কোমরের বেল্টে পিস্তল, হাতে একটা বেঁটে লাঠি। এ অবশ্য কাল সন্ধেবেলায় গঙ্গার ধারের সেই পুলিশটি নয়।

এ বলল, ‘‘কাকাবাবু, একটু আসতে পারি?’’

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পুলিশটি ভিতরে এসে কাকাবাবুর দুই হাঁটু ছুঁয়ে অভিবাদন করে বলল, ‘‘স্যার, আমি লোকাল থানার সাব-ইনস্পেক্টর জাভেদ ইমাম। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে পারি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘নিশ্চয়ই পারো। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসো।’’

জাভেদ অন্য তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘তোমাদের তো চিনি। তোমরা একটু বাইরে যাবে?’’

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, ‘‘না, ওরা কেন বাইরে যাবে? ওদের সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। তোমার যা বলবার ওদের সামনেই বলতে পারো।’’

জাভেদ থতমত খেয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘‘কাল সন্ধের পর গঙ্গার ঘাটে আপনার সামনে একটা ঝঞ্ঝাট হয়েছিল?’’

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, ‘‘এমন তো কিছু ঝঞ্ঝাট নয়। একটা সুন্দর চেহারার ছেলে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল। ভাল করে এখনও হর্স-রাইডিং শেখেনি। হুড়মুড় করে ঘোড়াসুদ্ধ আমার গায়ের উপর এসে পড়ছিল আর কী! তাই আমি দুটো ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ঘোড়াটাকে থামাই। তুমি জানতে এসেছ তো, আমার সেই রিভরভারের লাইসেন্স আছে কিনা? আছে। তোমাকে দেখাচ্ছি!’’

জাভেদ বলল, "না না। আপনার তো লাইসেন্স থাকবেই। আপনাকে কত বিপদআপদে পড়তে হয়। আমি জানতে চাইছি, বোকা-হাঁদা কনস্টেবলটা আপনাকে চিনতে পারেনি। সে আপনার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

জাভেদ বলল, "সেই লোকটি আপনার দিকেই ঘোড়া নিয়ে ছুটে আসছিল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার। সেটা আমি জানব কী করে? সেই লোকটিকেই তো জিজ্ঞেস করা উচিত। কালকের পুলিশটি কিন্তু তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। সেও কিছুই না বলে চলে গেল।"

নাসের জিজ্ঞেস করল, "জাভেদভাই, কে ঘোড়া চালাচ্ছিল?"

জাভেদ বলল, "সেলিম। তাকে চেনো? এ শহরের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকে সামলাতে পারেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঘোড়াটার নামে দোষ দিয়ো না। খুব ভাল জাতের ঘোড়া। যাই হোক, আমি ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাই না!"

জাভেদ কথা ঘুরিয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কাল হাজারদুয়ারি দেখতে গিয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তবে পুরোটা তো আমি ঘুরে দেখিনি। শুধু অস্ত্রাগার। বাকিটা সন্তু আর জোজো দেখেছে।"

জাভেদ বলল, "আপনি যখন অস্ত্রাগারে ছিলেন, তখন সেখানে তো আরও অনেক লোক ছিল, তাই না? তাদের মধ্যে কাউকে আপনার সন্দেহজনক চরিত্রের বলে মনে হয়েছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "না। এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

জাভেদ বলল, "কালই অস্ত্রাগার থেকে একটা মূল্যবান জিনিস চুরি গিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? কী চুরি গিয়েছে?"

জাভেদ বলল, "মহম্মদি বেগের ছুরি।"

কাকাবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, "সে কী? সেটা তো এমন কিছু দামি জিনিস নয়। আর কিছু চুরি যায়নি?"

জাভেদ বলল, "না, আর কিছু চুরি যায়নি। শুধু যে কাচের বাক্সটার মধ্যে ছুরিটা ছিল, সেটাই নেই!"

কাকাবাবু বললেন, ''মিউজিয়াম থেকে মাঝে মাঝে কিছু জিনিসপত্র চুরি যায়, সেগুলো গোপনে বিদেশে পাঠিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে বলে। কিন্তু মহম্মদি বেগের ছুরির কী দাম আছে? বাইরের কেউ তো মহম্মদি বেগকে চিনবেই না। কী করে চুরি হল? ওই ঘরে দু'জন পাহারাদার ছিল দেখেছি।''

জাভেদ বলল, ''কী করে চুরি হল, তা এখনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনারাই বোধহয় শেষ দেখেছেন ছুরিটাকে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তার মানে কি আমার উপরেই সন্দেহ পড়ছে? আমিই সরিয়েছি? কিন্তু ওসব ছুরিটুরি জমাবার শখ তো আমার নেই।''

জাভেদ জিভ কেটে বলল, ''না না, সে সন্দেহ করব কেন? আমি বলতে এসেছি, আপনি তো সেই সময় কাছাকাছি ছিলেন, যদি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন।''

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ''আমি কী কী পারি না তা বলছি। আমি চুরি-ডাকাতির ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। কোথাও খুনটুন হলে ডিটেকটিভদের মতো সেই রহস্যের সমাধান করতেও শিখিনি। গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ছোটাছুটি করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালবাসি। ইংরেজদের ফাঁকি দিয়ে নানাসাহেব কোথায় লুকিয়েছিলেন, সম্রাট কনিষ্কের পাথরের মুন্ডুটা কোথায় গেল, আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে একটা অনির্বাণ আলো কী করে জ্বলে, এইসব রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো আমার শখ, বুঝলে?''

জাভেদ বলল, ''তা তো জানিই। তবু, আপনি যখন এখানে আছেন...''

কাকাবাবু বললেন, ''শোনো। অস্ত্রাগার দেখে বেরিয়ে আসার পর আমি যখন সিঁড়িতে বসে আছি, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। কোথা থেকে একটা যাত্রাপার্টির লোক এসে, তাদের দু'জন লর্ড ক্লাইভ আর সিরাজ সেজে লড়াই শুরু করে দিল। অনেক লোক ভিড় করে দেখতে লাগল সেই কাণ্ড। মিউজিয়ামের গার্ডরাও বোধহয় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। তাদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে কেউ ওই কাচের বাক্সটা সরিয়ে ফেলতে পারে। আমি যদি পুলিশের লোক হতাম, তা হলে ওই যাত্রাদলের খোঁজ করতাম। কেন ওরা ঠিক ওইখানে বাজনাটাজনা বাজিয়ে খেলা দেখাতে লাগল!''

জাভেদ কিছু বলার আগেই হোটেলের মালিক এসে বললেন, ''স্যার, একটু আসতে পারি? আপনার জন্য একটা চিঠি আছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''আসুন, আসুন অয়স্কান্তবাবু!''

ধুতি আর ফতুয়া পরা হোটেলের মালিকটি বললেন, ‘‘আমার পুরো নামটা স্যার কেউ আর বলে না। সবাই বলে, কান্তবাবু। বাবা এমন শক্ত নাম রেখেছিলেন!’’

ওঁর পিছনে একজন লম্বামতো ভদ্রলোক। তার হাতে একটা চিঠি।

বাংলায় টাইপ করা সংক্ষিপ্ত চিঠি। কাকাবাবু সেটা পড়তে লাগলেন।

মান্যবর শ্রী রাজা রায়চৌধুরী মহাশয়,

আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আপনি শ্রদ্ধেয় মানুষ। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী। যদি এই গরিবের বাড়িতে একবার পদধূলি দেন, ধন্য বোধ করব। আমার নিজেরই আপনার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। কিঞ্চিৎ অসুবিধের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আপনার অপেক্ষায় বসে থাকব। দুপুরে এই অধমের গৃহেই দুটি ডাল-ভাত খাবেন।

ইতি—

দীন আমির আলি

কাকাবাবু চিঠিটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এই দীন আমির আলি কে?’’

জাভেদ বলল, ‘‘আমির আলি? তিনিই তো এই শহরের এখন সবচেয়ে নামী লোক। বিরাট বড়লোক। একখানা বাড়ি যা বানিয়েছেন, আগেকার আমলের নবাবদের প্যালেসের মতো।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘চিঠিতে লিখেছেন, গরিবের বাড়ি। অধমের গৃহ। একেবারে বিনয়ের অবতার!’’

এলা বলল, ‘‘উনি খুব ভাল মানুষ। সকলের সঙ্গে এত চমৎকার ব্যবহার করেন!’’

নাসের বলল, ‘‘কাকাবাবু, আপনি যান, ওঁর সঙ্গে কথা বললে আপনার ভাল লাগবে। উনি বাঙালি নন। কিন্তু এত ভাল বাংলা শিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারেন।’’

কাকাবাবু লম্বা লোকটিকে বললেন, ‘‘ঠিক আছে। ওঁকে বলবেন, চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি পরে কোনও এক সময় যাওয়ার চেষ্টা করব।’’

লম্বা লোকটি বলল, ‘‘স্যার, আমি ওঁর ম্যানেজার। আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি গাড়ি এনেছি। উনি আপনাদের জন্য পথ চেয়ে বসে আছেন।’’

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘‘কেন। এখনই যেতে হবে কেন? আজ সকালে আমরা অন্য জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করে ফেলেছি।’’

ম্যানেজারটি হাত জোড় করে বলল, ‘‘স্যার, আমির আলি সাহেব অসুস্থ, হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল, উনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন না, তাই নিজে আসতে পারলেন না। যে-কোনও সময় ওঁকে আবার হাসপাতালে ভরতি করতে হতে পারে। তাই যদি এখনই একবার আসেন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘একবার ঘুরে আসুন না স্যার। না হয় বেশিক্ষণ থাকবেন না।’’

কাকাবাবু জোজো আর সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কী রে, যাবি নাকি?’’

জোজো চিঠিখানা পড়ছিল, সে বলল, ‘‘আমি মোটেই শুধু ডাল-ভাত খেতে চাই না!’’

সন্তু বলল, ‘‘আগেই তোর খাওয়ার কথা!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আমি তা হলে পোশাক বদলে আসি।’’

নাসের বলল, ‘‘আমরা উঠছি। বিকেলবেলা আসব আপনাদের নিয়ে যেতে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘মিটিং-এ আমি যাচ্ছি না। দ্যাখো, যদি ওদের নিয়ে যেতে পারো!’’

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে নতুন গাড়ি। উর্দি-পরা ড্রাইভার।

কাকাবাবুরা তিনজন বসলেন পিছনে।

সন্তু ফিসফিস করে জোজোকে বলল, ‘‘বেশি বড়লোকদের বাড়িতে আমার কীরকম ভয়ভয় করে। কীরকম ব্যবহার করতে হবে বুঝি না। যদি কিছু ভুল হয়ে যায়!’’

জোজো ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘‘আরে দুর, কত বড়লোক আমি দেখেছি। খাম্বাজপুরের রাজবাড়ি দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যেত। সে বাড়ি এত বড় যে, বাড়ির মধ্যে টয় ট্রেন চলে।’’

সন্তু বলল, ‘‘তার মানে? বাড়ির মধ্যে ট্রেন চলে?’’

জোজো বলল, ‘‘হ্যাঁ, বাড়ির মধ্যে উঠোনটা দশখানা ফুটবল মাঠের

সমান। বসবার ঘর থেকে খাবার ঘর, কেউ হেঁটে যায় না। উঠোনে গিয়ে ছোট ট্রেনে উঠতে হয়। সে বাড়িতে গেলেই নতুন জুতো পরতে দেয়, আর হাতে লাগাতে হয় গ্লাভ্‌স, যাতে কোথাও ধুলো-ময়লা না লাগে। ট্রেনটাও চলে ইলেকট্রিকে, তাই ধোঁয়া হয় না।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''সেই খাম্বাজপুরটা কোথায়?''

কাকাবাবু বললেন, ''বোধহয় গুলবাজপুরের পাশে, তাই না?''

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, ''না, আপনি একটু ভুল বলেছেন কাকাবাবু, দুবরাজপুরের পাশে।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''সে রাজবাড়িতে আর কী কী আছে?''

জোজো বলল, ''আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন খুব গরমকাল। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। রাজার সভায় একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলেন। ম্যাজিশিয়ান মানে সায়েন্টিস্ট। তিনি ইচ্ছে করলেই মেঘ থেকে বৃষ্টি নামাতে পারেন। আমাদের খুব গরমে কষ্ট হচ্ছে দেখে বিকেলবেলা সেই সায়েন্টিস্ট একটা ছোট্ট প্লেনে চেপে উপরে উঠে গেলেন। প্লেনটা মেঘের মধ্যে ঢুকে যেতেই ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির চারদিকে মাইকে মেঘমল্লার গান বাজতে লাগল।''

কাকাবাবু বললেন, ''বাঃ, ওরকম চমৎকার জায়গা দ্যাখার সুযোগ আমাদের কখনও হল না।''

তারপর তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ম্যানেজার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনাদের আমির আলি সাহেব কী করেন?''

ম্যানেজার বললেন, ''উনি এখন আর কিছু করেন না। বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল না। তবে লখনউতে ওঁদের খুব বড় ব্যাবসা আছে, উনি নিজেই সেই ব্যাবসাটা অনেকটা বাড়িয়েছেন। এখন বেশিরভাগ সময় এখানেই এসে থাকেন। স্যার, উনি গরিব-দুঃখীদের অনেক টাকা দান-ধ্যান করেন। কেউ যদি এসে বলে, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, উনি বিয়ের সব খরচ দিয়ে দেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমাকে যে চিঠিটা দিলেন, সেটা কি উনি নিজে লিখেছেন!''

ম্যানেজার বললেন, ''না, স্যার। উনি মুখে বলেছেন, আমরা টাইপ করেছি। এঁরা লখনউয়ের লোক, বাঙালি তো নন। তবে আলি সাহেব বাংলা বলতে পারেন, পড়তেও পারেন। লিখতে জানেন না এখনও।''

খানিক পরে গাড়িটা এসে থামল এক জায়গায়। শহর ছাড়িয়ে কাটারা মসজিদের কাছাকাছি।

প্রথমে দেখা গেল একটা বেশ উঁচু সাদা রঙের গেট। তার উপরে কয়েকজন মানুষ বসতেও পারে। বোধহয় উৎসবের সময় বাজনদাররা ওখানে বসে সানাইটানাই বাজায়।

গেটের একদিকে পাথরের প্লেটে উর্দুতে কী যেন লেখা। আর-একদিকে ওরকমই পাথরের প্লেটে বাংলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'চেহেল সুতুন'।

জোজো সেটা পড়ে বলল, ''এটা বাড়ির নাম? এর মানে কী?''

কাকাবাবু সেই নামটার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, ''চেহেল সুতুন। এর মানে হচ্ছে চল্লিশটা থামওয়ালা বাড়ি। কী ম্যানেজারবাবু, তাই না?''

ম্যানেজারবাবু বললেন, ''আজ্ঞে, আমি ঠিক বলতে পারব না। আমি এখানকার লোক, বাংলা ছাড়া অন্য কিছু জানি না।''

কাকাবাবু আপন মনেই বললেন, ''এটা একটা বিশেষ বাড়ির নাম।''

গেটের পাশে দু'জন মিলিটারির মতো পোশাক পরা দরোয়ান। তারা স্যালুট করে লোহার দরজা খুলে দিল। গাড়িটা ঢুকে গেল ভিতরে।

দু'পাশে বাগান, মাঝখান দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা। আসল বাড়িটা অনেকটা ভিতরে। দূর থেকে খুব একটা বড় বাড়ি মনে হয় না। তবে বাগান অনেকখানি। এ বাড়ির রংও ধপধপে সাদা।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর একটা বেশ চওড়া বারান্দা, আগাগোড়া মার্বেল পাথরের। সেই বারান্দার ওদিকে কয়েকটি ঘর।

বারান্দার এক কোণ থেকে দুটো মস্ত বড় কুকুর ছুটে এল এদিকে। জোজোর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে, সে কাকাবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

কুকুর দুটো কাছে আসবার আগেই একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন মাথায় পাগড়ি-পরা লোক। সে শিস দিতেই কুকুর দুটো থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, ''ভাল জাতের কুকুর। ডোবারম্যান। পাহারার ব্যবস্থা বেশ ভালই দেখছি।''

পাগড়ি-পরা লোকটি বিনীতভাবে বলল, ''আসুন, এদিকে আসুন।''

ঘরটির মধ্যে খয়েরি রঙের পুরু কার্পেট পাতা। প্রায় চোদ্দো-পনেরোটা সোফাসেট, অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে বসতে পারে। উপরে ঝুলছে তিনখানা ঝাড়বাতি।

দরজার কাছে সবাইকে জুতো খুলতে হল। সেখানেই রাখা আছে অনেক ভেলভেটের চটি, বিভিন্ন পায়ের মাপের। নিজেদের মাপমতো পরতে হল সেই চটি।

সন্তু জোজোকে ফিসফিস করে বলল, "এ তো তোর সেই বোম্বাগড়ের রাজবাড়ির মতো।"

জোজো বলল, "বোম্বাগড় নয়, খাম্বাজপুর। সেখানকার চটিগুলো আরও ভাল।"

পাগড়ি-পরা লোকটি কাকাবাবুকে বলল, "আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন, যাওয়ার সময় আবার নিয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু লোকটির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর আপত্তি না জানিয়ে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে দিয়ে দিলেন লোকটির হাতে।

একটা সোফায় কাকাবাবুর দু'পাশে বসল জোজো আর সন্তু। এত বড় বাড়ি, কিন্তু ভিতরে কোনও লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। লখনউয়ের ব্যবসায়ী, এখানে এত বড় বাড়ি বানিয়ে আছেন। কাকাবাবু তাঁকে চেনেন না, কোনওদিন দ্যাখেননি, তবু কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁর এমন কী জরুরি কথা থাকতে পারে?

অন্য দিকের দরজা দিয়ে একজন লোক একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঢুকল। তিনটি লম্বা কাচের গেলাস, উপরে লেস দিয়ে ঢাকা, তার মধ্যে ঘন সাদা রঙের শরবত।

জোজো বলল, "দুধ মনে হচ্ছে। আমি খাব না।"

সন্তু একটা গেলাস নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "দুধ না। পেস্তা আর মালাই।"

জোজো এবার দু'চুমুকেই নিজের গেলাস শেষ করে বলল, "মন্দ নয়। আর-এক গেলাস চাইলে দেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "চাইলে হয়তো দেবে। কিন্তু চাইতে নেই। তুমি বরং আমারটা খাও।"

জোজো বলল, "না না। আমি সন্তুর সঙ্গে ইয়ারকি করছিলাম। আর খেতে চাই না।"

আর-একজন লোক একটা বড় ট্রে ভরতি ফল নিয়ে এল। কমলা, বেদানা, কলা, আঙুর।

জোজো বলল, ''ধুত, ফল কে খাবে?''

সন্তু বলল, ''আসছে, আসছে। এরপর কচুরি-শিঙাড়া।''

জোজো বলল, ''সকালেই কচুরি খেয়েছি। শিঙাড়া ফিঙাড়াও এখন চলবে না।''

সন্তু বলল, ''তারপর আসবে রেশমি কাবাব, রুমালি রুটি ...''

ম্যানেজারবাবুটি একটা হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে এলেন, সেই চেয়ারে বসে আছেন একজন খুব রোগা চেহারার বৃদ্ধ, সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুলও একেবারে সাদা। তার উপরে আবার একটা ছোট্ট সাদা টুপি।

বৃদ্ধটি হাত জোড় করেই আছেন, চেয়ারটি কাছে আসার পর তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ''নমস্তে, নমস্তে রায়চৌধুরীবাবু। আপনি পদধূলি দিয়েছেন বলে আমি ধন্য হয়েছি। আপনার মতো মহান লোককে চাক্ষুষ করাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।''

বৃদ্ধ চেয়ার থেকে উঠে কাকাবাবুর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করতে এলেন।

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, ''এ কী, এ কী, কী করছেন! না না, বসুন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোটই হব।''

বৃদ্ধ বললেন, ''তাতে কী হয়েছে। মানুষ গুণে বড় হলে তাঁকেও প্রণাম করতে হয়। আপনাকে কত লোক চেনে, আমি তো একজন সামান্য মানুষ!''

কাকাবাবু বললেন, ''কেউই সামান্য নয়, আমি সব মানুষকেই সমান মনে করি। তা ছাড়া আমি এমন কিছু গুণীও নই।''

বৃদ্ধ বললেন, ''আমার নাম দীন আমির আলি। আমি লখনউয়ে থাকি।''

কাকাবাবু বললেন, ''এখানে এত বড় বাড়ি বানিয়েছেন। তার মানে, আপনারা আসলে বাঙালি?''

আমির আলি বললেন, ''আমরা সাত পুরুষের লখনউয়ের বাসিন্দা। তার মানে তো সেখানকারই লোক হলাম, তাই না? আমার বাবা-মা কেউ এক ফোঁটাও বাংলা জানতেন না।''

''তবে আপনি এত বাংলা শিখলেন কী করে?''

''আমি বাচ্চা বয়স থেকে উর্দু অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার অনুবাদ পড়তাম। খুব ভাল লাগত। তখনই মনে হত, যদি বাংলা শিখে মূল লেখা পড়ি, তা হলে নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগবে। লখনউয়ে অনেক বাঙালি

থাকে। আপনাদের অতুলপ্রসাদ সেনের নামে লখনউয়ে একটা রাস্তাও আছে। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন অমর সান্যাল, তিনি খুব ভাল গান গাইতেন, তাঁর কাছে একটু একটু করে বাংলা শিখতে শুরু করি। বাংলা কী অপূর্ব সুমধুর ভাষা!''

''উর্দুও খুব মিষ্টি ভাষা! এখন তো আপনি চমৎকার বাংলা বলেন।''

''প্রথম প্রথম বাংলা বললে আমার বাড়ির লোক হাসত। আমার এক কাকা অবশ্য রাগ করে বলত, 'খবরদার, আমার সামনে বাংলা বলবি না। বাংলা তো হিন্দুদের ভাষা।' একদম ভুল কথা। লখনউয়ে হিন্দুরাও তো উর্দু বলে। বাংলাদেশের মুসলমানরাও তো বাঙালি, তাই না?''

''তা তো ঠিকই!''

সন্তু আর জোজো চোখাচোখি করল। এইসব কথা বলার জন্য এই বুড়ো লোকটি কাকাবাবুকে এখানে ডেকে এনেছেন? আসল কথাটা কী?

আমির আলি বললেন, ''এখন আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ আরও অনেকের লেখা পড়ি। যখনই সময় পাই, বাংলা পড়তেই ভাল লাগে। এখন আমার গোস্ত-বিরিয়ানিও পছন্দ হয় না, মাছের ঝোল-ভাত খাই রোজ। ডাল আর বেগুনভাজাও। আমার রক্তেই বাঙালিআনা ঢুকে গেছে। হয়তো কোনও এক সময় আমার কোনও পূর্বপুরুষ বাঙালি ছিল।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা তো হতেই পারে! একসময় ভারতের অনেক জায়গা থেকে অনেক জাতের মানুষ এই বাংলায় এসে থেকে গিয়েছে। তেমনই অনেক বাঙালিও গিয়েছে দূর দূর দেশে। আপনি যেমন বললেন, লখনউয়ে অনেক বাঙালি আছে, তেমনই আছে রাজস্থানে, গোয়ায়, গুজরাতে!''

আমির আলি বললেন, ''পাঁচ বছর আগে আমার প্রথম হার্টের অসুখ হয়। তার পরেই আমি একবার মুর্শিদাবাদ ঘুরতে এসেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে এসে আমি অনেক সুস্থ বোধ করেছি। এখানকার জল-হাওয়া আমার শরীরের পক্ষে ভাল। তাই এখানে বাড়ি বানিয়েছি। লখনউ থেকে প্রায়ই এখানে চলে আসি। এখন আমার বাড়ির লোকেরাও কিছু কিছু বাংলা শিখে গিয়েছে।''

কাকাবাবু খানিকটা অধৈর্য হয়ে বললেন, ''বাঃ খুব ভাল! আচ্ছা, এখন তবে উঠি? আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।''

আমির আলি বললেন, "সে কী! এখানে দুটি খেয়ে যাবেন না? সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, খাওয়া হবে না। আমাদের কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার কথা আছে। আমার ভাইপোরা আগে মুর্শিদাবাদে আসেনি।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমির আলি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে।

তারপর ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, "রায়চৌধুরী সাহেব, আমি আপনাকে ডেকে আনিয়েছি ক্ষমা চাইবার জন্য। আপনি ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।"

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "ক্ষমা? হঠাৎ একথা বলছেন? কীসের জন্য ক্ষমা? আমি তো আপনাকে দেখিইনি কখনও।"

আমির আলি বললেন, "কাল সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে আপনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল। একটা ঘোড়া গিয়ে পড়ছিল আপনার গায়ে। ছি ছি ছি ছি। যদি আপনার কিছু হয়ে যেত, তা হলে কত বড় ক্ষতি হত দেশের। ইস, ভাবতেই পারছি না।"

তারপর তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যানেজারকে বললেন, "ওকে ডাকুন!"

ম্যানেজার দৌড়ে বাড়ির ভিতরের দিকে গিয়ে একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। এ সেই কালকের সিনেমার নায়কের মতো যুবকটি।

আমির আলি বললেন, "এ আমার ছোট ছেলে সেলিম। এই সেলিমই কাল ঘোড়া চালাচ্ছিল। নতুন শিখছে, সামলাতে পারেনি। কতবার ওকে বলেছি, এখানে কত বড় বাগান, তার মধ্যে আগে প্র্যাকটিস কর। তা না, ও বাইরে যাবেই যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু বাগানে ঘুরতে ভাল লাগবে কেন? রাস্তা দিয়ে না ছোটালে পুরোপুরি শেখা হয় না।"

আমির আলি ছেলেকে বললেন, "সেলিম, রায়চৌধুরী সাহেবকে কদমবুসি করো। মাপ চাও!"

সেলিম ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল, মুখেও কিছু বলল না।

জোজো সন্তুর দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল। অর্থাৎ সে জিজ্ঞেস করতে চাইল, "কদমবুসি মানে কী রে?

সন্তু আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। অর্থাৎ সে নিজেও মানে জানে না।

সেলিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন,

''না না, ওসব দরকার নেই। ওসব আমি পছন্দ করি না। এই তো হাত মেলাচ্ছি।''

কাকাবাবু সেলিমের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিতে সেও এক হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। কী যেন একটা বলল, তা বোঝা গেল না।

সেলিম আজকে পাক্কা সাহেবদের মতো সুট পরে আছে। দেখাচ্ছেও সাহেবদের মতো।

কাকাবাবু বললেন, ''আমিও একসময় খুব ঘোড়া চালিয়েছি। প্রথম প্রথম দু'-একবার পড়েও গিয়েছি। ওরকম তো হয়ই!''

কাকাবাবুর খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে আমির আলি জিজ্ঞেস করলেন, ''সেই জন্যই কি আপনার একটা পা...''

কাকাবাবু বললেন, ''না। এটা অন্য অ্যাক্সিডেন্ট।''

আমির আলি বললেন, ''তা হলে আপনি আমাকে আর আমার ছেলেকে ক্ষমা করলেন তো?''

কাকাবাবু বললেন, ''নিশ্চয়ই! ও ঘটনা আমি মনেও রাখব না। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ় অ্যাক্সিডেন্ট।''

তারপর হেসে ফেলে বললেন, ''আপনারা কি ভেবেছিলেন, আমি খুব রেগে আছি, রাগের চোটে আপনাকে বা আপনার ছেলেকে গুলি করে ফেলতে পারি? তাই ঢোকার মুখে আমার রিভলভারটা রেখে দেওয়া হল?''

আমির আলি বললেন, ''আরে ছি ছি ছি ছি! তাই করেছে বুঝি? ওরা তো আপনাকে চেনে না। আসলে সিকিউরিটির জন্য এই বাড়ির মধ্যে কোনও অস্ত্র নিয়ে ঢোকা নিষেধ। এখনই ফেরত দিতে বলছি!''

এর পরেও আমির আলি কাকাবাবুদের বিদায় নিতে দিলেন না। না খাইয়ে ছাড়বেন না কিছুতেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে জোজো খুব খুশি।

আমির আলি সাহেব যতই বাঙালি খাবারের ভক্ত হয়ে থাকুন না কেন, এখানে কিন্তু শুধু ডাল-ভাত আর মাছ নয়, বিরিয়ানি, রোগন জুস, কোপ্তা-কালিয়া, কিছুরই অভাব নেই। তিনি নিজে অবশ্য একটুখানি ভাত আর মুরগির সুপ খেলেন।

সেলিম অবশ্য খাবারের টেবিলে কাকাবাবুদের সঙ্গে যোগ দিল না। সে নাকি দুপুরে কিছুই খায় না, অনেক কিছু খায় রাত্তিরে।

এই দুপুর রোদ্দুরেও সে বাগানে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখা যাচ্ছে

খাবার ঘরের জানলা দিয়ে। কাকাবাবু একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, ‘‘ভালই তো শিখেছে।’’

আমির আলি সন্তু আর জোজোর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। ওরাও তাই চুপচাপ। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা জোজোর পক্ষে সম্ভব নয়।

সে খেতে খেতে একসময় ফস করে জিজ্ঞেস করল, ‘‘সেলিম সাহেব কি সিনেমা করেন?’’

আমির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘‘সিনেমা?’’

জোজো বলল, ‘‘দু’-একটা হিন্দি সিনেমায় ওঁকে দেখেছি মনে হচ্ছে?’’

আমির আলি খানিকটা বিরক্তভাবে বললেন, ‘‘না, বাজে কথা। আমরা খানদানি বংশের লোক। সিনেমা-থিয়েটার আমরা পছন্দ করি না। আমি জীবনে কোনও ফিল্‌ম বা নাটক দেখিনি। সেলিম ইঞ্জিনিয়ার। সে আমার ব্যাবসা দেখবে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আপনি বাংলা এত ভালবাসেন। আপনার ছেলেমেয়েরাও কি বাংলা বইটই পড়ে?’’

আমির আলি বললেন, ‘‘আমার আরও দুই মেয়ে, এক ছেলে আছে। তারা বাংলা নিয়ে মাথা ঘামায় না। লখনউ ছেড়ে এখানে আসতেও চায় না। কিন্তু শুধু সেলিম মুর্শিদাবাদ খুব পছন্দ করে। প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসে, অনেকদিন থেকে যায়। এখানে লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খানিকটা বাংলা শিখেছে। আপনি আমার এই ছেলেটিকে দোয়া করবেন।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘দয়া? না না, দয়া করবার কী আছে!’’

আমির আলি বললেন, ‘‘দয়া না, দোয়া।’’

জোজো জিজ্ঞেস করল, ‘‘দোয়া মানে?’’

আমির আলি বললেন, ‘‘আশীর্বাদ।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি ঠিক শুনতে পাইনি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!’’

খুব বেশি খাওয়া হয়েছে, তাই হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই হল। তা ছাড়া আজ হঠাৎ গরম পড়ে গিয়েছে, রোদ বেশ চড়া।

বিকেলের দিকে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। এখন আকাশ আবার মেঘলা হয়ে এসেছে। গরমও কম।

গঙ্গার ঘাটে ফেরি নৌকোয় অনেকে এপার-ওপার যায়। কাকাবাবু একটা আলাদা নৌকো ভাড়া করলেন।

নদীতে এখন বেশি জল নেই। ওপারে পৌঁছোতেও বেশি সময় লাগল না, কারণ, নৌকোটা মেশিনে চলে। আগে বইঠার শব্দ হত ছপ-ছপ-ছপ, এখন শব্দ হয় ভট-ভট-ভট।

এপারের ঘাটে খোশবাগের রাস্তা দেখানো আছে। নৌকো থেকে নামবার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, ''খোশবাগ মানে কী রে!''

কাকাবাবু বললেন, ''জোজোর দেখছি সব কথায় মানে জানার খুব ইচ্ছে হয়েছে। সন্তু, বলতে পারবি?''

সন্তু বলল, ''বাগ মানে তো বাগান। কলকাতায় বি-বা-দী বাগ, আজাদ হিন্দ বাগ। আর খোশ মানে...''

কাকাবাবু বললেন, ''খোশ মানে খুশি। খুশির বাগান, সুন্দর বাগান। এটা আসলে একটা সমাধিস্থান। কিন্তু নানা ফুলের গাছটাছ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। এটা বানিয়েছিলেন নবাব আলিবর্দি, তাঁর মায়ের জন্য। তারপর তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সকলকেই সমাধি দেওয়া হয় এখানে।''

জোজো বলল, ''আমরা এটা দেখতে এসেছি কেন? সমাধিস্থানে তো দেখবার কিছু থাকে না। এর চেয়ে বরং সাহিত্যসভাটায় গেলে ভাল হত।''

সন্তু বলল, ''তাজমহলও তো একটা সমাধিস্থান। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক যায়।''

জোজো তর্ক করার ঝোঁকে বলল, ''যাঃ, কী বলছিস! তাজমহলে কেউ সমাধি দেখতে যায় না। বাড়িখানাই কী চমৎকার, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য। এই সমাধিস্থানটা মোটেই তেমন কিছু সুন্দর নয়।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা ঠিক, সমাধিস্থানে সত্যিই দেখার কিছু থাকে না। তবে, বিখ্যাত লোকের সমাধিস্থানে এলে সেইসব মানুষদের কথা মনে পড়ে। খানিকটা রোমাঞ্চ হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধি আছে এখানে, তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তবে তোমার মতো যারা ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, তাদের কাছে গুরুত্ব নেই। ঠিক আছে, আমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকব না।''

সন্তু বলল, ''আমি ভাল করে দেখতে চাই।''

পুরো সমাধিস্থানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক সমাধি। একটা উঁচু জায়গায় পাশাপাশি রয়েছে বেশ কয়েকটি সমাধি।

সেখানে এসে কাকাবাবু একটা সাদা-কালো পাথরের সমাধি দেখিয়ে বললেন, ''এটাই নবাব আলিবর্দির।''

সন্তু বলল, "আর সিরাজের কোনটা?"

কাকাবাবু আঙুল তুলে বললেন, "ওই যে পুব দিকেরটা।"

সন্তু সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। তার দেখাদেখি জোজোও পাশে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে একটা সেলাম ঠুকে দিল।

সিরাজের সমাধির পায়ের কাছে তাঁর বেগম লুতফুন্নেসার সমাধি। সেখানে একজন লোক সেই সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তোমাদের একটা গল্প বলি। এই যে দেখছ, আলিবর্দির সমাধির উপরের পাথরটা ফাটা। এটা কেন হয়েছে জানো? পলাশির যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের কথা বিশ্বাস করে সিরাজ তার সৈন্যদের ফিরে আসার হুকুম দিল। সেই ভুলটা না করলে সিরাজ হয়তো যুদ্ধে জিতে যেতেও পারত। সমাধিস্থানের মধ্যে আলিবর্দি সেই ভুলের কথা টের পেয়ে চিৎকার করে সিরাজকে বলতে চেয়েছিলেন, 'না না, সৈন্যদের ফিরিয়ো না।' আলিবর্দি সমাধি থেকে উঠতে চেয়েছিলেন বলেই উপরটা ফেটে গিয়েছে!"

জোজো বলল, 'যাঃ, একদম আজগুবি কথা! মানুষ মরে গেলে আবার কথা বলতে পারে নাকি?"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আগেই তো বলেছি, গল্প! লোকে এইসব গল্প বানায়। শুনতে বেশ লাগে। তা বলে বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমরা তো সকলে জানি ভূত বলে কিছু নেই। তা বলে ভূতের গল্প শুনলে কি গা ছমছম করে না?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই লোকটিকে দেখুন!"

লুতফার সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে সেই লোকটি একইরকমভাবে বসে আছে। কাকাবাবু তাকে ভাল করে দেখে বললেন, "তাই তো। আমির আলি সাহেবের ছোট ছেলে সেলিম। তোরা এখানে একটু অপেক্ষা কর। ওর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

তিনি সেলিমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সেলিম চোখ বুজে আছে, কিন্তু কাছাকাছি কোনও মানুষ এলে সবাই টের পায়। তা ছাড়া কাকাবাবুর ক্রাচে খটখট শব্দ হয়েছে।

সেলিম মুখ তুলে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, "আসসালাম আলাইকুম সেলিম সাহেব।"

সেলিম বেশ বিরক্তভাবে বলল, "আলাইকুম আসসালাম।"

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, শুধু একটা প্রশ্ন করব?’’

সেলিম কড়া গলায় বলল, ‘‘আমাকে ‘তুমি’ বলার পারমিশন আপনাকে কে দিয়েছে? আপনি আমাকে কতদিন চেনেন?’’

কাকাবাবু থতমত খেয়ে বললেন, ‘‘দুঃখিত, দুঃখিত। আমাদের এদিকে বয়স খুব ছোট হলে ‘তুমি’ই বলে ফেলি। দুঃখিত। আমি আবার বলছি, আপনাকে একটা সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারি?’’

সেলিম বলল, ‘‘গো অ্যাহেড!’’

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘গতকাল গঙ্গার ধারে আপনি কি ইচ্ছে করে আমার দিকে ঘোড়াটা চালিয়ে দিয়েছিলেন?’’

সেলিম বলল, ‘‘ইয়েস!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমিও তাই বুঝেছি। সত্যি কথাটা বলার জন্য ধন্যবাদ। তা হলে আর-একটা সত্যি কথা জিজ্ঞেস করি, কেন? আপনি কি আমাকে চেনেন? আমি কি আপনার সঙ্গে কখনও শত্রুতা করেছি?’’

সেলিম বলল, ‘‘না। আপনাকে চিনি না। শত্রুতার প্রশ্নই ওঠে না।’’

‘‘তা হলে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কেন?’’

‘‘নো। মেরে ফেলতে তো চাইনি। আই ওয়ান্টেড, ঘোড়ার পায়ের ধাক্কা লেগে আপনি আহত হবেন, কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকবেন, দ্যাটস অল!’’

‘‘সে কী! আপনি আমাকে চেনেন না, কোনও শত্রুতাও নেই। তবু আমাকে আহত করে হাসপাতালে পাঠাতে চাইবেন কেন?’’

‘‘তার কারণ, কয়েকজন লোক আমাকে জানিয়েছে, ইউ আর আ ট্রাবলসাম ম্যান। আপনি অন্য লোকদের ব্যাপারে নাক গলান। অন্য লোকের কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি, সেই জন্যই কিছুদিন আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে রাখা দরকার।’’

‘‘ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। আজ সকালের আগে আমিও আপনাদের চিনতাম না। আপনারা কী কাজ করতে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কেও আমার কোনও ধারণাই নেই। আপনাদের ব্যাপারে আমি মাথা গলাব কী করে? আপনি সত্যি কথা বলছেন বলেই জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কী কাজ করতে যাচ্ছেন?’’

‘‘একজন মানুষকে খুন করা হবে।’’

কাকাবাবু সহজে অবাক হওয়ার ভাব দেখান না। কিন্তু সেলিম এমন ঠান্ডা

মাথায় কথাটা বলল যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "খুন করবেন?"

সেলিম একইরকমভাবে বলল, "ইয়েস, খুন করা হবে। কোনও প্রমাণ থাকবে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে?"

সেলিম এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমি কি এতই বোকা যে, সে নামটা আপনাকে জানিয়ে দেব?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু কেন খুন করবেন, তা জানতে পারি কি?"

সেলিম বলল, "সেটাই বা আপনাকে জানাতে যাব কেন? এটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ। আপনারা আমাকে আহত করে হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছিলেন। সেটা হয়নি। আমি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি। এরপর আর ওরকম চেষ্টা করলেও পারবেন না। আমি সাবধান হয়ে যাব। আপনারা যে ভেবেছিলেন, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো আমার অভ্যেস, যদি সত্যিই এবার নাক গলাই?"

সেলিম বলল, "আপনারা মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এসেছেন। আজ সন্ধের মধ্যে যতটা পারেন দেখে নিন। কাল সকালেই এ-জায়গা ছেড়ে চলে যান। সেটাই আপনাদের পক্ষে ভাল হবে।"

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, "চলে যাব? তাই নাকি? আমি কোথায় থাকব কিংবা থাকব না, সেটা অন্য কেউ ঠিক করে দেবে? এরকম তো কখনও হয়নি। আমি এখানে আরও তিন-চারদিন থাকব ঠিক করেছি।"

সেলিম বলল, "আপনার প্ল্যান চেঞ্জ করুন। কাল না ফিরে গেলে আর কোনওদিনই ফিরতে পারবেন না এখান থেকে।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা একটা চ্যালেঞ্জ?"

সেলিম বলল, "ইয়েস। চ্যালেঞ্জ!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। ঠিক আছে, দেখা যাক।

তিনি ফিরে এলেন সন্তুদের কাছে।

সন্তু বলল, "ওদের বাড়িতে সেলিম তো কোনও কথাই বলেনি। এখানে এত কথা কী বলছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "সে তোরা পরে শুনবি।"

তারপর আপন মনে বললেন, "এমনও হতে পারে, ছেলেটা পাগল। তবে পাগলরাও এক-এক সময় খুব বিপজ্জনক হয়।"

ওঁদের নৌকোটা অপেক্ষা করছিল, কাকাবাবুরা উঠে পড়ার পর আবার ভটভট শুরু হল। একটুখানি যাওয়ার পর নৌকোর মাঝিটি বলল, "বাবা, আমাদের বাড়ি এই পাশের গাঁয়ে। সেখানে একটু থামব। আমার বউকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসতে হবে, চাল কিনবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার গ্রামের নাম কী?"

সে বলল, "রহিমপুর। বেশিক্ষণ লাগবে না। যাব আর আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো!"

নৌকোটা যখন মাঝনদী থেকে ঘাটের দিকে এগোচ্ছে, তখন কিছু লোকের হইচই শোনা গেল। তারা যেন কিছু একটা ভয়ে চ্যাচাচ্ছে।

আর-একটু যেতেই শোনা গেল, লোকেরা বলছে, "কুমির! কুমির! ধনাকে কুমিরে নিয়ে গেল!"

খানিকটা গভীর জলে দেখা গেল, একটি ছেলে খাবি খাচ্ছে। সে একবার জলের উপর একটা হাত তুলছে, একবার ডুবে যাচ্ছে।

জোজো বলল, "ওই ছেলেটাকে কুমিরে ধরেছে নাকি! কী হবে?"

তখনই ঝপ করে একটা শব্দ শুনে সকলে আবার চমকে ফিরে তাকাল।

সন্তু জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

জোজো দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কাকাবাবু, সন্তু, সন্তু... ওকে কুমিরে খেয়ে ফেলবে... কী হবে?"

কাকাবাবু কিছু না বলে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা ছুঁলেন একবার। কিন্তু রিভলভার দিয়ে তো কুমির মারা যায় না!

সন্তু ডুবন্ত ছেলেটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জোরে জোরে সাঁতার কেটে।

কাকাবাবু মাঝিকে বললেন, "ওদের পাশে নিয়ে চলো।"

তিনি জুতো খুলতে লাগলেন। তৈরি হলেন নিজেও জলে লাফ দেওয়ার জন্য।

সন্তু সেই ছেলেটির হাত ধরল, তারপর দু'জনেই ডুবে গেল।

কাকাবাবু ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখনই সন্তু আবার মাথা তুলে বলল, "ঠিক আছে।"

জোজো ফ্যাকাশে মুখে বলল, "ঠিক আছে মানে কী? কুমিরটা কোথায়?"

কাকাবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন।

সন্তু আরও কয়েকবার ডুবে গেল, আবার উঠল। তারপর ছেলেটিকে নিজের বুকের উপর রেখে চিতসাঁতার কেটে এগিয়ে এল নৌকোর দিকে।

ঘাটের লোকেরা তখনও চিৎকার করছে।

কাকাবাবু আর মাঝি দু'জনে মিলে টেনে তুলল সন্তু আর ছেলেটিকে।

সন্তু বলল, "কুমিরটুমির কিছু নেই। ছেলেটা এমনিই ডুবে যাচ্ছিল।"

ছেলেটির মুখখানা ভয়ে ছাই রঙের হয়ে গিয়েছে। কথাই বলতে পারছে না। কোনওরকমে কয়েকবার দম নিয়ে বলল, "আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কোনও পায়ে তো দাগ নেই। রক্তও বেরোয়নি!"

সন্তু বলল, "হয়তো কিছুতে ঠোক্কর মেরেছে। বড় মাছটাছ হতে পারে! তাতেই ভয় পেয়ে ও সাঁতার ভুলে গেছে!"

মাঝিটি বলল, "এ নদীতে তো কুমির নাই। কত মানুষ সাঁতরায়। কোনওদিন দেখি নাই কুমির। একবার একটা-দুটো শুশুক এসেছিল।"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কুমির নাই, তো আগে বলোনি কেন? গ্রামের লোকরাই বা কুমির কুমির বলে অযথা চ্যাঁচাচ্ছে কেন? কেউ ছেলেটাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি!"

মাঝিটা মুগ্ধভাবে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছেলেবাবুটির তো ভারী সাহস!"

সন্তু নিজের গায়ের জামা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, "এতে এমন কিছু সাহস লাগে না।"

মাঝি বলল, "কুমির নাই, কিন্তু হঠাৎ তো আসতেই পারে। বর্ষার সময় কোনওবার তো পুকুরেও কুমির আসে।"

জোজো বলল, "যদি সত্যি কুমির হত, তা হলে কী করতিস?"

সন্তু বলল, "অত ভাবলে চলে না। আর দেরি হলে ছেলেটা ডুবে যেত!"

ঘাটের লোকরা সকলে এখন চুপ। তারা হাঁ করে এই নৌকোর মানুষদের দেখছে।

ধনা নামের ছেলেটা নৌকো থেকে নেমেই একজন মহিলাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, ''নৌকোটা অন্য একটা জায়গায় নিয়ে চলো। এখানে থাকলে এই লোকরা অনেক কথা বলবে। আমাদের নামিয়ে খাতির করতে চাইবে। ওসব দরকার নেই।''

মাঝিটি নৌকো চালিয়ে দিয়ে কাঁচুমাচুভাবে বলল, ''আমার বাড়িতে যাব না?''

কাকাবাবু বললেন, ''যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। আর-একটু দূরে গিয়ে নামো। তোমার জন্যই তো ছেলেটি বেঁচে গেল।''

মাঝিটি বলল, ''কী যে বলেন বাবু! এই ছেলেবাবুটিই তো অসাধ্যসাধন করল।''

কাকাবাবু বললেন, ''তুমি গ্রামের বাড়িতে যাবে বলেই তো আমরা এদিকে এলাম। মাঝনদীতে থাকলে এদিককার চেঁচামেচি শুনতেও পেতাম না, ছেলেটির ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতেও পারতাম না।''

কাকাবাবু সন্তুর প্রশংসা করলেন না। শুধু তার ভিজে চুলে একবার আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন।

পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে মাঝিটিকে বললেন, ''এটা তোমার বউকে দিয়ে বলো, শুধু যেন চাল না কিনে আজ তোমাদের বাড়িতে মাছ-মাংসও রান্না হয়!''

তাঁর মনের মধ্যে একটা কথা ঘুরতে লাগল। সন্তু নিঃস্বার্থভাবে, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও একটি ছেলেকে বাঁচাল। আর সেলিম ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে খুন করতে চায়। কত রকম মানুষ আছে এই পৃথিবীতে!

আজ আর অন্য কোথাও যাওয়া হবে না। সন্তুর ভিজে জামাকাপড়ই আগে পালটানো দরকার।

মাঝিটি ফিরে আসার পর যাওয়া হল হোটেলে।

সেখানে নাসের নামের ছেলেটি বাইরে বসে আছে। ওদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলেও কাকাবাবুদের সে সেখানে নিয়ে যাবেই যাবে।

অগত্যা যেতেই হল। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই মঞ্চে উঠতে কিংবা বক্তৃতা দিতে রাজি হলেন না। পিছন দিকে বসে সব শুনতে লাগলেন। অনেকে নিজেদের কবিতা পাঠ করছে, কেউ কেউ আবৃত্তি করল অন্যদের কবিতা। একজন মাঝবয়সি লোক একখানা জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিয়ে ফেলল, কিন্তু

কার বিরুদ্ধে যে তার রাগ, তা কাকাবাবু বুঝতে পারলেন না।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ দত্ত এলেন একেবারে শেষের দিকে।

তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হল মঞ্চে। তিনি জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলেন বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর দর্শকদের মধ্যে কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, ‘‘কাকাবাবু, আপনি আসুন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা সবাই শুনতে চায়।’’

কাকাবাবু হাত নেড়ে জানালেন, তিনি যাবেন না। তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছে শুধু সেলিমের কথা। সে একজনকে খুন করবে। সে কাকে খুন করতে চায়, সেটা না জানলে তিনি লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন কী করে? সেলিম কি আজ রাতেই কাজটা সেরে ফেলতে চায়? বোধহয় না। সে কাল সকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছে তাঁকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য।

অনুষ্ঠান শেষে ইন্দ্রজিৎ দত্ত কাকাবাবুর সঙ্গে হোটেলে এলেন আড্ডা দিতে।

প্রথমেই তিনি বললেন, ‘‘কাকাবাবু, বহরমপুরের মিটিং-এ আপনি মূর্তিগুলো সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তাই-ই মিলে গেছে। বড় অষ্টধাতুর বিষ্ণু মূর্তিটা পাল আমলের। অন্য দুটো অত পুরনো নয়। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে একসময় চুরি গিয়েছিল। কলকাতার পণ্ডিতরাও সেই মত দিয়েছেন।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যাক, তা হলে আর আমার কোনও দায়িত্ব রইল না।’’

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আপনাদের মুর্শিদাবাদ বেড়ানো কেমন হচ্ছে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওদের জিজ্ঞেস করো।’’

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, ‘‘এমন কিছু দেখবার নেই। সবই তো ভাঙাচোরা বাড়ি!

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ‘‘তা ঠিক। হিরাঝিল, মোতিঝিল, এইসব দারুণ দারুণ বাড়ি কিছুই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ নাকি লন্ডনের মতন ছিল, এখন তা একেবারেই বোঝা যায় না। প্রায় সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখন লোকে এই হাজারদুয়ারি আর কাটরার মসজিদই শুধু দেখতে যায়।’’

সন্তু বলল, ‘‘জোজোর হাজারদুয়ারি পছন্দ হয়নি। ও আরও বড় বড় সব রাজবাড়ি দেখেছে। আমার কিন্তু ভাল লেগেছে খুব।’’

কাকাবাবু বললেন, "এখানে আমির আলির নতুন বাড়িটাও দেখবার মতো। আচ্ছা, লখনউয়ের ব্যবসায়ী এখানে এসে অত বড় বাড়ি বানালেন কেন?"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "শুনেছি তো এই জায়গাটা ওঁর খুব পছন্দ। ভদ্রলোক খুব দান-ধ্যান করেন। এখানকার মানুষ ওঁকে খুব পছন্দ করে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সত্যিই ভাল লোক। ওঁর এক ছেলে সেলিমও এখানেই বেশিরভাগ থাকে।"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "হ্যাঁ, সেও অতি ভদ্র। সকলের সঙ্গে বিনীত ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলে শোনা যায়নি।"

জোজো বলল, "তা হতে পারে। কিন্তু ও লোকটা কাকাবাবুর কাছে ক্ষমা চায়নি।"

ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে? ক্ষমা চাইবার মতো কী কাজ করেছে সেলিম?"

কাকাবাবু বললেন, "সে কিছু না। অতি সামান্য ব্যাপার। জোজো, আমরা বলেছি না, ওটা আমরা ভুলে যাব?"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "ও কাকাবাবু, আপনি তো এখানে এসেই একটা দারুণ কাজ করে ফেলেছেন।"

এবার কাকাবাবুর অবাক হওয়ার পালা। তিনি বললেন, "আমি আবার কী দারুণ কাজ করলাম?"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "আপনি পুলিশকে খুব সাহায্য করেছেন।"

কাকাবাবু আবার বললেন, "পুলিশকে সাহায্য করেছি? কই, কিছু তো করিনি!"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "জাভেদ নামে একজন ইনস্পেক্টর এসেছিল, আপনি তাকে একটা টিপ্‌স দিয়েছেন, তাতেই তো মহম্মদি বেগের ছুরিটা উদ্ধার করা গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি?"

ইন্দ্রজিৎ বললেন, "ওটা চুরি যাওয়ার ঠিক আগে হাজারদুয়ারির সামনে একটা যাত্রাপার্টি এসে নানারকম বাজনা বাজিয়ে লড়াই-লড়াই খেলা দেখাচ্ছিল। আপনি সেই যাত্রাপার্টির খোঁজ নিতে বলেছিলেন। তাদের খোঁজ পেতেই সব ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। সেই যাত্রাপার্টির লোকরা

স্বীকার করেছে যে, কোনও একজন লোক তাদের বলেছিল, ঠিক ওই সময় ওই জায়গায় গিয়ে খেলাটা দেখাতে। ওই খেলা দেখার জন্য সকলে ভিড় করেছিল, হাজারদুয়ারির গার্ডরাও উঁকিঝুঁকি মারছিল, সেই সুযোগে চোর ওই ছুরিটা সরিয়ে ফেলে। সেই সূত্র ধরে কে টাকা দিয়েছিল, তাও জানা গেল। সেই লোকটা বলল, তাকে টাকা দিয়েছে অন্য একজন।''

কাকাবাবু বললেন, ''চোর ধরা পড়েছে শেষ পর্যন্ত?''

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ''পুলিশ খুব ভাল কাজ করেছে, তবু একটু দেরি করে ফেলেছে। মূল টাকাটা যে দিয়েছিল, পুলিশ তার বাড়িতেও পৌঁছে গেল। সে বাড়িতে শুধু একজন কাজের লোক ছিল। সে বলল, পুলিশ আসার কিছুক্ষণ আগেই তিনজন লোক তার মালিকের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। সে বাড়ি সার্চ করে অবশ্য ছুরিটা পাওয়া গিয়েছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''সামান্য একটা ছুরির জন্য এত কাণ্ড! কেন?''

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ''সেটা নিশ্চয়ই জানা যাবে। কারা ওকে ধরে নিয়ে গেল, সেটাও দেখতে হবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই লোকটি কে?''

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ''তার নাম ফিরোজ শাহ। হিন্দু না মুসলমান তা বোঝা যাচ্ছে না। এই ফিরোজ বেশির ভাগ সময় থাকে লন্ডনে। ওখানে ব্যাবসা করে। ও নাকি এখানকারই কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তাই আসে মাঝে মাঝে। ওর এক আত্মীয়ের একটা বাড়ি আছে এখানে। সেই আত্মীয়ও এখন বেঁচে নেই। একজন কাজের লোক নিয়ে একা থাকে।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''ছুরিটা চুরি করতে গেল কেন?''

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ''সে তো ওকে জেরা না করলে জানা যাবে না। তবে অন্য লোকটি বলেছে, ওর নাকি নানা দেশের ছুরি জমানোর শখ। যারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তারা কিন্তু ছুরিটা নেয়নি, কিছুই নেয়নি। বোধহয় ওরা অপহরণ করেছে টাকার জন্য। এরকম তো প্রায়ই ব্যবসায়ীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।''

জোজো বলল, ''অ্যাবডাকশন! এরপর টাকা চাইবে। কিন্তু চাইবে কার কাছে? ওর তো বাড়িতে একজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই বললেন!''

ইন্দ্রজিৎ বললেন, ''সেটাও ঠিক। দেখা যাক। পুলিশ এর মধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে।''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ছুরিটা এখন কোথায়? থানায়? খুব সাবধানে রাখতে বলো। হয়তো এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার আছে!’’

কিছুক্ষণ পর খাবারের ডাক পড়ল।

আজ শুধু দু’রকমের মাছ আর মিষ্টি দই। এ হোটেলের রান্না বেশ ভাল।

এখন হোটেলে বেশি লোক নেই, দোতলাটা প্রায় ফাঁকা। কাকাবাবুরা দুটো ঘর নিয়েছেন। সন্তুদের পাশের দুটো ঘর তালাবন্ধ।

খাওয়ার পর সন্তু আর জোজো বলল, ওরা একটু ঘুরে আসবে। রাত্তিরবেলা হাজারদুয়ারি কেমন দেখায়, ওরা দেখতে চায়।

কাকাবাবু আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, ‘‘একটু সাবধানে, চোখ-কান খোলা রাখিস। তোদের যদি কেউ অপহরণ করে, তা হলে টাকা চাইলে আমি তো দিতে পারব না। অত টাকা পাব কোথায়?’’

জোজো বলল, ‘‘আমাদের যদি কেউ অপহরণ করে, তবে তার কপালে দুঃখ আছে।’’

কাকাবাবু হাসলেন, ‘‘এটা জোজো ঠিকই বলেছে।’’

ওরা চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু একা বসে রইলেন বারান্দায়।

একটু পরেই তিনি ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলেন। সেলিম আজও ঘোড়া ছোটাচ্ছে? আর তো কাউকে ঘোড়া চালাতে দেখা যায়নি এখানে। ঘোড়াটা অবশ্য থামল না।

কাকাবাবুর মাথায় ঘুরছে সেলিমের কথা। অত বড় লোকের ছেলে, সকলে তাকে ভদ্র, ভাল ছেলে বলে জানে। অথচ সে একটা মানুষ খুন করতে চাইছে কেন? সেটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রজিৎকে এই কথা জানিয়ে কোনও লাভ হত না। একটা খুন হলে তারপর পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু খুন হওয়ার আগে তা নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাবে কেন? কত লোকই তো বলতে পারে, আমি অমুককে খুন করব। কিন্তু সত্যি সত্যি ক’জন খুন করে? সেলিমকে সবাই পছন্দ করে, শুধু শুধু পুলিশ তার উপরে নজরও রাখবে না।

সন্তুরা ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে। দু’জনেই ফুর্তিতে আছে বেশ।

আর-একটু গল্প করার পর কাকাবাবু বললেন, ‘‘এবার তোরা শুয়ে পড়। কাল সকালে বেরিয়ে বাকি জায়গাগুলো দেখে নিতে হবে।’’

কাকাবাবু নিজের ঘরে এসে দরজা লক করে দিলেন। দরজাটা বেশ মজবুত, বাইরে থেকে খোলা যাবে না।

এ ঘরের তিনটে জানলা। তিনি সব জানলা বন্ধ করে ঘুমোতে পারেন না। প্রত্যেকটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, একটা জানলার কাছে একটা গাছ আছে। অন্য দুটো জানলার কাছাকাছি কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। তিনি শুধু গাছের কাছের জানলাটা বন্ধ রাখলেন।

রিভলভারটা রাখলেন বালিশের নীচে। একটু পরেই তাঁর ঘুম এসে গেল।

কাকাবাবুর ঘুম খুব পাতলা। সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। একসময় ধুপ করে একটা শব্দ হতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কোনও একটা জানলা দিয়ে একটা গোলমতন জিনিস এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। অভ্যেসবশত কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা হাতে নিয়ে জানলা দুটোর দিকে তাকালেন। সেখানে কেউ নেই।

গোলমতো জিনিসটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে! কাকাবাবু খাট থেকে নেমে এসে সোজা জিনিসটার কাছে এলেন। বোমা নাকি? ক্রমশ ধোঁয়া বাড়ছে। বোমা হোক আর যাই হোক, এটাকে এক্ষুনি ফেলে দিতে হবে। রিভলভারটা পকেটে রেখে তিনি জিনিসটা তুলতে গেলেন।

তখনই তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। পা দুটো দুমড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা ক্লোরোফর্মের ধোঁয়া। আর বেশিক্ষণ তিনি সজ্ঞানে থাকতে পারবেন না।

খুট করে শব্দ হল, কেউ চাবি দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। ছায়ামূর্তির মতন তিনজন মানুষ ঢুকল ঘরে। কাকাবাবু দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। ওই গোল জিনিসটা তুলে ওদের দিকে ছুড়ে মারতে চাইলেন। কিন্তু হাত অবশ হয়ে গেছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

প্রত্যেকদিন কাকাবাবুই আগে জেগে ওঠেন। আজ সন্তু আর জোজো সকালবেলা বাইরে বেরিয়ে দেখল, কাকাবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ।

কচুরি আর জিলিপি কিনতে বেরিয়ে গেল দু'জনে। দোকানটা একটু দূরে, সেখানে গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। দোকানেই বসে ওরা খেয়ে নিল ভাল করে, তারপর কাকাবাবুর জন্যে কিনে নিয়ে ফিরে এল।

কাকাবাবুর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ।

এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমোন না কাকাবাবু। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু ইতস্তত করে সন্তু দু'বার ধাক্কা দিল দরজায়, আলতো করে।

কোনও সাড়া নেই।

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেল। সামান্য শব্দে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তবে কি তিনি বাথরুমে গিয়েছেন?

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার দরজায় ধাক্কা দিল সন্তু। এবার একটু জোরে। জোজো ডেকে উঠল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু!"

তবুও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আরও কয়েকবার দুমদুম করা হল। কাকাবাবু বাথরুমে থাকলেও এ আওয়াজ শুনতে পাওয়ার কথা। তা হলে কি কাকাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

হোটেলের সব ঘরেরই একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে ম্যানেজারের কাছে। এ হোটেলের যিনি মালিক, তিনিই ম্যানেজার। সেই কান্তবাবু থাকেন পাশের বাড়িতে।

তাঁকে খবর দেওয়া হল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, "কী ব্যাপার? রায়চৌধুরীবাবুর কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "কী হয়েছে, তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না।"

কান্তবাবু বললেন, "ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরেই আছেন নিশ্চয়ই।"

সন্তু বলল, "আপনার কাছে তো আর-একটা চাবি আছে?"

কান্তবাবু জিভ কেটে বললেন, "এই রে! আমার কাছে তো চাবি নেই। হয়েছে কী, এক মাস আগে এই সাত নম্বর ঘরে যে লোকটা ছিলেন, তিনি যাওয়ার সময় চাবিটা নিয়ে চলে গেছেন, ফেরত দিতে ভুলে গেছেন আর কী? এই এক মুশকিল, হোটেলের খদ্দেররা অনেকেই চাবি পকেটে নিয়ে চলে যায়। এ চাবির তো আর ডুপ্লিকেট করা হয়নি!"

সন্তু বলল, "তা হলে দরজা ভাঙতে হবে।"

কান্তবাবু বললেন, "দরজা ভাঙতে হবে? আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হয় না?"

সন্তু দৃঢ়ভাবে বলল, "না। উনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, তা হলে এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।"

কান্তবাবু বললেন, ‘‘তা হলে, তা হলে, মানে, দরজা ভাঙতে গেলে তো আগে পুলিশে খবর দিতে হয়। পুলিশকে সাক্ষী রাখা দরকার।’’

জোজো বলল, ‘‘পুলিশ ডাকতে ডাকতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখনই দরজা ভাঙুন!’’

সে নিজেই দড়াম করে এক লাথি মারল দরজায়।

কান্তবাবু আঁতকে উঠে বললেন, ‘‘দাঁড়াও, দাঁড়াও ভাই, অমন করলে দরজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। বরং তালাটা যদি ভাঙা যায়...’’

একজন বেয়ারাকে ডাকা হল। সে একটা স্ক্রু ডাইভার এনে কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচি করার পর নষ্ট হয়ে গেল তালাটা। খুলে গেল দরজা।

সকলে ঢুকে পড়ল একসঙ্গে। বিছানা ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই, বাথরুমের দরজাও খোলা।

কান্তবাবু খাটের তলায় উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, ‘‘এখানেও তো নেই। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল, অথচ মানুষটা উধাও হয়ে যায় কী করে? কী অদ্ভুত কাণ্ড! এরকম কখনও দেখিনি, শুনিনি!’’

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো পড়ে আছে। চটি জোড়াও রয়েছে খাটের পাশে। বাইরে পরার পোশাকও রয়ে গেছে সব।

জোজো হাসিমুখে বলে উঠল, ‘‘ও বুঝতে পেরেছি! কাকাবাবুর হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার শখ হয়েছে। তাই জানলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাই না রে সন্তু?’’

সন্তু বলল, ‘‘ঠিক বলেছিস!’’

কান্তবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, ‘‘কী বললে? অদৃশ্য? অ্যাঁ?’’

জোজো বলল, ‘‘হ্যাঁ। কাকাবাবু তিরস্করণী মন্ত্র জানেন। সেই মন্ত্রবলে ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘যাঃ! অত বড় মানুষটা কি জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন?’’

জোজো বলল, ‘‘আপনি জানেন না? অদৃশ্য হলে শরীরটা হাওয়ার মতো হয়ে যায়। তখন একটা ছোট্ট ফুটোর মধ্য দিয়েও বেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। বাইরে গিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাবেন। আগেও এরকম হয়েছে, তাই না সন্তু?’’

সন্তু বলল, ‘‘বেশ কয়েকবার!’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘তাই বলছ? তবে তো আমার হোটেলের কোনও দোষ নেই। তবু পুলিশকে খবরটা দিতেই হবে।’’

কান্তবাবুরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্তু আর জোজো খাটের উপর বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর জোজো বলল, "ঘরের চাবিটা কার কাছে ছিল? কান্তবাবুর কাছে, না অন্য কারও কাছে?"

সন্তু বলল, "যদি কান্তবাবুর কাছে থেকে থাকে, তা হলে বলতে হবে, ভদ্রলোক খুব ভাল অ্যাক্টিং করতে পারেন।"

জোজো বলল, "একটা বাংলা টিভি সিরিয়ালে এইরকম চেহারার একজন লোক অ্যাক্টিং করে মনে হচ্ছে। আমি দেখেছি। সে-ও হোটেলের মালিক।"

সন্তু বলল, "না না, সে অন্য লোক। তার বয়স অনেক কম।"

জোজো বলল, "আমরা রাত্তিরে কোনও আওয়াজ পাইনি। কেউ একজন সাবধানে চাবি দিয়ে এই ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর উপরে।"

সন্তু বলল, "ঘরে কোনও রক্তের দাগ নেই। ধস্তাধস্তিরও চিহ্ন নেই। খুব সম্ভবত ওরা হঠাৎ কাকাবাবুর মুখ বেঁধে ফেলে নিয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তার কিছু নেই।"

জোজো বলল, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'ওরা' মানে কারা?"

সন্তু বলল, "সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে! কিন্তু কোথা থেকে শুরু করা যায়?"

জোজো বলল, "প্রথমেই এই হোটেলের মালিকটাকে ভয় দেখাতে হবে!"

"কী করে ভয় দেখাবি?"

"সে আমি জানি। তোকে ভাবতে হবে না।"

"আমার কী মনে হয় জানিস, জোজো। সব গন্ডগোলের মূলে আছে একটা ঘোড়া।"

"ঘোড়া?"

"হ্যাঁ, পরশুদিন গঙ্গার ধারে একটা ঘোড়া এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল কাকাবাবুর গায়ের উপর। ঘোড়াটা চালাচ্ছিল সেলিম। এইরকম কিছু হলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করে কিংবা ক্ষমা চায়। এখানে সকলে বলছে, সেলিম খুব ভাল আর ভদ্রলোক। অথচ সে কাকাবাবুর কাছে একবারও 'সরি' পর্যন্ত বলেনি।"

"তা ঠিক। এটা অদ্ভুত লাগে সত্যিই।"

“কাল দু’বার সেলিমের সঙ্গে দেখা হল। খোশবাগে কাকাবাবু ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। কিন্তু আমাদের কিছু জানালেন না। নিশ্চয়ই কিছু সিরিয়াস ব্যাপার!”

“হতে পারে, হতেই পারে। তা হলে কি আমরা সেলিমের সঙ্গেই দেখা করব?”

“আমাদের পাত্তা দেবে কিনা জানি না। তবু চেষ্টা করতে হবে।”

“তার আগে, মানে পুলিশ আসবার আগেই ঘরটা একবার সার্চ করা দরকার।”

দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারিতে কাকাবাবুর কিছু জামাপ্যান্ট রয়েছে। আর মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড, একটা টর্চ।

সন্তু বলল, “কাকাবাবুর রিভলভারটা নেই শুধু।”

জোজো বলল, “যারা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তারা রিভলভার তো নেবেই।”

সন্তু বলল, “এখন চতুর্দিকে যে অপহরণ চলছে, সেইরকমই কোনও দল হয়তো কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এরপর টাকা চাইবে। তা হলে আমরা সেলিমের কথা ভাবছি কেন? ওদের তো অগাধ টাকাপয়সা। ওরা নিশ্চয়ই এসব ছোট কাজ করবে না।”

জোজো বলল, “তুই যা বললি, তা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। যাদের অনেক টাকা থাকে, তাদের আরও টাকার জন্য লোভও থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না, ‘রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’। যাই হোক, সব দিকই ভেবে দেখতে হবে।”

কাকাবাবুর মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড এইসব পকেটে ভরে নিল জোজো। তারপর বলল, “চল, নীচে যাই।”

হোটেলের অফিস ঘরে এসে ওরা দেখল, কান্তবাবু একমনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন টেলিফোনে।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট।

টেলিফোনের কথা শেষ হলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে বললেন, “কী কাণ্ড হল বলো তো? কিছুই বুঝতে পারছি না।”

জোজো কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, “এখন আমাদের কী হবে? ওরা কাকাবাবুর টাকাপয়সা সব নিয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে কিছুই নেই। আমরা হোটেলের বিল মেটাব কী করে? বাড়ি ফিরবই বা কী করে?”

কান্তবাবু চমকে উঠে বললেন, ‘‘অ্যাঁ? তোমাদের কাছে টাকা নেই?’’

জোজো বলল, ‘‘সব তো ওঁর কাছেই ছিল।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘উনি তোমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন? আর ফিরবেন না?’’

জোজো বলল, ‘‘হয়তো অনেক দূরে কারও বিপদের কথা টেলিপ্যাথিতে জেনে তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছেন।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘টেলিপ্যাথি?’’

জোজো বলল, ‘‘মনে মনে টেলিফোন। ফিরবেন তো নিশ্চয়ই, তবে কতদিন লাগবে ঠিক নেই। আট-দশ দিনও লেগে যেতে পারে। আমাদের তো ততদিন এখানেই থেকে যেতে হবে।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘আট-দশদিন! যদি তারও বেশি হয়?’’

হঠাৎ উদার হয়ে গিয়ে তিনি বললেন, ‘‘ঠিক আছে। তোমাদের বিল মেটাতে হবে না। সব ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরাও ঘরটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাও!’’

জোজো বলল, ‘‘কোথায় চলে যাব? আমাদের ফেরার ভাড়াও নেই বললাম না? তা ছাড়া কাকাবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে!’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘তোমরা কোথায় যাবে, তা আমি জানব কী করে? সেটা কি আমার দায়িত্ব। তোমাদের কাকাবাবু যদি আর না-ই ফেরেন, তা বলে কি আমি তোমাদের বসে বসে অনন্তকাল খাওয়াব! আমার হোটেলে তো আমি দানছত্তর খুলে বসিনি!’’

এবার সন্তু বলল, ‘‘আপনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন?’’

কান্তবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, ‘‘একে মোটেই তাড়িয়ে দেওয়া বলে না। কোনও হোটেলে কেউ বিনা পয়সায় থাকতে পারে নাকি? পৃথিবীতে এরকম কথা কেউ শুনেছে?’’

সন্তু জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘ওই তো পুলিশের গাড়ি এসে গিয়েছে। পুলিশই এসে ঠিক করে দেবে, আমরা থাকব না চলে যাব। এখানকার পুলিশ তো খুব চটপটে।’’

একটা জিপগাড়ি থেকে নামল সেই ইনস্পেক্টর জাভেদ।

ভিতরে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী ব্যাপার? কাকাবাবুর কী হয়েছে?’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘আরে দেখুন না ভাই, সকালবেলা এসে দেখছি, রায়চৌধুরীবাবু নেই। এদিকে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। আমাদের তালা ভেঙে

ঢুকতে হল। ভিতরটা ফাঁকা। জলজ্যান্ত মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। উনি নাকি কী মন্ত্র জানেন, তার জোরে অদৃশ্য হতে পারেন। অদৃশ্য হয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন জানলা দিয়ে।''

জাভেদ ভুরু কুঁচকে বলল, ''কী বলছেন? অদৃশ্য? তার মানে?''

জোজো হা-হা করে হেসে উঠে বলল, ''জ্যান্ত মানুষ আবার অদৃশ্য হতে পারে নাকি? হা-হা-হা, পৃথিবীতে এরকম কথা কেউ শুনেছে?''

কান্তবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, ''অ্যাই, অ্যাই, তোমরাই তো একথা বলেছ আমাকে!''

সন্তু বলল, ''আমরা ছেলেমানুষ, আমরা যা খুশি বলতে পারি। তা বলে বুড়োমানুষ হয়ে আপনি তা বিশ্বাস করবেন? এই যুগে মন্ত্রফন্ত্র দিয়ে কোনও মানুষ অদৃশ্য হতে পারে? জানলা দিয়ে হাওয়ার মতো বেরিয়ে যেতে পারে?''

কান্তবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, ''তা হলে তোমরা ও কথা বললে কেন আমাকে?''

জোজো বলল, ''বলেছি এইজন্য, আপনি ভেবেছিলেন, কাকাবাবু নেই দেখে আমরা ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলব। আমরা সে ধাতুতে গড়া নই। আমরা জানি, কাকাবাবুকে আটকে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নেই। আমরা মোটেই ঘাবড়াইনি।''

কান্তবাবু বললেন, ''মোট কথা, আমার কোনও দায়িত্ব নেই। ঘর ঠিকঠাক ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, তারপর মানুষটা সেখান থেকে কোথায় গেলেন, কী করে গেলেন, তা খুঁজবে পুলিশ!''

জাভেদ বললেন, ''অবশ্যই আপনার দায়িত্ব আছে। যদি কেউ দরজা ভেঙে ঢুকত, তা হলে বোঝা যেত, চোর-ডাকাতের কারবার। কিন্তু চাবি দিয়ে দরজা খোলা হলে, সে চাবির দায়িত্ব হোটেল ম্যানেজারের। বাইরের লোক চাবি পাবে কী করে?''

কান্তবাবু বললেন, ''হারিয়ে গিয়েছে। একটা চাবি...''

জাভেদ বলল, ''বটে? একটা চাবি হারিয়ে গিয়েছে, একথা আপনি আগে কাউকে জানিয়েছেন? মোট কথা, আপনাকে থানায় যেতে হবে।''

কান্তবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, ''থানায়?''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''জাভেদস্যার, আমরা থানায় যাব না?''

জাভেদ বলল, ''হ্যাঁ, তোমরাও যাবে, তোমাদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে। আগে আমি উপরের ঘরটা একবার দেখে আসি।''

জোজো বলল, ‘‘তুই যা সন্তু, আমি এখানে বসছি।’’

কান্তবাবুও নিজে না গিয়ে দু’জন বেয়ারাকে পাঠালেন।

জোজো একটা চেয়ারে বসে হাঁটু দোলাতে লাগল, আর চেয়ে রইল কান্তবাবুর দিকে।

কান্তবাবু জোজোর দিকে একেবারেই না তাকিয়ে, খাতাপত্র উলটে কাজের ভান করতে লাগলেন।

একটু পরে জোজো আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘‘ম্যানেজারবাবু, আজ দুপুরে কী রান্না হবে?’’

কান্তবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ‘‘কচু পোড়া আর কাঁচকলা সেদ্ধ!’’

জোজো তবু সরলভাবে বলল, ‘‘কেন, মাছ হবে না? এখানকার গঙ্গায় ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না?’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘তোমার লজ্জা করে না? তোমাদের কাকাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তুমি খাওয়ার কথা ভাবছ?’’

জোজো বলল, ‘‘কেন, লজ্জা করবে কেন? কাকাবাবুই তো শিখিয়েছেন, খিদে পেলেই পেট ভরে খেয়ে নিতে হয়। না হলে ব্রেন কাজ করে না। আমার অবশ্য এখনও খিদে পায়নি। দুপুরের কথা ভাবছি!’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘তোমাদের মতো খদ্দের এলে আমার হোটেলটাই তুলে দিতে হবে মনে হচ্ছে!’’

জোজো বলল, ‘‘আপনার হোটেল এমনিতেই তুলে দিতে হবে বোধহয়।’’

কান্তবাবু বললেন, ‘‘কেন, কেন, কেন? আমার হোটেল উঠে যাবে কেন?’’

জোজো বলল, ‘‘আপনি বেশ ভাল রকমই ফেঁসেছেন। আপনার অ্যাক্টিং মোটেই ভাল হচ্ছে না। জাভেদসাহেব একবার থানায় নিয়ে গেলে আপনি সহজে ছাড়া পাবেন ভেবেছেন?’’

কান্তবাবু দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, ‘‘কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!’’

তিনি একটা পেপারওয়েট ছুড়ে মারতে গেলেন জোজোকে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। পেপারওয়েটটা হাতেই ধরা রইল। এক দৃষ্টিতে জোজোর দিকে চেয়ে রইলেন, একটা ছবির মতো।

সেই সময় ফিরে এল জাভেদ আর সন্তু।

জাভেদ বলল, "বিশেষ কিছু দেখবার নেই। তালাটা আজ সকালে ভাঙা হয়েছে, এই তো?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ফিঙ্গার প্রিন্টের ছবি তুললেন না?"

জাভেদ হেসে বলল, "ওসব ভাই ডিটেকটিভ বইয়েই থাকে। আমাদের এই মফস্‌সলে হাতের ছাপের ছবি তোলার কোনও ব্যবস্থাই নেই। যাই হোক, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওই যারা টাকার জন্য অপহরণ করে, তাদেরই কাণ্ড। তবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকাটাই ধাঁধায় ফেলেছে। চলুন কান্তবাবু, থানায় চলুন।"

থানায় বসবার জন্য চেয়ার পাওয়া যায় না, লম্বা লম্বা টুলে বসতে হয়। কান্তবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের একটি ঘরে, সেখানে অন্য একজন লোক তাঁকে জেরা করবে। সন্তু আর জোজোকে সামনে বসিয়ে জাভেদ বলল, "এবার বলো তো, কাল সন্ধে থেকে কী কী ঘটেছে?"

বিশেষ কিছু তো বলার নেই, ফুরিয়ে গেল একটুতেই।

জাভেদ জিজ্ঞেস করল, "তোমরা রাত্তিরে কোনও আওয়াজ শোনোনি?"

দু'জনেই মাথা নেড়ে জানাল, না।

জাভেদ বলল, "কাকাবাবুর মতো একজন দুর্দান্ত ধরনের মানুষকে হোটেলের দোতলা থেকে একেবারে নিঃশব্দে ধরে নিয়ে গেল। হোটেলের আর কেউ টের পেল না। এতেই সন্দেহ হয়, হোটেলের কেউ এ ব্যাপারে জড়িত।"

এরই মধ্যে একজন লোক জাভেদের কানের কাছে এসে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে এখনই বেরোতে হবে। একজন অপহরণকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সে ব্যাটাকে ধরতে পারলে অন্যদেরও জালে ফেলা যাবে। হয়তো এরাই কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সন্তু, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, আমি ঘুরে আসছি। হয়তো একটু দেরি হতে পারে।"

সন্তু বলল, "আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারি না?"

জাভেদ একটু চিন্তা করে বলল, "তোমরা যাবে? কিন্তু বিপদের ঝুঁকি আছে। ওরা অনেক সময় গুলি চালায়।"

সন্তু বলল, "সে তো যে-কোনও জায়গায় রাস্তা পার হওয়ার সময়ও অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি থাকে।"

জোজো বলল, ‘‘আমরা যাব।’’

জাভেদ বলল, ‘‘ঠিক আছে, চলো, তা হলে।’’

ওরা দু’জনে জাভেদের সঙ্গে একটা জিপগাড়িতে উঠল। সঙ্গে আরও তিনজন বন্দুকধারী পুলিশ।

যেতে যেতে জাভেদ বলল, ‘‘এখানে অপহরণের ব্যাপারটা খুব বেড়ে গিয়েছে। যতদূর মনে হচ্ছে, একটা দলই করছে এই কাজ। ওদের একজনকে ধরতে পারলেই বাকিদের খোঁজ পাওয়া যাবে।’’

তারপর সে পাশ ফিরে তার এক সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কেষ্টবাবু, আপাতত আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? আমাদের লোক পাকা খবর দিয়েছে তো?’’

কেষ্টবাবু বলল, ‘‘স্যার, আমাদের গোবিন্দ অপেক্ষা করছে লালবাগের একটা বাড়ির কাছে। গোবিন্দর খবর কখনও ভুল হয় না।’’

লালবাগে গিয়ে সে বাড়ি খুঁজবার আগেই গোবিন্দকে দেখা গেল বড় রাস্তায়। হাত তুলে সে গাড়ি থামাল।

জাভেদ মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী ব্যাপার?’’

গোবিন্দ বলল, ‘‘আপনারা একটু দেরি করলেন স্যার। পাখি উড়ে গিয়েছে!’’

জাভেদ অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলল, ‘‘এই-ই হয়, সবসময়। আমরা মোটেই দেরি করিনি। খবর পাওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়েছি, আর কত তাড়াতাড়ি আসব? আকাশ দিয়ে উড়ে আসব?’’

গোবিন্দ বলল, ‘‘স্যার, ক্রিমিনালদের মতিগতি তো বলা যায় না। লোকটা বেশ বেলা করে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল।’’

জাভেদ আবার জিজ্ঞেস করল, ‘‘কোথায় গেল, তার কোনও ধারণা আছে? লোকটার নাম কী?’’

গোবিন্দ বলল, ‘‘ওর দলের লোক ওকে বলে বাঁটলো। ও তালা ভাঙার ওস্তাদ। এই বাঁটলোর আর-একটা আখড়া আছে আজিমগঞ্জে, খানিকটা দূর হবে। সেখানে গিয়ে দেখবেন?’’

জাভেদ বলল, ‘‘ইয়েস, সেখানেই যাব। চলো চলো, তুমিও পিছনে উঠে পড়ো!’’

জিপ আবার মুখ ঘুরিয়ে ছুটল।

এর মধ্যে বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। আজও আকাশ মেঘলা, তেমন গরম নেই।

রাস্তায় এক জায়গায় একটা ট্রাক উলটে গিয়েছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, গাড়িটাড়ি যেতে পারছে না।

জাভেদ বিরক্ত হয়ে বলল, "এইখানে আমরা আটকে থাকব নাকি? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বোধহয় এখনও কাকাবাবুর খবর পৌঁছোয়নি। এর মধ্যে যদি বাঁটলোকে ধরে ফেলতে পারি..."

জাভেদ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

রীতিমতো জ্যাম হয়ে গিয়েছে, কোনও গাড়ি পার হতে পারছে না। পাশেই ধানখেত। এখন অবশ্য ধান কাটা হয়ে গিয়েছে।

জাভেদ ড্রাইভারকে বলল, "তুমি ওই খেতের উপর দিয়ে চালাতে পারবে না? জিপগাড়ি তো..."

রাস্তা আর খেতের মাঝখানে বেশ বড় গর্ত। তাই অন্য গাড়ি নামতে সাহস করছে না। জিপগাড়ির ড্রাইভার তবু নামিয়ে দিল গাড়ি, সেটা একপাশে অনেকটা হেলে পড়লেও ওলটাল না, কোনওরকমে জায়গাটা পেরিয়ে চলে এল অন্য দিকে।

সন্তু আর জোজোও জিপ থেকে নেমে পড়েছিল, ওরা দৌড়ে গিয়ে আবার উঠল।

আজিমগঞ্জে পৌঁছেও শহর ছাড়িয়ে একটা জংলামতো জায়গায় জিপটাকে নিয়ে এল গোবিন্দ। সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। এমনই ভাঙা যে, সেখানে কোনও মানুষ থাকে বলে মনে হয় না। আশপাশে আর কোনও বাড়িও নেই।

গোবিন্দ আঙুল তুলে বলল, "ওই দেখুন, একটা সাইকেল। নিশ্চয়ই এখানে মানুষ আছে।"

সত্যিই একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা আছে একটা গাছের গায়ে।

জাভেদ বন্দুকধারী পুলিশদের বলল, "তোমরা দু'জনে দু'দিকে দাঁড়াও। চোখ-কান খোলা রাখবে। আর-একজন থাকবে এই দরজার কাছে।"

জাভেদ রিভলভার হাতে নিয়ে সন্তু আর জোজোকে বলল, "তোমরা গাড়িতেই বসে থাকো।"

সন্তু বলল, "না, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।"

জাভেদ বলল, "আসতে চাও? ঠিক আছে পিছনে পিছনে থাকো। যদি গুলিটুলি চলে, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বে!"

সাবধানে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল জাভেদ।

এককালে কোনও ধনী লোকের বাড়ি ছিল, এখন পরিত্যক্ত। সামনে অনেকখানি চওড়া বারান্দা, সেটা আগাছায় ভরা। দরজা-জানলা ভাঙা।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "ঠিক সিনেমার মতো মনে হচ্ছে, না রে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। সিনেমায় এরপর কী হয় বল তো? আসামি পালিয়ে যায়। সাবধানে থাকতে হবে।"

জাভেদ ওদের দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "চুপ!"

প্রথম দুটো ঘর একবারে ফাঁকা। কোনও মানুষ থাকার চিহ্নই নেই।

তারপর একটা ঘরের কাছে আসতেই দ্যাখা গেল, ভিতরে একটা টেবিলে বসে একজন লোক কী যেন খাচ্ছে।

গোবিন্দ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মাথা নাড়ল, তার মানে, ওই লোকটাই বাঁটলো। একজন স্ত্রীলোক বাঁটলোকে কিছু একটা খাবার এনে দিল।

জাভেদ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বাঁটলো উঠে দাঁড়াল।

জাভেদ ঠান্ডা গলায় বলল, "ওঠবার দরকার নেই। খাচ্ছিস, খেয়ে নে। খাওয়ার মাঝখানে কোনও মানুষকে আমি অ্যারেস্ট করি না।"

বাঁটলো আবার বসে পড়ে বলল, "আপনারা...আপনারা আমাকে ধরতে এসেছেন কেন? আমি কী করেছি?"

জাভেদ বলল, "সে কথা পরে হবে। বলছি না, খেয়ে নে আগে!"

বাঁটলো আবার খেতে শুরু করল। তার খাওয়ার শপশপ শব্দ হচ্ছে।

সন্তু বেরিয়ে গেল বাইরে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, "জাভেদদা, ও কী খাচ্ছে?"

জাভেদ বলল, "পান্তাভাত আর বেগুনপোড়া।"

জোজো বলল, "মাছ, মাংস কিছু নেই?"

জাভেদ বলল, "দেখছি না তো!

জোজো বলল, "এরা নিশ্চয়ই অপহরণ করে অনেক টাকা পায়। তা দিয়ে কী করে? ভাল করে খায় না?"

জাভেদ বলল, "পান্তাভাত এখানে অনেকে খুব পছন্দ করে। আমিও খুব খাই। তবে এর সঙ্গে আলু দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝাল থাকলে আরও ভাল।"

বাঁটলো বলল, "আমি তো স্যার ভ্যান রিকশা চালাই। আমায় কেন ধরতে এসেছেন। ওই গোবিন্দটা আপনাদের ভুল খবর দিয়েছে।"

গোবিন্দ বলল, "আমাকে চেনে দেখছি। ও আগেও একবার ধরা পড়তে পড়তে পিছলে গিয়েছিল।"

জাভেদ ধমক দিয়ে বলল, "তোর খাওয়া হয়েছে? শেষ কর, তাড়াতাড়ি শেষ কর। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"

বাঁটলো বলল, "এই তো, হয়ে গেছে।"

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করল, " আর ভাত নেবে না?"

বাঁটলো বলল, "নাঃ, পেট ভরে গিয়েছে। এবার একটু আঁচিয়ে নিই স্যার?"

জাভেদ বলল, "বাইরে যেতে হবে না। এখানেই হাত ধুয়ে নে।"

বাঁটলো বলল, "বাইরে যাব না, এই তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে..."

অন্যদিকের পাল্লা-ভাঙা দরজার কাছে রাখা আছে একটা জলের জাগ।

সেটা তুলে নিয়েই হাত ধোওয়ার বদলে ছুড়ে মারল জাভেদের দিকে। ঠিক সময় মাথাটা সরিয়ে না নিলে জাগটা জাভেদের মাথা ফাটিয়ে দিত।

এরই মধ্যে বাঁটলো লাফিয়ে বাইরে নেমে লাগাল দৌড়।

দশ-বারো পায়ের বেশি যেতে পারল না। একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সন্তু বেরিয়ে এসে তার পায়ে একটা ল্যাং মারল।

বাঁটলো পড়ে গেল ধপাস করে।

ততক্ষণে জাভেদ নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে চলে এসেছে।

বাঁটলোর পিঠের উপর পা দিয়ে বলল, "পালাতে চাইছিলি, তাই না? এই ছেলেটি তোর কী উপকার করেছে জানিস? তুই যদি আর-একটু দূরে যেতিস, আমার পুলিশ তোকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিত। এই ছেলেটির জন্য তুই বেঁচে গেলি!"

সন্তু বলল, "পুলিশের গুলি ওর গায়ে না-ও লাগতে পারত।"

জাভেদ বলল, "ওকে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের দরকার। এই, ওঠ!"

বাঁটলো উঠে দাঁড়াতেই জাভেদ তার চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, "কাকাবাবুকে তোরা কোথায় নিয়ে রেখেছিস?"

বাঁটলো অবাকভাবে বলল, "কাকাবাবু? কার কাকাবাবু? আমি তো চিনি না!"

জাভেদ বলল, "কাল রাত্তিরে তোরা রত্নমঞ্জুষা হোটেল থেকে একজন খোঁড়া ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিস। তিনি এখন কোথায়?"

বাঁটলো বলল, "রত্নমঞ্জুষা? সে হোটেলে আমি জীবনে কখনও ঢুকিনি। কোনও খোঁড়া ভদ্দরলোককে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা আমি কিছুই জানি না!"

জাভেদ বলল, "এঃ, তুই কিছুই জানিস না? সত্যি কথা বল, তা হলে কম শাস্তি পাবি। নইলে তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

বাঁটলো এবার কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "সত্যি বলছি স্যার। মা কালীর দিব্যি।"

জাভেদ বলল, "ওসব দিব্যিটিব্যি আমি বুঝি না। আমি দশ গুনব, তার মধ্যে যদি না বলিস... এক, দুই..."

বাঁটলো বলল, "সত্যি কথাটা শুনুন স্যার। আমরা ভাড়া খাটি। আমাদের একজন এসে বলে, অমুক লোকটাকে ধরে এনে দিতে হবে। আমরা তাকে ধরে এনে দিই। তার জন্য আমরা খুব কমই পয়সা পাই। তারপর সেই লোকটাকে নিয়ে ওরা কী করে, তা আমরা জানি না। এর মধ্যে শুধু এরকম একটা কেস করেছি, সে লোকটার নাম ফিরোজ শাহ। 'কাকাবাবু' বলে কারও নাম শুনিনি।"

জাভেদ বলল, "কে তোদের এরকম লোক ধরে আনার বরাত দেয়?"

বাঁটলো বলল, "সে নাম কি আমি বলতে পারি স্যার। এ লাইনে একবার নামটাম বলে দিলে আমার দলের লোকরাই আমাকে খুন করে ফেলবে।"

জাভেদ বলল, "আর না বললে যে আমি তোকে খুন করে ফেলতে পারি? তোকে গুলি করে মেরে ফেলে তারপর রিপোর্ট লিখব, তুই আমাকে ছুরি দিয়ে মারতে এসেছিলি। ব্যস। মিটে গেল। বরং থানায় আমাদের কাছে রাখলে তোর দলের লোক কোনও ক্ষতি করতে পারবে না!"

এরপর বাঁটলোকে জিপে তুলে এনে নিয়ে আসা হল থানায়।

সেখানে সারাদিন ধরে জেরা করা হল বাঁটলোকে।

কিছুতেই তার পেট থেকে কথা বের করা যায় না।

প্রায় সন্ধের সময় সে তার দলের একজনের নাম বলে ফেলল।

সন্তু আর জোজো সর্বক্ষণ বসে বসে সব শুনছিল। জাভেদ তাদের বলল, "আমার মনে হচ্ছে, এ-লোকটা সত্যিই কাকাবাবু সম্পর্কে কিছু জানে না। এতক্ষণ ধরে জেরা করছি। জানলে একটা কিছু বলে ফেলত। ফিরোজ শাহ'র কেসটা স্বীকার করেছে। আমার ধারণা, কাকাবাবুর অপহরণের ব্যাপারটা অন্য কোনও দলের কাজ।"

সন্তু বলল, "সব শুনে আমারও মনে হল, বাঁটলো লোকটি সত্যিই কাকাবাবুর কথা জানে না। কতক্ষণ আর একটা লোক মিথ্যে কথা বলতে পারে?"

জাভেদ বলল, ‘‘তবু আর-একটা লোকের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তাকে ধরতে পারি কিনা দেখি। তার কাছ থেকে হয়তো আরও কিছু খবর পাওয়া যাবে। তোমরা হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি রাত্তিরে তোমাদের খবর দেব!’’

জোজো বলল, ‘‘বাবা রে! সারাদিন ধরে শুধু একই কথা, একটি কথা শুনছি। মাথা ধরে গিয়েছে। আমি এখন হোটেলেই ফিরতে চাই!’’

সন্তু বলল, ‘‘অন্য লোকটা যদি ধরা পড়ে, তাকে একবার দেখব না?’’

জাভেদ বলল, ‘‘ধরা পড়লে তোমাদের খবর দেব। হোটেল থেকে ডাকিয়ে আনব।’’

সন্তু বলল, ‘‘ঠিক আছে!’’

দু’জনে বেরিয়ে পড়ল থানা থেকে।

জোজো বলল, ‘‘তোর খিদে পায়নি সন্তু? দুপুরে তো প্রায় কিছুই খাইনি!’’

দুপুরে থানায় কয়েকখানা রুটি, ডাল আর কিমার তরকারি খেতে দেওয়া হয়েছিল দোকান থেকে আনিয়ে। তাতে জোজোর পেট না ভরারই কথা। কিংবা পেট ভরলেও মন ভরেনি। বারবার বলছিল, ‘আমি কিমার তরকারি পছন্দ করি না। এর মধ্যে অনেক ভেজাল থাকে।’ ’’

জোজো বলল, ‘‘কাকাবাবুর মানিব্যাগ তো আমার কাছে আছে। চল, কোনও রেস্তরাঁয় গিয়ে ভাল করে খেয়ে নিই।’’

সন্তু বলল, ‘‘কাকাবাবু কোথায় আছেন, তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই বা কে জানে!’’

জোজো বলল, ‘‘সেই ভেবে কি আমরা না খেয়ে থাকব? তাতে কোনও লাভ হবে? কাকাবাবুই তো বলেছেন, খিদে পেলেই ভাল করে খেয়ে নিতে হয়, না হলে ব্রেন কাজ করে না?’’

একটা পাঞ্জাবির দোকানে ঢুকে ওরা কষা মাংস, রুটি আর মিষ্টি দই খেয়ে নিল।

জোজো তৃপ্তির সঙ্গে বলল, ‘‘আঃ! এইবার আমার ব্রেন ভাল কাজ করছে। এখন আমাদের কী করা উচিত বল তো!’’

সন্তু বলল, ‘‘তুই বল!’’

জোজো বলল, ‘‘সকালে আমরা প্রথমে সেলিমের কথা ভেবেছিলাম। এখন একবার চল, সেলিম কিংবা আমির আলির সঙ্গে দেখা করে আসি।

ওঁরা কাকাবাবুর খবরটা জানেন কিনা তাও বোঝা যাবে।''

সন্তুও ঠিক এটাই ভাবছিল। সে মুখে কিছু না বলে একটা সাইকেল রিকশা ডাকল।

আমির আলি সাহেবের সেই সাদা রঙের বাড়ির সামনের গেট বন্ধ।

পাহারাদারটি ওদের কথা শুনে বলল, ''ভিতরে যাওয়া যাবে না। যখন-তখন দেখা করার হুকুম নেই।''

জোজো বলল, ''কাল আমাদের এখানে নেমন্তন্ন ছিল, আপনার মনে আছে তো? তারপর হয়েছে কী, পকেট থেকে আমার একটা আইডেন্টিটি কার্ড কখন পড়ে গেছে। সেটা হারিয়ে গেলে খুব মুশকিল হবে। একবার ভিতরে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করব শুধু। যদি কার্ডটা এখানে থাকে...''

পাহারাদার কিছুতেই শুনতে চায় না।

অনেক কাকুতিমিনতি করার পর গেটটা খুলে দিয়ে বলল, ''ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে।''

সামনের বাগানে কয়েকটা আলো জ্বলছে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সাদা ঘোড়াটা।

সন্তু ঘোড়াটার গলা চাপড়ে একটু আদর করতেই সেটা বেশ খুশি হয়েছে মনে হল।

সন্তু বলল, ''বেশ ভাল জাতের ঘোড়া। ভদ্র।''

জোজো বলল, ''সন্তু, যদি কুকুর দুটো আসে?''

সন্তু বলল, ''এইসব বাড়ির কুকুর প্রথমেই কামড়ায় না। ট্রেনিং দেওয়া থাকে। কাছে এসে জোরে জোরে ডাকে। ভয় পাবি না, দৌড়োবি না, একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি সামলে নেব!''

কুকুর দুটো অবশ্য দেখা গেল না।

বারান্দায় উঠে এসে সন্তু একটা দরজায় টোকা দিল। তারপর দেখল, পাশে একটা ডোরবেলও আছে।

দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন সেই ম্যানেজারবাবু, যিনি কাল আমিরসাহেবের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ওদের দেখে বেশ অবাক।

শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ''কী ব্যাপার?''

জোজো বলল, ''আমরা একবার আমিরসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।''

ম্যানেজারবাবু মুখ ভেংচে বললেন, "দেখা করতে চাই বললেই দেখা করা যায়? এ কি মামার বাড়ি পেয়েছ নাকি? ওঁর শরীর ভাল নেই।"

সন্তু বলল, "তা হলে কি সেলিমসাহেবকে একবার ডেকে দেবেন?"

জোজো বলল, "আমাদের কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে একটা জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন।"

ম্যানেজার বললেন, "বটে! খুব মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ তো? তোমাদের কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন! এমন হাসির কথা কখনও শুনিনি!"

সন্তু বলল, "আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমরা সেলিমসাহেবের সঙ্গে মাত্র দু'-তিন মিনিট কথা বলব!"

ম্যানেজারবাবু বললেন, "সেলিমসাহেব যখন-তখন বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। যাও যাও, সরে পড়ো।"

তিনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

জোজো বলল, "যাঃ বাবা! কাল দুপুরে অত যত্ন করে খাওয়াল এ বাড়িতে আর আজ এখানে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল!"

সন্তু বলল, "বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ। আমার মনে হয়, আমির আলি সাহেব কিংবা সেলিমসাহেবকে খবর দিলে নিশ্চয়ই একবার দেখা করতেন। এই ম্যানেজারই দেখা করতে দিল না।"

জোজো বলল, "ওই ম্যানেজার কেন বলল, কাকাবাবু সেলিমসাহেবকে একটা জরুরি কথা বলে পাঠিয়েছেন, সেটা একটা হাসির কথা?"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তার মানে বুঝলি না? আমি বুঝেছি। তার মানে হল, ম্যানেজারবাবু জানেন, কাকাবাবুর পক্ষে এখন কোনও খবর পাঠানো সম্ভব নয়। কাকাবাবু কোথাও বন্দি হয়ে আছেন।"

জোজো বলল, "অ্যাঁ? তাই তো। এ বুড়ো জানল কী করে?"

সন্তু বলল, "সেটাই তো প্রশ্ন। তা ছাড়া জানিস জোজো, কেউ অকারণে অভদ্র ব্যবহার করলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আমরা আমিরসাহেব আর সেলিমসাহেবের সঙ্গে শুধু দেখা করতে চেয়েছি। যতই বড়লোক হোক, তাদের সঙ্গে অন্য কেউ দেখা করতে চাইতে পারে না? সেইজন্য মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে? আমার ইচ্ছে করে, এদের উপর একটা কিছু প্রতিশোধ নিতে।"

জোজো বলল, "কী প্রতিশোধ নিবি? দরজাই খুলবে না।"

সন্তু বলল, "একটা উপায় আছে। আমি কিছুদিন ঘোড়া চালানো শিখেছি। ভালই পারি। এই সাদা ঘোড়াটা নিয়ে যদি পালিয়ে যাই। সেলিমসাহেবের প্রিয় ঘোড়া, নিশ্চয়ই সেলিমসাহেব কষ্ট পাবে। ছোটাছুটি করবে এদিক-ওদিক। সেটাই হবে ওর শাস্তি।"

জোজো বলল, "তুই ঘোড়াটা নিয়ে যাবি? আমি তা হলে কী করব?"

সন্তু বলল, "তুই আমার পিছনে বসে শক্ত করে ধরে থাকবি। পারবি না?"

সন্তু কাছে গিয়ে ঘোড়াটাকে একটু আদর করে চড়ে বসল। ঘোড়াটা আপত্তি করল না।

জোজোকেও তুলে নিয়ে সন্তু টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে।

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলেও ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগল।

প্রথমে তিনি ভাবলেন, এটা হোটেলের ঘর, না কোন ঘর? খাটটা অনেক বড়। হোটেলের ঘরের দেওয়ালে গঙ্গার একটা বাঁধানো ছবি ছিল। এ ঘরের কোনও দেওয়ালে কোনও ছবি নেই।

তারপর তিনি দেখলেন, তিনি তাঁর ডোরাকাটা স্লিপিং সুটটাই পরে আছেন। এই পোশাক পরে তো তিনি বাইরে যান না। তা হলে এই একটা অন্য ঘরে এলেন কী করে?

তারপর তাঁর মনে পড়ল, মাঝরাত্তিরে কীসের যেন ধোঁয়ায় তাঁর দম আটকে আসছিল, মাথা ঘুরছিল। তখন কয়েকজন লোক তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখতে পাননি ভালো করে।

এবার তিনি উঠে বসলেন। খাটের পাশেই একটা ছোট শ্বেতপাথরের টেবিল। তার উপর পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে একটি দামি ড্রেসিং গাউন।

পাশের একটা থালায় অনেক রকম ফল। একটা বড় গেলাস ভরতি কীসের যেন শরবত। আর-একটা জলের জাগ।

খাটের পাশেই রয়েছে একজোড়া নতুন চটি।

কাকাবাবু ভাবলেন, এ যে রাজকীয় ব্যবস্থা দেখছি। আগে অনেকবার,

অনেক জায়গায় তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এত খাতির পাননি।

খাট থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন পরে দেখলেন। বেশ ফিট করেছে। চটি জোড়াও তাই।

ড্রেসিং গাউনটা পরতে গিয়ে তাঁর স্লিপিং সুটের একটা পকেট ভারী ভারী লাগল। সেখানে হাত দিয়ে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

তাঁর রিভলভার। পকেটেই ছিল, ওরা কেড়ে নেয়নি? এ আবার কেমন বন্দি করে রাখা? তিনি যেন কারও বাড়িতে অতিথি। তা হলে জোর করে ধরে আনল কেন?

তেষ্টা পেয়েছে, কাকাবাবু শরবতের বদলে খানিকটা জল খেলেন। তারপর গেলেন বাথরুমে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়।

বাইরে রীতিমতো ঝোপ-জঙ্গল। এখানে-সেখানে ভাঙা দেওয়াল। হাত-পা ভাঙা মূর্তি, আধখানা দরজা। বোঝা যায়, এটা একটা খুব পুরনো আমলের বাড়ি, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে, শুধু বোধহয় দু'-একটা ঘর আর বাথরুম সারিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শহরের কাছাকাছি নয় বোধহয়।

তিনি বাথরুম থেকে বেরোতেই একজন বুড়ো লোক এসে জিজ্ঞেস করল, "স্যার আপনি কী খাবেন? চা না কফি?"

কাকাবাবু বললেন, "আগে চা-ই নিয়ে এসো। পরে কফি খাব।"

লোকটি বলল, "তখন কি কফির সঙ্গে ডিমের পোচ দেব? না অমলেট, না হাফ বয়েল? টোস্ট খাবেন, না পরোটা?"

কাকাবাবু হেসে ফেললেন। এ যে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ব্যাপার!

তিনি বললেন, "সে পরে দেখা যাবে, এখন শুধু চা নিয়ে এসো।"

একটু পরেই লোকটি ঠিক বড় হোটেলের মতোই ট্রে-তে সাজিয়ে পোর্সেলিনের পটে চা, খুব দামি সোনালি বর্ডার দেওয়া কাপ-প্লেট আর দুধ, চিনি আলাদা করে নিয়ে এল।

হোটেলের বেয়ারাদের টিপ্‌স দিতে হয়। কাকাবাবুর কাছে পয়সাটয়সা কিছু নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি ভাবলেন, সন্তু আর জোজো এখন কী করছে?

সকালে উঠে ওরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে কী করবে?

তবে তিনি জানেন, সন্তু সহজে ঘাবড়াবার ছেলে নয়। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে অনেকবার।

তিনি যদি এখান থেকে চলে যেতে চান, কেউ কি বাধা দেবে? তাঁর সঙ্গে রিভলভারটা আছে, তাঁকে কে আটকাবে?

মুশকিল হচ্ছে, তাঁর ক্রাচ দুটো নেই। এই অবস্থায় তিনি হাঁটবেন কী করে? এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।

তবু তিনি চা শেষ করে ঘরের বাইরে এলেন।

একটা বারান্দা, সেটার বেশ করুণ অবস্থা। একটা দিক একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাড়িটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। নিশ্চয়ই নবাবি আমলের বাড়ি।

বারান্দা দিয়ে একটু এগোতেই পাশের আর-একটা ঘর দেখা গেল। দরজা খোলা। সেখানে হুইল চেয়ারে বসে আছেন আমির আলি। একজন লোক তাঁর পিঠ ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।

তিনি বললেন, ‘‘গুড মর্নিং রায়চৌধুরীসাহেব। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল তো? কোনও অসুবিধে হয়নি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘না, অসুবিধে আর কী হবে? ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিলে চমৎকার ঘুম হয়। আপনি ভাল আছেন তো?’’

আমির আলি একটু লজ্জিতভাবে বললেন, ‘‘আপনাকে ওরকমভাবে নিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার। মাথা গরম করে ফেলে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আপনি আমাকে খবর দিলেই তো আমি চলে আসতাম। এরকম ধরেটরে আনার দরকার ছিল না!’’

আমির আলি হাতের ইঙ্গিতে অন্য লোকটিকে চলে যেতে বললেন।

তারপর অন্য একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ‘‘বসুন রায়চৌধুরীবাবু। আমার ছেলে আপনাকে এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। সেটা শুনলেই ভাল করতেন। তা হলে আর কোনও গন্ডগোল হত না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এটা আপনার ছেলের আবদার। সে তো বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। এরকম বাজে আবদার করে কেন? আমার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকব, তাতে সে বাধা দেওয়ার কে?’’

আমির আলি বললেন, ‘‘বাজে আবদার নয়। আমরা এখানে এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছি, যার মধ্যে আপনার জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। আপনি নাকি

অন্যদের ব্যাপারে নাক গলান? বেশ কয়েকজন আমাদের একথা বলেছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমার নাকটা এমন কিছু লম্বা নয় যে, সব ব্যাপারে গলাতে যাব। তবে আমার নাক বাজে গন্ধ সহ্য করতে পারে না। আপনারা যে কাজটা করতে যাচ্ছেন, সেটা কী? মানুষ খুন?''

আমির আলি শান্তভাবে বললেন, ''জি হাঁ। আপনি এর মধ্যেই জেনে ফেললেন কী করে?''

''আপনার ছেলেই আমাকে সেকথা বলেছে। আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনার মতো একজন ভদ্রলোক, মানী লোক, কী করে মানুষ খুন করার মতো অমানবিক কাজ সমর্থন করছেন?''

''সেটা আপনাকে বুঝতেও হবে না। কিন্তু আপনি কি পুলিশ? খুনের তদন্ত করা আপনার কাজ?''

''না। সেটা আমার কাজ নয়। আমি পুলিশও নই। কিন্তু কোথাও কেউ খুন হচ্ছে, সেটা জানতে পারলে তা আটকানোর চেষ্টা করা তো যে-কোনও মানুষেরই কর্তব্য!''

''যাকে খুন করা হবে, সেটা মানুষ নয়। নরকের পোকা!''

''আমার মতে সব মানুষই সমান। সব মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে, আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবে। অন্য কেউ তাকে মারতে পারবে না, সভ্য সমাজে সে অধিকার নেই।''

''এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার। আমাদের পরিবারের কাউকে যদি একজন খুন করে, তা হলে তাকে কিংবা সেই পরিবারের একজনকে খুন করতে না পারলে শান্তি হয় না। একে বলে রক্ত-ঋণ। আমরা এক পূর্বপুরুষের রক্ত-ঋণ শোধ করব।''

''সে তো আরব দেশে এরকম প্রথা ছিল শুনেছি।''

''মনে করুন, আমরাও আরবেরই লোক। অন্তত কোনও এক সময় ছিলাম।''

''কিন্তু এটা স্বাধীন ভারত। এখানে রক্ত-ঋণটিন চলে না। এখানে যে-কোনও কারণেই হোক, কোনও মানুষকে খুন করলে আপনাদের শাস্তি পেতেই হবে! যে খুন করবে, তার ফাঁসিও হতে পারে।''

আমির আলি একটা হাত তুলে বললেন, ''এ কী! আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''খুনটুনের কথা শুনেও উত্তেজিত হব না? আপনি

এত ঠান্ডা মাথায় এসব বলছেন কী করে, তাতেই আশ্চর্য হচ্ছি।''

আমির আলি বললেন, ''শুনুন, আমাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। খুনটা হবে অনেকের চোখের সামনে। তবু কেউ আমাদের দোষী করবে না। কার খুনের বদলা নেওয়া হচ্ছে শুনলে আপনারও সমর্থন করা উচিত।''

কাকাবাবু বললেন, ''কোনও কারণেই আমি মানুষ খুন সমর্থন করতে পারব না। তবু শুনি, আপনারা কার খুনের বদলা নিতে চান?''

''এই বাড়িটার নাম 'পান্নামহল'। এখন প্রায় সবই ভেঙেচুরে গিয়েছে। এ বাড়ি কার ছিল জানেন? আমিনা বেগমের।''

''কোন আমিনা বেগম?''

''সিরাজদ্দৌল্লার জননী।''

''এটা অত দিনের পুরনো বাড়ি?''

''হ্যাঁ। এ বাড়ি আমাদের। আমরা সিরাজের বংশধর।''

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, ''কী যে বলেন? সিরাজের কোনও ছেলে ছিল নাকি?''

আমির আলির মুখে হাসি নেই। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, ''ছেলে ছিল না, কিন্তু মেয়ে ছিল! এখনকার বিজ্ঞান বলে, শুধু ছেলেদের কেন, মেয়েদেরও একই বংশ। একই জিন রক্তে প্রবাহিত হয়। আপনার পিছনের দেওয়ালে একটা ছবি আছে। দেখুন তো কার ছবি?

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বললেন, ''ও তো সিরাজের ছবি। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ওই একটা ছবিই তো দেখা যায় সব বইয়ে। মাথায় পালক গোঁজা শিরস্ত্রাণ।''

আমির আলি বললেন, ''এবার বলুন তো, আমার ছোট ছেলে সেলিমের সঙ্গে ওই ছবির হুবহু মিল নেই?''

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ''ওইরকম সাজলে গুজলে হয়তো একরকম দেখাতেও পারে। কিন্তু তাতে কী হল, একটা ছবির সঙ্গে একজন মানুষের খানিকটা মিল থাকলেও থাকতে পারে।''

আমির আলি কঠোরভাবে বললেন, ''আমার ছোট ছেলে সেলিম নবাব সিরাজের শেষতম বংশধর। ওর মধ্যে আবার সিরাজ ফিরে এসেছেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''এ আপনি কী বলছেন, আলিসাহেব? নবাব সিরাজের মৃত্যু হয়েছে আড়াইশো বছর আগে। এতদিনে বংশটংশের কোনও চিহ্ন থাকে?''

আমির আলি বললেন, ‘‘কেন থাকবে না। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের একই বংশ নেই? রানির ছেলেও একই বংশ। আমার কাছে ডেফিনিট প্রমাণ আছে। দশ বছর আগে আমি একটা পুরনো খাতা আবিষ্কার করেছি। তাতে আমাদের বংশতালিকা দেওয়া আছে। তার থেকেই জানা যায়, আমরা সিরাজ ও লুতফা বেগমের বংশধর।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সেই জন্যই আপনি এখানকার বাড়ির নাম রেখেছেন ‘চেহেল সুতুন’? নবাব আলিবর্দির বাড়ির ওই নাম ছিল। নামটা দেখেই আমার খটকা লেগেছিল।’’

আমির আলি বললেন, ‘‘হ্যাঁ, আলিবর্দিও আমাদের পূর্বপুরুষ। আমরাই বাংলা-বিহার-ওড়িশার মালিক।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কিন্তু এখন তো স্বাধীন দেশ। এখন তো কেউ কোনও রাজ্যের মালিক নয়। এখন গণতন্ত্র। যারা নির্বাচনে জেতে, তারা দেশ চালায়। নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজদের দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে!’’

আমির আলি বললেন, ‘‘রাজত্ব শেষ হলেও টাইট্‌ল তো আছে। গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানি। আসল মহারানি এখন না হলেও সকলে তো মহারানিই বলে। যেমন পটৌডির নবাব, কুচবিহারের রাজা, ত্রিপুরার মহারানি, মাণ্ডির রাজা ...। সেইরকম, আমার ছেলে সেলিমও হবে বাংলার নবাব!’’

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, ‘‘নতুন করে বাংলার নবাব। বেশ তো! তার জন্য গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখুন। সরকার যদি মেনে নেয়, তা হলে আমাদেরও মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু এর মধ্যে খুনটুনের কথা আসছে কোথা থেকে?’’

আমির আলি বললেন, ‘‘আমার ছেলে সেলিম সিরাজের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাকে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। সিরাজকে যারা মেরেছে, তাদের অন্তত একজনকে খুন করে প্রতিশোধ না নিলে রক্ত-ঋণ শোধ হবে না!’’

‘‘এ কী অদ্ভুত কথা! সিরাজ খুন হয়েছিল আড়াইশো বছর আগে। তার খুনিদের এখন পাবেন কোথায়?’’

‘‘তাদের বংশধর কেউ না-কেউ আছে। সেই জন্যই আমরা প্রতি বছর এসে খোঁজ করি।’’

‘‘সিরাজের হত্যার জন্য আসল দায়ী তো ইংরেজরা। তারা এদেশ ছেড়ে

চলে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। মিরজাফররা তো ছিল ইংরেজদের হাতের পুতুল।''

''তবু তাদের বংশধরদের রক্তে রয়ে গেছে সেই পাপ। আমরা মিরজাফর বা মিরনের কোনও সরাসরি বংশধরকে খুঁজছিলাম। এদের অনেকেই বিদেশে চলে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত এবারেই একজনকে পেয়েছি। একেবারে আসল লোক। তাকে মারলেই আমাদের সত্যিকারের পুণ্য হবে।''

''সে কে?''

''দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন। আপনার সামনেই তাকে খতম করা হবে!''

এইসময় ঘরে ঢুকল সেলিম। সে প্রায় ছবির নবাবের মতোই সাজ করেছে। মাথায় পালকের মুকুট। কোমরে তলোয়ার। এখন এরকম পোশাক দেখলে যাত্রাদলের নবাব মনে হয়। তার এক হাতে একটা চাবুক।

গম্ভীরভাবে সে বলল, ''আব্বাজান, এই লোকটির সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। হয়তো তোমার পছন্দ হবে না। তুমি একটু অন্য ঘরে যাবে?''

আমির আলি বললেন, ''কী বলবি, বল না আমার সামনেই।''

সেলিম কাকাবাবুর দিকে ফিরে কটমট করে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, ''সেলিমসাহেব, আপনি আমাকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই মাঝরাত্রে আমাকে অজ্ঞান করে ধরে আনলেন। আমি আশা করেছিলাম, আপনি ভদ্রলোকের মতো কথা রাখবেন। সেই জন্যই আমি রাত্তিরবেলা সাবধান হইনি।''

সেলিম রুক্ষ স্বরে বলল, ''ভদ্রলোক? আমি ভদ্রলোক নই, আমি নবাব। আমি যখন-তখন ইচ্ছেমতো মত বদল করতে পারি। আমার মনে পড়ল, আমার কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া বাকি আছে। আপনি চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে নিলডাউন হয়ে বসুন, তারপর হাতজোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান।''

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ভুরু তুলে বললেন, ''আমি ক্ষমা চাইব? কেন? আমি আবার কী দোষ করলাম? লোকে তো বলছে, আপনি ঘোড়া চালিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ছিলেন, আপনারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।''

সেলিম বলল, ''নবাব কখনও সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চায় না। আপনি গুলি চালালেন, তাই ঘোড়াটা খেপে গেল।''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বাঃ, ঘোড়াটা হুড়মুড় করে আমার গায়ে এসে পড়বে, আমার হাত-পা ভাঙবে, আমি থামাবার চেষ্টা করব না? এরকম অদ্ভুত কথা কখনও শুনিনি!’’

সেলিম বলল, ‘‘ঘোড়াটা হঠাৎ খেপে গেল বলেই আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। নবাব বংশের কেউ কখনও সাধারণ মানুষদের সামনে ঘোড়া থেকে পড়ে যায় না!’’

কাকাবাবু হাসি চেপে বললেন, ‘‘আপনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছেন, তার কারণ আপনি ভাল করে শেখেননি। নবাব বংশের লোক হলেও ঘোড়া চালানো শিখতে হয়।’’

সেলিম একটু এগিয়ে এসে হাতের চাবুকটা দুলিয়ে বলল, ‘‘মাটিতে নেমে বসুন, ক্ষমা চান। না হলে চাবুক খেতে হবে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যে-নবাব সাধারণ মানুষকে বিনা দোষে চাবুক মারে, তার নবাবি বেশিদিন টেকে না। আপনি নিজেকে নবাব ভাবুন আর নাই-ই ভাবুন, এই অপরাধে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।’’

সেলিম রক্তচক্ষে বলল, ‘‘ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। নামুন মাটিতে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘না।’’

সেলিম এবার সত্যি সত্যি এক ঘা চাবুক কষাল কাকাবাবুর গায়ে!

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আদেশের সুরে বললেন, ‘‘চাবুকটা ফেলে দিন! নইলে আমি গুলি করব!’’

সেলিম হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর সে আবার চাবুক তুলতেই তিনি বাধ্য হয়ে গুলি চালালেন।

তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল।

কাকাবাবু ওকে মারবার জন্য নয়, শুধু চাবুকটা ফেলে দেওয়ার জন্য ওর হাতের মুঠোয় টিপ করে গুলি চালিয়েছিলেন। গুলিটা ঠিক জায়গায় লাগল বটে, কিন্তু সেলিমের কিছুই হল না। বুলেটটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে।

সেলিম আবার হেসে উঠে বলল, ‘‘গোলা গা ডালা! গুলিতে আমার কিছুই হয় না।’’

কাকাবাবু একটুর জন্য হকচকিয়ে গিয়েও রিভলভারের ব্যারেলটা খুলে দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। আগের দিন আমির আলির বাড়িতে

তাঁর রিভলভারটা জমা রাখতে হয়েছিল। সেই সময় আসল গুলিগুলো সরিয়ে খেলনা গুলি ভরে দিয়েছে। তাই রিভলভারটা কেড়ে নেয়নি!

সেলিম আবার চাবুক তুলতেই কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, ''আমাকে ওভাবে মারতে যাবেন না সেলিম! আমার একটা শপথ আছে, কেউ যদি আমার গায়ে হাত তোলে, কিংবা কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করে, তা হলে আমি কোনও না-কোনও সময় গুনে গুনে সেই আঘাত ফিরিয়ে দেব।''

এবার আমির আলিও হেসে ফেললেন।

তিনি বললেন, ''এ আপনি কী বলছেন, রায়চৌধুরীবাবু! আপনি আর প্রতিশোধ নেবেন কী করে? সে সুযোগ তো আর পাবেন না। আপনাকে আমরা মেরে ফেলতে চাইনি। আজ রাত্তিরে আমাদের কাজ মিটে গেলে আপনাকে আবার অজ্ঞান করে কোথাও রেখে দিয়ে আসব। তারপর জীবনে আর আমাদের দেখা পাবেন না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আগেও অনেকেই এই কথা বলেছে। কিন্তু আমি ঠিক বেঁচে ফিরে আসি। কাউকে বিনা কারণে আঘাত করলে উলটে নিজেকেও একসময় সেই আঘাত পেতে হয়, এটা মনে রাখা ভাল।''

সেলিম আবার চাবুক কষাল, কাকাবাবু গুনলেন, ''দুই।''

আবার চাবুক, আবার গুনলেন, ''তিন।''

এবার আমির আলি হাত তুলে বললেন, ''ব্যস, ব্যস! আর দরকার নেই। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি তো আচ্ছা গোঁয়ার! একবার মাপ চেয়ে নিলেই তো পারতেন, তা হলে আর মার খেতে হত না!''

কাকাবাবু বললেন, ''আমার কাছেই ওঁকে মাপ চাইতে হবে, অবশ্যই!''

সেলিম একটা ঘৃণার শব্দ করল, তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, ''কাসেম! কাসেম!''

একজন বন্দুকধারী লোক ঢুকে এল ঘরে।

সেলিম তাকে বলল, ''এই লোকটাকে অন্য ঘরে রেখে দে। দুপুরে কিছু খেতে দিবি না।''

কাসেমের প্রায় দৈত্যের মতো চেহারা। সে কাকাবাবুর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই কাকাবাবু আর বাধা দিলেন না।

কাসেম তাঁকে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ভিতরে ফেলে দিল।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সারাদিন কাকাবাবু বন্দি হয়ে রইলেন সেই ঘরে।

বাথরুমের জানলার গরাদ অনেক পুরনো, ভেঙে ফেলা এমন কিছু শক্ত নয়। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করলেন না। খোঁড়া পায়ে দোতলা থেকে লাফিয়ে নামবেন কী করে? ক্রাচ দুটো নেই। রিভলভারটাও অকেজো। এই অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করারও কোনও মানে হয় না।

তিনি ঠিক করলেন, দেখাই যাক না, কী হয়!

সকালে কফির সঙ্গে ডিম আর কত কী দেবে বলেছিল, সেসব আর এল না। দুপুরেও খাবার দিল না কিছু। তবে একটা থালায় যে অনেকরকম ফল ছিল, কমলালেবু, কলা, আপেল, সেটা সরিয়ে নেয়নি। মাঝে মাঝেই একটা করে ফল খেতে লাগলেন। একটা দিন শুধু ফল খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

দুপুরের দিকে তিনি খানিকটা ঘুমিয়েও নিলেন।

জেগে উঠে জানলা দিয়ে দেখলেন, বাইরের আকাশ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। সারা বাড়িতে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরেও আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধের একটু পরে দরজা খুলে গেল।

সেই বন্দুকধারী কাসেম এসে বলল, "চলো!"

কাকাবাবু বাইরে আসতেই কাসেম তাঁর হাত ধরতে গেল।

তিনি বললেন, "হাত ধরতে হবে না। আমি এমনিই যাচ্ছি।"

লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এই রাইফেলটা কি অটোমেটিক নাকি?"

কাসেম বলল, "চুপ!"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে এরা কত টাকা মাইনে দেয়?"

সে আবার বলল, "চুপ!"

কাকাবাবু বললেন, "ও, মাইনের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, তাই না? বাড়িতে তোমার বউ, ছেলেমেয়ে আছে?"

সে বলল, "আছে!"

এবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। কাকাবাবু আগেই দেখে নিলেন, পাশের ঘরটায় আমির আলি কিংবা কেউ নেই।

কাসেম রাইফেলটা কাকাবাবুর দিকে তাক করে বলল, "আস্তে আস্তে নামো। এদিক-ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, ‘‘পাগল নাকি! আমি এই খোঁড়া পায়ে দৌড়ে পালাতে পারব? আমার কোনও ক্ষমতাই নেই। আমাকে কেন ধরে রেখেছে, তাও জানি না। তুমি কিছু জানো?’’

সে বলল, ‘‘না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুমি হুকুম তামিল করছ মাত্র। ওরা যদি তোমায় হুকুম করে আমায় গুলি করে মেরে ফেলতে, তাও করবে নিশ্চয়ই?’’

কাসেম এবার কাকাবাবুর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, ‘‘ওসব বাজে কথা বন্ধ করো!’’

বাড়ির বাইরে এসে খানিকটা জংলা জায়গা পার হতেই দেখা গেল অনেকটা ফাঁকা মাঠ, পাশে একটা পুকুর।

সেখানে দু’দিকের দুটো খুঁটিতে দাউদাউ করে মশাল জ্বলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন লোক। তাদের পাশে হুইল চেয়ারে বসে আছেন আমির আলি।

ফুটবলের একটা গোলপোস্ট রয়েছে একধারে। তার মাঝখানে গোলকিপারের মতো একজন মানুষ, কিন্তু তার দুটো হাত দু’দিকের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। তার সামনাসামনি খানিকটা দূরে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মতন সেজে দাঁড়িয়ে আছে সেলিম, তার হাতে এখন খোলা তলোয়ার।

দৃশ্যটা প্রায় একটা বধ্যভূমির মতো। একটা-দুটো ক্যামেরা থাকলেই মনে হতে পারত, এসব কিছুই সত্যি নয়। সিনেমা তোলার জন্য সাজানো হয়েছে।

আসলে তো সত্যিই। এখানে সবাইকে দেখিয়ে সেলিম ওই হাত-বাঁধা লোকটিকে খুন করবে।

কাকাবাবু আগে সবদিক ভাল করে দেখে নিলেন।

যে দশ-বারোজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের চেনা মুখ। যে লোকটি হাজারদুয়ারির সিঁড়িতে সই চাইতে এসে ধাক্কা মেরেছিল। যে লোকটি গঙ্গার ধারে এসে দেশলাই চেয়েছিল। এবং হোটেলের মালিক কান্তবাবু। আর যাদের কাকাবাবু চেনেন না, তাদেরও মুখ দেখে মনে হয়, এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমির আলি এ শহরের অনেককেই নিজেদের দলে টেনেছেন।

বন্ধুকধারী কাসেম ছাড়াও রয়েছে আর তিনজন পাহারাদার। তাদের কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। বন্দুক নেই।

হাত-পা বাঁধা লোকটাকে তিনি চেনেন না।

কাকাবাবু প্রথমটায় একটু দমে গেলেন। তাঁর চোখের সামনে একজন মানুষকে খুন করা হবে। তিনি আটকাবেন কী করে? তাঁর রিভলভারটাও অকেজো। এত মানুষের সঙ্গে তিনি একা তো লড়তে পারবেন না।

কাসেম তাঁকে একপাশে বসিয়ে দিল।

এবার সেলিম বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, ‘‘ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কান্ট্রিমেন, এই যে লোকটাকে দেখছেন, এর পূর্বপুরুষের নাম মহম্মদি বেগ। আপনারা জানেন, সে কে!’’

হাত-পা বাঁধা লোকটি চেঁচিয়ে বলল, ‘‘না, না, না!’’

সেলিম আবার বলল, ‘‘বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আমার পূর্বপুরুষ। সেই মহান নবাবকে এই শয়তান মহম্মদি বেগ কী জঘন্যভাবে খুন করেছে তাও আপনারা জানেন। সেই বংশের সবাই শয়তান। এই শয়তানটাকে খুন করে আজ আমি আমাদের বংশের রক্তের ঋণ শোধ করব।’’

হাতবাঁধা লোকটি আবার চেঁচিয়ে বলল, ‘‘আপনারা ভুল করছেন। ভুল করে আমাকে ধরে এনেছেন। মহম্মদি বেগ কে তা আমি চিনিই না। কোনওদিন নাম শুনিনি। সে আমার পূর্বপুরুষ কী করে হবে? আমি মুসলমানও নই, আর্মেনিয়ান। আমার নাম ফিরোজ অ্যারাটুন শাহ!’’

সেলিম বলল, ‘‘তোর মা মুসলমান ছিল। তোর সম্পর্কে সব খবর আমরা জানি। তুই হাজারদুয়ারি থেকে মহম্মদি বেগের ছুরিটা চুরি করেই আরও ফেঁসে গিয়েছিস।’’

ফিরোজ বলল, ‘‘আমি তো ছুরি চুরি করিনি। আমি জীবনে কখনও চুরি-জোচ্চুরি করিনি।’’

সেলিম বলল, ‘‘আলবাত চুরি করেছিস! কেন চুরি করেছিস, তাও বলে দিচ্ছি! লোকে যখন মিউজিয়াম দেখতে যায়, কাচের বাক্সটার মধ্যে ওই ছুরিটার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তখন কেউ না-কেউ মহম্মদি বেগের কুকীর্তির কথা শুনিয়ে দেয়। তখন প্রত্যেকে ঘেন্নায় মুখ কুঁচকোয়। ছুরিটা না দেখলে লোকে ওই লোকটার নামটা ভুলেই যেত! তাই তুই ছুরিটা সরিয়েছিস!’’

ফিরোজ বলল, ‘‘ভুল! সব ভুল! আমি ওসব কিছুই জানি না। ছুরিটা অন্যরা চুরি করে আমার কাছে বিক্রি করেছে। আমি নানা দেশের ছুরি সংগ্রহ করি। আমার কাছে অন্তত দুশো রকমের ছুরি আছে। সেগুলো আমি সাজিয়ে রাখি আমার লন্ডনের বাড়িতে।’’

সেলিম বলল, ‘‘অনেক কথা হয়েছে। আমরা সব জানি। এ সবই তোর মিথ্যে কথা। তোকে আর সময় দেওয়া হবে না।’’

ফিরোজ কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, ‘‘আমায় মারবেন না। আমি নবাব সিরাজকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস করুন, আমি মহম্মদি বেগের বংশের কেউ নই!’’

সেলিম তবু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘এখন দেখুন, এই শয়তানটার শাস্তি। ওকে আমি টুকরো টুকরো করে কাটব!’’

তলোয়ার তুলে সে এক পা এক পা করে এগোতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘এ কী করছেন? এ লোকটির পরিচয় এখনও ঠিকমতো প্রমাণ হল না। যদি ও ওই বংশের কেউ না হয়!’’

সেলিম মুখ ফিরিয়ে ঘৃণার সঙ্গে বলল, ‘‘ইউ শাট আপ!’’

কাকাবাবু তখন স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে গিয়ে একজন প্রহরীর কোমর থেকে তলোয়ারটা এক টানে খুলে নিলেন।

তাঁর মতো একজন খোঁড়া লোক যে এমনভাবে লাফাতে পারেন, তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। প্রহরীটি বাধা দেওয়ারও সময় পেল না।

কাকাবাবু ফিরোজকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘একজন নিরস্ত্র লোককে হাত-পা বেঁধে এইভাবে খুন করা হবে, আর সকলে তাই দাঁড়িয়ে দেখবে? ছিঃ!’’

সেলিম বলল, ‘‘সরে যাও, নইলে তুমি আগে মরবে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ঠিক আছে। লড়ে যান আমার সঙ্গে। তারপর ওকে মারবেন!’’

সেলিম নাক কুঁচকে বলল, ‘‘আমি কোনও খোঁড়া লোকের সঙ্গে লড়ি না। হঠ যাও! যদি মরতে না চাও ...’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমাকে না মেরে ওকে মারতে পারবেন না! খোঁড়া হয়েছি বটে, কিন্তু এ লড়াইয়ের জন্য আমার দুটো হাত আর একটা পা-ই যথেষ্ট!’’

তিনি উলটো দিকে চট করে ঘুরে তলোয়ার চালিয়ে ফিরোজের দু’হাতের দড়ি কেটে দিলেন।

আবার সামনে ফিরে বললেন, ‘‘কই, আসুন!’’

সেলিম বলল, ‘‘তোমাকে এখনই মেরে ফেলার ইচ্ছে আমার ছিল না। তুমি নিজেই যখন মরতে চাও ... কাসেম, এ লোকটাকে গুলি করে শেষ করে দে!’’

কাসেম রাইফেলটা তুলে তাক করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, ছিঃ! আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করার সাহসও তোমার নেই! তুমি আবার নবাব সাজতে চাইছ?

সেলিম পাগলের মতন চিৎকার করে বলল, কাসেম, কাসেম, দেরি করছিস কেন?

আর তখনই একটা সিনেমার মতো কাণ্ড হল।

হঠাৎ শোনা গেল কপাকপ কপাকপ করে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ছুটে আসছে সেই সাদা ঘোড়া। সেটা খুব জোরে আসছে কাকাবাবু আর কাসেমের দিকে। ঘোড়াটার পিঠে সন্তু আর জোজো।

সেলিম অবাক হয়ে বলল, ‘‘আমার দুলদুল, ও চুরি করেছে। ধর, ওকে ধর!’’

কাসেম বন্দুকের নল ঘোরাল ঘোড়াটার দিকে।

সেলিম আবার আর্ত গলায় চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এই, এই, আমার দুলদুলের গায়ে যেন গুলি না লাগে!’’

কাসেম বুদ্ধি করে বন্দুকের নলটা উঁচু করে আকাশে গুলি ছুড়ল।

সেই আওয়াজে ঘোড়াটা থমকে গেল, সামনের দু’পা উঁচু করে ডেকে উঠল।

কিন্তু সন্তু আর জোজো পড়ে গেল না। সন্তু বলল, ‘‘শক্ত করে ধরে থাক।’’

ঘোড়াটা আবার সামনের পা মাটিতে নামাতেই সন্তু এবার আরও জোরে চার্জ করল। একটা খুঁটি থেকে তুলে নিল একটা মশাল। রে রে রে রে চিৎকার করে সে তেড়ে এল কাসেমের দিকে।

এবার কী করবে, তা কাসেমের বুদ্ধিতে কুলোল না, সে ভয় পেয়ে পালাতে গেল। ঘোড়াটা এসে পড়ল তার পিঠের উপর।

সে মাটিতে পড়ে যেতেই কাকাবাবু তার রাইফেলটা কেড়ে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেলিমের বুকে ঠেকিয়ে বললেন, ‘‘এবার তোমার পাগলামির শেষ! তলোয়ারটা ফেলে দাও!’’

সেলিম তবু তলোয়ারটা নিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একটু আগে তুমি আমায় মারতে বলেছিলে। এখন আমি তোমাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারি। যদি এখনও বাঁচতে চাও, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।’’

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন আমির আলি। এবার ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, ‘‘ওরে সেলিম, তলোয়ারটা ফেলে দে! আর আশা নেই।’’

কাকাবাবু অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘‘যার কাছে যা অস্ত্র আছে, সব নামিয়ে রাখো পায়ের কাছে। কেউ এদিক-ওদিক করার চেষ্টা করলেই আগে এই সেলিম মরবে!’’

সন্তু আর জোজো ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল কাকাবাবুর কাছে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘শাবাস সন্তু আর জোজো। দ্যাখ, কার কাছে কী অস্ত্র আছে, সব এক জায়গায় জড়ো কর। কেউ যেন এখান থেকে না পালায়!’’

সন্তু আর জোজো প্রত্যেককে সার্চ করতে লাগল। দেখা গেল, যাদের মনে হয়েছিল বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাদেরও কারও কারও কাছে রয়েছে ছুরি। কান্তবাবুর কোমরে একটা ভোজালি।

সন্তু তাঁকে বলল, ‘‘পুলিশ আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল?’’

জোজো বলল, ‘‘এবার আর সহজে ছাড়বে না। আপনার হোটেল লাটে উঠে যাবে!’’

কাকাবাবু সেলিমকে বললেন, ‘‘তুমি এবার হাঁটু গেড়ে বসো। তোমাকে চাবুক মারা হবে। তিন ঘা। তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব!’’

সেলিম এবার সত্যিকারের পাগলের মতো বিকট গলায় চিৎকার করে বলল, ‘‘ওরে রায়চৌধুরী, তুই আমার কিছুই করতে পারবি না। পুলিশ আমায় ছুঁতে পারবে না। আমি আবার তোকে ধরব। আর ওই মহম্মদি বেগের আওলাদটাকে কুচিকুচি করে কাটব! আমি বাংলার নবাব!’’

ফিরোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল যেন, সে ভয়ে চুপসে গেছে। এবার সে অন্য মূর্তি ধরল।

মাটি থেকে একটা তলোয়ার টপ করে তুলে নিয়ে সেও কর্কশ গলায় বলল, ‘‘সে সুযোগ তোকে আর দেব না সেলিম! আমি সত্যিই মহম্মদি বেগের বংশধর। তিনি ছিলেন একজন বীরপুরুষ। অত্যাচারী সিরাজের গায়ে কেউ হাত তোলার সাহস করেনি, তিনিই শুধু ভয় পাননি। সিরাজ মহম্মদি বেগকে একদিন বলেছিল, রাস্তার কুকুর। তার শোধ তিনি নিয়েছেন। আজও সে অপমান আমরা ভুলিনি। আজ সিরাজের বংশধরকে আমি শেষ করে দেব!’’

তলোয়ারটা নিয়ে সে ছুটে এল সেলিমের দিকে। তার চোখ-মুখ সাংঘাতিক হিংস্র।

কাকাবাবু একটু পিছিয়ে গিয়ে গুলি চালালেন তার দিকে। সে সেলিমের খুব কাছে গিয়েও দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। রক্তের ধারা গড়িয়ে এল।

এই ঘটনায় হঠাৎ আবার বদলে গেল সেলিম। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। সে কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, ‘‘আব্বাজান, এই লোকটা আমাকে মারতে এসেছিল। সত্যি সত্যিই মেরে ফেলত? আর এই রায়চৌধুরীটা, ও আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?’’

এখন তার গলায় আর একটুও অহংকারের ভাব নেই।

আমির আলি কোনও কথা বললেন না।

জোজো শুকনো গলায় বলল, ‘‘কাকাবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনিই ও লোকটাকে মেরে ফেললেন?’’

কাকাবাবু দু’দিকে মাথা নাড়লেন।

তারপর বললেন, ‘‘আমার টিপ এখনও খারাপ হয়নি। আমার গুলি ওর হাতের চামড়া ঘেঁষে গিয়েছে, লাগেনি। ও ভয়ের চোটে ওরকমভাবে পড়ে আছে।’’

জোজো বলল, ‘‘অনেক রক্ত গড়াচ্ছে যে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওর হাতে তলোয়ার ছিল, তাতেই বোধহয় খোঁচাটোঁচা লেগেছে! ওকে উলটে দিয়ে দ্যাখ তো!’’

সন্তু আর জোজো গিয়ে ফিরোজকে উলটে দিতেই দেখা গেল, সে চোখ পিটপিট করছে। তার থুতনিটা কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে, গুলিটুলি সত্যিই লাগেনি।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এ লোকটাও তো দেখছি খানিকটা পাগল। জানিস তো, যাদের মধ্যে পাগলামি থাকে, তারা আসলে ভিতু হয়। এমনিতে দাঁত কিড়মিড় করে সাহস দেখায়, কিন্তু একটা হঠাৎ ধাক্কা খেলে ভয়ে কাঁপে। সেলিমকে দ্যাখ না, অত চ্যাঁচামেচি করছিল, এখন মনে হচ্ছে, ওর মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই!’’

রাইফেলটা তুলে সবাইকে তিনি বললেন, ‘‘যে যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। কেউ নড়বে না। সবাইকে থানায় যেতে হবে।’’

বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, দেশলাই-চাওয়া লোকটি দৌড় মারবার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু গুলি চালালেন তার পা লক্ষ্য করে। একটা গুলি তার পায়ে লেগেছে। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

কাকাবাবু তার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে সন্তুকে বললেন, ‘‘থানায় খবর দিতে হবে। এখানে কারও কাছে মোবাইল ফোন নেই?’’

জোজো বলল, ‘‘হোটেলওয়ালা কান্তবাবুর কাছে একটা দেখেছি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সেটা নিয়ে এসো। নম্বরটাও জেনে নিয়ো ওর কাছে।’’

জোজো ছুটে গেল।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তুই একেবারে ঠিক সময় এসে হাজির হলি কী করে রে?’’

সন্তু বলল, ‘‘সেটা বেশ মজার ব্যাপার। আমি বেশি কিছু না ভেবেই সেলিমসাহেবের ঘোড়াটা চুরি করেছিলাম। খানিকক্ষণ ঘোড়া ছোটালাম গঙ্গার ধারে। এক-একবার দেখি কী, ঘোড়াটার রাশ আলগা করলেই সেটা নিজে নিজে একদিকে যাচ্ছে। বাঁক নিচ্ছে। তখন আমার মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছি, ঘোড়ার পিঠে যদি অন্য কেউ চাপে, আর সে যদি জোর না করে, তা হলে ঘোড়া তার মনিব যেখানে আছে, সেখানে চলে যায়। তাই আমি ভাবলাম, দেখা যাক তো, ওর মনিব কোথায় আছে। এখানে এসে পৌঁছোলাম খানিকটা আগে। গাছের আড়ালে অপেক্ষা করছিলাম। এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখে বুঝতে পারছিলাম না, কী করা যায়। যখন দেখলাম, একটা লোক তোমাকে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করতে যাচ্ছে, তখন আর কোনও কিছু চিন্তা না করে এদিকে ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একেবারে ঠিক ঠিক সময়ে এসে গিয়েছিস। সত্যি কথা কী জানিস সন্তু, এবারে আমি একটুখানি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি নিজেও বাঁচব না। ওই ফিরোজকেও বাঁচাতে পারব না। তরোয়াল দিয়ে কি রাইফেলের গুলি আটকানো যায়!’’

জোজো মোবাইল ফোনটা নিয়ে এসে বলল, ‘‘কাকাবাবু, হোটেলওয়ালা একটা নম্বর বলেছে থানার। ঠিক কিনা কে জানে। চেষ্টা করে দেখব?’’

কাকাবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই আমির আলি জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘রায়চৌধুরীবাবু, আমি একটা কথা বলতে পারি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, বলুন!’’

আমির আলি বললেন, ‘‘আপনি কি সত্যি সত্যি আমাদের থানায় নিয়ে যাবেন?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এর মধ্যে মিথ্যেমিথ্যির কী আছে? মানুষকে খুন

করা দারুণ অপরাধ। খুনের চেষ্টাও অপরাধ। আপনার ছেলে সেলিম আর ফিরোজ, ওরা দু'জনেই খুন করতে গিয়েছিল। ওদের তো শাস্তি পেতেই হবে। আর আপনারা, খুনের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যও অপরাধী, আইনের চোখে। এখন আইনই আপনাদের শাস্তি দেবে!''

আমির আলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

ধরা গলায় তিনি বললেন, ''আমাদের বনেদি, খানদানি বংশ। সাধারণ অপরাধীদের মতো আমাদের থানায় আটকে রাখবে, এর চেয়ে আমার মরে যাওয়াও ভাল ছিল।''

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, ''আমির আলি সাহেব, আপনাদের ভাল বংশ, অনেক টাকা, ব্যবহারও ভদ্র। তবু আপনি এরকম একটা খুনকে সমর্থন করেছিলেন? আপনার ছেলের পাগলামির রোগ, ওর চিকিৎসা করা উচিত ছিল! তার বদলে আপনি ওকে প্রশ্রয় দিয়ে ওরই ক্ষতি করেছেন। এ যুগে কেউ রাজা কিংবা নবাব হতে চায়, সেটা কি সম্ভব? আড়াইশো বছর আগের ঘটনা নিয়ে কেউ প্রতিশোধ নিতে চায়? এটা পাগলামি ছাড়া আর কী? ওর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পাগল হয়েছিলেন?''

আমির আলি বললেন, ''হয়তো তাই। আমারও মাথার ঠিক ছিল না। এখানকার অনেক লোক একটা কথা বলেছিল, আপনি যেখানে থাকবেন, সেখানেই একটা কিছু গন্ডগোল হবে!''

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, ''না, মোটেই তারা ঠিক কথা বলেনি। যদি অন্যায়, অপরাধ কিছু না ঘটে, সেখানে তো আমি গন্ডগোল করি না। চুপচাপ থাকি। কিন্তু চোখের সামনে যদি কিছু অন্যায় ঘটতে দেখতে পাই, তখন তো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবই। আপনি তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, এটা জানেন না, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, এরা দু'জনেই সমান অপরাধী। আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না।''

আমির আলি বললেন, ''তাও ঠিক। একটা অনুরোধ করব আপনাকে? আমাকে থানায় দেওয়ার বদলে আপনি এখানেই আমাকে একটু গুলি চালিয়ে মেরে ফেলুন। আমি হার্টের রুগি, আমি এখন মরে গেলেও ক্ষতি নেই। তার বদলে আপনি আমার ছেলে সেলিমকে ছেড়ে দিন।''

কাকাবাবু বললেন, ''আপনি জানেন না। অনেকেই জানে না, আজ পর্যন্ত আমি একজন মানুষকেও মারিনি। চরম বিপদের মধ্যে পড়েও আমি কাউকে একেবারে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারি না। আপনার ছেলের প্রাপ্য

আছে, তিন ঘা চাবুক। আর জেলখাটার শাস্তি। আপনি আমাকে এখনই কথা দিন যে, কোনও এক সময় আপনি নিজেই ওকে তিন ঘা চাবুক মারবেন, তা হলে আমি আর নিজের হাতে সেই শাস্তি দেব না। আর জেলখাটার ব্যাপারটা ... কী করা যায় বল তো সন্তু?''

সন্তু বলল, ''সেলিম আর ফিরোজ যদি দু'জনে দু'জনের কাছে ক্ষমা চায়, তা হলে ওদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তাই না রে জোজো?''

জোজো বলল, ''ওরা হাতে হাত মিলিয়ে ভেউভেউ করে কাঁদুক!''

কাকাবাবু এবার হেসে বললেন, ''ভেউভেউ শব্দ করে সকলেই তো কাঁদে না। তবে হাতে হাত মেলাবার ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমির আলি সাহেব, আপনিই দেখুন, যদি ব্যবস্থা করতে পারেন।''

সেলিম আর ফিরোজ একটু দূরে দূরে মাটিতে এলিয়ে শুয়ে আছে।

আমির আলি সাহেব তাদের কাছে গিয়ে কী যেন বললেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে জানালেন, ''নাঃ, ওরা রাজি নয়, আমার কথা শুনবে না।''

কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, সেলিম, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে না। এবারে তোমাকে গুনে গুনে তিন ঘা চাবুক খেতে হবে। তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। সেখানে তুমি ছিঁচকে চোর আর পকেটমারদের সঙ্গে জেলে থাকবে! পুলিশ যাতে তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে না দেয়, তা আমি দেখব। সে ক্ষমতা আমার আছে!

সেলিম এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, এখন কাঁদলেও ক্ষমা পাবে না।

অন্য লোকটার দিকে ফিরে তিনি বললেন, ফিরোজ, তোমাকে আমি নির্দোষ ভেবে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি, তুমিও একজন খুনি! তা হলে জেলেই কাটাও বাকি জীবন।

ফিরোজ গড়িয়ে এসে কাকাবাবুর পা ধরে বলল, আমায় ক্ষমা করুন। আমি বাঁচতে চাই।

কাকাবাবু পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার কাছে ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। দু'জনে দু'জনের নামে ক্ষমা চাও।

সেলিম আর ফিরোজ উঠে বসে প্রথমে পরস্পরের হাত ধরল, তারপর দু'জনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

কাকাবাবু বললেন, ''ব্যস, ব্যস, মুখে আর কিছু বলবার দরকার নেই।''

অন্য পাশে ফিরে তিনি বললেন, ''আমির আলি সাহেব, আপনারা এখানে একটা খুনের দৃশ্য দেখতে এসেছিলেন। তার বদলে, দু'জন মানুষের ক্ষমা করার দৃশ্য অনেক সুন্দর নয়? আমি এমন চমৎকার দৃশ্য বহুদিন দেখিনি!''

মেঘ সরে গিয়ে এখন জ্যোৎস্না ফুটেছে আকাশে। তার মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুলদুল ঘোড়াটা।

কাকাবাবু বললেন, ''দ্যাখ, দ্যাখ সন্তু, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওই সাদা ঘোড়াটাকে। ও যেন পৃথিবীতে হিংসে, রাগ, খুনোখুনির ব্যাপার কিছুই জানে না!
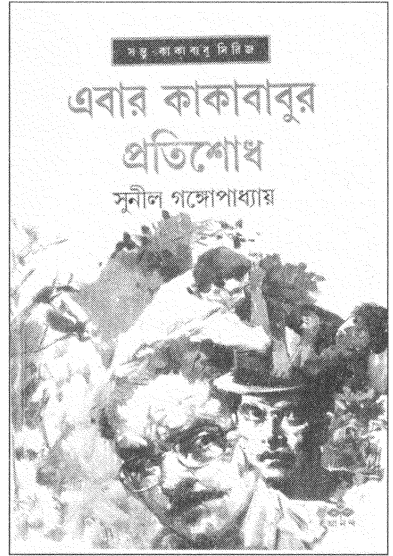
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ

সকালবেলা কাকাবাবু দাঁতটাত মেজে বাথরুম থেকে বেরোতেই রঘু ফিসফিস করে বলল, ‘‘আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন, নীচের ঘরে বসে আছেন। খুব বড়লোক।’’ কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘‘এত সকালে? তোকে বলেছি না, ন’টার আগে কাউকে ভিতরে বসাবি না?’’ রঘু বলল, ‘‘কী করব, দেখে যে মনে হল ভ্যাইপি! গম্ভীর গলা। এলেবেলে লোক হলে দরজাই খুলতাম না! ইনি খুব দামি সুট পরা।’’

রঘু আজকাল মাঝে মাঝেই ইংরেজি শব্দ বলে। তার নিজস্ব উচ্চারণে। আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, ‘‘দামি সুট দেখেই তুই বুঝে গেলি ভি আই পি? অনেক চোর-ডাকাতও দামি পোশাক পরে! ধুতি কিংবা পাজামা পরা লোক বুঝি ভি আই পি হয় না?’’

রঘু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘‘আজ্ঞে তাও হয়। এই তো আমাদের শিপ মিনিস্টার ধুতি পরা!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ভি আই পি হোক বা যাই-ই হোক, এখন আমি কথা বলতে পারব না। বলে দে, ন’টার পর আসতে।’’

রঘু কাঁচুমাচুভাবে বলল, ‘‘স্যার, আপনি তো নীচে নামবেনই, আপনিই বলে দিন না!’’

রঘু আগে বলত ‘বাবু’, এখন বলতে চায় ‘স্যার’। কাকাবাবু অনেকবার বারণ করেছেন, স্যার বলতে হবে না, তাও সে শুনবে না।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কেন, তুই লোকটিকে ভয় পাচ্ছিস নাকি? ঠিক আছে, যা। চা-টা দিসনি তো? তা হলে আবার দেরি হবে।’’

রঘু জিভ কেটে বলল, ‘‘আপনার বাথরুম থেকে বের হতে দেরি হচ্ছিল, তাই চা দিয়ে ফেলেছি। বিস্কুটও দিয়েছিলাম, বললেন, ‘লাগবে না!’’’

রঘু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু পোশাক বদলাতে লাগলেন।

সারা বাড়িতে আর কেউ জাগেনি। কাল এক বিয়েবাড়িতে বাড়ির সকলের নেমন্তন্ন ছিল, ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। সন্তু এখনও ঘুমোচ্ছে, আজ ওর কলেজের ছুটি। যতই রাত জাগুন, কাকাবাবুর ঠিক ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। রোদ উঠবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। অনেক দিনের অভ্যেস।

নীচে নেমে এসে কাকাবাবু দেখলেন, একজন লোক সোফায় বসে কাগজ পড়ছে।

লোকটির দশাসই চেহারা। লম্বায় ছ’ফিট তিন-চার ইঞ্চি তো হবেই। রঘুর কথামতো, পরনের সুটটা খুব দামি ঠিকই। পায়ের কালো রঙের জুতো এমনই চকচকে পালিশ করা যে, মনে হয়, যেন মুখ দেখা যাবে। গায়ের রং বেশ ফরসা, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, মুখে পুরুষ্টু গোঁফ। প্রথম দেখেই মনে হয়, লোকটি পুলিশ কিংবা আর্মির অফিসার।

কাকাবাবুকে দেখেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘‘গুড মর্নিং মিস্টার রায়চৌধুরী।’’

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, ‘‘নমস্কার।’’

লোকটির গলার আওয়াজ খুব ভরাট আর গম্ভীর। কিন্তু খুব বিনীতভাবে বলল, ‘‘আমি খুব সকালে এসে পড়েছি। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এই সময় তো আমি কোনও দরকার নিয়ে আলোচনা করি না।’’

লোকটি বলল, ‘‘আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বেশি বা কম সময়ের প্রশ্ন নয়, প্রত্যেকদিন আমি মর্নিং ওয়াকে যাই। সেখান থেকে ফেরার আগে আমি কোনও কাজের কথা পছন্দ করি না।’’

লোকটি বলল, ‘‘মর্নিং ওয়াক খুব ভাল অভ্যেস। আমিও যদি যাই আপনার সঙ্গে? হাঁটতে হাঁটতে আমার কথাটা সেরে নেব।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আপনি ন’টার পর ঘুরে আসুন না।’’

লোকটি বলল, ‘‘আমি কাল লেট নাইটে কলকাতায় পৌঁছেছি। আজই

দিল্লি ফিরে যেতে হবে। সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছোতে হবে এয়ারপোর্টে। শুধু আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।''

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ''ঠিক আছে। চলুন।''

বাইরে একটা সাদা রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক হোটেলে এই ধরনের গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

লোকটি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, ''আপনি কত দূরে যাবেন?''

কাকাবাবু হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ''বেশি দূরে না। ওই যে পার্কটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই চারপাশে ঘুরি কয়েকবার।''

লোকটি তার গাড়ির ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে বলল, ''ঠিক আছে, চলুন, মিস্টার রায়চৌধুরী।''

ক্রাচ বগলে নিয়ে রাস্তায় নেমে কাকাবাবু বললেন, ''শুনুন, প্রথমেই বলে রাখি, কোনও চুরি-ডাকাতির ব্যাপার যদি হয়, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব না। ওসব পুলিশের কাজ।''

লোকটি বলল, ''না, না, সেরকম কিছু নয়। কোনও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করতে আসিনি। আপনি ব্যস্ত মানুষ, আমি জানি।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি এমন কিছু ব্যস্ত নই। মাঝে মাঝে আমি দু'-একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাই বটে, তাও নিজের শখে। টাকার জন্য ডিটেকটিভগিরি করা আমি মোটেও পছন্দ করি না। ওসব আমি পারি না। বেশির ভাগ সময় আমি নিজের ইজ়িচেয়ারে শুয়ে বই পড়তে ভালবাসি।''

লোকটি বলল, ''আপনি অনেক বই পড়েন, আপনি খুব জ্ঞানী মানুষ, তাও আমি জানি। আমার অবশ্য বইটই পড়ার অভ্যেস নেই। নিউজ়পেপারও পড়ি না। তবে, টিভিতে নিউজ দেখি।''

কাকাবাবু বললেন, ''আপনি বেশ ভালই বাংলা বলছেন। কিন্তু আপনি বাঙালি নন, তাও বুঝতে পারছি। আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কোথায়? কলকাতায় বাড়ি?''

লোকটি বলল, ''আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি বাঙালি নই। তবে, আমার বাবা কাজ করতেন কলকাতায়, তখন আমি কলকাতায় থেকেছি। আমার ন'বছর বয়স পর্যন্ত। আমাদের কলকাতায় বাড়ি ছিল ভবানীপুরে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলেছি। সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুলে পড়েছি। সেই তখনই যে বাংলা শিখেছিলাম, তা ভুলিনি একটুও।

সেই ন'বছর বয়সের পর কলকাতা ছেড়ে যাই। তারপর দু'বার কলকাতায় এসেছি, তাও দু'-একদিনের জন্য মাত্র। এতদিন পরেও বাংলা ঠিক মনে আছে।''

পার্কের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার নামটাই তো এখনও জানা হয়নি।''

লোকটি মুখ নিচু করে বলল, ''হ্যাঁ, আমার নাম জানানো হয়নি। নাম বলার একটু অসুবিধে আছে।''

কাকাবাবু থমকে গিয়ে অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, ''নাম বলার অসুবিধে আছে? অথচ আপনি আমার সঙ্গে কাজের কথা বলতে এসেছেন?''

লোকটি বলল, ''কাজের কথা তো বলতে আসিনি। একটা বিষয় নিয়ে শুধু কথা বলতে এসেছি।''

কাকাবাবু কোনওরকমে বিরক্তি চেপে রেখে বললেন, ''কোনও বিষয়টিষয় জানার আগ্রহ আমার নেই। যে লোক নিজের নাম জানায় না, তার কাছ থেকে আমি অন্য কিছু জানতে যাব কেন?''

লোকটি বলল, ''আচ্ছা, ধরে নিন, আমার নাম ধ্যানচাঁদ।''

কাকাবাবু আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, ''ধরে নেব? কেন, ধরে নিতে যাব কেন? তার মানে, এটা আপনার আসল নাম নয়। ধ্যানচাঁদ তো ছিল এককালের এক বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়ের নাম!''

লোকটি বলল, ''ঠিক বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে একটা খেলার বিষয়েই কথা বলতে এসেছি। সেই জন্যই ওই নামটা নিলাম।''

কাকাবাবু এবার বিরক্ত হওয়ার চেয়েও অবাক হলেন বেশি। ভুরু কুঁচকে বললেন, ''খেলা? মশাই, আপনি কি আমার সঙ্গে সকালবেলা ইয়ারকি করতে এসেছেন?''

লোকটি এবার গোঁফের ফাঁকে সামান্য হেসে বলল, ''না, ইয়ারকি মোটেই নয়, খুবই সিরিয়াস ব্যাপার! পুরোটা শুনলে বুঝবেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''আর কিছুই আমি শুনতে চাই না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে! আচ্ছা মিস্টার ধ্যানচাঁদ, আপনি ওসব খেলাটেলার কথা অন্য কাউকে গিয়ে বলুন। আমি এখন একা থাকতে চাই।''

ধ্যানচাঁদ বলল, ''অন্য কারও কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। খেলাটা হবে আপনার সঙ্গে আমার।''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কী মুশকিল! বললাম না, ছেলেমানুষি খেলাটেলার বয়স আমার নেই।’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘ছেলেমানুষি ব্যাপার তো নয়, এটা একেবারেই বড়দের খেলা। আর এ-খেলাটা আপনাকে খেলতেই হবে!’’

একটা বকুলগাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, ‘‘কী ব্যাপার বলুন তো? সকালবেলায় এসে আপনি আমায় কী খেলাটেলার কথা বলছেন? আমি তাতে রাজি না হলেও আমাকে খেলতেই হবে কেন? জোর করে আমায় খেলাবেন?’’

ধ্যানচাঁদ নিচু গলায় বলল, ‘‘জোর করার প্রশ্ন নেই। খেলতে আপনি বাধ্য। নইলে আপনি খুন হয়ে যাবেন! আপনাকে আমি খুন করতে চাইব, আপনি বাঁচার চেষ্টা করবেন, অথবা আমাকে মারতে চাইবেন, এটাই হচ্ছে খেলা। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনাকে খেলতেই হবে।’’

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ। কেউ কেউ কাকাবাবুকে রোজই দেখেন বলে হাত তুলে নমস্কার জানাচ্ছেন। বকুলগাছটা থেকে টুপটাপ করে ঝরে যাচ্ছে একটা একটা ফুল। বাতাস বেশ ঠান্ডা। এরই মধ্যে একটা লোক শান্ত গলায় বলল খুন করার কথা!

কাকাবাবু একটুও বিচলিত হলেন না। এর আগেও কয়েকজন তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। একজন তো পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল, তবু বেঁচে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আপনি আমাকে মারতে চাইবেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনিই না। কখনও আগে দেখিনি। তবে কি কখনও না জেনে আপনার কোনও ক্ষতি করেছি?’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘আপনার রামকুমার পাধির কথা মনে আছে?’’

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘‘রামকুমার পাধি? এরকম নাম কখনও শুনেছি বলেও মনে হয় না।’’

ধ্যানচাঁদ জোর দিয়ে বলল, ‘‘হ্যাঁ শুনেছেন। আপনার মনে না-ও থাকতে পারে। শুনেছেন ঠিকই। ভোপালের ভীমবেটকার কথা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ভীমবেটকা? সেটা তো একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গা। পাহাড়ের গায়ে অনেক গুহা আছে। সেখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি। কেন, সেখানে কিছু হয়েছে নাকি?’’

ধ্যানচাঁদ বলল, "এখন কিছু হয়নি। তবে, কয়েক বছর আগে সেখানেই এক রাত্তিরে আপনি রামকুমার পাধিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ও, সেই ডাকাতটা? যে তিনজন ইতিহাসের পণ্ডিতকে গলা কেটে খুন করেছিল? ওরে বাবা, সে তো শুনেছি সাংঘাতিক ডাকাত। সেসময় একটা গুজব রটেছিল যে, ভীমবেটকার একটা গুহার মধ্যে প্রচুর গুপ্তধন আছে। সেই গুপ্তধন খোঁজার জন্য প্রচুর লোক নেমে পড়ে, অনেক খুনোখুনি হয়। তারপর..."

ধ্যানচাঁদ বলল, "বাকিটা আমি বলছি। তারপর আপনার বুদ্ধিতেই এক রাতে সকলে ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে ছিল ওই রামকুমার পাধি। যে এক কুখ্যাত ডাকাত।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই ডাকাতটাকে আমি চিনতাম না। পুলিশ শনাক্ত করেছে।"

ধ্যানচাঁদ জিজ্ঞেস করল, "তারপর সেই ডাকাতটার কী হল?"

কাকাবাবু অস্থির হয়ে বললেন, "সকালবেলা এসে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করার কী মানে হয়? সে তো পাঁচ-ছ' বছর আগেকার ব্যাপার, সব চুকেবুকে গিয়েছে। সে ডাকাতটার কী হয়েছে, তা আমি কী করে জানব? তার নামে অনেক কেস ছিল, ফাঁসি হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি তো আর সেখানে ডাকাত ধরতে যাইনি, সেটা আমার কাজও নয়। ভীমবেটকায় ইতিহাসের খুব মূল্যবান সব চিহ্ন আছে। গুপ্তধন খোঁজার নামে কেউ যাতে সেগুলো নষ্ট না করে, সেটা আটকাতেই গিয়েছিলাম আমি। তখন যারা ধরা পড়েছে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। আমি আর কিছু জানি না।"

ধ্যানচাঁদ কঠোরভাবে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমি আজেবাজে কথা বলতে আসিনি। রামকুমার পাধির ফাঁসি হয়নি, জেলের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল, তা আপনি অবশ্যই জানেন। তখনকার কাগজে আপনার মতামতও ছাপা হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। সেই ডাকাতটা জেলের মধ্যেই আত্মহত্যা করে। আমি বলেছিলাম বটে যে, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আরও অনেক খবর জানা যেত।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "না, মোটেই সে আত্মহত্যা করেনি। তাকে পুলিশরা পিটিয়ে মেরে ফেলে, তারপর তার লাশটা একটা দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। তাতেই বলা হয় যে, সে আত্মহত্যা করেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতেও পারে। পুলিশরা এরকম কাজ অনেক সময় করে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনি যে আজ খুনোখুনির খেলার কথা বলছেন, তার কী সম্পর্ক বলুন তো? এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।"

ধ্যানচাঁদ এবার কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। সেটা একটা ইংরেজি খবরের কাগজের কাটিং। কাকাবাবুর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা পড়ুন!"

কাকাবাবু দেখলেন খবরটা। হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি শহরে দিনেরবেলা প্রকাশ্য রাস্তায় তিনজন লোক মোটরসাইকেলে চেপে এসে একজন লোককে পরপর ছ'টা গুলিতে ফুঁড়ে দেয়। লোকটি একটা চায়ের দোকানে বসে ছিল। সে কোনও বাধাই দিতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আততায়ীরা পালিয়ে যায়, কেউ তাদের ধরার চেষ্টাও করেনি। মৃত লোকটির পরিচয় জানা গিয়েছে। সে একজন দাগি আসামি। তার নামে অনেক খুন ও ডাকাতির মামলা ঝুলছিল। তার নাম রামকুমার পাধি। তার কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

কাকাবাবু কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ধ্যানচাঁদ বলল, "তারিখটা লক্ষ করেছেন? মাত্র তেইশ দিন আগের ঘটনা। একই লোক কি দু'বার মারা যেতে পারে?"

কাকাবাবু বললেন, "তবে কি ওই ডাকাতটা জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল?"

ধ্যানচাঁদ বলল, "না, মোটেই না! জেলখানাতেই তার মৃত্যু হয়েছিল। সে রেকর্ড আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে কি এক নামে দু'জন লোক? তা তো থাকতেই পারে।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "না, সে ব্যাপারও নয়। এই তেইশ দিন আগে মাণ্ডিতে যে রামকুমার পাধি মারা গিয়েছে, সেই আসল ডাকাত রামকুমার। তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আর জেলখানার মধ্যে যাকে মারা হয়েছে, তার নাম মোটেই রামকুমার ছিল না। তার নাম ছিল সুরজকান্ত। সে মোটেই ডাকাতও ছিল না। পুলিশ কিছুতেই তা মানতে চায়নি, তাকেই রামকুমার সাজিয়ে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছে।"

এ-পাড়ারই দুটি ছেলে কাকাবাবুকে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবু

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নেওয়া পছন্দ করেন না, তা ওরা জানে। তাই হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে একজন জিজ্ঞেস করল, ‘‘কাকাবাবু, আপনি এই শনিবার থাকছেন তো? ঠিক আসবেন কিন্তু।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কোথায়? কী আছে শনিবার?’’

অন্য ছেলেটি বলল, ‘‘আপনার বাড়িতে কার্ড দিয়ে এসেছি। এই শনিবার আমাদের নাটক আছে। আপনি চিফ গেস্ট।’’

কাকাবাবু হেসে বললেন, ‘‘নাটকের আবার চিফ গেস্ট কী? ঠিক আছে, সময় পেলে দেখতে যাব, কিন্তু আমি স্টেজে উঠব না।’’

ছেলে দুটি আরও কিছু বলতে গেল, কাকাবাবু তাদের কাটিয়ে দিলেন।

ধ্যানচাঁদ অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার সে বলল, ‘‘চলুন, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।’’

ওঁরা দু’জনেই হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু দু’জনেই চুপ।

আর-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, ‘‘হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন, আসল ডাকাতের বদলে পুলিশ সুরজকান্ত নামের একজন নির্দোষ লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তা যদি হয়, সেটা খুবই অন্যায় হয়েছে। এ-বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন তো? পুলিশের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।’’

কাকাবাবুর চোখের দিকে চোখ রেখে ধ্যানচাঁদ কেটে কেটে বলল, ‘‘সেই সুরজকান্ত আমার ভাই। আমার নিজের ভাই।’’

কাকাবাবু একটু চমকে উঠে বললেন, ‘‘আপনার ভাই? আমি খুবই দুঃখিত! আমি আপনাকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘আমি কারও সিমপ্যাথি চাই না। আমার ভাই জীবনে কোনও অন্যায় করেনি। পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট ছিল। সে ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করত। সে ভীমবেটকায় কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি, গুপ্তধন খুঁজতেও যায়নি। সে ওখানকার গুহাগুলোতে যে প্রি-হিস্টোরিক আমলের ছবি আছে, সেই সব ছবির একটা লিস্ট তৈরি করার জন্য ভীমবেটকায় প্রায়ই যেত।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘গুহার ছবির লিস্ট করার জন্য সে রাত্তিরবেলা যেত? সেখানে তো কোনও আলো ছিল না। পাহাড় আর জঙ্গল!’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘তার কাজের সুবিধের জন্য সে রাত্তিরবেলা যাবে কি

দিনেরবেলা যাবে, তা সে নিজে ঠিক করবে। কেন, সেখানে রাত্তিরে যাওয়ার জন্য কি কোনও নিষেধ ছিল?''

কাকাবাবু বললেন, ''না, তা অবশ্য ছিল না। তখন কোনও পাহারাও দেওয়া হত না।''

ধ্যানচাঁদ বলল, ''মোট কথা, আমার ভাই ক্রিমিনাল ছিল না। সেই রাতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে প্রথমেই নটোরিয়াস ক্রিমিনাল রামকুমার পাধি বলে দাগিয়ে দেয়। সে হাজার বার অস্বীকার করেছে, তবু পুলিশ মানেনি। পুলিশ তো অনেক সময় এরকমই করে। কোনও নির্দোষ লোকের ঘাড়ে একটা মিথ্যে দোষ চাপিয়ে তারপর তাকে মেরে ফেলে।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই সব পুলিশের বিচার হওয়া উচিত। আপনার ভাইয়ের এরকম মৃত্যুর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত!''

ধ্যানচাঁদ গম্ভীরভাবে বলল, ''আপনি শুধু দুঃখিত হলে তো চলবে না। আমার ভাইকে খুন করার জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে!''

কাকাবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, ''আপনার ভাইকে আমি খুন করেছি? এ কী অদ্ভুত কথা! শুনুন মিস্টার ধ্যানচাঁদ, আমি জীবনে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু কখনও আত্মরক্ষার জন্যও একটা মানুষ মারিনি। কয়েকবার দু'-একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ক্রিমিনাল একেবারে আমাকে সামনাসামনি মারতে এসেছে, তখনও আমি তাদের বুকে গুলি চালাইনি। হাতে কিংবা পায়ে মেরেছি, তারা কেউ মরেনি। মানুষ মারা আমার কাজ নয়। আপনার ভাইকে তো আমি চিনতামই না, আজই আপনার মুখে তার নাম প্রথম শুনলাম।''

ধ্যানচাঁদ বলল, ''তবু তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনিই দায়ী।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই রাতে ভীমবেটকার একটা গুহায় গুপ্তধনের লোভে একদল লোক হামলা করবে, এ-খবর আমি জেনেছিলাম। তাই আমি গ্যাস বোমা ফাটিয়ে সেখানে যারা ছিল, অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম সকলকে। আট-দশ জন, তাদের মধ্যে একজন সাধুও ছিল। পুলিশ অজ্ঞান অবস্থাতেই তাদের তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কে ক্রিমিনাল আর কে নির্দোষ, তা প্রমাণ করা পুলিশের কাজ। আপনার ভাইকে রামকুমার পাধি বলে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। আমি কিছুই বলিনি, আমি কিছু জানতামও না তার সম্পর্কে।''

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘এ সবই ঠিক, আমি জানি। তবু আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের ফ্যামিলিতে একটা নিয়ম আছে। আমাদের ফ্যামিলির কোনও লোককে যদি কেউ খুন করে, তা হলে সেই খুনিকে কিংবা খুনির ফ্যামিলির কোনও একজনকে না মারতে পারলে আমাদের শান্তি নেই।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ব্লাড ফর ব্লাড? আরব দেশে এরকম প্রথা ছিল। খুব খারাপ, বর্বর প্রথা। এ ফ্যামিলির একজন অন্য ফ্যামিলির একজনকে খুন করবে, তারপর সেই ফ্যামিলির একজন আবার এ ফ্যামিলির একজনকে, আবার এ ফ্যামিলি থেকে আর-একজন প্রতিশোধ নেবে, এরকম তো চলতেই থাকবে! পরপর খুনোখুনি! এ-যুগে এসব চলে নাকি? এখন আইন-আদালত আছে, বিচারের ব্যবস্থা আছে...’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘বিচার অনেক সময় ভুল হয়। প্রমাণের অভাবে অনেক ডাকাত কিংবা খুনিও ছাড়া পেয়ে যায়। মিস্টার রায়চৌধুরী, সেই জন্যই তো আমি আপনাকে সব কথা আগে থেকে জানিয়ে রাখছি। আপনাকে আত্মরক্ষার পুরো সুযোগ দিচ্ছি। আমি ভদ্রলোক, আপনাকে কখনও পিছন দিক থেকে এসে মারব না। লড়াই হবে সামনাসামনি। আপনি যদি আমাকে আগেই মেরে দিতে পারেন, তা হলে আর আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের ফ্যামিলি থেকে আর কেউ আপনাকে মারতে আসবে না। লাইক আ স্পোর্টসম্যান, আমরা হার-জিত মেনে নেব। তা হলে কাল থেকে শুরু হোক আমাদের ডেথ-ডেথ খেলা!’’

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘না, আমি রাজি নই! এই ধরনের খেলা খেলে অশিক্ষিত, অসভ্য লোকেরা! তা ছাড়া আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি কোনওভাবেই দায়ী নই!’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘আপনার পজিশন হচ্ছে নম্বর থ্রি। এক নম্বর দায়ী হচ্ছে সেই পুলিশ অফিসার, যে আমার ভাইয়ের নামে মিথ্যে দোষ চাপিয়েছিল। তার নাম মহিম পান্ডে। তার উপরেই প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে গত বছর একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। আর যে-লোকটা জেলের মধ্যে আমার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করেছিল, তার নাম সুলতান আহমেদ। সে আরও কয়েকবার এই কাণ্ড করে যাচ্ছিল, একবার ধরা পড়েছে। সে এখন দশ বছরের জন্য জেল খাটছে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা হলে তো তার শাস্তি হয়েছেই!’’

ধ্যানচাঁদ বলল, "ও শাস্তির কোনও মানেই হয় না। কোনও পুলিশের লোকের যখন জেল হয়, সে জেলের মধ্যে দিব্যি আরামে থাকে। ভাল খাবারদাবার পায়। অন্য পুলিশরা তাকে সাহায্য করে। ওকে শাস্তি দিতে হলে আমাদের আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। সেই জন্য আমাদের ফ্যামিলির লোকজন ঠিক করেছে, রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য মরতে হবে আপনাকেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি মরার জন্য ব্যস্ত নই। অন্য কাউকে মারতেও চাই না! ব্যস, কথা শেষ! গুড বাই।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "আমাকেও এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। আর বেশি সময় নেই। মিস্টার রায়চৌধুরী, আমার কথাগুলো হালকাভাবে নেবেন না। এ-খেলা আপনাকে খেলতেই হবে, না হলে আপনার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না কেউ। আজ বারো এপ্রিল। খেলা শুরু কাল থেকে। মে-জুন-জুলাই-অগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এ ছ'মাস চলবে এই খেলা। তার মধ্যে যদি আপনাকে খুন করতে না পারি, তা হলেই খেলা শেষ। তখন আমি হার মেনে নেব। এই খেলায় আপনি অন্য কারও সাহায্য নিতে পারেন, আমারও একজন সহকারী থাকবে। তবে আবার বলে রাখছি, খেলাটা হবে সবসময় সামনাসামনি। পিছন থেকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ একেবারেই না!"

কাকাবাবু বললেন, "রাবিশ! খুনোখুনির নাম খেলা? আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন, এসব বিচ্ছিরি কথা আমি আর শুনতে চাই না! গেট লস্ট!"

ধ্যানচাঁদ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "গুড বাই। মনে রাখবেন, কাল তেরো এপ্রিল থেকে ...। এর মধ্যে আপনি কোথাও পালাবার কিংবা লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোনও লাভ হবে না।"

তারপরই পিছন ফিরে সে হাঁটতে শুরু করল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকাবাবু তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই মনে হয়, লোকটি একসময় আর্মিতে ছিল। পার্কের গেট পেরিয়ে সে বাইরে দাঁড়াতেই সাদা গাড়িটা চলে এল তার কাছে। তাকে নিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল হুশ করে।

কাকাবাবু হাঁটতে শুরু করে ভাবলেন, লোকটি ঠান্ডা মাথায় যেসব কথা বলে গেল, তা কি সত্যি হতে পারে? ওর ভাই সুরজকান্ত মারা গিয়েছে পাঁচ-ছ' বছর আগে। এতদিন পর তার প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, "ওর ভাই সুরজকান্তকে আমি মোটেই ধরিয়ে দিইনি। অন্য অনেকের সঙ্গে সে ধরা পড়েছিল। সে দোষী না নির্দোষ, তাও আমি জানি না। অত রাতে সুরকান্ত ভীমবেটকায় গিয়েছিল কেন?"

প্রায় এক ঘণ্টা পার্কে ঘোরাঘুরি করে কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন। রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির দরজার সামনে আসতেই পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা গাড়ি। কলকাতার রাস্তায় কত সাদা গাড়িই তো থাকে। কিন্তু এই গাড়িটা ছুটে আসছে সোজা কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ফুটপাতে উঠে দাঁড়ালেন। গাড়িটা কিন্তু কাকাবাবুকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল না। কাছে এসে থেমে গেল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ধ্যানচাঁদ। তার হাতে একটা রিভলভার দেখা যাচ্ছে।

হাসিমুখে ধ্যানচাঁদ বলল, "দেখছেন তো মিস্টার রায়চৌধুরী, এই মুহূর্তে আমি গুলি চালিয়ে আপনাকে ঝাঁঝরা করে দিতে পারতাম। কেউ আমাকে ধরতে পারত না। দিচ্ছি না কেন বলুন তো? কারণ, আমাদের খেলা শুরু হবে কাল থেকে। আমি ভদ্রলোক, কথা রাখি। মনে রাখবেন, আমি এ-কথাও দিয়েছি, ছ'মাসের মধ্যে আপনাকে আমি খুন করবই।"

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল।

উপরে উঠে এসে কাকাবাবু হাঁক দিয়ে বললেন, "রঘু, আমায় কফি দে!"

তিনখানা খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখা আছে ছোট গোল টেবিলটার উপরে। কাকাবাবু রকিং চেয়ারে বসে পড়ে একটা কাগজ খুললেন। কিন্তু কাগজ পড়ায় তাঁর মন বসল না। শুধু মনে পড়ছে ওই লোকটার কথা। সকালবেলা ওই লোকটা একটা রিভলভার দেখিয়ে শাসিয়ে গেল? কাকাবাবু মরতে ভয় পান না। এর আগে কতবার তিনি কতরকম বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, যখন-তখন মরে যেতে পারতেন। ভয় থাকলে তো তিনি ওইসব বিপদের মধ্যে যেতেনই না। বাড়িতে বসে থাকতেন। খোঁড়া পা নিয়েও তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে দৌড়েছেন কতবার। কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছেন। একদিন না-একদিন তো সব মানুষেরই মৃত্যু হয়। তা বলে একজনের সঙ্গে জোর করে খুনোখুনির খেলা খেলতে হবে? কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!

লোকটার নাম ধ্যানচাঁদ। ওটা ওর আসল নাম নয়। ইন্ডিয়া যখন হকি খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছিল, তখন ধ্যানচাঁদ ছিলেন সেই টিমের ক্যাপ্টেন। বিখ্যাত মানুষ, ভাল মানুষ। তাঁর নাম নিয়েছে একজন খুনি! এটাও তো অন্যায়।

রঘু কফি নিয়ে এল, সঙ্গে দু'খানা টোস্ট।

কাকাবাবু বললেন, ''টোস্ট খাব না। নিয়ে যা।''

রঘু বলল, ''খালি পেটে গরম কফি খাবেন? তাতে পেট জ্বালা করে।''

কাকাবাবু বললেন, ''কে বলল, পেট জ্বালা করে? তুই খেয়ে দেখেছিস?''

রঘু বলল, ''আমি জীবনেই কফি খাইনি স্যার। কিন্তু লোকে যে বলে!''

কাকাবাবু বললেন, ''জীবনে কফি খাসনি? আজ এক কাপ খেয়ে দ্যাখ। দু'চামচ চিনি দিবি, নইলে খুব তেতো লাগবে।''

''আপনি তো চিনি-দুধ কিছুই নেন না। এই কালো কালো জিনিসটা কী করে যে খান! একটা অন্তত টোস্ট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেয়ে ফেলুন আগে।''

''তোকে আর সর্দারি করতে হবে না। বলছি, টোস্ট দুটো নিয়ে যা!''

''না, নিয়ে যাব না। একটা অন্তত খেতেই হবে। খেয়ে নিন কাইন্ডলি।''

''কাইন্ডলি? খুব ইংরেজি শেখা হয়েছে! নিয়ে যাবি, না ছুড়ে ফেলে দেব?''

রঘু এবার ধমক খেয়ে টোস্ট দুটো তুলে নিয়ে মুখ চুন করে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর একটু অনুতাপ হল। অত বকলেন কেন রঘুকে? ও তো ভাল কথাই বলছিল। হঠাৎ তাঁর মেজাজ গরম হয়ে গেল, এরকম তো হয় না! ওই ধ্যানচাঁদই তাঁর মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে। একবার মেজাজ খারাপ হলে অনেকক্ষণ ধরে মাথার মধ্যে সেটাই ঘোরে। মেজাজ ঠিক করতে হলে গান গাইতে হয়। কফিতে এক চুমুক দিয়ে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরলেন :

''তবে রে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝাঁটা
....
তোরে এখন বাঁচায় কে'টা বল!

তোর মুখের দু' পাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
এখনি হবে প্রাণান্ত
আয় রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল।

'মারব ঝ্যাঁটা'র পর আর-একটা কী লাইন আছে, মনে পড়ছে না। গানের লাইন ভুলে গেলে খুব অস্বস্তি লাগে। কাকাবাবু দু'-তিনবার গেয়ে গেয়ে লাইনটা মনে আনবার চেষ্টা করলেন।

দরজার কাছ থেকে সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''কাকাবাবু, আজ মর্নিং ওয়াকে গিয়েছিলে?''

সন্তু সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। এখনও চোখমুখ ধোয়নি। মাথার চুলও খোঁচা খোঁচা। হাতে টুথব্রাশ। সে কাকাবাবুর বাথরুমটা ব্যবহার করে।

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, যাব না কেন? এই তো ঘুরে এলাম।''

সন্তু বলল, ''কাল আমরা বাড়ি ফিরেছি রাত দুটোয়। তুমি এত কম ঘুমোও কী করে?''

কাকাবাবু বললেন, ''আমার বেশি ঘুমের দরকার হয় না। তোর মতো বাচ্চারাই বেশি ঘুমোয়।''

সন্তু হেসে বলল, ''আমি আর কী ঘুমোই! জোজো? জোজো যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে। কাল আমরা বাসে করে যাচ্ছিলাম, বসার জায়গা পাইনি। জোজো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমোচ্ছিল।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমরা কে কতদিন বাঁচব ঠিক নেই। তার মধ্যে অর্ধেকটা সময় যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই, তা হলে অনেক কিছুই দেখা হবে না, অনেক কাজও করা হবে না। জীবনের চার ভাগের এক ভাগ ঘুমের জন্য বরাদ্দ। সেটাই যথেষ্ট।''

সন্তু বলল, ''তার মানে দিনে ছ'ঘণ্টা তো? আমি তার বেশি ঘুমোই না। এক-এক দিন হয়তো বেশি ঘুমিয়ে ফেলি, কিন্তু আবার এক-এক দিন, মানে ধরো, পরীক্ষার সময় যে রাত জেগে পড়াশোনা করি, তখন তিন ঘণ্টার বেশি ঘুম হয় না। তা হলে অ্যাভারেজে সেই ছ'ঘণ্টা!''

কাকাবাবু বললেন, ''তোর বন্ধু জোজোকেও সেকথা বুঝিয়ে দিস।''

''আমি তোমার বাথরুমে যাব?''

''যা।''

''বিকেলে ক'টার সময় ট্রেন? আজ তো আমাদের শিমুলতলা যাওয়ার কথা।''

''উঁ উঁ, আজ যাব কিনা ভাবছি।''

''কেন? এখন আমাদের ছুটি আছে। চলো, চলো!''

''দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি।''

সন্তু বাথরুমে চলে গেল। কাকাবাবু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন।

কারণটা অতি সামান্য। আসলে বেড়ানোটাই মূল উদ্দেশ্য। তাই সন্তু আর জোজো শিমুলতলায় যাওয়ার জন্য উৎসাহে মেতে আছে। কিন্তু এখন কি যাওয়া উচিত? ধ্যানচাঁদ বলে গেল, কোথাও পালাবার কিংবা লুকোবার চেষ্টা করবেন না। শিমুলতলায় গেলে যদি সে ভাবে, তিনি কলকাতা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন? সে নিশ্চয়ই নজর রাখবে। অথচ, সে তো দিল্লি ফিরে গেল। তা হলে নজর রাখবে কী করে? সে যাই-ই হোক, শিমুলতলায় যাওয়ার প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা আছে। ওই লোকটার হুমকিতে তিনি প্রোগ্রাম বদলাবেন কেন? ট্রেনের টিকিটও কাটা আছে, তা হলে যেতেই হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে কাকাবাবু একটা স্টিলের আলমারি খুললেন। এই আলমারিটা নানারকম জিনিসে ঠাসা। প্রায় সব জিনিসই তাঁর দেশ-বিদেশের ভক্তরা উপহার দিয়েছে। অনেক কিছুই ব্যবহার করা হয় না। সুন্দর সুন্দর মূর্তি, দু'খানা দেওয়ালঘড়ি, অনেক রকমের জামা, মাথার টুপি, সুন্দর খাপওয়ালা চারখানা ছোরা। একজোড়া ক্রাচও রয়েছে। কাকাবাবু যে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করছেন, তা অনেক দিনের পুরনো। রং চটে গিয়েছে। কাকাবাবু পুরনো জিনিসই বেশি পছন্দ করেন। একেবারে অকেজো না হলে তিনি কিছুই ফেলতে চান না।

কাকাবাবু ক্রাচজোড়া বের করলেন। ভারী সুন্দর দেখতে। ঝকঝকে পালিশ করা কালো রঙের, হাতলের কাছে হাতির দাঁতের কারুকাজ। এ ছাড়াও রয়েছে নানারকম কায়দা, পরপর কয়েকটা বোতাম। একটা বোতাম টিপলে ইচ্ছেমতো ক্রাচটাকে ছোট কিংবা বড় করা যায়। সুইডেনে কাকাবাবুর বন্ধু গুনার মিডডাল এই ক্রাচ দুটো উপহার দিয়েছিলেন। তিনি বারবার বলেছিলেন, ‘‘রাজা, তুমি এই ক্রাচ অবশ্যই ব্যবহার করবে। তোমাকে কত জায়গায় যেতে হয়। দেখবে, এটা খুব কাজে লাগবে। বেশি ভারীও নয়!’’

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে বলে কাকাবাবু এত দিন ব্যবহার করেননি। নিজের পুরনো ক্রাচ দুটো চালান করে দিলেন খাটের নীচে। কয়েকটা জামাও বের করে নিলেন। এগুলোও পরে ফেলাই ভাল। শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী? মরে গেলে তো আর পরাই হবে না। সন্তুর গায়েও ফিট করবে না এইসব জামা।

হঠাৎ মরার কথা মনে আসছে কেন বারবার? ওই ধ্যানচাঁদ নামের লোকটা

সত্যিই তাঁকে খুন করতে পারবে? তার চেয়েও বড় কথা, আত্মরক্ষার জন্য কাকাবাবু কি বাধ্য হবেন ওকে খুন করতে? কিন্তু তিনি যে তা চান না। যত বড় ক্রিমিনালই হোক, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান না কাকাবাবু। একটা বেশ মোটা মতো জামাও বের করলেন। এ জামা খুব ঠান্ডার দেশে পরবার মতো। শিমুলতলায় শীত হবে না। এখন গরমকাল। তবু কাকাবাবু জামাগুলো একটা ছোট সুটকেসে ভরে নিলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''তা হলে কী ঠিক হল? আমরা শিমুলতলায় যাচ্ছি তো?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, যাচ্ছি। দুপুর সাড়ে বারোটায় ট্রেন। জোজোকে খবর দে।''

সন্তু বলল, ''জোজো এগারোটার মধ্যে এসে যাবে। কাকাবাবু, আমরা ওখানে ক'দিন থাকব?''

কাকাবাবু বললেন, ''বাদশা তো বলেছে, অন্তত দিনসাতেক থেকে আসতে। অতদিন ওখানে থেকে কী করব? আমি তো ভাবছি, বড়জোর দিনতিনেক ...''

সন্তু বলল, ''না, না, সাতদিনই ভাল। ওদিকে অনেক বেড়ানোর জায়গা আছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''দেখা যাক, গিয়ে যদি ভাল লাগে! তবে ভূতটুত আমার বেশিদিন সহ্য হয় না।''

সন্তু বলল, ''বাদশাদা তো বলে গিয়েছেন, ভূত দেখা যাবেই। গ্যারান্টি। বাদশাদা তো বাজে কথা বলার লোক নন। তা হলে কি আমরা এবার সত্যি সত্যি ভূত দেখব!''

কাকাবাবু বললেন, ''ধুত। যত সব বাজে কথা!''

এগারোটার মধ্যেই ঠিক জোজো এসে হাজির। সঙ্গে একটা ঢাউস ব্যাগ। সেটা আবার একদিকে লাল, আর একদিকে কালো। তার উপরে সাদা অক্ষরে কী যেন লেখা। দু'-এক জায়গা একটু কুঁচকে আছে বলে লেখাগুলো ঠিক পড়া যাচ্ছে না।

সন্তু বলল, ''এ কী রে, এত বড় ব্যাগ এনেছিস কেন?''

জোজো বলল, ''এখানে ক'দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। ওখানেও বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টিতে জামা-প্যান্ট ভিজবে। কাদায় আছাড় খেতে পারি। তাই বেশি জামা-প্যান্ট নিয়েছি।''

সন্তু ভুরু তুলে বলল, ''এত বড় ব্যাগ ভরতি শুধু জামাকাপড়?''

জোজো বলল, ''না, তা নয়। বাবা বললেন, শিমুলতলায় যাচ্ছিস? বাঃ, বেশ ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গা। ওখানকার জল খেলে খুব খিদে পায়। তাই আমি ভাবলুম, যখন-তখন খিদে পেলে কী খাব? কখন কী পাওয়া যাবে, তাও তো জানি না। সেই জন্য দশ প্যাকেট বিস্কুট আর চিজ় নিয়েছি। আর ডিমের পাউডার।''

''ডিমের পাউডার আবার কী?''

''আমরা এখন ডিমের পাউডার বানাচ্ছি বাড়িতে। আস্ত ডিম সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলা, ভেঙেটেঙে যায়। তাই আগে ডিমের অমলেট বানাই। সেটাকে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে ফেলি। তারপর ইচ্ছেমতো সেই গুঁড়ো খানিকটা জলে মিশিয়ে গরম করলেই আবার অমলেট হয়ে যায়। একই রকম খেতে লাগে। কাকাবাবু, আপনি খেয়ে দেখবেন তো?''

''দেখব টেস্ট করে।''

''জোজো, তোর ব্যাগের উপর কী লেখা রে?''

জোজো ব্যাগের কোঁচকানো জায়গাগুলো ঠিক করল। তখন পড়া গেল, দু' লাইনে লেখা :

এবার যাব শিমূলতলায়
গান শুনব ভূতের গলায়।

নিজেই সেই লাইন দুটো উচ্চারণ করে পড়ে জোজো বলল, ''কাল থেকে পোয়েট্রি লিখতে শুরু করেছি, ইংলিশে আর বাংলায়। প্রথমে লিখেছিলাম, এবার যাব শিমূলতলা। চেপে ধরব ভূতের গলা! কিন্তু সেটা ঠিক পছন্দ হল না। কাকাবাবু, এটা বেটার হয়নি?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, এটাই বেটার। কিন্তু এখানে ভূতদের মধ্যে যদি ব্রহ্মদত্যি থাকে, তা হলে তোমার এই লেখা দেখে গান শোনাবার বদলে রেগে গিয়ে তোমারই গলা চেপে ধরবে।''

''কেন, কেন, রেগে যাবে কেন?''

''বামুন মরলে তো ব্রহ্মদত্যি হয়। সাধারণত তারা লেখাপড়া জানে। ভুল বানান সহ্য করতে পারে না। তোমার ওই লেখায়...''

''কী, ভুল লিখেছি? মূল বানান ম-এ দীর্ঘ ঊ না?''

''তা ঠিক। কিন্তু এটা তো সে মূল নয়। শিমুল একটা গাছের নাম। সংস্কৃতে

যাকে বলে শাল্মলি। সেই শাল্মলি থেকে চলতি কথায় শিমুল। তুমি পোয়েট্রি লিখছ, ভুল বানান তো চলবে না।''

''আপনার কথা শুনেই আমার নেক্সট দু'লাইন মনে এসে গেল! বলব?

যদি দেখি ব্রহ্মদত্যি
তবে বলব তিন সত্যি!''

''এটা লিখে রাখতে হবে।''

সন্তু বলল, ''ইংরেজিতে কী কবিতা লিখেছিস, শোনা তো!''

জোজো বলল,

''There was a man Called Kissinger
Who was a very bad singer.''

সন্তু বলল, ''বাঃ, আর-একটা শোনা।''

কাকাবাবু বললেন, ''পরে হবে। পরে হবে।''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু, আপনার এই ক্রাচ দুটো দারুণ দেখতে তো!''

কাকাবাবু বললেন, ''দারুণ বলেই এতদিন ব্যবহার করিনি। আজ ভাবলাম, শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী? চলো, তা হলে।''

একটা ট্যাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে জসিডি।

জসিডি স্টেশনে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাদশা। তার পুরো নাম সিরাজুল হক, সবাই তাকে বাদশা বলেই ডাকে। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া চেহারা। খুব দিলদরিয়া মানুষ। বন্ধুবান্ধবদের খুব খাওয়াতে ভালবাসে। মধুপুর, দেওঘর, জসিডি, শিমুলতলায় তার চারখানা রেডিয়ো, টিভির দোকান আছে। চলে বেশ ভালই। তার নিজের বাড়ি শিমুলতলায়। সেখানে সে আর-একটা বড় বাড়ি কিনেছে।

বাদশা একটা টাটা সুমো গাড়ি এনেছে। জসিডি থেকে শিমুলতলা বেশি দূর নয়।

গাড়িতে উঠে বাদশা বলল, ''কাকাবাবু, আজ রাতেই কি ভূতের বাড়িতে

থাকবেন, না প্রথম রাতটা কাটাবেন আমার বাড়িতে? আমার বাড়িতেও ভাল ব্যবস্থা আছে।"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, "ভূতের বাড়ি, ভূতের বাড়িতে থাকব!"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখো বাদশা, আমি তো আর ভূত ধরতে আসিনি। সেটা আমার কম্মো নয়। আমি এসেছি, সন্তু আর জোজো এই দিকটায় বেড়াতে আসতে চাইছিল আর তোমার বাড়িতে নাকি দারুণ বিরিয়ানি রান্না হয়, তা চেখে দেখার জন্য। যে-বাড়িতেই থাকি, তাতে কিছু আসে যায় না।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "সত্যি ভূত আছে?"

বাদশা বলল, "সত্যি ভূত না মিথ্যে ভূত, তা জানি না। তবে পাড়ার লোক ওটাকে বলে 'ভূতের বাড়ি'। আমি নিজের কানে শুনেছি, ও-বাড়িতে এক-এক দিন রাতে নানারকম বিকট শব্দ হয়। দুমদুম করে পায়ের আওয়াজ হয় সিঁড়িতে। দরজা-জানলা দড়াম দড়াম করে পড়ে। ভয়ে কেউ সন্ধের পর ওই বাড়ির ধারেকাছে যায় না।"

সন্তু বলল, "শুধু শব্দ? ভূতে কোনও ক্ষতি করে না?"

বাদশা বলল, "এককালে এখানে বাঙালিরা অনেক বড় বড় বাড়ি বানিয়েছিল শখ করে। ছুটি কাটাতে আসত সপরিবার। এখন অনেকেরই আর বংশধর নেই। থাকলেও এদিকে আসে না, বিলেত-আমেরিকায় যায়। বাড়িগুলো ভেঙে ভেঙে নষ্ট হচ্ছে। সেরকম একটা বাড়ি আমি কিনেছি। দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রমথনাথ মিত্রের বাড়ি ছিল ওটা। পনেরোখানা ঘর, বিশাল বিশাল বারান্দা, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান, সবই প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি পুরো বাড়িটাই ভেঙে ফেলে ওখানে একটা হোটেল বানাব ঠিক করেছি। কিন্তু ভূতেরা বাধা দিচ্ছে বলে হচ্ছে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী করে বাধা দিচ্ছে? শুধু আওয়াজ করে?"

বাদশা বলল, "না। কন্ট্রাক্টরের একজন লোককে একদিন দুপুরে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। তার হাত ভেঙে গিয়েছে। সে আর ও বাড়িতে ঢোকে না। বাড়িটা যেদিন ভাঙা শুরু হল, সেদিন..."

জোজো বলল, "যাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সে কি কাউকে দেখেছে?"

বাদশা বলল, ‘‘হ্যাঁ, সে বলেছে, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সে দেখেছে, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা কাপড় পরা কঙ্কাল!’’

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, ‘‘সাদা কাপড় পরা। সব ভূতই সাদা কাপড় পরে!’’

বাদশা আবার বলল, ‘‘যেদিন বাড়িটা ভাঙা শুরু হয়, সেদিন বিকেলের দিকে একজন মিস্তিরি রক্তবমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর সেও বলেছে, একটা কঙ্কাল এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে! থু-থু করে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে তার গায়ে। সে গ্রামে ফিরে গিয়েছে। আর কোনও মিস্তিরিও কাজ করতে রাজি হচ্ছে না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কঙ্কালের থুতু? কঙ্কালের কি জিভ থাকে? কখনও শোনা যায়নি।’’

সন্তু বলল, ‘‘আমিও এটা নতুন শুনছি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যে মিস্তিরি রক্তবমি করেছে, তার টিবি রোগ আছে কিনা খোঁজ নেওয়া হয়েছে? এরা প্রচুর পরিশ্রম করে। সেই অনুযায়ী ভাল খাবারদাবার খেতে পায় না। অনেকেরই টিবি হয়। রোগটা অনেকখানি ছড়ালে রক্ত পড়ে।’’

বাদশা বলল, ‘‘কাকাবাবু, আমি জানি, আপনি এসব কিছুই বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যই আপনাকে এখানে এনেছি। আপনি কয়েকদিন থেকে বলে দিন, সত্যিই ব্যাপারটা কী হচ্ছে। যদি ভূত বলে কিছু না থাকে, তা হলে লোকে ভয় পাচ্ছে কেন? সেটাই আমি জানতে চাই।’’

জোজো বলল, ‘‘কাকাবাবু, ভূত দেখা কি অসম্ভব?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘না, অসম্ভব কেন হবে? কেউ কেউ দেখে। মানুষ তিন রকম। যারা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে, ঠাকুর-দেবতার পুজো করে, ছেলেবেলা থেকেই এসব বিশ্বাস মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে, তারা কখনও ভূতও দেখতে পারে, ঠাকুর-দেবতাদেরও দেখতে পারে। বিশ্বাস থেকেই তো ওসব তৈরি হয়। আর যারা বিশ্বাস তো করেই না, ওরকম কিছু সম্ভবই নয় বলে মনে করে, তারা জীবনেও ভূত দেখতে পাবে না। আর একদল আছে, যারা ঠিক বিশ্বাসও করে না, আবার জোর অবিশ্বাসও করে না। তারা কখনও দেখতেও পারে, আবার না-ও দেখতে পারে।’’

জোজো বলল, ‘‘আরও একদল আছে, যারা ভূত বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাতে একা থাকতে ভয় পায়।’’

সন্তু বলল, "যেমন তুই!"

জোজো বলল, "ঠিক বলেছিস। আর তুই কোন দলে?"

সন্তু বলল, "আমার মতোও একদল আছে, যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, ভয়ও পায় না, কিন্তু ভূতের গল্প খুব ভালবাসে। ভাল গল্প হলে একটু একটু গা ছমছমও করে।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক সময় চোর-ডাকাতরা এরকম ভাঙা বাড়িতে আস্তানা গেড়ে ভূত সেজে ভয় দেখায়!"

বাদশা বলল, "তা যদি হয়, তা হলে তো ঝামেলা চুকেই গেল। সেই চোর-ডাকাতদের কোনও একটাকে কি চেষ্টা করলে ধরা যাবে না? একটাকে ধরলেই তাকে দেখিয়ে সবাইকে বলা যাবে, এই দেখুন ভূত নয়, জ্যান্ত মানুষ। তারপর সে ব্যাটাকে ধরে খুব করে পেটালেই অন্যদের সন্ধান পাওয়া যাবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি।"

গাড়িটা এসে থামল একটা লোহার গেটের সামনে। চারদিকে অন্ধকার। একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে ডেকে উঠল।

একটা বড় টর্চ জ্বেলে বাদশা বলল, "এই হচ্ছে সেই বাড়ি। দেখুন, লোহার গেটের দু'পাশে দুটো পাথরের সিংহ ছিল, এখন মুন্ডু নেই, পাশে গাছ গজিয়ে গিয়েছে। অনেক ঘরের ছাদ নেই। শুধু দুটো ঘর আস্ত আছে এখনও।"

কাকাবাবু বললেন, "ওতেই হবে। দু'খানা ঘরই যথেষ্ট। বাথরুমটাথরুম আছে তো?"

বাদশা বলল, "আমি ভেবে দেখলাম, আজকের রাতটা আপনারা আমার বাড়িতেই থাকুন। এখানে ঘরটর পরিষ্কার করা আছে ঠিকই, কিন্তু আলোর ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কাল সন্ধের পর এখানে চলে আসবেন।"

সন্তু তবু বলল, "কেন, আজ থেকেই থাকি না। আমাদের সঙ্গে তিনখানা টর্চ আছে। আর আলো লাগবে না।"

বাদশার পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। খানিকক্ষণ কথা বলে সেটা অফ করে বাদশা বলল, "আমার স্ত্রী আজ কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন। প্রচুর খাবারদাবার করে রেখেছেন। সন্তু, আজ বরং খেয়েদেয়ে ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। কাল হয়তো সারারাত জাগতে হতে পারে।"

বাদশার নিজের বাড়ি সেখান থেকে মিনিটদশেকের পথ। সেটাও বেশ বড় বাড়ি। আলোয় ঝলমল করছে। আরও কিছু মানুষ আগে থেকেই বসে

আছেন বৈঠকখানায়। বোঝাই যাচ্ছে, আজ এটা নেমন্তন্ন বাড়ি।

তারপর প্রচুর খাওয়াদাওয়া আর গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে গেল। পাশাপাশি দুটো ঘরে খাটের উপর বিছানা পাতাই আছে। সন্তু আর জোজো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

প্রতিদিনই ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ বই পড়ার অভ্যেস কাকাবাবুর। তিনি একটা বই খুলে বসলেন। একসময় দেখলেন দেড়টা বেজে গিয়েছে। শুয়ে পড়লেন আলো নিভিয়ে।

ভোরবেলা জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে চোখে, কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ভারী নরম, নীলচে আলো। সূর্য ওঠার আগে এইরকম রং হয়, তারপর এই আলো হবে সোনালি। অনেক রকম পাখি ডাকছে, আর সেই সব ডাক ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে দুটো মোরগের কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ। কী গলার জোর ওদের!

কাকাবাবুর আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। উঠে চোখমুখ ধুয়ে তিনি জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়লেন। এখানে এসেও তিনি মর্নিং ওয়াকের অভ্যেসটা ছাড়বেন কেন?

সন্তু আর জোজোকে তিনি ডাকলেন না। এ-বাড়ির অন্য কেউও এখনও জাগেনি মনে হয়। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

কী চমৎকার ফুরফুরে বাতাস। বাতাস এসে যেন গা জড়িয়ে আদর করছে। কলকাতায় বৃষ্টি হলেও এখানে বৃষ্টি নেই। তবে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। বেলা বাড়লেই গরম হবে।

লাল রঙের রাস্তা। দূরে পাহাড়ের রেখা। এই সময় রাস্তায় মানুষজন থাকার কথা নয়। তবু দুধওয়ালা কিংবা বাগানের মালির মতো কেউ যাচ্ছে সাইকেলে। তারা কৌতূহলে কাকাবাবুকে ফিরে ফিরে দেখছে। এদিকে সকলেই সকলকে চেনে। ক্রাচ বগলে এই নতুন মানুষটি কে, তারা ভাবছে।

কাকাবাবু সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, এক-একটা বড় বাড়ির ভগ্নস্তূপ। গেটে এখনও নাম লেখা আছে। এককালের বিখ্যাত সব বাঙালির নাম। তখনও বাঙালিরা এত গরিব হয়ে যায়নি। কিছু কিছু বাঙালি লেখাপড়া শিখে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক টাকা উপার্জন

করতেন। কত শখের এই সব বাড়ি। এখন অনেক বাড়িরই দরজা-জানলা খুলে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা।

কালকের সেই ভূতের বাড়িটা কোন দিকে, তা কাকাবাবু বুঝতে পারছেন না। অবশ্য অনেক ভাঙা বাড়িকেই রাতে ভূতের বাড়ি বলে মনে হতে পারে।

একটা কোকিল ডাকছে, খুব কাছেই। কিন্তু পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। কোকিল সব সময় পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে যে, দেখতে পাওয়া খুব শক্ত। কাকাবাবু তবু উঁকিঝুঁকি মেরে সামনের গাছগুলো দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একজন বলল, ''স্যার, উইল ইউ হেল্‌প মি?''

কাকাবাবু চমকে উঠে দেখলেন, একটি অল্পবয়সি ছেলে, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে, প্যান্ট-শার্ট পরা, পাতলা চেহারা। কাঁধে একটা ব্যাগ।

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে ইংরেজিতে বলল, ''স্যার, একটু হেল্‌প করবেন? আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি তো এখানে নতুন এসেছি, অনেক কিছুই চিনি না।''

ছেলেটি বলল, ''দেখুন, এই কাগজটায় লেখা আছে।''

কাকাবাবু কাগজটা নিলেন। খুব বিচ্ছিরি হাতের লেখা। জড়ানো জড়ানো। তবু কষ্ট করে পড়বার চেষ্টা করলেন। ''নিয়ার নাটোর প্যালেস। হাউজ় অফ বাদশা। বিগ গার্ডেন। মিস্টার রাজা...''

আর পড়তে পারলেন না। এর মধ্যেই ছেলেটি তার ব্যাগ থেকে অনেক লম্বা পাকানো নাইলনের দড়ি বের করে ফস করে কাকাবাবুর গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিল। এত তাড়াতাড়ি সে কাজটা সেরে ফেলল যে, কাকাবাবু বাধাও দিতে পারলেন না।

কাকাবাবু বললেন, ''এ কী?''

ছেলেটি হি হি হি হি করে হেসে উঠল। তার গলার আওয়াজ বাচ্চা ছেলেদের মতো। হাসতে হাসতে সে বলল, ''ছি ছি ছি, মিস্টার রায়চৌধুরী, আজ থারটিন্‌থ এপ্রিল। আজ থেকে ডেথ-ডেথ খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, মনে নেই? আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।''

দড়িটা খানিকটা লম্বা করে সে কাকাবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ভাঙা বাড়ির পিছন দিকে। রাস্তার লোকজন কেউ দেখতে পাবে না তাদের।

ফাঁসটা এমন আঁট হয়ে গিয়েছে যে, কাকাবাবুর দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেটা আবার ব্যঙ্গের সুরে বলল, "আপনি এত সহজে ধরা দিলেন? ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন অন্তত লড়াই করতে পারবেন। বাঙালিরা কি লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে? এই বাঙালিদের মধ্যেই তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মেছিলেন!"

কাকাবাবু অতি কষ্টে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

ছেলেটি বলল, "আমি কর্নেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট। এই যাঃ, কর্নেল বলে ফেললাম! যাক গে, এখন আপনি জানলেও ক্ষতি নেই। আর তো বেঁচে থাকবেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা!"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল কোথায়?"

ছেলেটি বলল, "তা জেনে আপনার কী লাভ? বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আমি এখনই মেরে ফেলতে পারি। আপনার পকেটে রিভলভার আছে জানি। কিন্তু আপনি পকেটে হাত ঢোকাবার চেষ্টা করলেই আমি দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান দেব। সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গলায় যে ফাঁসটি দিয়েছি, ওতে একটা মেটাল রিং আছে। সেটা আপনার গলায় কেটে বসে যাবে। আর এই যে দড়িটা দেখছেন, এটাও নাইলন আর মেটাল মেশানো। স্বয়ং ভীম এলেও এটা ছিঁড়তে পারবে না। এই ফাঁস আমরা সার্কাসের বাঘ-সিংহের গলায় পরাই।"

কাকাবাবু বলতে চাইলেন, "তুমি বুঝি সার্কাসে কাজ করো?" কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় খুব লাগছে।

ছেলেটি আবার বলল, "একটা গাড়ি আসবে, তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি আপনাকে এখানে মেরে ফেললেই ঝামেলা চুকে যেত। কিন্তু কর্নেল, মানে ধ্যানচাঁদ, নিজের হাতে আপনাকে শাস্তি দিতে চান।"

কাকাবাবু খুব চেষ্টা করে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, "আমি তোমার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নই। আমার কফি খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।"

ছেলেটি দারুণ অবাক হয়ে বলল, "কফি? আপনার আর জীবনে কফি খাওয়া হবে না। বললাম তো, আপনার আয়ু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে দ্যাখো!" তিনি একটা ক্রাচ উঁচু করে তার গায়ের একটা বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা লকলকে ছুরি। সেটা দড়িটায় ছোঁয়ানো মাত্রই কচাত করে কেটে গেল। প্রায় চোখের নিমেষে, একটুও ঘষতে হল না।

টাল সামলাতে না পেরে ছেলেটি চিত হয়ে পড়ে গেল।

কাকাবাবু তার বুকে অন্য ক্রাচটা চেপে ধরে বললেন, ‘‘নোড়ো না। দেখলে তো, ভীমও যে-দড়ি ছিঁড়তে পারে না, এ-যুগের অস্ত্র দিয়ে কত তাড়াতাড়ি সে দড়ি কাটা যায়? সাধারণ ছুরির চেয়ে এই ছুরিটায় ধার এক হাজার গুণ বেশি।’’

ছেলেটির চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। যে-দড়ি বাঘ-সিংহ ছিঁড়তে পারে না, একটা ছুরি দিয়ে এক মুহূর্তে সেটা কাটা হয়ে গেল!

কাকাবাবু গলার ফাঁসটা খানিকটা আলগা করে নিয়ে বললেন, ‘‘তুমি সার্কাসে কাজ করো। তোমার নাম কী?’’

ছেলেটি বলল, ‘‘বলব না। বেশি কথার দরকার নেই। আপনি আমাকে খুন করুন। আই অ্যাম রেডি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কেন, মারব কেন? এত সুন্দর একটা সকাল, এর মধ্যে খুনোখুনির কথা ভাবতে তোমাদের লজ্জা করে না?’’

ছেলেটি বলল, ‘‘এই খেলায় কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি হেরে যায়, তাকে মেরে ফেলার নিয়ম আছে। আপনিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারেন। কিল মি। আমি হেরে গিয়েছি, আমাকে খতম করে দিন।’’

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, ‘‘চোপ! সার্কাসে চাকরি করছিলে, তা ছেড়ে এই বাজে খেলায় যোগ দিতে তোমাকে কে বলেছে? কত টাকা পাবে? উঠে দাঁড়াও!’’ কাকাবাবু ক্রাচটা তার বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিলেন।

সে জেদির মতো বলল, ‘‘না, উঠব না। এখানেই আমার ডেডবডি পড়ে থাকবে।’’

কাকাবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, ‘‘ওঠো বলছি!’’

সে বলল, ‘‘না উঠলে আপনি কী করবেন? মারবেন তো? মারুন! হেরে গিয়ে আমি দয়া চাই না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুমি কী চাও বা না চাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মানুষ খুন করা আমার কাজ নয়। তুমি যদি না ওঠো, তা হলেও আমি তোমায় প্রাণে মারব না। পায়ে গুলি করব। তুমি চিরকাল খোঁড়া হয়ে থাকবে আমার মতো। সেটা ভাল হবে?’’

ছেলেটি এবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যাও, তোমার কর্নেল ধ্যানচাঁদকে গিয়ে বলো, আজই এই খেলা শেষ করে দিতে। ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি মোটেই

দায়ী নই। তবু আমি হাজারবার ক্ষমা চাইতে রাজি আছি।''

ছেলেটি বলল, ''ওসব বলে আর লাভ নেই। একবার এ-খেলা শুরু হলে হেস্তনেস্ত না হলে থামে না। কর্নেল আপনাকে খুন করবেনই। আপনি যদি আমাকে আজ ছেড়েও দেন, তা হলেও আমি আবার আপনাকে মারবার চেষ্টা করব।''

কাকাবাবু বললেন, ''এ যে দেখছি, মহা পাজি ছেলে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তবে একটুআধটু শাস্তি তো দেওয়া যেতেই পারে। আমার একটা নিয়ম আছে, যে আমার গায়ে হাত তোলে, তাকে আমি কিছু না-কিছু শাস্তি দিই। তুমি আমার গলায় ফাঁস পরিয়েছ, তার জন্য তোমাকে দু'-তিনটে থাপ্পড় অন্তত খেতেই হবে।'' তিনি ছেলেটির চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। তারপর তাকে থাপ্পড় মারতে গিয়েও থেমে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। চেয়ে রইলেন তার চোখের দিকে। গলার আওয়াজ শুনেই তাঁর একটু সন্দেহ হয়েছিল, এখন ওর চোখ দুটো দেখে কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, ''ছেলে তো নয়, এ যে দেখছি একটি মেয়ে!''

সে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, ''হ্যাঁ, মেয়ে, তো কী হয়েছে? মেয়েরা অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে না? মেয়েরা এখন সব পারে।''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। মেয়েরা সব পারে। এমনকী, মানুষ খুন করতেও পারে। কিন্তু আমি এখনও ওল্ড ফ্যাশন্ড। আমি মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে পারি না। তোমাকে যে দু'-তিনটে থাপ্পড় মারব ভেবেছিলাম, তা তো আর হচ্ছে না। তা হলে কি আমি তোমায় এমনি এমনি ছেড়ে দেব?''

মেয়েটি বলল, ''থাপ্পড় মারতে পারবেন না কেন? মারুন। তারপর আমিও আপনার নাকে এখন একটা ঘুসি মারব!''

''ওরে বাবা, তেজ আছে দেখছি! শোনো, আমি তোমার সম্পর্কে কী ঠিক করলাম। যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, তা হলে তোমাকে এখনই ছেড়ে দেব। আর যদি উত্তর না দিতে চাও, তা হলে আমার গলার ফাঁসটা খুলে তোমার গলায় পরিয়ে দেব, তারপর তোমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমি চলে যাব। কোনটা চাও?''

''আপনার কী প্রশ্ন, শুনি আগে।''

''তোমার নাম কী? তুমি আমার নাম জানো। অথচ আমি তোমার নাম জানি না, এতে কথাবার্তা বলা যায় না।''

"এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার নাম লায়লা।"

"সুন্দর নাম। তুমি ছেলে সেজে এসেছ কেন?"

"বেশ করেছি। অনেক মেয়েই তো আজকাল প্যান্ট-শার্ট পরে।"

"তুমি সার্কাসে কাজ করো?"

"করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

"সার্কাসের কাজ ছেড়ে তুমি এই কর্নেল ধ্যানচাঁদের সঙ্গে কুৎসিত কাজে যোগ দিয়েছ কেন? সে তোমাকে বেশি টাকা দিচ্ছে?"

"টাকার জন্য নয়। উনি একসময় আমার মাকে একটা খুব বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।"

"তোমার মাকে বাঁচিয়েছেন, সেটা খুব ভাল কাজ। মহৎ কাজ। কিন্তু কেউ একটা মহৎ কাজ করার পর যদি একটা খুব খারাপ কাজ করে, কোনও মানুষকে মারতে চায়, তা হলে সে আরও খারাপ লোক হয়ে যায়। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই মানুষের মতো কাজ, আর বিনা কারণে কাউকে খুন করলে সে আর মানুষ থাকে না। জঙ্গলের হিংস্র পশুদের সঙ্গে তার তফাত কী?"

"আপনাকে আর উপদেশ ঝাড়তে হবে না। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি আজ আমাকে ছেড়ে দিলেন কিংবা দয়া করলেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি যে-কোনও জায়গায়, আবার আপনাকে ধরব। আপনাকে মেরে ফেলা হবেই, এটা সোজাসুজি বলে দিলাম। এটাই আমার ডিউটি।"

"ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করে দেখো। সেবারেও যদি না পারো, তখন আমি তোমাকে ধরে ফেললে, কিন্তু আর ছাড়ব না। তখন তোমার হাত-পা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটা সার্কাসের দলে ভরতি করে দেব। সেখানে তুমি দড়ির উপর ডিগবাজি খাবে। সেখান থেকে যাতে তুমি পালাতে না পারো, সে ব্যবস্থাও করা হবে। এখন যাও, দৌড়োও! আমার চোখের সামনে আর থেকো না!"

লায়লা সত্যিই এক দৌড় লাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বাড়ির আড়ালে।

কাকাবাবু এবার খুব সাবধানে গলার ফাঁসটা খুললেন। জিনিসটা খুবই সাংঘাতিক। দড়ির মধ্যে আবার একটা লোহার রিং, তাতে আবার খাঁজকাটা। দড়িটা ধরে জোরে টানলেই গলার মধ্যে একেবারে চেপে বসে যাবে। এই জিনিসটা কাকাবাবু সঙ্গে নিয়ে যেতে চান না। সন্তুদের কাছে ধ্যানচাঁদের হুমকির কথা কিছুই বলেননি। আজ সকালের এই ঘটনার কথাও তিনি চেপে

যাবেন। ওরা এখানে বেড়ানো আর ভূত নিয়ে মজা করার মেজাজে আছে। কী দরকার তা নষ্ট করার!

এটা এখানে ফেলে গেলেও কেউ না-কেউ পেয়ে যাবে। সে এটা ব্যবহারও করতে পারে। কাকাবাবু ফাঁসটা হাতে নিয়ে ফিরতে লাগলেন। আসবার পথে তিনি একটা বড় পুকুর দেখেছিলেন। সেটার কাছে এসে কাকাবাবু খুব টিপ করে ফাঁসটা ছুড়ে দিলেন। পুকুরের ঠিক মাঝখানে সেটা ঝুপ করে পড়েই ডুবে গেল। যাক। নিশ্চিন্ত।

সন্তু, জোজোরা জেগে উঠেছে এর মধ্যে। বাইরের বারান্দায় বসেছে চা নিয়ে।

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা, ঠিক পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে তাঁর কফি খাওয়ার। ওই লায়লা নামের মেয়েটির জন্য। কী সাংঘাতিক তেজি মেয়ে। কাকাবাবু তেজি মেয়েদেরই পছন্দ করেন। এইরকম তেজি মেয়ে কত রকম দারুণ দারুণ কাজ করতে পারে। তার বদলে খুনোখুনির খেলায় মেতেছে, এটা খুব দুঃখের ব্যাপার।

জোজো একটা টোস্টে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বলল, ‘‘কাকাবাবু, আপনার দেরি দেখে আমরা ব্রেকফাস্ট শুরু করে দিয়েছি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বেশ করেছ। এবার আমার কফি দিতে বলো।’’

জোজো বলল, ‘‘কাকাবাবু, আমরা সবাই আজকাল বলি ব্রেকফাস্ট। এর কি কোনও বাংলা নেই? সন্তু বলছে, জলখাবার। কিন্তু জলখাবার তো স্ন্যাক্স, বিকেলেও খাওয়া যায়। ব্রেকফাস্ট কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক। সারারাত তো আমরা না খেয়ে থাকি, তাই সকালের প্রথম খাবারটা উপোস ভাঙা।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ব্রেকফাস্টের আর-একটা বাংলা আছে। প্রাতরাশ। সেটা ঠিক চলে না। হিন্দিতে বলে ছোটা হাজরি। মানে দুপুরেরটা বড় খাবার, সকালেরটা ছোট।’’

সন্তু বলল, ‘‘জোজো সকালেই বড় খাবার খেয়ে নেয়। এর মধ্যেই পাঁচটা টোস্ট, দুটো কলা, ডবল ডিমের অমলেট খেয়ে ফেলেছে। দুটো সন্দেশ বাকি আছে।’’

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘অমলেট মানে সেই এগ পাউডার নাকি?’’

জোজো বলল, ‘‘না, না, এখানে ফ্রেশ ডিম আছে। এখন পাউডারের দরকার হবে না।’’

বারান্দায় উঠে এসে চেয়ারে বসে পড়ে কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমার

বাবার মুখে শুনেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সত্যিই এগ পাউডার পাওয়া যেত। যেসব মিলিটারি পাহাড়ে-জঙ্গলে যুদ্ধ করতে যেত, তারা আর সেখানে ডিম পাবে কোথায়? তাই এগ পাউডার গুলে খেত!''

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, ''দেখলি, দেখলি!''

সন্তু বলল, ''আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। শিমুলতলায় অনেক ডিম পাওয়া যায়।''

বাদশা নিজেই কফি নিয়ে এল কাকাবাবুর জন্য। তারপর বলল, ''আজ দুপুরে গিরিডি বেড়াতে যাবেন? সুন্দর জায়গা। কয়েকটা ঝরনা আছে। একসময় আমাদের বাঙালিদের খুব প্রিয় জায়গা ছিল গিরিডি। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, আরও অনেকে ওখানে গিয়ে থাকতেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''ওদের জিজ্ঞেস করো।''

সন্তু বলল, ''আজ না। আজ আমরা শুধু ভূত দেখব। বেড়াতে যাব কাল।''

বাদশা বলল, ''প্রতিদিনই যে ও-বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়, তা নয়। এক-একদিন কিছুই হয় না।''

জোজো বলল, ''বাদশাদা, তুমি কখনও নিজের চোখে ভূত দেখেছ?''

বাদশা বলল, ''না, তা দেখিনি। তবে নানারকম আওয়াজ শুনেছি, তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।''

জোজো বলল, ''কীরকম আওয়াজ? কীরকম?''

বাদশা বলল, ''যেমন ধরো, একটা মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। আমি টর্চ জ্বেলে সারা বাড়ি খুঁজে দেখেছি, কোথাও কোনও মেয়ে নেই, কেউ নেই, তবু কান্নার শব্দ। আবার কখনও কারা যেন বেশ কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তখন কিন্তু ভয় করে সত্যি। এই দ্যাখো, বলতে বলতে আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''এক-এক সময় ভয় পেতেও তো ভাল লাগে। জীবনে কখনও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, দুঃখের কান্না নেই। সে তো খুব একঘেয়ে ব্যাপার।''

বাদশা বলল, ''কাকাবাবু, পটনা থেকে আমি ডিটেকটিভ এজেন্সির তিন জন লোক আনিয়েছি। তারা আজ দিনেরবেলা সারা বাড়ি সার্চ করে দেখবে। কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। সন্ধের পর মেন গেটের বাইরে বসে তারা পাহারা দেবে, যাতে কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে। এর পরেও

যদি অলৌকিক কিছু দেখা যায় কিংবা শোনা যায়, তা হলে তো মানতেই হবে!''

কাকাবাবু শুধু বললেন, ''হুঁ।''

বাদশা জিজ্ঞেস করল, ''আপনি হুঁ বললেন কেন? আপনিও তা হলে মেনে নেবেন?''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''আমার মানা কিংবা না মানায় কী আসে যায়?''

বাদশা বলল, ''বাঃ, আপনি বিখ্যাত রাজা রায়চৌধুরী। আপনি কত অত্যাশ্চর্য সমস্যা সল্‌ভ করেছেন। বিদেশেও লোকে আপনার নাম জানে।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি যে ভূতের ব্যাপারেও এক্সপার্ট, তা তো জানতাম না। কতকাল ধরে ভূতের গল্প চলে আসছে, কত লোক ভূত দেখেছে নিজের চোখে, এর মধ্যে আমার একার কথার কী দাম আছে? আচ্ছা ধরো, আজ প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ওই বাড়িতে ভূতটুত কিংবা অলৌকিক কিছু আছে। তখন তুমি কী করবে?''

বাদশা বলল, ''হিন্দুরা এইসব বাড়িতে কী সব পুজোটুজো করে। তাতে নাকি অপদেবতা চলে যায়। আমি তো মুসলমান হয়ে পুজো করতে পারব না। আমি সেরকম অবস্থায় বাড়িটা বেচে দেব। আমার আর সস্তার দরকার নেই।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আচ্ছা বাদশা, তুমি কখনও যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করেছ?''

একটু চমকে গিয়ে বাদশা বলল, ''হঠাৎ এ-কথাটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''হঠাৎই মনে এল। তোমার চেহারা বেশ সুন্দর, গলার আওয়াজও ভাল। তুমি থিয়েটার-সিনেমায় অ্যাক্টিং করলে বেশ নাম করতে পারতে। আজকাল তো টিভিতেও কত রকম সিরিয়াল হয়, তাতেও অনেকে চান্স পায়।''

বাদশা বলল, ''না, কাকাবাবু! কয়েকজন আমাকে বলেছে সিনেমায় নামতে। কিন্তু ওসব দিকে মন দিলে আমার ব্যাবসার বারোটা বেজে যেত। তবে, কলেজে পড়ার সময় দু'-একবার থিয়েটার করেছি।''

জোজো বলল, ''বাদশাদা, সিনেমা-টিভিতে অ্যাক্টিং না করে ক্যাসেট, টিভি সেট বিক্রি করে।''

সন্তু বলল, ‘‘ক্যাসেটের কথা ভুলে যা। এখন ডিভিডি’র যুগ।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সত্যিই আশ্চর্য, তাই না? একটা ছোট্ট পাতলা ডিস্‌ক, তাতে পুরো একটা সিনেমা ভরা থাকে। কত দৃশ্য, কত ক্যারেক্টার, কত মারামারি, দু’ঘণ্টা ধরে ওইটুকু ডিস্‌ক চালিয়ে সব দেখা যায়!’’

বাদশা বলল, ‘‘আজ দুপুরে কোনও সিনেমা দেখবেন? আমার কাছে অনেক সিডি আছে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা দেখা যেতে পারে। যা গরম পড়ছে, দুপুরে আর বাইরে বেরোনো যাবে না।’’

দুপুরে আবার দারুণ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। কাল রাতে মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ ছিল, আজ পাঁচ রকম মাছ। আর তিন রকম মিষ্টি।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এতরকম পদ থাকলে কি ভাল করে খাওয়া যায়? শেষের দিকে কোনওটারই স্বাদ পাওয়া যায় না। বাঙালি রান্নায় শুধু একটা ডাল, একটা তরকারি আর একটা মাছ বা মাংসই তো ভাল।’’

বাদশা বলল, ‘‘এ আর কী দেখছেন? আমার শ্বশুরবাড়িতে খাবার টেবিলে মিনিমাম চোদ্দো-পনেরো রকম আইটেম থাকে। মাংসই চার রকম!’’

বাদশার স্ত্রী নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করছে। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘ফিরোজা, তোমার বাবা রোজ চোদ্দো রকম পদ খান?’’

ফিরোজা হেসে বলল, ‘‘না, কাকাবাবু, আমার বাবা মাছ-মাংসই খান না। শুধু নিরামিষ। তবে লোককে নেমন্তন্ন করে অনেক কিছু খাওয়াতে ভালবাসেন!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমাকে যদি কোনওদিন চোদ্দো-পনেরোটা আইটেম খেতে হয়, তা হলে আমি মরেই যাব।’’

সন্তু দু’রকম মাছ খাওয়ার পর আর কিছু নিতে চায়নি। জোজো একটার পর-একটা খেয়ে যাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘জোজো, খুব বেশি খেলে কিন্তু কবিতা লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য খুব কম খেতেন।’’

জোজো বলল, ‘‘এসব তো আমি নিজে খাচ্ছি না।’’

সন্তু মুখ তুলে অবাক হয়ে বলল, ''নিজে খাচ্ছিস না মানে?''

জোজো বলল, ''আমার এক মামা আছেন, তিনি মাছ খেতে খুব ভালবাসেন। একবার কুড়ি পিস রুই মাছ খেয়ে ফেলেছিলেন। তার পরেই সাতখানা কই মাছ। সেই মামার কথা ভাবছি, আর মাছগুলো আমার পেটে চলে যাচ্ছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''একেই বলে নরাণাং মাতুল ক্রমঃ। মানে, ভাগনেরা সব মামার মতো হয়।''

জোজো বলল, ''আমার সেই মামাকে নিয়ে তো কবিতা লিখেছি। শুনবেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''এখন নয়, এখন নয়। খেতে বসে কবিতা শুনতে নেই। আর খেতে বসে যদি কেউ গান গায়, তা হলে তার বউ পাগল হয়ে যায়!''

খাওয়ার পর খানিক বাদে দেখা হল সিনেমা। হেলেন অফ ট্রয়। গরম এতই বেড়েছে যে, পাখা চললেও সকলে দরদর করে ঘামছে।

ঠিক সন্ধের সময় গরগর করে মেঘ ডেকে উঠল। তারপরই শোঁ শোঁ হাওয়া। এখনই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। এই সময় ওদের সেই অন্য বাড়িটায় যাওয়ার কথা।

জোজো বারান্দায় এসে ঝড় দেখতে দেখতে বলল, ''আকাশ একেবারে কালো। মনে হয়, জোর বৃষ্টি হবে। তাতে ঠান্ডা হয়ে যাবে, আজ রাতে ঘুমোব ভাল করে।''

সন্তু বলল, ''সে কী রে, ঘুমোবি কী? আজ তো সারারাত জেগে থাকার কথা। ভূত দেখতে হবে না?''

এ-বাড়ির অনেক ঘরই একেবারে ভেঙে গিয়েছে, ছাদ নেই। তবে উপরে ওঠার সিঁড়িটা ঠিক আছে। একটা বারান্দা আর-একটা বড় হলঘর প্রায় আস্তই বলা যায়। আর দুটো ছোট ঘরের দেওয়ালে মস্ত মস্ত ফাটল। অনেক কাল আগের একটা ছবি ঝুলছে এক দেওয়ালে, বৃষ্টি পড়ে পড়ে ছবিটা এখন অস্পষ্ট। হয়তো মানুষের ছবি ছিল, এখন মনে হয় পাহাড় আর মেঘের ছবি।

বড় হলঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পাতা হয়েছে কার্পেট। ইলেকট্রিক নেই। বাদশা বলেছিল, বাইরে থেকে তার টেনে এনে আলো জ্বালিয়ে দিতে পারে। কাকাবাবু বলেছেন, 'দরকার নেই। ইলেকট্রিকের আলোয় ভূত আসে না।' তার বদলে এক পাশে জ্বলছে একটা হ্যাজাক বাতি। তার আলো বেশি দূর পৌঁছোয় না। তারপরে সব অন্ধকার। অবশ্য কয়েকটা টর্চ আছে সঙ্গে। আর আনা হয়েছে জলের বোতল, কয়েক বাক্স স্যান্ডউইচ, দুটো বড় ফ্লাস্ক ভরতি চা আর কফি। বাদশা নিজে একটা রাইফেল নিয়ে এসেছে।

সকলে মিলে বসল একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। পিছন দিক দিয়ে কেউ আসতে পারবে না, সামনের দিক থেকে যে-ই আসুক, দেখা যাবে।

বাদশা বলল, "কথা বলা যাবে না কিন্তু, চুপচাপ থাকতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকব? তা কি সম্ভব? তা ছাড়া, কথা বললে দোষ কী? ভূত তো আমাদের ভয় পাবে না। আমাদেরই ভয় দেখাতে আসবে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ভূত মানুষকে ভয় দেখায় কেন? তাতে ভূতেদের কী লাভ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি জানব কী করে? আমি তো ভূতদের সাইকোলজি বুঝি না। এখন বরং জোজোর কবিতা শোনা যাক। সেই মামার কবিতাটা।"

জোজো অমনি বলে উঠল :

"লাভলু মামার গায়ে হলদে জামা
পটাশ করে ছিঁড়ল একটা বোতাম
মাংস-মুড়ি খাচ্ছে এক ধামা
আহা, আমি যদি লাভলু মামা হতাম!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে। কিন্তু ধামা কথাটার মানে কি কেউ বুঝছে? এখন আর তেমন ব্যবহার হয় না।"

সন্তু বলল, "আমি জানি, ঝুড়ির মতো একটা জিনিস। বেতের তৈরি। কিন্তু জোজো, মাংস-মুড়ি খায় কী করে?"

জোজো বলল, "কেন, মাংস দিয়ে মুড়ি খাসনি কখনও? দারুণ লাগে! আমার মামা তো প্রায়ই খান।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘খাওয়া ছাড়া তোমার মামা আর কী করেন?’’

জোজো বলল, ‘‘সাঁতার কাটেন।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সাঁতার কাটেন? সে তো খুব ভাল কথা। আর কিছু করেন না?’’

জোজো বলল, ‘‘হ্যাঁ। সেটাই তো আসল কাজ। সাপ ধরেন।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সাপ ধরেন মানে? কোথায় সাপ ধরেন?’’

জোজো বলল, ‘‘সুন্দরবনে আর নর্থ বেঙ্গলে। একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি লাভলু মামাকে এই কাজ দিয়েছে। অনেক টাকা দেয়।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওরে বাবা, সাপ ধরা তো খুব শক্ত কাজ। তোমার মামা শিখলেন কী করে?’’

জোজো বলল, ‘‘আফ্রিকা থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। উনি তো সাপ ধরায় এক্সপার্ট। কত দেশ থেকে ওঁকে ডাকাডাকি করে, উনি এখন আর যেতে চান না। তার কারণ, আমাদের মতো এত ভাল মাছ তো অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ফরাসি দেশ থেকে চলে এলেন, কারণ, সে-দেশে মুড়ি পাওয়া যায় না। ওঁর প্রতিদিন মুড়ি চাইই চাই। মুড়ি দিয়েও উনি মাছ খান। তার নাম মুড়িঘণ্ট। লাভলুমামা কিন্তু সব সাপ ধরেন না। অনেক সাপ ধরে ধরেও ছেড়ে দেন। উনি শুধু ধরেন ময়াল সাপ। ফরেন কান্ট্রিতে ওই সাপেরই খুব ডিমান্ড। ময়াল সাপ কাকে বলে জানিস তো সন্তু? বাংলায় যাকে বলে পাইথন।’’

সন্তু বলল, ‘‘জানি। সাপ মানে তো বাংলায় যাকে বলে স্নেক!’’

বাদশা হেসে ফেলে বলল, ‘‘এটা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। বলব?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বলো, বলো, গল্প শুনেই তো সময় কাটাতে হবে।’’

বাদশা বলল, ‘‘এটা ঠিক গল্প নয়। ফ্যাক্ট! স্কুলে আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন, বাংলা পড়াতেন। ওঁর বাড়ি চিটাগাং। অনেক কথারই উচ্চারণ শুনে বোঝা যেত না। একদিন উনি কবিতা পড়াচ্ছেন, তার একটা লাইন ছিল, ‘মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকি, ফাটি যাওত ছাতিয়া।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্যার, ‘দাদুরি’ মানে কী?’ উনি বললেন, ‘‘দাদুরি’ মানে জানো না? ভ্যাক, ভ্যাক!’ আমি তো আরও বুঝলাম না, ভ্যাক আবার কী জিনিস? স্যারের

দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকতে উনি বললেন, 'ভ্যাক বুঝলা না? সোজা বাংলায় যারে বলে বেং!' আমি আবার অগাধ জলে, বেং-ও কখনও শুনিনি। ক্লাসের অন্য ছেলেরা হাসছে। স্যার রেগে গিয়ে বললেন, 'ইংরাজি না কইলে তোমরা কিছুই বুঝো না, এই তোমাগো দোষ। ওই ইংরাজিতে যারে কয় ফ্রোগ, ফ্রোগ! দাদুরি মানে ফ্রোগ।''

খুব জোরে হেসে উঠলেন কাকাবাবু। সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এটা বেশ ভাল গল্প। তোরা সব বুঝলি তো?''

সন্তু বলল, ''ফ্রোগ হচ্ছে ফ্রগ, তাই না?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ। বেং হচ্ছে ব্যাং, আর ভ্যাক হচ্ছে ভেক, সেটাও ব্যাঙের আর-এক নাম।''

সন্তু বলল, ''জোজোর সাপের গল্প, তারপরই এল ব্যাঙের গল্প। এর পর?''

বাদশা বলল, ''কাকাবাবু, একটা ব্যাপার দেখুন, ব্যাং তো অতি সাধারণ প্রাণী, কিন্তু তার কত নাম! আরও একটা নাম আছে, মণ্ডূক।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা ঠিক। মণ্ডূক থেকে কূপমণ্ডূক। কুয়োর ব্যাং। এই কথাটা খুব ভাল। কুয়োর ব্যাং তো সারা জীবন কুয়োতেই থাকে। বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছু জানে না, তাই কুয়োটাকেই মনে করে পৃথিবী। অনেক মানুষও হয় এরকম।''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না। আপনি আজকাল বড্ড জ্ঞান দেন। কূপমণ্ডূকের মানে না জানলে কী ক্ষতি হয়?''

কাকাবাবু বললেন, ''কিছুই ক্ষতি হয় না। তুমিও কূপমণ্ডূক হয়েই থাকতে। আমি আজকাল বেশি জ্ঞান দিচ্ছি? ঠিক আছে, আর দেব না। অন্য গল্প হোক, তোমার আর কোনও মামা নেই?''

সন্তু বলল, ''জোজো, কবিতা লিখতে গেলে কিন্তু অনেক কিছু জানতে হয়।''

জোজো বলল, ''আমি এখন তোর চেয়েও ভাল বাংলা লিখতে শিখেছি। তুই শালপ্রাংশু মানে জানিস ?''

সন্তু বলল, ''জানব না কেন? শাল গাছের মতো উঁচু, কিংবা বড়।''

''আর বাসুকি?''

''সাপেদের রাজা। বিরাট লম্বা। দেবতারা যখন সমুদ্রমন্থন করেছিলেন,

তখন মন্দার নামে একটা পাহাড়কে এই সাপটাকে দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে ঘোরানো হয়েছিল।''

কাকাবাবু বললেন, ''এই রে, আবার যে জ্ঞানের কথা এসে যাচ্ছে!''

বাদশা বলল, ''আবার সেই সাপের কথা! বাসুকি আসলে একটা মস্ত বড় পাইথন, তাই না? পাইথনের আর-একটা বাংলা নাম আছে, অজগর। ছেলেবেলায় আমরা অ-আ শিখেছি, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে...''

কাকাবাবু বললেন, ''জোজো, তোমার আর-একটা কবিতা শোনাও!''

জোজো জিজ্ঞেস করল, ''ইংরেজি না বাংলা?''

কাকাবাবু বললেন, ''তোমার যেটা ইচ্ছে। ইংরেজিই হোক।''

জোজো বলে উঠল :

''A crow cries and a crocodile smiles
Each has a choice in different styles.''

কাকাবাবু বললেন, ''বাঃ, এটা তো আরও ভাল হয়েছে।''

সন্তু বলল, ''মডার্ন কবিতা। কাক কখনও কাঁদে না, আর কুমিরও হাসে না।''

বাদশা বলল, ''কুমিরের কান্না বলে একটা কথা আছে। কুম্ভীরাশ্রু। সেটা কিন্তু ফল্‌স কান্না। লোক দেখানো।''

কাকাবাবু বললেন, ''এই রে, এবার বাদশা জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তবে, জোজোর এ-কবিতা কিন্তু সত্যি ভাল। একসঙ্গে বাংলা আর ইংরেজি দু'রকম কবিতাই লিখতে পারে, এটা কম কথা নয়!''

প্রশংসা শুনে জোজো বলল, ''এখন একটু স্যান্ডউইচ খেলে হয় না?''

সন্তু বলল, ''এর মধ্যেই? এখনও আটটা বাজেনি।''

কাকাবাবু বললেন, ''ইচ্ছে হচ্ছে, ও খেয়ে নিক না। এখন কিছু খাক, পরেও আবার খাবে।''

গল্প করতে করতে আরও অনেকটা সময় কেটে গেল।

একসময় জোজো জিজ্ঞেস করল, ''এখানে বাথরুম নেই? নীচে যেতে হবে?''

বাদশা বলল, ''না, নীচে যেতে হবে না। বারান্দার কোণে একটা বাথরুম আছে। ওদিকটা ভাঙা নয়, চিন্তা নেই। টর্চ নিয়ে যাও।''

জোজো বলল, ‘‘ওরে বাবা, একা যেতে পারব না। সন্তু, তুই যাবি আমার সঙ্গে?’’

সন্তু বলল, ‘‘চল, যাচ্ছি তোর সঙ্গে!’’

ওরা দু’জনে বেরিয়ে গেল দুটো টর্চ নিয়ে।

বারান্দাটা অনেকখানি লম্বা, তার শেষে বাথরুম। দরজা খুলে জোজো বলল, ‘‘সন্তু, তুই কাছেই দাঁড়িয়ে থাক। দূরে যাবি না।’’

সন্তু বলল, ‘‘ঠিক আছে।’’

একটু পরেই জোজো ভিতর থেকে বলল, ‘‘এই সন্তু, তুই কী বলছিস?’’

সন্তু বলল, ‘‘কিছু তো বলছি না।’’

‘‘তুই যে আমার নাম ধরে ডাকলি?’’

‘‘কই, আমি তো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।’’

‘‘এই সন্তু, আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবি না বলছি! ভাল হবে না।’’

‘‘কী মুশকিল! তোকে ভয় দেখাব কেন?’’

‘‘সন্তু, সন্তু!’’

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। জোজোর মুখখানা ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে।

সে এসে সন্তুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ‘‘সন্তু, বাথরুমের মধ্যে আর-একজন কেউ রয়েছে। কথা বলছে।’’

সন্তু বলল, ‘‘আমি দেখছি।’’

সন্তু নিজে বাথরুমে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। আগেকার আমলের বাথরুম। বেশ বড়। তবু টর্চের আলোয় সবটাই দেখা যায়। কেউ সেখানে লুকিয়ে বসে নেই। একটা মাত্র জানলা, তাও বন্ধ।

সন্তু বলল, ‘‘কই রে, ভিতরে তো কেউ নেই।’’

জোজো বলল, ‘‘আমি স্পষ্ট শুনেছি, আমার নাম ধরে ডাকছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, তুই বুঝি...’’

সন্তু বলল, ‘‘ওটা তোর মনের ভুল। আগে থেকেই ভয় পেলে এরকম হয়।’’

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে শোনা গেল, ‘‘হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো।’’

সেই হাঁচির শব্দ শুনে সন্তু পর্যন্ত কেঁপে উঠল। শব্দটা ঠিক দরজার কাছে, অথচ কেউ নেই সেখানে।

নিজেকে সামলে নিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''কে? কেউ আছে এখানে?''

এবারে শোনা গেল একটা অদ্ভুত গলায় গানের মতো, ''আয় আয় কাছে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই!''

সন্তুকে ছেড়ে দিয়ে জোজো মারল এক দৌড়।

সন্তু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে টর্চের আলোয় দেখল বারান্দাটা। কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। তবু গলা শোনা যাচ্ছে। তবে কি সত্যিই অশরীরী?

এবার সাধারণ মানুষের মতো গম্ভীর গলায় শোনা গেল, ''যত সব উটকো ঝামেলা। কেন আসে এরা? অ্যাই, তুই এখানে কী চাস?''

সন্তু কোনওক্রমে বলল, ''কিছু না।''

আর তার সাহসে কুলোল না। সেও এবার জোরে পা চালিয়ে ফিরে গেল হলঘরে। জোজো ততক্ষণে চোখ বড় বড় করে হাত-পা নেড়ে সব বলতে শুরু করেছে।

বাদশা বলল, ''বাথরুমে লোকের গলা শোনা যাচ্ছে? তা কী করে হয়? আজ সারা বাড়ি খুব ভাল করে সার্চ করে দেখা হয়েছে, কিছু নেই। বাইরে থেকেও কেউ আসতে পারবে না।''

সন্তু বলল, ''আমিও তো নিজের কানেই শুনলাম।''

বাদশা বলল, ''আমি দেখে আসছি নিজে।''

কাকাবাবু মিটিমিটি হাসছেন। তিনি বললেন, ''যাও, কিছুই দেখতে পাবে না।''

ওরা ফিরে এল মিনিটদশেক পরে।

তিনজনেই গলার আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। কোথাও কারও লুকোনোর কোনও জায়গাই নেই। অশরীরী ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''কী কী বলছিল বলো তো?''

সন্তু আর জোজো দু'জনেই শুনিয়ে দিল কথাগুলো। দ্বিতীয়বার অন্য রকম কথা। দু'জন মানুষ কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, ''*আয় আয় কাছে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই,* এটা তোমরা চিনতে পারলে না? 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমায় ভূতের রাজার গান। যে-গানটা গেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে। স্পেশ্যালভাবে রেকর্ড করায় গলাটা অন্যরকম শুনিয়েছে। সেই ভূতের রাজার গান এখানকার ভূতেরা শিখে নিয়েছে।''

জোজো বলল, "কাকাবাবু, ব্যাপারটা তা হলে কী হচ্ছে? সত্যি ভূত আছে?"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার একটা গান শোনা গেল। প্রথমে মনে হল, অনেক দূর থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে। তারপর খুব কাছে আর জোরে। কোনও মেয়ের গলা, কিছুটা নাকি-নাকি। আবার গানের আওয়াজটা দূরে চলে গেল।

জোজো কাকাবাবুর গা ঘেঁষে এসে বলল, "ওরে বাবা, এসব কী?"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তুমি ভূতের গান শুনতে চেয়েছিলে। তোমার ব্যাগে লিখে রেখেছিলে, *এবার যাচ্ছি শিমুলতলায়/গান শুনব ভূতের গলায়।* ভূতেরা সেটা পড়ে নিয়ে তোমায় গান শোনাচ্ছে।"

গানটা আবার শোনা গেল বেশ কাছে। একবার ডান দিক থেকে, পরে একবার বাঁ দিকে। কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেকটা এই রকম :

ভুলভুলাইয়া ঘ্যাঙোর ঘ্যাং,
ছঁররা মাঁরি ঘুমের গাড়ি,
কঁড়কঁড়াত ফঁরফড়াত,
আঁমার বাড়ি, আঁমার বাড়ি,
যা রে ছাঁড়ি যারে ছাঁড়ি...

কাকাবাবু বললেন, "ভূতের গান হিসেবে খুব সুবিধের নয়। ওগো মেয়ে, আর-একটা ভাল গান শোনাও না!"

গানটা হঠাৎ থেমে গেল।

বাদশা ব্যাকুলভাবে বলল, "কাকাবাবু, এসব কী হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ আপনি হালকাভাবে নিচ্ছেন। আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন প্লিজ! গানটা কোথা থেকে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বোঝাতে গেলে যদি জ্ঞানের কথা হয়ে যায়?"

জোজো কাকাবাবুর একটা হাঁটু ধরে বলল, "কাকাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন ওই কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। হঠাৎ বলে ফেলেছি!"

সন্তু কড়া গলায় বলল, "এই জোজো, কান ধর!"

কাকাবাবু জোজোকে বুকে টেনে নিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। জোজোকে আমি কত ভালবাসি। ওর যা মনে এসেছে, তাই তো বলেছে। বলবে না কেন? মুশকিল

হচ্ছে কী, আমি তোদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই মিশতে চাই। কিন্তু আমার বয়স যে অনেক বেশি! তাই মাঝে মাঝে ওসব কথা বেরিয়ে আসে। মনে হয়, আমি যা জানি, তা তোদেরও জানা উচিত।''

বাদশা বলল, ''আমাদের সেসব শুনতে ভাল লাগে। এখন কী হচ্ছে, আপনি বলুন।''

কাকাবাবু বললেন, ''তোমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, তা হলে এসব কিছুই অলৌকিক বলে মনে হয় না। সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যদি মানুষের কথা শোনা যায়, কিংবা গান ভেসে আসে, অথচ কাউকে চোখে দেখা যায় না, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ নেই তো?''

জোজো বলল, ''বাথরুমে একজন আমার নাম ধরে ডাকল, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ সে আমাকে দেখছে!''

কাকাবাবু বললেন, ''না, তা নয়। মনে করো, তুমি ঘরে বসে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনছ। তা বলে কি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানেই বসে থাকতে হবে? কত লোকই তো আলাদা আলাদা জায়গায় বসে তাঁর গান শোনে।''

বাদশা বলল, ''সে তো রেডিয়ো-টিভিতে, কিংবা ক্যাসেট প্লেয়ারে। আমরা অনেক খুঁজে দেখেছি, সেরকম কিছু নেই।''

কাকাবাবু বললেন, ''নেই, কিন্তু আছে।''

জোজো বলল, ''ফিসফাস কথা, গানটা একবার কাছে, একবার দূরে...''

কাকাবাবু বললেন, ''এসব স্পেশ্যালভাবে রেকর্ড করা যায়। এইসব পুরনো বাড়িতে ঘুলঘুলি থাকে। স্কাইলাইট থাকে। এখনকার বাড়িতে এসব থাকে না বলে জোজোরা দেখেনি।''

সন্তু বলল, ''আমি নর্থ ক্যালকাটায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে দেখেছি। এই তো এই হলঘরেও রয়েছে, অনেক উপরে, একটা-দুটো-তিনটে স্কাইলাইট।''

কাকাবাবু বললেন, ''বারান্দাতেও ঘুলঘুলি আছে। যেখানে চড়াই পাখি আর শালিক পাখিরা বাসা করে। এই স্কাইলাইট-ঘুলঘুলিতে নিশ্চয়ই কয়েকটা ছোট ক্যাসেট প্লেয়ার লুকোনো আছে। রিমোট কন্ট্রোলে কিংবা টাইমার দিয়ে সেগুলো চালু করাও শক্ত কিছু নয়।''

বাদশা খুব অবাক হয়ে বলল, ''ক্যাসেট প্লেয়ার লুকোনো আছে? কে রাখল? চেক করে দেখতে হবে তো!''

কাকাবাবু বললেন, "একটা মই পেলে আমি এখনই প্রমাণ করে দিতে পারি।" তারপর একটু থেমে, একগাল হেসে বললেন, "আমি কিন্তু আজ রাতেই অন্তত একটা ভূত ধরে দিতে পারি।"

বাদশা দুই ভুরু তুলে বলল, "ভূত ধরে দিতে পারেন? কী করে..."

কাকাবাবু তাঁর একটা আঙুল বাদশার বুকে ছুঁইয়ে বললেন, "এই যে! এসব গানটান তোমারই কীর্তি। তুমি রেকর্ড-ক্যাসেটের ব্যাবসা করো, এসবের নানান কায়দাকানুনও তোমার জানা। আই অ্যাম শিয়োর, তোমার ওই লম্বা পাঞ্জাবির দু'পকেটে কয়েকখানা রিমোট কন্ট্রোল আছে। সন্তু, ওর পকেট সার্চ করে দ্যাখ তো!"

বাদশাও এবার হেসে ফেলে বলল, "থাক, সার্চ করতে হবে না। সত্যি কাকাবাবু, আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি সকালবেলায় তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কখনও অভিনয় করেছ কিনা। তোমার ব্যবহার দেখে তখনই আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমাদের সঙ্গে যেন অভিনয় করে চলেছ। তা চালিয়ে গিয়েছ এতক্ষণ পর্যন্ত। কী ব্যাপার বলো তো? কেন এই ভূতের নাটক করলে আমাদের নিয়ে?"

বাদশা বলল, "আসল ব্যাপার কী জানেন, কাল দুপুরেই এ-বাড়ির ভূতেরা ধরা পড়ে গিয়েছে।"

সন্তু বলল, "ভূতেরা ধরা পড়ে গিয়েছে? তার মানে?"

বাদশা বলল, "বুঝতেই পারছ, আসল ভূত নয়। তোমরা তো এসে পৌঁছোলে কাল সন্ধেবেলা। তার আগেই দুপুরবেলা চারটি ছেলে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। তাদের একটা গোপন পার্টি আছে। তারা মাঝে মাঝেই রাতে সিটিং করত এই বাড়িতে। অন্য কেউ যাতে না জানতে পারে, সেই জন্যই তারা নানারকম ভূতের খেলা দেখাত। ভয়ে আর কেউ এদিকে আসত না। কাকাবাবু যে এখানে আসছেন, তা তারা জানতে পেরে গিয়েছিল। আমার কাছে গিয়ে সব স্বীকার করে তারা বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী আসছেন, ওঁর কাছে তো ভূতের জারিজুরি খাটবে না। উনি ঠিক ধরে ফেলবেন। ওঁকে মেরে ফেলতেও চাই না আমরা।' "

কাকাবাবু বললেন, "চাইলেই বুঝি আমাকে মেরে ফেলা যায়?"

বাদশা বলল, "ওদের মধ্যে দুটো ছেলে আপনার ভক্ত। সেই জন্যই আপনাকে মারার চেষ্টাও করবে না। মোট কথা, কালই আমাকে ওরা বলল,

এই বাড়িটা ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। ওরা অন্য বাড়ি খুঁজে নেবে। তার বদলে ওরা কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা চাইল। আমি কুড়ি হাজার দিইনি। তবে ভবিষ্যতে ওরা আর গোলমাল করবে না, এই শর্তে দিয়েছি দশ হাজার। এদিকে আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। তখন তো আর খবর দেওয়ার উপায় নেই। ততক্ষণে আপনারা ট্রেনে চেপে গিয়েছেন। তাই ভাবলাম, আপনারা এখানে খাবেনদাবেন, বেড়াবেন, আর খানিকটা ভূত ধরার উত্তেজনাও হবে। তাই এসব সাজিয়েছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।''

জোজো হতাশভাবে বলল, ''যাঃ, তা হলে আর এবারেও ভূত দেখা হল না? কোনওদিনই কি ভূত দেখতে পাব না?''

কাকাবাবু বললেন, ''পাবে, পাবে। যেখানে আমি থাকব না, সেখানে ভূত দেখতেও পারো। খাঁটি ভূতেরা আমার সামনে আসতে লজ্জা পায়।''

জোজো বলল, ''তা হলে আর এখানে শুধু শুধু রাত জেগে কী হবে? বাদশাদার বাড়িতে গিয়ে নরম বিছানায় শুয়ে পড়লেই হয়।''

সন্তু বলল, ''না, না। আমার এখানেই বেশ ভাল লাগছে। ভূত না-ই বা দেখা হল, তা হলেও সকলে মিলে বেশ গল্প করা যাবে।''

বাদশা বলল, ''আমারও মনে হয়, রাতটা সকলে মিলে এখানে আড্ডা দিয়ে কাটালেই ভাল হবে। এখানকার লোকেরা বুঝবে, ভূতেরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদের দেখে ওদেরও কিছুটা ভয় ভাঙবে।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''ওই ভূতের গানটা কে লিখেছে?''

বাদশা লাজুক মুখ করে বলল, ''আমি।''

''ওই একখানাই? না, আরও রেকর্ড করা আছে?''

''আরও দু'খানা আছে।''

''তা হলে সেগুলোও চালাও। শুনে দেখি।''

''ঠিক আছে। তার আগে আমরা স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে নিই? এখনও অনেক রাত বাকি।''

বাদশা স্যান্ডউইচের প্যাকেটগুলো খুলতে খুলতে বলল, ''কাপে কফি ঢেলে ফেলো তো সন্তু!''

এমন সময় ছাদে দুমদুম আওয়াজ হল।

কাকাবাবু বললেন, ''আবার মেঘ গজরাচ্ছে বুঝি?''

সন্তু বলল, ''ঝড়-বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে।''

জোজো উঠে গিয়ে একটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ‘‘আকাশ পরিষ্কার। আর মেঘ নেই।’’

আবার ছাদে দুমদুম শব্দ হল, এবার আরও জোরে।

চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। তার মধ্যে ছাদের উপরের দুমদুম শব্দ আচমকা বুক কাঁপিয়ে দেয়।

ছাদের উপর সেই শব্দ হতেই কয়েক মুহূর্ত এরা সকলে চুপ করে রইল।

তৃতীয়বারও সেই শব্দ হওয়ার পর বাদশা পাংশু মুখে বলল, ‘‘এটা কীসের আওয়াজ আমি বুঝতেই পারছি না। কাকাবাবু, বিশ্বাস করুন, ছাদে আমি কোনওরকম ভয় দেখাবার ব্যবস্থা করিনি।’’

সন্তু বলল, ‘‘কোনও চোরটোর এলেও শুধু শুধু শব্দ করবে কেন? জন্তুজানোয়ার হতে পারে। বাঁদর আসে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কোনও বাঁদর এত জোরে শব্দ করতে পারে নাকি?’’

জোজো বলল, ‘‘একমাত্র গন্ডার হওয়া সম্ভব!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ছাদের উপর গন্ডার! চমৎকার আইডিয়া!’’

আবার সেই শব্দ।

বাদশা রীতিমতো ভয় পেয়ে বলল, ‘‘এ যে মনে হচ্ছে ছাদটা ভেঙে ফেলবে! এখন আমরা কী করব?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ছাদে কেন এত শব্দ হচ্ছে, তা জানার একমাত্র উপায় ছাদে গিয়ে দেখে আসা। সিঁড়ি আছে?’’

বাদশা বলল, ‘‘হ্যাঁ আছে। চলুন, আমরা সকলে মিলে দেখে আসি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সকলে মিলে কেন? তা হলে মনে হবে, আমরা ভয় পেয়েছি। ভয়টাকে মানলেই ভয় আরও বেড়ে যায়। তোমরা বসো, আমি দেখে আসছি।’’

সন্তু বলল, ‘‘কাকাবাবু, তুমি যাবে কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তোমার অসুবিধে হবে, আমি যাচ্ছি।’’

বাদশা বলল, ‘‘না, না, সন্তু। আমিই যাচ্ছি। আমি দেখে আসছি।’’

সন্তু তবু বলল, ‘‘আমি যাব।’’

বাদশা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘‘তা কখনও হয়! আমার বাড়ি, দায়িত্ব আমার। সঙ্গে তো রাইফেল থাকছেই। চোর-ডাকাত যদি হয়, গুলি করে মাথা উড়িয়ে দেব।’’

সে আর দেরি না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অন্য তিনজন বসে রইল উৎকর্ণ হয়ে।

একসময় জোজো ফিসফিস করে বলল, ‘‘কাকাবাবু তো বলে দিয়েছেন ভূত নেই। তাই শুনে আসল ভূতরা রেগে গিয়েছে। নিজেদের জানান দিচ্ছে।’’

সন্তু বলল, ‘‘ভূতেরা বুঝি দুমদুম শব্দ করে?’’

জোজো বলল, ‘‘ব্রহ্মদৈত্য হতে পারে।’’

বাদশা ফিরে এল একটু পরেই। ফ্যাকাশে মুখে বলল, ‘‘কেউ নেই, কিছু নেই উপরে।’’

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ‘‘কিছুই দেখতে পেলে না?’’

বাদশা বলল, ‘‘আমি ছাদের চারপাশটা দেখে এলাম। কোনও কিছুর চিহ্নই নেই।’’ তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে হাত জোড় করে বলল, ‘‘আপনি বিশ্বাস করুন কাকাবাবু, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘পুরনো বাড়ির ছাদ, নানারকম শব্দ হতেই পারে। গরমকালে বোধহয় খানিকটা এক্সপ্যানশন হয়, তাতে অনেকটা গুড়ু-র গুড়ু-র শব্দ হয়। কিন্তু এরকম তো...’’

আবার দুমদুম শব্দ! কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ছাদটা ভাঙার চেষ্টা করছে।

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘‘আমি একবার দেখে আসবই আসব।’’

বাদশা বলল, ‘‘আমার রাইফেলটা নিয়ে যাও!’’

সন্তু বলল, ‘‘আমি রাইফেল চালাতে জানি না। কাকাবাবু, তোমার রিভলভারটা দাও!’’

সেটা নিয়ে সন্তু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

রেলিং নেই বটে, কিন্তু সিঁড়িটা ভাঙা নয়। উপরের দরজাটা হাট করে খোলা।

ছাদে এসে সন্তুও প্রথমটা কিছুই দেখতে পেল না। ফাঁকা ছাদ, একটা-দুটো ঝাঁকড়া গাছ দেখা যায়, উঠেছে পাশ দিয়ে। ছাদটা দু’ভাগে ভাগ করা। অন্য দিকটাই একেবারে ভেঙে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়েও কিছু দেখা গেল না।

তারপর একটা গাছে বেশ জোরে শব্দ হতেই সন্তু সেদিকে ফিরে তাকাল।

সেই গাছ থেকে একজন কেউ হাত বাড়িয়ে ধরল ছাদের কার্নিশ। মনে হল, একটা গোরিলা। যতই অবিশ্বাসী হোক, রাত্তিরবেলা নির্জন ছাদে এরকম অদ্ভুত কিছু দেখলে বুকটা কেঁপে উঠবেই। বুক কাঁপলেও সন্তু শক্ত করে রিভলভারটা চেপে ধরে রইল। গোরিলা যদি হয়, তা হলে তো রিভলভার থেকেও কোনও লাভ নেই। গুলি করলে আরও বিপদ হবে।

গোরিলা নয়, মানুষ!

কার্নিশ পেরিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিশাল লম্বা-চওড়া পুরুষ, প্যান্ট-কোট পরা, মাথায় একটা টুপি। মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। অনেক গল্পের বইয়ে সাহেব-ভূতদের এরকম ছবি থাকে।

তাড়াতাড়িতে সন্তু টর্চটা আনতে ভুলে গিয়েছে। ভূতের ভয় তার একেবারেই নেই। মানুষ যখন, তখন আর ভয় পাওয়ার কী আছে? বুকের কাঁপুনিটা থেমে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কে? কে ওখানে?"

ছায়ামূর্তি ইংরেজিতে বলল, "ইউ গো ব্যাক। কল মিস্টার রায়চৌধুরী।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হু আর ইউ?"

সে এবার বাংলায় গম্ভীরভাবে বলল, "তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। যাও, তোমার আঙ্কলকে ডাকো।"

সন্তু বলল, "আমার আঙ্কল যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি কে আগে বলুন!"

সে এবার বিচ্ছিরি কর্কশভাবে বলল, "এ যে দেখছি একটা নেংটি ইঁদুর। যা যা, নীচে যা। তোর আঙ্কলকে গিয়ে বল, আমি ভূত!"

সন্তু বলল, "আপনার পরিচয় না দিলে আমি গুলি চালাব। সত্যি ভূত কিনা দেখব।"

সে এবার বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলল, "তুই আবার গুলি চালাতেও শিখেছিস নাকি? চালা তো দেখি।"

সন্তু ট্রিগার টিপল। লোকটাকে ঠিক মারার জন্য নয়, ভয় দেখানোর জন্য। মাথার উপর দিয়ে গেল গুলিটা।

সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গুলি চালাল দু'বার। সন্তুর বুকে। সন্তু পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটি আবার ছাদের পাঁচিল টপকে নেমে গেল গাছ বেয়ে।

নীচের ঘরে কাকাবাবুরা পরপর তিনবার গুলির শব্দ শুনতে পেলেন। বাদশা লাফিয়ে উঠে বলল, "অ্যাঁ? গুলি!"

সে ছুটে যেতেই জোজোও গেল তার পিছনে পিছনে।

কাকাবাবুর ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে একটু দেরি হল।

তিনি দরজার কাছে আসতেই জোজো ডুকরে উঠে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, সন্তু মরে গিয়েছে!"

কাকাবাবু কেঁপে উঠে বললেন, "অ্যাঁ? কী বলছ জোজো? না, না, এ হতেই পারে না!"

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, উপুড় হয়ে পড়ে আছে সন্তু। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ।

বাদশা তার শরীরটা উলটে দিল। সন্তুর বুক থেকে এখনও গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

বাদশা সন্তুর নাড়ি ধরে বসে রইল।

কাকাবাবু পাগলের মতো বলতে লাগলেন, "কী, বাদশা? কী? শুনতে পাচ্ছ কিছু? বাদশা!"

বাদশা হতাশভাবে বলল, "সাড়া নেই। নিশ্বাসও টের পাচ্ছি না।"

কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ভাঙা গলায় বললেন, "সন্তু, সন্তু নেই? অ্যাঁ? অ্যাঁ? কী বলছ বাদশা। মিথ্যে কথা। সন্তু নেই!"

বাদশা বলল, "কাকাবাবু, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। এখনই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যদি কিছু আশা থাকে।" তারপর জোজোকে বলল, "তোমাকেও শক্ত থাকতে হবে। পা দুটো ধরো ওর। গেটের সামনে গাড়ি আছে। কাকাবাবু, আপনি আস্তে আস্তে নামুন। তাড়াহুড়ো করে হোঁচট খাবেন না, তাতে আরও বিপদ হবে।"

বাদশা আর জোজো সন্তুকে বয়ে নিয়ে গেল নীচে।

কাকাবাবু সাবধানে সিঁড়িতে পা ফেলতে লাগলেন। তাঁর দু'চোখ ঠেলে আসছে কান্না। এক জায়গায় তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভূত কখনও মানুষকে গুলি করে না। সাধারণ চোর-ডাকাত কিংবা পার্টির ছেলেরাই বা শুধু শুধু সন্তুকে মারতে যাবে কেন? এ নিশ্চয়ই সেই কর্নেল ধ্যানচাঁদের কাজ। ওরা এমনই নিষ্ঠুর! বাদশা যখন ছাদে উঠল, তখন তো তাকে গুলি করেনি। ওরা নিশ্চয়ই সন্তুকে চিনতে পেরেই মেরেছে।

ইস, কেন তিনি সন্তুকে কর্নেল ধ্যানচাঁদের হুমকির কথা বলে দেননি।

তা হলে সন্তু সাবধান হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু এইরকম ভূতের বাড়িতে ওরা আক্রমণ করতে আসবে, তা কাকাবাবু ভাবতেই পারেননি। এটা তাঁরই ভুল। ধ্যানচাঁদ লোকটা হঠাৎ-হঠাৎই আসবে বলেছিল। সন্তুকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। সন্তু না থাকলে তাঁরও আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না। ধ্যানচাঁদই জিতে গেল।

বাদশা আবার উঠে এসে কাকাবাবুর হাত ধরে বলল, ''নামুন, আমার কাঁধে ভর দিন।''

কাকাবাবু চোখ মুছে ফেললেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মনে মনে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি।

শিমুলতলায় একজন ডাক্তার বাদশার বন্ধু। প্রথমে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল।

তিনি দেখে বললেন, ''বাঁচবার আশা খুব কম। তবে এখনও প্রাণ আছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। কয়েক বোতল রক্ত দিতে হবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''সন্তু আর আমার ব্লাড গ্রুপ একই। আমার শরীর থেকে যত ইচ্ছে রক্ত নিন।''

ডাক্তারটি বললেন, ''সেসব ব্যবস্থা তো এখানে নেই। জসিডি নিয়ে যেতে হবে। কিংবা দেওঘর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।''

কাকাবাবু কাতরভাবে বললেন, ''আপনি দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন।''

ডাক্তার ভার্গব বললেন, ''নিশ্চয়ই যাব।''

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটল জসিডির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে বাদশা নিজে, দারুণ স্পিডে। সন্তুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাকাবাবুর কোলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোজো।

ডাক্তার ভার্গব বললেন, ''বাদশা, অত জোরে চালাচ্ছ, অ্যাকসিডেন্ট হলে তো সকলকে মরতে হবে। তাতে কী লাভ হবে!''

বাদশা বলল, ''আমি ঠিক দেখে চালাচ্ছি।''

এখন অনেক রাত, জসিডি হাসপাতালে কয়েকজন নার্স শুধু ডিউটি দিচ্ছেন। কোনও ডাক্তার নেই।

সন্তুকে ভরতি করানো হল এমার্জেন্সিতে। এখনই অপারেশন করা দরকার। কিন্তু ভার্গব অপারেশন করেন না, তিনি পেটের রোগের চিকিৎসা করেন।

ডাক্তার ভার্গবকে সন্তুর পাশে বসিয়ে রেখে আবার ছুটে বেরিয়ে গেল বাদশা। এই হাসপাতালের ডাক্তার জয়ন্ত দাসকে সে চেনে। তাঁর বাড়ি কোথায় তাও জানে।

কাকাবাবু চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। রক্তমাখা শরীর, চোখ দুটো বোজা। বেঁচে থাকার কোনও চিহ্নই নেই। জোজো দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

দু'জন নার্স এলেন সন্তুর গায়ের রক্তটক্ত পরিষ্কার করতে।

একজন বললেন, ''আহা গো, এই বয়সের ছেলেকে কে এমন করে মারলে?''

অন্যজন বললেন, ''আজকাল তো এই রকমই হয়েছে। কারও দয়ামায়া নেই।''

প্রথমজন ডাক্তার ভার্গবকে জিজ্ঞেস করলেন, ''স্যার, একে বাঁচানো যাবে?''

ডাক্তার ভার্গব বললেন, ''আশা তো করতেই হবে।''

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাদশা টানতে টানতে নিয়ে এল অন্য একজন ডাক্তারকে। তাঁর মাথার চুল উসকোখুসকো, পাজামা আর গেঞ্জি পরা।

বাদশা বোধহয় ওঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনেছে, জামাও পরতে দেয়নি, চুল আঁচড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি সন্তুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ঘরের অন্যদের। মুখখানা গম্ভীর।

ডাক্তার ভার্গব বললেন, ''খুব মৃদু পাল্‌স পাওয়া যাচ্ছে এখনও।''

বাদশা বলল, ''কাকাবাবু, ডাক্তার জয়ন্ত দাস খুব নামী সার্জন।''

ডাক্তার দাস বললেন, ''আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কী হবে জানি না। আপনারা সকলে বাইরে অপেক্ষা করুন, এখানে ভিড় করে থেকে লাভ নেই।''

এরপর চারদিনের মধ্যেও সন্তুর জ্ঞান ফিরল না।

ডাক্তার জয়ন্ত দাস ছাড়াও আরও তিনজন স্থানীয় ডাক্তার দেখছেন তাকে। সন্তুর পেট থেকে একটা গুলি বের করা গিয়েছে। আর-একটা বের করতে তাঁরা সাহস পাচ্ছেন না। হার্টে খোঁচা লেগে যাওয়ার ভয় আছে।

এই চারদিনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে জোজোর। সকলে মিলে একটা গেস্ট হাউজে থাকছেন এই ক'দিন। সব ব্যবস্থা বাদশাই করছে। জোজো এর মধ্যে কিছুই খাচ্ছে না, একটা কথাও বলছে না। কাকাবাবু তবু মাঝে মাঝে শুধু টোস্ট আর কফি খাচ্ছেন। জোজো কোনও খাবারই মুখে দেবে না। বাদশা অনেক চেষ্টা করেছে, তবু জোজো কিছু ছোঁবে না।

কাকাবাবুও তাকে বলেছেন, ''জোজো, একটু কিছু খাও। শুধু শুধু তোমার শরীরও খারাপ করে তো লাভ নেই।''

জোজো শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে কাকাবাবুর দিকে। দু'চোখের নীচে শুকনো জলের রেখা। মুখে কোনও শব্দ নেই। কাকাবাবুর অনুরোধেও সে কিছু খায়নি।

চারদিন পর ডাক্তার জয়ন্ত দাস বললেন, ''কাকাবাবু, এখানে আমরা যত দূর সাধ্য করেছি। এখানে অনেক যন্ত্রপাতি নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস্ করলেন, ''কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে?''

ডাক্তার দাস বললেন, ''ট্রেনে নিয়ে যান। খুব সাবধানে। সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা হলে আপনিই চলুন, অনুগ্রহ করে। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।''

জয়ন্ত দাস বললেন, ''ওরকম করে বলছেন কেন? আমরা কি আপনার কথা, সন্তুর কথা জানি না? সন্তু কত অভিযানে আপনার সঙ্গী হয়েছে। সন্তুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে আমাদের ডাক্তারি শেখা সার্থক হবে। কিন্তু এখানে আর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। গুলিটা এমন বিশ্রী জায়গায় আটকে আছে! আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।''

আগেই টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা ছিল। হাওড়া স্টেশন থেকেই সন্তুকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল পি জি হাসপাতালে। এখানে অনেকেই কাকাবাবুর জানা। তখনই ডাক্তারদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

ঘণ্টা দু'-এক বাদে এই হাসপাতালের সুপার ডাক্তার রফিকুল আহমেদ কাকাবাবুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, ''কাকাবাবু, আপনি এখন বাড়ি যান। কিংবা আমার কোয়ার্টারে গিয়েও বিশ্রাম নিতে পারেন। শুধু শুধু হাসপাতালে বসে থাকবেন কেন? পেশেন্টের যা অবস্থা, এখনই অপারেশন

করা যাবে না। একদিন-দু'দিন অন্তত অবজারভেশনে রাখতে হবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''রফিকুল, একটা সত্যি কথা বলো তো? সন্তুর বেঁচে থাকার চান্স কতখানি?''

ডাক্তার আহমেদ বললেন, ''সত্যি কথাই তো বলতে হবে। পাঁচ জন ডাক্তারকে নিয়ে একটা মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য আনঅফিশিয়ালি। এর চেয়ে ভাল চিকিৎসা আর এদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু কাকাবাবু, খুবই দুঃখের কথা, এখনও পর্যন্ত সন্তুর যা কন্ডিশন, তাতে ওর না-বাঁচার সম্ভাবনাই নাইনটি পার্সেন্ট!''

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, ''তাও তো এখনও টেন পার্সেন্ট আশা আছে। তাই না?''

ডাক্তার আহমেদ বললেন, ''তা ঠিক।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি আশাবাদী। তোমরা শেষ চেষ্টা করো।''

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু একটা ট্যাক্সি নিলেন। সঙ্গে জোজো। সে এখনও কথা বলছে না।

কাকাবাবু জোজোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, ''জোজো, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। ডাক্তাররা বলেছেন, এখনও আশা আছে। আমরা আশা রাখব। তার জোরেই সন্তুকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।''

জোজোকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে কাকাবাবু ট্যাক্সিটা ঘোরাতে বললেন।

এই ক'দিন অন্য কিছু চিন্তা করার সময় পাননি। এখন তাঁর মনে পড়ল সেই কর্নেল ধ্যানচাঁদের কথা। সে নিজেই সন্তুকে গুলি করেছিল, না কোনও খুনিকে পাঠিয়েছিল? ওরা নিশ্চয়ই এখনও তাঁকে অনুসরণ করছে। এই ট্যাক্সির পিছনে ওদের গাড়ি আছে? ধ্যানচাঁদ বলেছিল, সে দিল্লি ফিরে যাবে। সেটা বাজে কথা। লড়াইটা ছ'মাস চলার কথা। সে প্রথম দিনেই আঘাত হানতে এসেছিল।

হঠাৎ কাকাবাবু একটা অদ্ভুত কাজ করলেন।

ট্যাক্সিটা ময়দানের মধ্যে দিয়ে আসছে, রেড রোডের কাছে এসে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, ''এখানে থামাও!''

ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ অবাক। সে জিজ্ঞেস করল, ''আপনি এখানে নামবেন? এই অন্ধকারের মধ্যে?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, এখানে আমার দরকার আছে।''

তিনি ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। তারপর নেমে গেলেন পাশের অন্ধকার মাঠে।

ওরা যদি তাঁকে অনুসরণ করে থাকে, তা হলে আসুক এখানে। সামনাসামনি লড়াই হোক। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। সামনাসামনি লড়াই হলে কেউ তাঁকে মারতে পারবে, এটা কাকাবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। ধ্যানচাঁদ তো বলেছিল, সামনাসামনি লড়াই হবে, পিছন থেকে আক্রমণ করবে না। কই, আসুক এখানে!

রাস্তার ধারের পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। ও কে? সেই লায়লা নাকি? না, এ-মেয়েটি একটু বেশি লম্বা।

একটু পরেই সে মেয়েটি চলে গেল। দূর থেকে হেঁটে আসতে আসতে একটা লোক সেখানে দাঁড়াল সিগারেট ধরাবার জন্য। প্যান্ট-কোট পরা। এ কি ধ্যানচাঁদ? হ্যাঁ, তাই মনে হয়। লোকটি লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে, আর বারবার নিভে যাচ্ছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "এই যে ধ্যানচাঁদ, আমি এখানে।"

লোকটি মুখ তুলে একবার তাকাল, আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর সিগারেটটা ধরিয়েই সে হাঁটতে শুরু করে দিল সামনের দিকে।

কাকাবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোথায় ধ্যানচাঁদ? এসো, তোমার লড়াইয়ের সাধ এবার মিটিয়ে দেব।"

প্রায় আধ ঘণ্টা কাকাবাবু সেখানে রইলেন, কেউ এল না। এবার কাকাবাবু বুঝলেন, কেউ তাঁকে হাসপাতাল থেকে অনুসরণ করেনি।

বড় রাস্তায় এসে তিনি খানিক পরে একটা ট্যাক্সি পেয়ে চলে এলেন বাড়িতে।

কাল বাড়িতে আর সকলে খবর পেয়ে গিয়েছেন। সন্তুর বাবা আর মা ঘুরে এসেছেন হাসপাতাল থেকে।

কাকাবাবু একতলায় বসবার ঘরে সন্তুর বাবার সামনে বসে পড়ে তাঁর হাঁটু চেপে ধরে বললেন, "দাদা, আমার ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই। সন্তু আমার সঙ্গে গিয়েছিল বলেই এরকম বিপদ হল। এখন কী হবে?"

সন্তুর বাবা বললেন, "আরে রাজা, তুই এরকম করছিস কেন? তুই তো জোর করে নিয়ে যাসনি। সন্তু ইচ্ছে করেই তোর সঙ্গে যায়। ও এইসব ভালবাসে। আমরা কোনওদিন ওকে বাধা দিইনি। লেখাপড়াতেও ফাঁকি দেয় না, ভাল রেজাল্ট করে।"

সন্তুর মা বললেন, "তোমরা তো গেলে ভূত দেখতে। হঠাৎ গুলিটুলি করল কে? ভূতে কি গুলি করে?"

কাকাবাবু বললেন, ''না, গুলি করেছে আমার কোনও এক শত্রু।''

সন্তুর মা বললেন, ''তুমি তো অনেক শত্রু মাথায় নিয়ে ঘোরো। কেন যে যাও ওসব করতে। আমার মন বলছে, সন্তু ঠিক বেঁচে যাবে। আমি ওর জন্য পুজো দেব।''

কাকাবাবু বললেন, ''মায়ের মন, তুমি যখন বলছ, সেটাই সত্যি হবে। আমাদের সকলের ইচ্ছেশক্তিই সন্তুকে বাঁচিয়ে তুলবে।''

এরপর দিনের পর দিন চলল, যাকে বলে, যমে-মানুষের লড়াই। এক-এক দিন ডাক্তাররা বলেন, আর আশা নেই। পরের দিনই ডাক্তাররা আবার বলেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

এগারো দিন পর সন্তু প্রথম চোখ খুলল।

ডাক্তার আহমেদ এসে কাকাবাবুকে সেই খবর দিয়ে বললেন, ''এখনও আপনারা ভিতরে যেতে পারবেন না। পেশেন্ট কথা বলার অবস্থায় নেই। আর-একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি কাকাবাবু, সন্তু চোখ মেলেছে বলেই খুব বেশি কিছু আশা করবেন না। কোমা থেকে ফিরে এলে দু'-একদিন ভাল থাকে, কথাটথা বলে। মনে হয়, একেবার ভাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপরই আবার...। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, জানেন তো?''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''এখনও কত পার্সেন্ট আশা করা যায়?''

ডাক্তার বললেন, ''ওই বড়জোর দশ পার্সেন্ট।''

কাকাবাবু বললেন, ''তাই যথেষ্ট। আমি এখনও আশাবাদী। সন্তু বেঁচে উঠবেই।''

ডাক্তার বললেন, ''আমিও তাই প্রার্থনা করছি!''

সেদিন মাঝ রাত্তিরে কাকাবাবুর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

গম্ভীর গলায় একজন বলল, ''কী রাজা রায়চৌধুরী, ভয় পেয়ে গেলেন? আপনার ভাইপোকে মেরেছি বলে এখন বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন? খেলাটা আর চালিয়ে যাওয়ার সাহস নেই? আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''তুমি ফোন করে ভাল করেছ। আমি তোমাকেই খুঁজছি। আমার ভাইপো এখনও মরেনি, সে বেঁচে উঠবে। তবু, তুমি তাকে

মারতে চেয়েছিলে, এর জন্য শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। চলে এসো সামনাসামনি, আমি তোমাকে শেষ করে দেব।''

কর্নেল হা হা করে হেসে বলল, ''এই তো আসল পরিচয়টা বেরিয়ে এসেছে এবার। তুমি বলেছিলে খুব বড়াই করে যে, তুমি মানুষ মারতে চাও না!''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, বলেছিলাম, এখন মত পালটে ফেলেছি। তোমার মতো যারা মানুষের বেশে শয়তান, তাদের মেরে ফেলাই উচিত। তুমি পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকো, ঠিক প্রতিশোধ নেব।''

কর্নেল আবার হেসে বলল, ''তোমার ভাইপোর জন্য তুমি খেপে গিয়েছ। এখন বুঝতে পারছ তো, আমার নির্দোষ ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমার কত কষ্ট হয়েছে? আমি কেন প্রতিশোধ নিতে চাইছি?''

''আমি বারবার বলেছি, তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। আমি তাকে চোখেও দেখিনি। আর তুমি একটা নির্দোষ ছোট ছেলেকে গুলি করে মারতে গেলে? আবার হাসছ? তুমি সত্যিই একটা নরপশু!''

''তুমি আমায় গালাগালি দিচ্ছ, রায়চৌধুরী! শত্রু হচ্ছে শত্রু, তার আবার ছোট-বড় কী? শত্রুর হাতে অস্ত্র থাকলে তাকে প্রথম সুযোগে মেরে ফেলাই নিয়ম। তবু আমি তোমার ভাইপোকে তিনবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তুই নীচে চলে যা। তোর কাকাকে ডেকে দে।' সে শোনেনি, সে-ই প্রথম আমার দিকে গুলি চালিয়েছে।''

''সন্তু প্রথম তোমার দিকে গুলি চালিয়েছে?''

''আলবাত! ওর যদি জ্ঞান ফেরে জিজ্ঞেস কোরো। শুধু শুধু ওর হাতে অস্ত্র দিয়েছিলে কেন? গুলি চালাতেই জানে না, টিপ নেই একটুও। গুলিটা আমার মাথার অনেকখানি উপর দিয়ে গিয়েছে।''

''সন্তুর হাতের টিপ দুর্দান্ত। ও ইচ্ছে করেই তোমাকে মারেনি। শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিল।''

''হা-হা-হা-হা। আমাকে ভয় দেখাবে! আমাকে?''

''অত কথার দরকার নেই। কাল ভোরেই কিংবা সন্ধেবেলা ময়দানে চলে এসো। ডুয়েল হোক। তোমার লড়াইয়ের শখ আমি মিটিয়ে দেব!''

''ময়দানে আমি তোমার সঙ্গে লড়তে যাব? তুমি আগে থেকে পুলিশকে খবর দিয়ে রাখবে। পুলিশ এসে আমায় ধরবে! আমি কি এত বোকা?''

''না, পুলিশকে খবর দেব না। কথা দিচ্ছি।''

''তোমার কথায় কোনও বিশ্বাস নেই। বাঙালিরা খুব মিথ্যে কথা বলে।

আমি তো কলকাতায় অনেক দিন ছিলাম। বাঙালিদের চিনি। একা-একা লড়াই করার সাহস নেই। বাঙালিরা কাপুরুষ!''

''একটা ছোট ছেলেকে একেবারে খুন করার জন্য যারা গুলি চালায়, তারা কাপুরুষেরও অধম। তুমি বাঙালিদের এখনও চেনোনি। একজন খোঁড়া লোকের হাতেই তোমার প্রাণ যাবে। তুমি কোনও একটা জায়গা ঠিক করে বলো, আমি সেখানেই যাব। আর কেউ থাকবে না।''

''সেখানেও তুমি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওসব চলবে না। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে হঠাৎ কোনও জায়গায়। আগে থেকে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। সেটাই এই খেলার নিয়ম। সেটা কালও হতে পারে। দু'সপ্তাহ পরেও হতে পারে।'' লাইন কেটে দিল কর্নেল।

আজ হাসপাতালে সন্তুর কেবিনে সকলে এসেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, বিপদ কেটে গিয়েছে, আর ভয় নেই। অন্য গুলিটাও বের করা গিয়েছে। দুটি গুলিই লেগেছিল হৃৎপিণ্ডের ঠিক নীচে। আর আধ ইঞ্চি উপরে লাগলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হত।

অর্ধেকটা উঁচু হয়ে বসে একটু একটু করে সুপ খাচ্ছে সন্তু। দারুণ রোগা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। গাল দুটো এমন চোপসানো যে, প্রায় চেনাই যায় না। ডাক্তাররা বলেছেন, সন্তুকে আরও দিনদশেক থাকতে হবে হাসপাতালে, তারপর বাড়িতে গিয়েও অন্তত দু'মাস বিশ্রাম। সন্তুর গলার আওয়াজটাও চিঁ-চিঁ হয়ে গিয়েছে। শুধু জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ।

সন্তুর এক পাশে বসেছেন মা, অন্য পাশে জোজো। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

সন্তু বলল, ''আমি কি মরেই যাব ভেবেছিলি নাকি রে জোজো?''

জোজো দু'দিকে জোর মাথা নেড়ে বলল, ''না।''

মা বললেন, ''আমি রোজ তোর নামে প্রার্থনা করেছি।''

সন্তু বলল, ''মরব কেন? কত কাজ বাকি আছে। কাকাবাবু, আমাদের সেই অরুণাচলের গুহায় যেতে হবে না? সেটা কবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''না রে সন্তু, তোর আর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। দাদা যেতে দেবেন না।''

সন্তুর বাবা বললেন, "মোটেই সেই কথা বলিনি আমি। এখন এই অবস্থায় তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েক মাস পরে চাঙা হয়ে উঠুক, তারপর কি আর ওকে আটকানো যাবে!"

মা বললেন, "আটকাতে হলে রাজাকেই আটকানো উচিত। ওর এত বারবার বিপদের মধ্যে যাওয়ার দরকার কী?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু রিটায়ার্ড লোকের মতো বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবে, এ কি ভাবা যায়?"

বাবা বললেন, "রাজা ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে, সন্তুও সেরকম হয়েছে।"

ডাক্তার আহমেদ মাত্র পনেরো মিনিট সময় দিয়েছেন। সন্তুর বেশি কথা বলা বারণ। দেখতে দেখতে কেটে গেল সময়, সকলকে বেরিয়ে আসতে হল।

কাকাবাবু জোজোর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আজকের মতো আনন্দের দিন আমার জীবনে খুব কম এসেছে।"

জোজো বলল, "আজই আমার জীবনের বেস্ট দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কতদিন কিছু খাওনি। খুব ইচ্ছে করছে, আজ তোমাকে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে ভাল করে খাওয়াই। কিন্তু সন্তুকে বাদ দিয়ে তো যাওয়া ঠিক নয়। সন্তু একেবারে সেরে উঠুক, ততদিন খাওয়াটা বাকি থাক।"

জোজো বলল, "আজ অবশ্য আমারও যাওয়ার উপায় নেই। অমিতাভ বচ্চন আমার বাবাকে আর আমাকে 'সোনার বাংলা' হোটেলে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। বাবার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলেন তো দুপুরবেলা। সচিন তেন্ডুলকর কনুইয়ের ব্যথা সারাবার জন্য আসছেন কাল।"

জোজো আবার তার আগেকার স্বভাবে ফিরে গিয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন কাকাবাবু। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। আমি একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঘুরে যাব।"

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। এখন থেকে ছ'মাস একটা বিপদ যে সব সময় তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে, সে-কথা তিনি এখনও কাউকে বলেননি। ইচ্ছে করে তিনি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। কখন কোথা দিয়ে হুট করে এসে যাবে কর্নেল ধ্যানচাঁদ, তার ঠিক নেই। আসে তো আসুক। ধ্যানচাঁদ বলেছিল, পিছন থেকে কখনও আক্রমণ করবে না। আসবে সামনে দিয়ে। সেটাই যা ভরসা। আশা

করি, কথা রাখবে। সামনের দিক থেকে কোনও লোককে আসতে দেখলেই কাকাবাবু চোখ সরু করে তাকাচ্ছেন। সবসময় শক্ত করে রাখতে হচ্ছে কাঁধ। এ কী জ্বালা! অথচ উপায়ও তো নেই। আজও দেখা গেল না কাউকে।

বাড়িতে এসে কাকাবাবু টেলিফোন করলেন ভোপালে। সেখানকার পুলিশের এক কর্তার নাম সুদর্শন পাণ্ডে, কাকাবাবুর বিশেষ পরিচিত। এঁর বড়ভাই কাজ করতেন কাকাবাবুর সঙ্গে। ভোপালের সব টেলিফোন নম্বর বদলে গিয়েছে। আজই লালবাজার থেকে কাকাবাবু কয়েকটা নতুন নম্বর উদ্ধার করেছেন। সুদর্শন পাণ্ডেকে সহজেই পাওয়া গেল তাঁর অফিসে। এঁরা সন্ধের পরেও কাজ করেন।

প্রথমে কুশল সংবাদ আর বাড়ির খবরটবর নেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, ‘‘সুদর্শন, দু’-একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই যে।’’

সুদর্শন পাণ্ডে বললেন, ‘‘বলুন রাজাদা, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কী সাহায্য করতে পারি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘পাঁচ-ছ’ বছর আগে তোমাদের ওখানে ভীমবেটকায় একটা ডাকাতির কেস হয়েছিল, মনে আছে?’’

সুদর্শন বললেন, ‘‘হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? বিখ্যাত কেস। আপনার বুদ্ধিতে রাত্তিরবেলা এক ডজন ক্রিমিনাল ধরা পড়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ে, আপনি এমন কায়দা করেছিলেন, কেউ পালাতে পারল না, ভীমবেটকার অমূল্য সব জিনিস বেঁচে গেল।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সে রাতে ঠিক কারা কারা ধরা পড়েছিল, সেই নামগুলো আমায় দিতে পারবে?’’

সুদর্শন বললেন, ‘‘সেসব নাম তো আমার মনে নেই। আমি কেসটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমি তখন পোস্টেড ছিলাম পাঁচমারি শহরে। তবে ফাইল দেখে বলে দিতে পারি।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, তুমি ফাইল দেখে নামগুলো আমাকে জানাও। আর-একটা কাজ করতে হবে। সুরজকান্ত নামে কেউ সেই সঙ্গে ধরা পড়েছিল কিনা, সেটাও দেখবে।’’

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘ওই সুরজকান্তের পদবি কী?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা আমি জানি না। সেটা জানতে হবে। ওর ফ্যামিলি সম্পর্কেও জানতে চাই।’’

সুদর্শন বললেন, "রাজাদা, শুধু নাম শুনে একটা লোককে ট্রেস করা খুব শক্ত কাজ।"

কাকাবাবু বললেন, "শক্ত কাজ বলেই তো তোমাকে অনুরোধ করছি।"

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে সেই লোকটি?"

কাকাবাবু বললেন, "সে বেঁচে নেই। পাঁচ-ছ' বছর আগে মারা গিয়েছে। সেই রাতে সম্ভবত ভীমবেটকায় উপস্থিত ছিল। সে হিস্ট্রি নিয়ে শখের চর্চা করত। খুব সম্ভবত সুরজকান্ত নামে সে পত্রপত্রিকায় দু'-একটা লেখাও বের করেছিল। তুমি হিস্ট্রির কোনও পণ্ডিতের কাছে খোঁজ নাও, তিনি হয়তো চিনতে পারবেন।"

সুদর্শন বললেন, "ঠিক আছে রাজাদা, আমাকে কিছুটা সময় দিন।"

এক ঘণ্টার মধ্যেই সুদর্শন ফোন করে বললেন, "রাজাদা, আমি ভীমবেটকার ফাইলটা পেয়েছি। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের নামগুলো পড়ে শোনাব?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনাও!"

নামগুলো পড়ার পর সুদর্শন বললেন, "এর মধ্যে সুরজকান্ত বলে কারও নাম নেই। অথচ আপনি যে বললেন, সেই রাতে সে ওখানে উপস্থিত ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "এই লিস্টে রামকুমার পাধি বলে একটা নাম আছে। সে কে?"

সুদর্শন বললেন, "ওরে বাবা, সে তো একটা খুব নটোরিয়াস ক্রিমিনাল। অনেক খুন করেছে। একেবারে গলা কেটে ফেলত। ওকে ধরিয়ে দিয়েই তো আপনি একটা সাংঘাতিক কাজ করেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ওকে চিনতামই না। অন্যদের সঙ্গে ধরা পড়তে পারে। সেই রামকুমার পাধির শেষ পর্যন্ত কী শাস্তি হল?"

সুদর্শন বললেন, "ফাইলে তো লেখা রয়েছে দেখছি, রামকুমার পাধি জেলের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তবে, ওর যা ক্রিমিনাল রেকর্ড, বিচারে ওর ফাঁসি হতই। সেটা বুঝেই সে আত্মহত্যা করেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "সুদর্শন, গত মাসের খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে যে, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি শহরে এক সকালে চায়ের দোকানে একজন লোককে তিনজন আততায়ী এসে গুলি করে খুন করে যায়। পুলিশ আইডেন্টিফাই করেছে যে, ওই খুন হওয়া লোকটির নাম রামকুমার পাধি।

সে একজন কুখ্যাত ক্রিমিনাল। এখন ভোপালের জেলে যে-রামকুমার পাধি আত্মহত্যা করল, আর ছ'বছর পরে মান্ডিতে যে রামকুমার পাধি খুন হল, তারা কি একই লোক, না আলাদা?''

সুদর্শন বললেন, ''এই রে, ওটা হিমাচল প্রদেশের ব্যাপার। আমরা কিছুই জানি না। ঠিক আছে, আমি এটারও খোঁজ নিচ্ছি।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আর সুরজকান্ত সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?''

সুদর্শন বললেন, ''সে তো আরও সময় লাগবে। এত তাড়াতাড়ি হবে না।''

কাকাবাবু বললেন, ''সুদর্শন, তোমার অনেক সময় নিচ্ছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওই সুরজকান্তের ফ্যামিলির খবরটা জানা আমার খুব দরকার। হয়তো আমি ভোপালেও একবার আসব শিগগিরই। আর একবার ভীমবেটকা দেখতে যাব।''

সুদর্শন উৎসাহের সঙ্গে বলল, ''আসুন আসুন, চলে আসুন। শুধু একটু খবর দেবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।''

সন্তু বাড়ি ফিরে আসার দু'দিন পর কাকাবাবু গেলেন শঙ্করপুর। সেখানে একটা গেস্ট হাউজ় বুক করা আছে। সন্তুকে দেখার জন্য যত রাজ্যের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসছে সকাল-বিকেল। বাড়িতে সর্বক্ষণ ভিড়। সকলে একই গল্প শুনতে চায় বারবার। ভূতের বাড়িতে কে গুলি করেছিল সন্তুকে?

গল্প বলার দায়িত্ব জোজোর। সে বানাতে বানাতে ঘটনাটা এত দূর নিয়ে গিয়েছে যে, আসল ঘটনাটা আর চেনারই উপায় নেই। তার গল্পে ভূত আর ডাকাত মিলেমিশে যায়।! সন্তুর গুলিতে তিনটে ডাকাত আর দুটো ভূত ঘায়েল হওয়ার পর সন্তুর রিভলভারে গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ও আর গুলি ভরার সময় পায়নি। তার মধ্যেই একজন ওর বুকে আচমকা গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি না ফুরোলে সন্তুকে মারার সাধ্য ছিল না কারও। সন্তু বিছানায় আধশোওয়া হয়ে এইসব গল্প শুনে মিটিমিটি হাসে। সে জানে, জোজোর গল্পের প্রতিবাদ করে কোনও লাভ নেই।

কাকাবাবু কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে কাটাতে চান সমুদ্রের ধারে। সঙ্গে

কয়েকটা বই এনেছেন। সারাদিন বারান্দায় বসে পড়েন সেই বই। বিকেলবেলা সমুদ্রের ধারে হাঁটতে যান। এদিক-ওদিক নজর রাখেন, কর্নেল আর তার দলের কেউ আছে কি না।

তিন দিনের মধ্যেও তাদের কারও পাত্তা নেই। এই এক ঝামেলা। মারামারি যখন হবেই, তখন চুকে গেলেই তো হয়। দিনের পর-দিন অপেক্ষা করাটাই বিরক্তিকর। ওই কর্নেল লোকটা কোথায় কখন হুস করে উদয় হবে, তারও তো ঠিক নেই।

কোথাও একা থাকতে চাইলেও তো একা থাকা যায় না। গেস্ট হাউজের পাশের ঘরটিতে আছে একটি বাঙালি পরিবার। বাবা, মা একটি বারো বছরের মেয়ে আর সাত বছরের ছেলে। এদের মধ্যে মেয়েটির নাম পূর্বা, সে কাকাবাবুকে চিনে ফেলেছে। নানাসাহেবের সিন্দুক রহস্য ধরে ফেলার পর কাকাবাবুর ছবি ছাপা হয়েছিল অনেক কাগজে। পূর্বা সেই ছবি কেটে রেখেছে। 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাও দেখেছে টিভিতে। সে আর তার বাবা-মা-ও প্রায়ই গল্প করতে আসেন কাকাবাবুর সঙ্গে।

পূর্বার বাবা চাকরি করেন জামশেদপুরে। তিনি দু'-তিনবার বললেন, ''কাকাবাবু, আপনি একবার জামশেদপুরে আসুন না, ওখানেও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবেন।''

কাকাবাবু হালকাভাবে উত্তর দেন, ''আচ্ছা দেখি, যাব কোনও এক সময়।''

পূর্বা হাততালি দিয়ে বলে, ''হ্যাঁ, তা হলে খুব ভাল হবে। কাকাবাবু আমাদের বাড়িতে থাকবেন।। সন্তুকেও নিয়ে আসতে হবে কিন্তু।''

পূর্বার বাবা কাকাবাবুরই সমবয়সি হবেন। তিনিও বলছেন, 'কাকাবাবু', মেয়েও বলছে 'কাকাবাবু'! সকলের কাছেই তিনি মার্কামারা 'কাকাবাবু' হয়ে গিয়েছেন। আজকাল সাধারণত কেউ কাকাকে কাকাবাবু বলে ডাকে না। বলে কাকু কিংবা আঙ্কল। কিন্তু রায়চৌধুরীদের বাড়িতে কাকাবাবু, জ্যাঠাবাবু, মামাবাবু বলে ডাকাই রীতি ছিল। সেই জন্য সন্তু 'কাকাবাবু' বলে, অন্যরাও তাই বলে শুনে শুনে।

একদিন একটা পুলিশের গাড়ি থামল সেখানে।

বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। পুলিশ কেন এখানে? তাঁর কাছে কেউ পাঠিয়েছে? মোবাইল ফোনে কথা হয় বাড়ির

সঙ্গে। সন্তু ভালই আছে। নিজে নিজে খাট থেকে নামতে পারে, কিন্তু এখনও তার হাঁটা নিষেধ।

কাকাবাবু ধরেই নিলেন, পুলিশ এসেছে তাঁর কাছে।

আসলে তা নয়। একটু পরে পূর্বা এসে জানিয়ে গেল, পুলিশ অফিসারটি তার মাসতুতো জামাইবাবু। তিনি কাঁথি থানার ওসি, এমনিই এসেছেন পূর্বাদের খবর নিতে।

পূর্বা তাঁকে নিয়ে এল কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করাতে। লোকটির নাম রমেন দত্ত। তিনিও কাকাবাবুর নাম শুনেছেন। পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, এই রে, যদি কর্নেল ধ্যানচাঁদ কিংবা তার দলবল তাঁর উপর নজর রেখে থাকে, তা হলে তারা নিশ্চয়ই মনে করবে, কাকাবাবুই পুলিশ আনিয়েছেন। ভাববে, তিনি ভয় পেয়েছেন। তা হলে আর এখানে থাকা হবে না।

সেদিন বিকেলে সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ হেঁটে কাকাবাবু গেলেন ধীবরদের গ্রামের দিকে। এখানে একটা পুরনো কালের মন্দির আছে। ভাঙাচোরা অবস্থা, বিশেষ কেউ আসে না। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে কয়েকটা টেরাকোটার মূর্তি আছে। কাকাবাবু ভাবলেন, মূর্তিগুলো দেখে আসবেন। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। খুব শিগগিরই বৃষ্টি নামবে। হাওয়া দিচ্ছে শনশন করে। মন্দিরটার পাশ দিয়েই একটা রাস্তা গিয়েছে। কাকাবাবু আগের দিনও এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখানে একবার থেমেছিলেন। কিন্তু কাছে আসেননি। মন্দিরটার সামনেই দু'ধারে লাইন দিয়ে বসে আছে কয়েকজন ভিখিরি। সবাই বেশ বুড়ো। কাকাবাবুকে দেখেই সবাই 'বাবু দাও, কিছু দাও' বলতে লাগল।

কাকাবাবু প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটি বের করলেন। পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকার নোটই বেশি, আর কিছু খুচরো পয়সা। আর কয়েকটা দু'টাকার নোট আছে। আজকাল ভিখিরিরা খুচরো পয়সা নিতে চায় না।

তিনি দু'টাকার নোটগুলো দিতে লাগলেন এক-একজনকে।

একজন বলল, "হায় ভগবান, সির্ফ দো রুপিয়া! এ বাবু, দশঠো রুপিয়া দেও!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, হবে না। সকলকে সমান দিচ্ছি।"

বুড়িটি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরল।

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, ''লায়লা! দারুণ মেকআপ নিয়ে বুড়ি সেজেছ, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। ঠিক ধরেছি!''

লায়লা হেসে বলল, ''সত্যিই, দারুণ চোখ তো তোমার। দেখি দেখি, তাকাও আমার দিকে।''

লায়লার অন্য হাতে মুঠো করা কিছু ছিল, সেগুলো ছুড়ে দিল কাকাবাবুর চোখে। কাকাবাবু 'উঃ' করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য বুড়িগুলোও খলখল করে হেসে উঠে দাঁড়াল। তাদের হাতের শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়তে লাগল।

লায়লা চেঁচিয়ে বলল, ''সবাই মিলে ওকে ধরো। বয়ে নিয়ে যাব।''

পাঁচ-ছ' জন মিলে কাকাবাবুকে জাপটে ধরলেও কাকাবাবু কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে। টলতে টলতে খানিকটা পিছিয়ে এসে চোখ খুললেন, তাঁর চোখ টকটকে লাল।

কাকাবাবু বললেন, ''আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অন্ধ লোকরাও লড়াই করতে পারে। কেউ আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে এলেই তার আঙুলগুলো কচুকাটা হবে!''

একটা ক্রাচ পড়ে গিয়েছে, অন্য ক্রাচটা তিনি ছাড়েননি। তার দুটো বোতাম টিপতেই একসঙ্গে বেরিয়ে এল ছ'খানা লম্বা ছুরি।

লায়লা অন্যদের বলল, ''সাবধান, কেউ কাছে যাবি না। দু'-একটা পাথর নিয়ে আয় তো। পাথর ছুড়ে মারতে হবে ওর মাথায়।''

কিন্তু বালির জায়গা, পাথর পাবে কোথায়। মন্দিরের ভাঙা ইট খুঁজতে গিয়েই একজন বলে উঠল, ''এই, এই, পুলিশের গাড়ি!''

এমনিই মেয়েগুলো সবাই দৌড়ে পালাতে শুরু করল।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল একটা গাড়ি। জানলা দিয়ে মুখ বের করে রমেন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, ''কী কাকাবাবু, কিছু হয়েছে?''

কাকাবাবুর দু'চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কোনওক্রমে তা সহ্য করে তিনি বললেন, ''না, কিছু হয়নি তো! এমনই দাঁড়িয়ে আছি।''

রমেন দত্ত আবার বললেন, ''গেস্ট হাউজে ফিরবেন? আমার গাড়িতে উঠুন না, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।''

কাকাবাবু বললেন, ''তার দরকার নেই, তুমি এগোও!''

এবারে লায়লারা নির্ঘাত ধরে নেবে, পুলিশ এসে কাকাবাবুকে বাঁচাল।

অথচ এটা কাকতালীয়। এই সময় হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। কাকাবাবু মুখটা তুললেন আকাশের দিকে। বৃষ্টির জলে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

প্লেনটা দেড় ঘণ্টা লেট করে পৌঁছোল। কাকাবাবু ছ'বছর পর এলেন ভোপালে। এয়ারপোর্টটা বেশ বদলে গিয়েছে। অনেক বড় আর আধুনিক হয়েছে। সেবারে সন্তু আর জোজো সঙ্গে এসেছিল। এখানে ছিল ধীরেন, রীনা, আর তাদের দুই ছেলে। খুব আড্ডা আর মজা হয়েছিল। অবশ্য পরে খুনোখুনি আর সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল, তবু লোভীদের কাছ থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল ভীমবেটকার মতো ঐতিহাসিক মূল্যবান জায়গা।

ধীরেন আর রীনারা এখানে নেই। সুদর্শন এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু কোনওক্রমেই পুলিশের সাহায্য নিতে চান না। এর মধ্যে সুদর্শনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু তিনি থাকবেন ঠিক করেছেন একটা হোটেলে। সেটা শহর থেকে একটু বাইরে। এই সময় ভোপালে খুব গরম হয়। তবু কাকাবাবু পরে আছেন একটা মোটা জামা, অনেকটা জ্যাকেটের মতো। উপহার পাওয়া।

আসবার সময় তাঁর বউদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''রাজা, তুমি ওখানে ওই জামাটা পরে যাচ্ছ, তোমার গরম লাগবে না?''

কাকাবাবু বলেছিলেন, ''বউদি, কয়েকবার বৃষ্টিতে ভিজে আসায় বেশ ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। তা ছাড়া, প্লেনে যাওয়ার সময় এক-একদিন এমন ঠান্ডা ছাড়ে যে, শীত লেগে যায়।''

সন্তু এখন বেশ ভাল আছে। তার বুকজোড়া বিশাল ব্যান্ডেজ এখনও রয়েছে বটে, কিন্তু সে নিজেই হেঁটে হেঁটে টয়লেটে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়াশোনাও শুরু করেছে। তার পরীক্ষা সামনে। সে এই অবস্থাতেই পরীক্ষা দেবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, ''কাকাবাবু, এখন হঠাৎ ভোপালে যাচ্ছ কেন?''

কাকাবাবু এখনও ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদের ডেথ-ডেথ খেলার কথা সন্তুকে বলেননি, কাউকেই বলেননি। সন্তুর ওই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''ভীমবেটকার গুহাগুলো আর একবার দেখে আসব ভাবছি। হাতে তো কোনও কাজ নেই এখন!''

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অন্য কাজও আছে, একবার ভীমবেটকাতেও যাবেন ঠিকই।

নিজের ব্যাগটা সংগ্রহ করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। এখন দুপুর দুটো। প্লেনে খাবার দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর পছন্দ হয়নি, খাননি। খিদে পেয়েছে, হোটেলে পৌঁছে কিছু খেতে হবে।

ট্যাক্সির লাইন থেকে প্রথম ট্যাক্সিটাই নিলেন কাকাবাবু।

ড্রাইভার একা, তার কোনও সঙ্গী নেই। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে দরজা খুলে তিনি ভিতরে বসলেন।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, ‘‘কোথায় যাবেন স্যার?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘অলিম্পিক হোটেল। চেনো তো?’’

ড্রাইভার বলল, ‘‘নিশ্চয়ই চিনি। খুব বড় হোটেল।’’

ট্যাক্সিটা এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে ছুটল হাইওয়ে দিয়ে। পিছনে কোনও গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা, তা দেখতে লাগলেন ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কেউ আসছে না বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাল করে হেলান দিয়ে বসতেই চমকে উঠলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে উঠে এল লায়লা। তার হাতে রিভলভার।

সেই রিভলভার একেবারে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে লায়লা বলল, ‘‘একদম নড়বে না। তোমার ভাইপোর চেয়ে আমার টিপ অনেক ভাল। মাথাটা ছাতু করে দেব।’’

কাকাবাবু বিস্ময় সামলে নিয়ে হালকা গলায় বললেন, ‘‘নলটা কপালে ঠেকিয়ে তারপর গুলি করলে তার জন্য আবার টিপ লাগে নাকি?’’

লায়লা বলল, ‘‘ট্রিগারটা টিপলে তোমার মাথার ঘিলুফিলু চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সেটা কি ভাল হবে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘মোটেই ভাল হবে না, তাতে ট্যাক্সিটা নোংরা হয়ে যাবে। ড্রাইভার সাহেবকে কষ্ট করে ধুতে হবে।’’

লায়লা বলল, ‘‘সুতরাং চুপ করে বসে থাকো।’’ তারপর ড্রাইভারকে বলল, ‘‘গাড়ি থামাও। ওকে সার্চ করো।’’

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে কাকাবাবুর পকেট হাতড়ে রিভলভারটা বের করে নিল।

লায়লা বলল, ‘‘ওর ক্রাচ দুটোও সামনে নিয়ে এসো। ও দুটো ডেঞ্জারাস জিনিস।’’

ড্রাইভার সে দুটো সরিয়ে নেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, ‘‘এখন তো

আমার কাছে আর অস্ত্র নেই। এবার তোমার রিভলভারটা সরাও। তুমি ছেলেমানুষ, হঠাৎ ট্রিগারে হাত চলে গেলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।''

লায়লা বলল, ''সরাব। তার আগে তোমার হাত দুটো বাঁধতে হবে। নইলে তুমি ড্রাইভার বা আমার গলা টিপে ধরতে পারো!''

ড্রাইভার একটা লোহার চেন দিয়ে বেঁধে দিল কাকাবাবুর হাত।

ড্রাইভার বলল, ''চোখ দুটোও বাঁধা দরকার। কারণ, আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা এঁর জানার দরকার নেই।''

প্রতি ট্যাক্সিতেই একটা লাল রঙের কাপড় থাকে, সেটা দিয়ে বাঁধা হল কাকাবাবুর চোখ।

কাকাবাবু বললেন, ''বিচ্ছিরি গন্ধ! যাই হোক, রিভলভারটা সরিয়েছ তো?''

লায়লা বলল, ''হ্যাঁ। তবে তুমি কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলে আমি কিন্তু ঠিক গুলি চালাব।''

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল।

কাকাবাবু বললেন, ''কয়েক দিন আগে তুমি আমার চোখে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে দিয়েছিলে। আজ একেবারে চোখ বেঁধে দেওয়ালে। চোখ বাঁধা থাকলে আমি কোনওরকম চালাকি করতে পারি না। তবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি? উত্তর দেবে?''

লায়লা বলল, ''প্রশ্ন শুনি, তারপর ঠিক করব, উত্তর দেব কিনা।''

''তুমি এই ট্যাক্সিটার মধ্যে কোথায় ছিলে? আমি তো ওঠার সময় তোমায় দেখিনি। ড্রাইভারের পাশের সিট খালি ছিল।''

''ভাল করে দ্যাখোনি। আমি ড্রাইভারের পায়ের কাছে শুয়ে ছিলাম। কম্বল গায়ে দিয়ে।''

''তা দেখিনি ঠিকই। আর-একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমি কোন ট্যাক্সিটা নেব, তা তোমরা বুঝলে কী করে? আমি তো অন্য ট্যাক্সিও নিতে পারতাম!''

''তুমি কখন এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে বেরোচ্ছ, তা একজন জানিয়ে দিয়েছে মোবাইল ফোনে। সেই অনুযায়ী এ-ট্যাক্সিটা এগিয়ে আনা হয়েছে। এটা ছাড়াও ওখানে আমাদের সাতখানা ট্যাক্সির সঙ্গে ব্যবস্থা করা ছিল। একটা না-একটায় তো তোমাকে উঠতেই হত।''

''এয়ারপোর্টের মধ্যেও তোমাদের লোক আছে?''

"শুধু কি তাই? কলকাতা থেকেও তো একজন এই প্লেনেই এসেছে তোমার সঙ্গে।"

"ওরে বাবা, অনেক পয়সা খরচ করো তো তোমরা! কিন্তু জানলে কী করে যে, আজই এই প্লেনে আমি ভোপাল আসব?"

"তুমি দশ দিন আগে টিকিট কেটেছ। কোথাকার টিকিট কাটছ, সেটা জানা কি খুব শক্ত?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ, তোমাদের দারুণ নেটওয়ার্ক। টাকাপয়সাও অনেক। আমার সেসব কিছুই নেই। এবার আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন। তোমাদের ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, আমাদের লড়াই হবে সামনাসামনি। কিন্তু এটা কী হচ্ছে? আমার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, চোখ আর হাত বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেলার জন্য। এটাই কি খেলার নিয়ম?"

লায়লা বলল, "হবে, হবে, সামনাসামনি লড়াই হবে। সেই জন্যই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাতে তুমি পুলিশের সাহায্য নিতে না পারো। শঙ্করপুরে তো তুমি পুলিশের সাহায্য নিয়েই বেঁচে গেলে। শঙ্করপুরে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারিনি বলে আমি কর্নেলের কাছে ধমক খেয়েছি। তাই এবারে আর আমি কোনও চান্স নিইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "শঙ্করপুরে আমি পুলিশের সাহায্য নিইনি। গাড়িটা হঠাৎ এসে পড়ল।"

লায়লা ধমক দিয়ে বলল, "ওসব বাজে কথা ছাড়ো। এখানেও তুমি পুলিশের সাহায্য নিতে, সে সুযোগই আমরা দিইনি। তোমাকে বলা হয়েছিল, তুমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখতে পারো। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট উন্ডেড, তা আমরা কী করতে পারি। কর্নেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

কাকাবাবু একটুখানি হেসে বললেন, "আমাকে ধমক দিতে পারে, এমন মেয়েও আছে! ভাল, ভাল, সার্কাসে তুমি কী খেলা দেখাতে?"

লায়লা বলল, "তোমার কোয়েশ্চেন শেষ হয়ে গিয়েছে। নাউ স্টপ!"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝে মাঝে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করে। গান গাইলে মন ভাল হয়ে যায়। একটা গাইব?"

"ইংলিশ অর বেঙ্গলি?"

"বেঙ্গলি হলে তো তুমি বুঝবে না। ঠিক আছে, ইংলিশই গাইছি।"

একটুক্ষণ চুপ করে কাকাবাবু একটা গান বানালেন। তারপর নিজস্ব সুরে ধরলেন সেই গান :

"আ গার্ল প্লেজ উইথ আ টাইগার ইন আ সার্কাস
বাট ইটস নট অ্যালাইভ, ইটস আ কা-কাস!"

লায়লা জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট ইজ কা-কাস?"

কাকাবাবু বললেন, "কথাটার বানান হচ্ছে carcass, কিন্তু 'আর'-টা উচ্চারণ হয় না। কা-কাস মানে, মরা পশু।"

লায়লা ঝুঁকে এসে কাকাবাবুর গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল, "ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? স্টপ ইট। মরবে তো কিছুক্ষণ পরেই। এখনও গানের শখ!"

কাকাবাবু বললেন, "আর যদি না মরি? তা হলে তোমারও যে একটা থাপ্পড় পাওনা রইল আমার কাছে। যদি না মরি, তা হলে এটা শোধ দেব কী করে? আমি যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না।"

লায়লা ভেংচাতে ভেংচাতে বলল, "তুমি আর ছেলে বা মেয়ে, কারও গায়েই হাত তুলতে পারবে না, রাজা রায়চৌধুরী। দিস ইজ় দ্য লাস্ট ডে অফ ইয়োর লাইফ।"

গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা অন্য রাস্তায় ঢুকল বোঝা গেল। এ রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো। গাড়িটা লাফাচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ নয়। এক জায়গায় গাড়িটা থেমে গেল।

কেউ একজন দরজা খুলে বলল, "রায়চৌধুরীকে আনতে পেরেছ? গুড। এবার ওর চোখ খুলে দাও।"

গলার আওয়াজ শুনেই কাকাবাবু বুঝলেন, এ সেই ধ্যানচাঁদ অর্থাৎ কর্নেল।

চোখ খোলার পর কাকাবাবু দেখলেন, এসে পড়েছেন একটা জঙ্গলের মধ্যে। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে দু'জন লোক। কর্নেল ধ্যানচাঁদ যথারীতি পরে আছে প্যান্ট-কোর্ট। একটা বড় মাংসের টুকরো থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সে বলল, "ওয়েলকাম, মিস্টার রায়চৌধুরী। আজই আমাদের খেলা শেষ হয়ে যাবে। তার আগে আমরা একটু কিছু খেয়ে নিচ্ছি। সরি, তোমাকেও দেওয়া উচিত। তুমি কিছু খাবে?"

একটুও চক্ষুলজ্জা না দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, খেতে পারি, আমার খিদে পেয়েছে।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "অ্যাই, রায়চৌধুরীকেও মটন রোস্ট দাও। লায়লা, তুমিও খেয়ে নিতে পারো।"

কাকাবাবু চেন দিয়ে বাঁধা হাত দুটো তুলে দেখালেন।

ধ্যানচাঁদ বলল, "না, না, হাত-বাঁধা অবস্থায় খাবে কী করে? লায়লা, ওর বাঁধন খুলে দাও। ওর কাছে অস্ত্রটস্ত্র নেই তো!"

লায়লা কাকাবাবুর বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, "নেই। তবে, ওই ক্রাচ দুটো দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। ডেঞ্জারাস জিনিস।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি, ওগুলো থেকে ছুরিটুরি বেরিয়ে আসে। গুলিও করা যায় নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, গুলিও করা যায়।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "এ যে দেখছি জেমস বন্ডের অস্ত্রের মতো। ইন্ডিয়ায় তৈরি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সুইডেনে।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "এ দুটো আমার নিজের কালেকশনে রেখে দেব। তোমার তো আর লাগবে না।"

কাকাবাবুকে এক টুকরো মাংস দেওয়া হল। আর-একটা রুটি।

তিনি বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে বললেন, "বাঃ, ভাল মাংস। এবার একটু জল চাই।"

লায়লা এগিয়ে দিল একটা জলের বোতল।

ধ্যানচাঁদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সিগারেট কিংবা চুরুট খাও? তোমার শেষ যা-যা ইচ্ছে আছে, তা মিটিয়ে নিতে পারো।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি ওসব খাই না। আমার আর কিছু চাই না। আই অ্যাম ফাইন।"

ধ্যানচাঁদও খাওয়া শেষ করে হাতটাত ধুয়ে বলল, "শোনো রাজা রায়চৌধুরী, আমি খেলাটা আজই মিটিয়ে ফেলতে চাই। আমি ছ'মাস সময়ের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। তা ছাড়া আমার অন্য কাজ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে ধরেবেঁধে নিয়ে এসে এতজন লোক মিলে মারার চেষ্টা করবে, এটাই বুঝি খেলার নিয়ম ছিল?"

ধ্যানচাঁদ বলল, "না, না, এরা সকলেই চলে যাবে। আমি বলে দিচ্ছি। আমি জেন্টলম্যান, কথার খেলাপ করি না। শুধু লায়লা থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।"

সে ড্রাইভারকে বলল, "তুমি বাকি দু'জনকে নিয়ে ফিরে যাও। এখানে আর আসতে হবে না। আমার গাড়ি একটু দূরে রাখা আছে। আমি তাতেই লায়লাকে নিয়ে ফিরে যাব। এই লোকটার ডেডবডি এখানেই পড়ে থাকবে, হায়না-শেয়ালরা খেয়ে নেবে।"

অন্য লোক দুটিকে তুলে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "আমার ব্যাগ? আমার ব্যাগটা রয়ে গিয়েছে ট্যাক্সিতে।"

ট্যাক্সিটা থেমে গেল।

ধ্যানচাঁদ হেসে বলল, "এখনও ব্যাগের মায়া? ও ব্যাগ তো আর তোমার কাজে লাগবে না রায়চৌধুরী। আ ডেডম্যান নিডস নো লাগেজ। ব্যাগটা এখানে পড়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। তাতে তোমার পরিচয় জেনে যেতে পারে কেউ। ড্রাইভার, যাওয়ার পথে একটা বড় নদী পড়বে। সেই নদীতে ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে যেয়ো!"

কাকাবাবু দু'কাঁধ ঝাঁকালেন। ধ্যানচাঁদ ধরেই নিয়েছে, সে জিতবে। দেখা যাক!

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর ধ্যানচাঁদ বলল, "রায়চৌধুরী, আমি তোমাকে চয়েস দিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করতে চাও, না রিভলভার নিয়ে?"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "তলোয়ারের লড়াই? আজকাল তো কেউ শেখে না।"

ধ্যানচাঁদ বলল, "তুমি জানো কিনা, সেটা বলো। আমাদের ফ্যামিলিতে সকলকে শিখতে হয়। বহুকালের ট্র্যাডিশন।"

কাকাবাবু বললেন, "কর্নেল, তুমি আমার সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই করতে চেয়ো না। আমি আগেই বলে দিচ্ছি, তুমি পারবে না। এটা শুধু আমি নিজের সম্পর্কে গর্ব করে বলছি না। অল ইন্ডিয়া ফেনসিং কম্পিটিশনে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দু'বার। এখন আমি খোঁড়া বলে ছোটাছুটি করতে পারি না, তাতে অসুবিধে হয়। তবু সারা ভারতে এই লড়াইয়ে আমার সমকক্ষ আছে মাত্র চারজন। তুমি হেরে যাবে!"

কর্নেল অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "তুমি অল ইন্ডিয়া কম্পিটশনে জিতেছ? আমি ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে প্রাইজ় পেয়েছি। তুমি পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারবে না আমার সামনে।"

একটা লম্বা ব্যাগ পড়ে আছে একপাশে। সেটার জ়িপ খুলে দুটো খাপে ঢাকা তলোয়ার বের করল ধ্যানচাঁদ।

একটা কাকাবাবুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "লায়লার খুব ইচ্ছে, তোমার বুকে আমি তলোয়ার বসিয়ে দিচ্ছি, সেই দৃশ্যটা ও দেখবে!"

লায়লা বলল, "ফেয়ার গেম হবে। তুমি লড়াই করে হেরে গিয়ে মরবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার শখ মিটিয়ে কর্নেল তোমাকে খুশি করতে পারবে বলে মনে হয় না।"

কাকাবাবুর কাছে ক্রাচ নেই, তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্যানচাঁদ প্রথম আঘাত করতে আসতেই কাকাবাবু সেটা আটকালেন। তারপর ধ্যানচাঁদ লাফিয়ে লাফিয়ে যতবার মারতে এল, কাকাবাবুর হাত চলল বিদ্যুতের মতো। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি।

একবার ধ্যানচাঁদের তলোয়ার খুব জোর ঠেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "অত লাফিয়ে লাভ নেই কর্নেল! সিনেমায় ওরকম দেখায়। তুমি একটু পরেই হাঁপিয়ে যাবে!"

কর্নেল বলল, "শাট আপ! আমাকে উপদেশ দিচ্ছ কোন সাহসে?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে উপদেশ দেব না। এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমার দুর্বলতা কোথায়।"

ধ্যানচাঁদ আরও একবার লাফিয়ে উঠতেই কাকাবাবু তার হাতের মুঠোর ধার ঘেঁষে মারলেন প্রচণ্ড শক্তিতে। ধ্যানচাঁদের হাত থেকে তলোয়ারটা খসে পড়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তুলে নাও। আবার লড়ো।" লায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার বুঝলে তো, কে কার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিতে পারে?"

ধ্যানচাঁদ বলল, "থাক, এ-খেলাটার দরকার নেই। অনেক সময় লাগবে। রিভলভার ভাল। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। পাঁচটার সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

ধ্যানচাঁদ নিজের রিভলভার হাতে নিল।

কাকাবাবু বললেন, "আমি কি আমারটা ফেরত পেতে পারি? নাকি আমাকে খালি হাতে লড়তে হবে?"

ধ্যানচাঁদ বলল, "অফ কোর্স তোমারটা ফেরত পাবে। রায়চৌধুরী, তুমি বোধহয় জানো না, আর্মিতে আমার শার্প শুটার হিসেবে বিশেষ নাম ছিল। তিনটে মেডেল পেয়েছি। আমার একটা গুলিও নষ্ট হয় না।"

কাকাবাবু কোনও মন্তব্য করলেন না। নিজের রিভলভারটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, চেম্বারে গুলি ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর বললেন, ‘‘ঠিক আছে, আমি রেডি।’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘আমি কুড়ি পা দূরে গিয়ে দাঁড়াব। লায়লা এক-দুই-তিন গুনবে। তারপর আমরা একসঙ্গে গুলি চালাব। ফাইট টু কিল!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হলিউডের ওয়েস্টার্ন সিনেমায় যেমন দেখা যায়? কিন্তু সেসব সিনেমার প্রত্যেকটাতেই যে হিরো, সে জেতে। ভিলেন তো কখনও জেতে না।’’

ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘আমি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমিই হিরো।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমি এসেছি আমার ভাইপো সন্তুকে মারার চেষ্টার শাস্তি দিতে। তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কিন্তু সন্তুকে তুমি খুন করতে চেয়েছিলে।’’

ধ্যানচাঁদ রুক্ষ গলায় বলল, ‘‘ওসব বাজে কথা এখন থাক। লায়লা, স্টার্ট।’’

লায়লা গুনতে শুরু করতেই ধ্যানচাঁদ চট করে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। একটা হাত বের করে চালাল গুলি।

কাকাবাবু রিভলভার তুললেনই না।

ধ্যানচাঁদের পরপর দুটো গুলি এসে লাগল কাকাবাবুর বুকে। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। গুলি দুটোই পড়ে গেল মাটিতে।

দারুণ অবাক হয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ধ্যানচাঁদ বলল, ‘‘এ কী হল? এ কী হল?’’

লায়লা চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এ লোকটা জাদু জানে!’’

কাকাবাবু এবার খালি জায়গায় পেয়ে গুলি চালালেন ধ্যানচাঁদের দিকে। গুলি লাগল ডান হাতে। রিভলভারটা ছিটকে গেল।

সে ‘আঃ’ শব্দে আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ‘‘এবার মারব তোমার বুকে। তারপরই খেলা শেষ!’’

অমনি লায়লা ছুটে এসে ধ্যানচাঁদকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, ‘‘না, না, ওকে মারার আগে আমাকে মারতে হবে! প্লিজ, আমাকে মারো!’’

কাকাবাবু ধ্যানচাঁদকে ওভাবে মারতেন না, শুধু আর-একটু আহত করে দিতেন। লায়লাকে মারার তো প্রশ্নই ওঠে না।

লায়লাও বুঝে গিয়েছে যে, কাকাবাবু কোনও মেয়েকে মারবেন না। সে দু'হাত তুলে ওই কথা বলতে বলতে ডান হাতের মুঠো থেকে একটা কিছু ছুড়ে মারল। এবারে আর লঙ্কার গুঁড়ো নয়, একটা গোলমতো জিনিস।

সেটা দেখতে পেয়েই কাকাবাবু মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে দূরে সরে গেলেন যতটা সম্ভব।

বিকট শব্দে ফাটল একটা হ্যান্ড গ্রেনেড। ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা।

কাকাবাবু মাটিতে মুখ গুঁজেছিলেন, আবার মুখ তুলতেই দেখলেন, লায়লা আর ধ্যানচাঁদ দৌড়োচ্ছে একটা ঝোপের দিকে। ব্যথায় চিৎকার করছে ধ্যানচাঁদ।

তারপরই পাওয়া গেল একটা গাড়ির শব্দ।

কাকাবাবু তাঁর বুলেটপ্রুফ জামাটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ''পালাল। ওর লেগেছে, কিন্তু কতটা? ডান হাতের পাঞ্জাটাই কি উড়ে গিয়েছে!''

ক্রাচ দুটো কুড়িয়ে নিয়ে কাকাবাবু জঙ্গলটা পেরিয়ে এলেন। কেউ তাঁকে তাড়া করল না। বড় রাস্তায় এসে তাঁকে অপেক্ষা করতে হল খানিকক্ষণ। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া সহজ নয়। দু'-তিনটি প্রাইভেট গাড়িকে তিনি হাত দেখালেন, কেউ থামল না। তারপর এল একটা মিলিটারি কনভয়। কাকাবাবু একেবারে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাত তুলে রইলেন। সামনের গাড়িটা ব্রেক কষল। এক্কেবারে তাঁর খুব কাছে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, ''কেয়া হুয়া?''

কাকাবাবু বললেন, ''জঙ্গলের মধ্যে আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে। অনুগ্রহ করে কাছাকাছি কোনও বাস রাস্তা কিংবা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আমাকে পৌঁছে দেবেন?''

ড্রাইভারের পাশে বসা একজন অফিসার জিজ্ঞেস করল, ''হু আর ইউ? এই জঙ্গলে কী করছিলে?''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি একজন সায়েন্টিস্ট। এই জঙ্গলে বুনো চা-গাছ পাওয়া যায় কিনা, তার খোঁজ করতে এসেছিলাম।''

অফিসারই জিজ্ঞেস করলেন, ''জঙ্গলের মধ্যে চা-গাছ? এই ভোপালে?''

কাকাবাবু বললেন, ''ইয়েস। ভারতের অনেক জঙ্গলে বুনো চা-গাছ পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলো খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।''

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। বছর দু'-এক আগে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সঙ্গে তিনি চা-গাছের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এতদিন সকলে জানত, চা-গাছ শুধু হয় বাংলা, অসম আর ত্রিপুরায়। সেখানে চাষ করতে হয়। কিন্তু এখন অন্য কোথাও কোথাও জংলি চা-গাছের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

কাকাবাবুর কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে অফিসার তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন চা-গাছের কথা। বস্তার জেলার জঙ্গলে কয়েকটা বুনো চা-গাছ আবিষ্কার করা হয়েছিল। কাকাবাবু শোনালেন সেই কথা।

একটা মোড়ের মাথায় খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কাকাবাবু অফিসার ও ড্রাইভারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লেন সেখানে।

এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলেন হোটেলে। রাতে পুলিশের কর্তা সুদর্শনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল অনেকক্ষণ। কিন্তু কাকাবাবু তাঁকে আজ দুপুরের ঘটনা বিন্দুবিসর্গও জানালেন না। কাকাবাবু সুদর্শনকে যে কয়েকটা বিষয়ে খবরাখবর নিতে বলেছিলেন, তিনি তার কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''কিছুদিন আগে মান্ডি শহরে খুন হয়েছে রামকুমার পাধি। আবার সাড়ে পাঁচ বছর আগে এখানকার জেলে রামকুমার পাধি নামে একজন কুখ্যাত খুনি আত্মহত্যা করেছিল। এটা কী করে সম্ভব? কোন জন আসল?''

সুদর্শন বললেন, ''আসল রামকুমার পাধিই খুন হয়েছে মান্ডিতে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা হলে জেলের মধ্যে যে আত্মহত্যা করেছিল, সে-ই সুরজকান্ত?''

সুদর্শন বললেন, ''হ্যাঁ, তবে তার নাম ছিল সুরজকান্ত ওরফে ছোটেলাল। ছোটেলাল নামেও তাকে অনেকে চিনত। এই ছোটেলালের নামে ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। সে ছিল একটা স্মাগলার দলের চাঁই। দুর্লভ সব মূর্তি, ছবি, পুরনো কালের মুদ্রা পাচার করাতেই সে ছিল এক্সপার্ট। আবার এই ছোটেলালই সুরজকান্ত নামে ইতিহাস বিষয়ে কিছু লেখা ছাপিয়ে ছিল কাগজে। সে নিজেই লিখত, না অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ছাপাত, তা জানা যায় না।''

''ছোটেলাল আর সুরজকান্ত, এর মধ্যে কোনটা তার আসল নাম?''

''বাড়িতে তার নাম ছিল সুরজকান্ত।''

''তার বাড়ি কোথায় ছিল। জানতে পেরেছ?''

''হ্যাঁ। তাও জানা গিয়েছে। তার বাড়ি ছিল ইন্দোর শহরে।''

''তার বাড়িতে কে কে আছে?''

''মা নেই, বাবা আছেন। এক বোন আর এক বড় ভাই।''

''বড় ভাইয়ের নাম জানো?''

''জানি। জগমোহন। এরা পদবি ব্যবহার করে না। এই জগমোহন ছিল আর্মি অফিসার। লেফটেনান্ট কর্নেল হয়েছিল। কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছে।''

''আর্মিতে তার সুনাম কেমন ছিল, তা কি জানা যেতে পারে?''

''তাও আমি খবর নিয়েছি রাজাদা। আর্মিতে জগমোহনের বেশ সুনামই ছিল। লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত। ভাল অফিসার। তবে খানিকটা রগচটা। আর-একটা কথা, রাজাদা, এই জগমোহন-সুরজকান্তর বাবা বিমলাপ্রসাদের নামে খুনের চার্জ ছিল। ভাল করে প্রমাণ হয়নি বলে মাত্র পাঁচ বছরের জেল খেটেছে। এদের অনেক টাকা। কী করে এত টাকার মালিক হল বিমলাপ্রসাদ, তা ঠিক জানা যায় না।''

''ইন্দোরে ওদের বাড়ির ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর জানো?''

''ঠিকানা জানি। ফোন নম্বর আপনাকে পরে জোগাড় করে দেব। আর কিছু?''

''সুরজকান্ত জেলের মধ্যে আত্মহত্যা করেছিল না তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল?''

''জেলের রেকর্ডে আত্মহত্যা বলেই লেখা আছে। ওরা তো আর অন্য কিছু বলে স্বীকার করবে না। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে। সেই সময় ওই জেলের ইনচার্জ ছিলেন আবিদ খান। তিনি রিটায়ার করে এই শহরেই আছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি হয়তো আসল ঘটনাটা বলতে পারবেন। আন-অফিশিয়ালি।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমার পক্ষে ওই আবিদ খানের সঙ্গে দেখা করার একটা অসুবিধে আছে। সুদর্শন, তুমি আর-একটা উপকার করতে পারো? তুমি আবিদ খানকে অনুরোধ করতে পারো, এই হোটেলে আসবার জন্য?''

সুদর্শন বললেন, ''সে ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। আবিদ খান বেশ মজলিশি

মানুষ, গান-বাজনার আসরে প্রায়ই দেখা যায়। এখন রিটায়ার করেছেন, হাতে অনেক সময়। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিচ্ছি। রাজাদা, আপনার শরীর ভাল আছে তো?''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে। শুধু একটু ঠান্ডা লেগেছে। খুব গরমে অনেক সময় ঠান্ডা লেগে যায়।''

সুদর্শন বললেন, ''তা ঠিক। বুকে ঘাম বসে যায়। রাজাদা, আপনি কিন্তু আমাকে এখনও বলেননি যে, আপনি সুরজকান্ত আর তার ফ্যামিলি সম্পর্কে কেন এত ইন্টারেস্টেড?''

কাকাবাবু বললেন, ''জানাব। সময় হলেই জানাব।''

আবিদ খান দেখা করতে এলেন দু'দিন পরে সন্ধেবেলা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ। মস্ত বড় গোঁফ, মাথার চুল সব সাদা। পাজামা আর ঘি রঙের পাঞ্জাবি পরা।

কাকাবাবুকে আদাব জানিয়ে বললেন, ''রায়চৌধুরীসাব, আপনার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়নি বটে, কিন্তু আপনার বুদ্ধিতেই যে ভীমবেটকায় অনেক ক্রিমিনাল ধরা পড়েছিল, তা আমি জানি। আপনি যে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন, তাতেই আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।''

কাকাবাবু তাঁর হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, ''খানসাব, আমার পক্ষে হোটেল থেকে বেরোনোর একটু অসুবিধে আছে। আপনি নিজেই যে এসেছেন, তাতে আমি ধন্য হয়েছি।''

আবিদ খান বললেন, ''না, না, আমি তো শুনেছি, আপনার তবিয়ত ভাল নেই। আমি আসব না কেন? অনেকদিন জেলখানার মধ্যে ছিলাম। এখন রোজ বাইরে ঘুরে বেড়াই, গান-বাজনা শুনতে যাই। আর কোনও কাজ নেই।''

কাকাবাবু বললেন, ''জেলখানার মধ্যে কতরকম ঘটনা ঘটে। আপনার নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা বই লিখে ফেলুন না!''

আবিদ খান হেসে বললেন, ''লেখার ক্ষমতা থাকলে লিখতাম। সকলের কি আর সে ক্ষমতা থাকে? আপনি কী জানতে চান, হুকুম করুন।''

কাকাবাবু বললেন, ''ভীমবেটকায় যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের একজনের

নাম সুরজকান্ত। কিন্তু পুলিশ-রিপোর্টে তার নাম নেই। তাতে আছে রামকুমার পাধির নাম। তাই না?''

আবিদ খান বললেন, ''রামকুমার পাধির নাম ছিল। কিন্তু সে আসলে ধরা পড়েনি। পুলিশ ভুল করে অন্য একজন রামকুমার পাধিকে ধরেছিল।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই অন্যজনই সুরজকান্ত।''

আবিদ খান বললেন, ''না তো। পরে জানা গিয়েছে, তার নাম ছিল ছোটেলাল। অন্য আসামিরাই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। সে ছিল একজন স্মাগলার। একটা ডাকাতির কেস ছিল তার নামে।''

কাকাবাবু বললেন, ''ছোটেলাল আর সুরজকান্ত, একই লোকের দুই নাম। কিন্তু পুলিশের কেসে তার নাম তো বদলানো হয়নি। রামকুমার পাধিই ছিল।''

আবিদ খান বললেন, ''আসল ব্যাপার কী জানেন, যে-পুলিশ অফিসার তাকে আইডেন্টিফাই করেছিল, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওই লোকটাই রামকুমার পাধি। একটা ফোটো এনে দেখিয়েছিল, রামকুমার পাধির সঙ্গে ছোটেলালের চেহারারও কিছুটা মিল আছে। সুতরাং পুলিশের সন্দেহ হয়নি।''

কাকাবাবু বললেন, ''ওই সুরজকান্ত কিংবা ছোটেলাল নামে লোকটা কেমন ছিল, আপনার মনে আছে?''

আবিদ খান বললেন, ''জি, মনে আছে। বেশি বছর আগের তো কথা নয়। লোকটা এমনিতে চুপচাপ থাকত। তবে খুব বদরাগী আর গোঁয়ার। হঠাৎ হঠাৎ রেগে উঠত। একদিন একজন ওয়ার্ডারের নাকে হঠাৎ ঘুসি মেরে রক্ত বের করে দিয়েছিল। আর-একদিন অন্য একজন আসামির সঙ্গে মারামারি করেছিল। অথচ তাকে দেখলে বোঝা যাবে না। মনে হত, ভাল বংশের ছেলে। অনেক ভাল বাড়ির ছেলে বখাটে হয়ে যায়, এ ছিল সেই ধরনের।''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''সুলতান আহমেদ কে ছিল?''

আবিদ খান বললেন, ''সুলতান? সে ছিল ডেপুটি জেলর।''

''সে সুরজকান্তকে জেরা করার সময় খুব মারধর করত?''

''না, না। আসামিদের জেরা করার জন্য তো সি আই ডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হত। জেলের মধ্যে তো জেরা হয় না। জেলে আসামিরা কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে, তা সামলানোর ভার ছিল সুলতান আহমেদের উপর।''

''সুরজকান্ত কি আত্মহত্যা করেছিল? প্লিজ, সত্যি কথাটা বলবেন?''

''না, আত্মহত্যা করেনি।''

“কিন্তু পুলিশ-রিপোর্টে আত্মহত্যার কথাই আছে।”

“আত্মহত্যার মতোই দেখিয়েছিল। একদিন সকালবেলা দেখা গেল, সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। রিপোর্টেও তাই আছে।”

“অথচ আপনি বলছেন, সে আত্মহত্যা করেনি। তা হলে কেউ তাকে মেরে ফেলেছিল। সুলতান আহমেদ নয়? না হলে, পরে সুলতান আহমেদের জেল হল কেন?”

“রায়চৌধুরীসাব, সুলতান আহমেদের জেল হয়েছে, তার কারণ, সে কয়েদিদের খাবারের বরাদ্দ থেকে রেগুলার টাকা চুরি করত। আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।”

“শুধু টাকা চুরির জন্য দশ বছরের জেল হয়?”

“লোকটা মারকুটেও ছিল। একটু গন্ডগোল দেখলেই কয়েদিদের ধরে ধরে পেটাত। একটা উনিশ বছরের ছেলে তার মার খেয়ে হঠাৎ মারা যায়। সেই অপরাধেই তার লম্বা জেল হয়। কিন্তু সে সুরজকান্তকে মারেনি। এটা আমি ভাল করেই জানি।”

“আপনি ভাল করেই জানেন? তার মানে কি আপনিই সুরজকান্তকে মেরে ফেলেছিলেন?”

একগাল হেসে আবিদ খান বললেন, “আমি যদি মারতাম, তা হলে আজ আপনার সামনে তা স্বীকার করতেও আমার অসুবিধে ছিল না। অত পুরনো ঘটনার জন্য তো এখন আমার শাস্তি হবে না। আমি কখনও মারধর করিনি। জীবনে কোনওদিন কাউকে একটা থাপ্পড়ও মারিনি। ওসব নোংরা কাজ করত আমার নীচের অফিসাররা। সুরজকান্তকে মারে অন্য আসামিরা।”

কাকাবাবুর বললেন, “জেলের মধ্যে অন্য আসামিরা একজনকে মেরে ফেলল! এটা কী করে সম্ভব?”

আবিদ খান বললেন, “আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সব আসামিই তো আলাদা আলাদা খুপরিতে থাকে না। কিছু কিছু আসামিকে বড় একটা হলঘরে রাখা হয়। সেখানে একসঙ্গে দশ-বারোজন থাকে। ভীমবেটকার আসামিরা সকলে এইরকম একটা ঘরে ছিল। আপনি তো জানেনই, ওই দশ জন আসলে এক দলের নয়, আলাদা আলাদা দলের। ওদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত। একদিন রাতে ওরা দু’-তিনজনে ঘুমের মধ্যে সুরজকান্তের গলা টিপে মেরে ফেলে। তারপর ওরই জামাটা গলায় বেঁধে লোহার গরাদে ঝুলিয়ে দেয়। রাতে গার্ডরা কিছু টের পায়নি, সকালে দেখা গেল ওই অবস্থা।”

“আপনারা বুঝেছিলেন, ওটা আত্মহত্যার কেস নয়?”

“আমাকে সকালবেলাতেই কোয়ার্টার থেকে ডেকে এনেছিল। দেখলেই বোঝা যায়, ওভাবে আত্মহত্যা করা যায় না। গলায় আঙুলের দাগ। কোনও মানুষই নিজের গলা টিপে মারতে পারে না।”

“রিপোর্টে সেকথা লেখেননি কেন?”

“তা হলে অনেক ঝামেলা হত। এনকোয়ারি হত আমাদের নামে। গাফিলতির অভিযোগ উঠত। আসামিদের ঠিক কে কে সুরজকান্তকে মেরেছে, কী জন্য মেরেছে, তা জানার কোনও উপায় ছিল না। কেউ কিছু স্বীকার করেনি। আমরা কিছুই প্রমাণ করতে পারতাম না। তাই আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়াই সহজ ছিল।”

“পুলিশের মারে কোনও কোনও আসামির মরে যাওয়ার মতো ঘটনাও তো ঘটে?”

“কখনও কখনও ঘটে, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সুরজকান্তের মৃত্যু সেভাবে হয়নি। তা আমি হলফ করে বলতে পারি।”

“অর্থাৎ সুরজকান্ত বা ছোটেলাল নিজেও ছিল একজন ক্রিমিনাল। অন্য ক্রিমিনালদের মধ্যে দু’-একজন তাকে খুন করেছে। কারা খুন করেছে তা জানা যায়নি। আপনারাও রিপোর্টে তা চেপে গিয়েছেন।”

“ঠিক তাই!”

কাকাবাবু বললেন, “ধন্যবাদ। আমার এটুকুই শুধু জানার দরকার ছিল। আবিদ খানসাহেব, আমি কথা দিচ্ছি, এতদিন পর এসব নিয়ে আমি খবরের কাগজটাগজে কিছু জানাব না। আমি জানতে চেয়েছি ব্যক্তিগত কারণে।”

আবিদ খানসাহেব বললেন, “ক্রিমিনালদের মধ্যে এরকম প্রায়ই ঘটে। দেশের মধ্যে হোক, বাইরে হোক, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দু’-একজন মরে।”

কাকাবাবু বললেন, “অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আসুন, এবার চা খাওয়া যাক। আজ কোথায় গান শুনতে যাচ্ছেন?”

আবিদ খান চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে কর্নেলের লোকেরা। ফেলে দিয়েছে নদীতে। তাতে তাঁর জামাকাপড়, কিছু কাগজপত্র আর বই ছিল। টাকাপয়সা অবশ্য ছিল না। আজকাল ক্রেডিট কার্ডের যুগ। হোটেলের নীচেই অনেক দোকান

আছে। সেখানকার একটা দোকান থেকে কাকাবাবু দু'সেট জামাপ্যান্ট আর একটা স্লিপিং সুট কিনে এনেছেন। কাগজ-কলম কিছুই নেই সঙ্গে। তবে এইরকম বড় হোটেলের ড্রয়ারে কিছু লেখার কাগজ আর সস্তার কলম রাখা থাকে। কাকাবাবু সেই একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলেন।

বিমলাপ্রসাদ খুনের অভিযোগে পাঁচ বছর জেল খেটেছে।

তার দুই ছেলে জগমোহন আর সুরজকান্ত।

জগমোহন আর্মি অফিসার হয়। সেখানে তার সুনাম ছিল। তবে স্বভাবে কিছুটা বদরাগী।

সুরজকান্ত প্রথমে বিশেষ কিছু করত না, শখের ইতিহাসের গবেষক সেজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। পরে বদলোকদের পাল্লায় পড়ে সে স্মাগলার ও ডাকাতদের দলে যোগ দেয়।

ভীমবেটকায় সে গুহার ছবি তোলাও যায়নি সে রাতে। সে অন্য ক্রিমিনালদের মতো গুপ্তধনের লোভেই গিয়েছিল। রামকুমার পাধির নামে ভুল করে ধরা হলেও, সেও একজন ক্রিমিনালই ছিল।

জগমোহন সম্ভবত তার এই ভাইয়ের পরিবর্তনের কথা কিছুই জানত না। সে ভেবেছিল যে, তার ছোট ভাইটি সরল, ভালমানুষ।

সে তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। রক্তের বদলে রক্ত।

তার ভাইকে খুন করেছে জেলের মধ্যে অন্য অপরাধীরা। সেসব ঠিকঠাক না জেনে সে প্রতিশোধ নিতে চায় রাজা রায়চৌধুরীকে খুন করে।

অদ্ভুত না?

যদি বা সে রাজা রায়চৌধুরীকে কোনওক্রমে খুন করতেও পারে, তারপর যে তাকে পুলিশে ধরবে, তার ফাঁসিও হতে পারে, সে কথা সে ভাবছে না?

জঙ্গলের মধ্যে রাজা রায়চৌধুরীর গুলিতে সে নিশ্চিত আহত হয়েছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে পালিয়েছে।

এরপর সে কী করবে?

সামনাসামনি লড়াই করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন সে তা ভুলে গিয়ে দলবল জুটিয়ে রাজা রায়চৌধুরীর উপর আক্রমণ চালাতে চাইবে? সেটা খুবই সম্ভব। দেখা যাক, কী হয়!

লিখতে লিখতে কাকাবাবুর ঘুম এসে গেল।

পরদিন তিনি ঠিক করলেন, কলকাতায় ফিরে যাবেন। এখানে তিনি যা জানতে

এসেছিলেন, তা জানা হয়ে গিয়েছে। এখন আর এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কিন্তু কাকাবাবু সবসময় বিপদের ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন। অসীম তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছে, নিজের বাড়ির বিছানায় শুয়ে কোনও অসুখে ভুগে তাঁর মৃত্যু হবে না। একদিন না-একদিন তিনি কোনও পাহাড়ে বা জঙ্গলেই মরবেন। সেটাই তিনি চান।

এত দূর এসে আর-একবার ভীমবেটকা দেখে যাবেন না? একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি চলে এলেন সেখানে। বিকেলবেলা। গাড়িটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে ছোট ছোট পাহাড়। এর মধ্যে কোথায় কোথায় যে গুহাগুলো রয়েছে, তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। অনেকদিন পর এসে কাকাবাবু দেখলেন, ঢোকার জায়গাটার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। সামনে একটা গেট, কিছুটা অংশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাহারাদারও রয়েছে দু'জন। রোজই কিছু লোক দেখতে আসে জায়গাটা। আজও রয়েছে কয়েকটা গাড়ি। কেউ কেউ খাবারদাবার নিয়ে এসে এখানে পিকনিক করে। ছ'টা বেজে গেলেই সকলকে বের করে দেওয়া হবে, সেকথা লেখা আছে একটা বোর্ডে।

কাকাবাবু সোজা চলে এলেন সাধুবাবার আখড়ায়। সবচেয়ে ভাল গুহাটি দখল করে আছেন সাধুবাবা। আগে এখানে কোনও মূর্তিটুর্তি ছিল না। এখন চার হাতওয়ালা একটা পিতলের লম্বা মূর্তি বসানো হয়েছে। সেটা কোন দেবতার মূর্তি, তা ঠিক বোঝা গেল না। সাত-আটজন নারী-পুরুষ ভক্তের সঙ্গে কথা বলছেন সাধুবাবা। শুধু একটা গেরুয়া লুঙ্গি পরা। খালি গা। মুখ-ভরতি দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুলে জটা। বেশ সাধু-সাধুই চেহারা।

কাকাবাবুকে দেখেই তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা থামিয়ে বললেন, "আরে, রাজাজি, আপ কব আয়া?"

কাকাবাবু বললেন, "দু'-তিন দিন আগে। আপনি কথাবার্তা সেরে নিন। আমি অপেক্ষা করছি।"

সাধুবাবা বললেন, "বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।"

কাকাবাবু একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন এক পাশে। ছ'বছর আগের সেই রাতে যে দশ জন ধরা পড়েছিল, তাদের মধ্যে একজন সাধুও ছিল। তবে সে সাধু ইনি নন। ইনি তখন তীর্থ করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে। একজন চেলার উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন এই আখড়া দেখাশোনার। সেই চেলাটিরও গুপ্তধন পাওয়ার লোভ হয়েছিল। সাধু হলেও অনেকের লোভ

যায় না। সেই চেলাটির জেল হয়েছিল মাত্র তিন বছর। ছাড়া পাওয়ার পর সে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

এই সাধুবাবার অবশ্য কোনও দোষ বা লোভের কথা জানা যায় না। সন্ধে হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বিদায় নিল সকলে। এখান থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। পশ্চিম আকাশে অস্ত সূর্যের লাল রেখা। সেদিকে বেশ মেঘ জমেছে। কাকাবাবু ঠিক করেই এসেছেন। আজ আর ফিরবেন না, রাতটা এখানেই কাটাবেন। এই জায়গাতেই কাকাবাবু এক রাতে দশ জন ক্রিমিনালকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল কর্নেলের ভাই সুরজকান্ত। কর্নেল যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, এটাই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সে-রাতে কাকাবাবু পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন। আজ তিনি পুলিশের কোনও সাহায্য চাননি। সুদর্শনও কিছু জানেন না।

অন্য লোকজন সব বিদায় নেওয়ার পর সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বলিয়ে রায়চৌধুরীসাব, কেয়া খবর?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘সাধুজি, আপনি রাতে কী খান?’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘দো-তিন রোটি, থোড়া ডাল, অউর এক চামচ মধু। দিনের বেলা ফল ছাড়া কিছু খাই না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘মধু?’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘এক চেলা মধু দিয়েছে। শিষ্যরাই সবকিছু দেয়।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আজ আর দু’খানা রুটি বেশি বানাবেন? আপনার সঙ্গে খাব। রাতে এখানেই থাকব। একটা এক্সট্রা খাটিয়া আছে নিশ্চয়ই।’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘আপনি আমার মেহমান। আপনি আমার সঙ্গে অন্ন ভাগ করবেন, এতে আমার পুণ্য হবে। কিন্তু রাজাজি, একটা কথা আছে। বাইরের মানুষরা চলে গেলে আমি পূজায় বসি। ধ্যান করি। তিন-চার ঘণ্টা লেগে যায়। তারপর রুটি পাকাই। আপনি কি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমিও বেশি রাতে খাই। আচ্ছা সাধুজি, এখানে কি এখনও রাতে কেউ আসে?’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘মাঝে মাঝে আসে। আওয়াজ শুনতে পাই। তবে কাউকে দেখতে পাই না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এখানে তো সারা রাত দু’জন গার্ডের পাহারা দেওয়ার কথা।’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘কথা তো আছে। কিন্তু কাজ নেই। গার্ড দু’জন একটু রাত হলেই ভেগে যায়। পাহাড়ের নীচের গাঁওয়ে গিয়ে আরামসে শুয়ে থাকে।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা হলে কি এখনও গুপ্তধনের লোভে কেউ কেউ আসে? এখানে গুপ্তধন কিছু নেই, আমি জানি। তবু গুপ্তধনের কথা একবার রটে গেলে লোকের মনে সেটা গেঁথে যায়। যাই হোক, যারা আসে, তারা আপনাকে বিরক্ত করে না তো?’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘নাঃ! শুধু এক রাতে আমি খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, একসময় মনে হল, কেউ আমার খাটিয়াটা ঠেলছে। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, কী একটা জানোয়ার দৌড়ে পালাল। মনে হল, জংলি শুয়োর।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এখানে শুয়োর আছে নাকি?’’

সাধুবাবা বললেন, ‘‘আছে। সেই থেকে আমি ধুনি জ্বালিয়ে রেখে তার পাশে শুই। আগুন দেখলে কোনও জানোয়ার কাছে আসে না।’’

একটু পরে সাধুজি পুজোয় বসলেন।

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন সামনের খোলা জায়গাটার দিকে। সাধুবাবা ঠিকই বলেছেন, পাহারাদার দু’জনই নেই। তারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। লোহার গেটটা তালাবন্ধ। তবে সেই গেট টপকে আসা খুবই সহজ। কর্নেল আর লায়লা কি এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে! ওরা কি হোটেলটার উপর নজর রাখেনি? তাঁর ট্যাক্সিটা অনুসরণ করলেই এখানে পৌঁছে যেতে পারে। দিনেরবেলা দেখা জায়গাগুলোই রাতে রহস্যময় মনে হয়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সত্যিই যেন কেউ লুকিয়ে আছে!

কাকাবাবু ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, ‘‘এসো, কর্নেল! এসো ধ্যানচাঁদ ওরফে জগমোহন, আমাকে মারতে চাও তো এসো, লড়ে যাও! রাজা রায়চৌধুরীকে এ পর্যন্ত অনেকেই মারতে চেয়েছে, তুমি পারো কিনা দেখি! তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে যদি হেরে যাই, তবে মরব। তার জন্য আমি রেডি। আর আমায় যদি মারতে না পারো, তা হলেও তোমাকে আমি ছাড়ব না। সন্তুকে তুমি প্রায় মেরে ফেলেছিলে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে!’’

কোথাও একটু খসখস শব্দ হলেই কাকাবাবু চট করে সেদিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

আজ বোধহয় পূর্ণিমা, এর মধ্যেই আস্ত একখানা চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে আকাশে। গরম কমে গিয়ে স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে

ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা তারা। কী সুন্দর এই সময়টা। চতুর্দিক একেবারে শান্ত।

পিছন দিকে একটা খসখস শব্দ হলেও কাকাবাবু আর ফিরলেন না সেদিকে। না, তিনি আর মৃত্যুর কথা ভাববেন না। এমন শান্ত, সুন্দর জায়গায় খুনোখুনি কিংবা মৃত্যুর কথা চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে আনন্দের। মানুষ কেন নিজে বেঁচে থেকে অন্যদেরও বাঁচতে দেয় না!

ইতালি থেকে একটা চিঠি এসেছে কাকাবাবুর নামে। তাঁর বন্ধু রুডল্ফ আন্তোনিও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আল্পস পাহাড়ে একটা অভিযানে যাওয়ার জন্য। ইতালি, ফ্রান্স আর সুইজ়ারল্যান্ডের মাঝখানে এই আল্পস পাহাড়। ইউরোপে সবচেয়ে বড়, উপরে বরফ ঢাকা। আগে ফরাসি দেশ থেকে ইতালি যেতে হলে এই পাহাড় পেরিয়ে যেতে হত। অনেক উঁচু পর্যন্ত ঘোরানো ঘোরানো সেই রাস্তা এখনও আছে। এখন আল্পসের পেটের ভিতর দিয়ে একটা টানেল তৈরি হয়েছে। খুব সম্ভবত সাড়ে ষোলো কিলোমিটার লম্বা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টানেল। গাড়িটাড়ি সেই টানেলের মধ্যে দিয়ে এদেশ-ওদেশ চলে যেতে পারে অনেক কম সময়ে। অত বড় টানেলের মধ্যে যদি কোনও গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, তাতে খুব বিপদ। অন্য গাড়িও পার হতে পারে না। দারুণ ট্রাফিক জ্যাম, সে এক কেলেঙ্কারি অবস্থা।

কিছুদিন আগে, আল্পসের সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা গাড়িতে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্য কয়েকটা গাড়িতে, অনেক লোকের মৃত্যু হয়। সব কিছু পরিষ্কার করতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। তারপরেও বিপদ কাটেনি। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার স্মৃতিতে এখন সব গাড়িই ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে যায়। তারই মধ্যে এক-এক দিন সন্ধেবেলা হঠাৎ সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খুব জোর আওয়াজ শোনা যায়। কোনও গাড়িটাড়ি কিংবা যন্ত্রপাতির আওয়াজ নয়, অন্যরকম। সেই আওয়াজ শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে।

সেটা কীসের আওয়াজ কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারণা, ওটা পাহাড়ের কান্না। মানুষ অত বড় একটা পাহাড়ের পেট ফুটো করে দিয়েছে, পাহাড় তা সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু পাহাড়ের কি প্রাণ আছে

যে, সে কাঁদবে? সেই আওয়াজটা শুধু সন্ধেবেলাতেই হয় কেন? অনেক ভাবে অনুসন্ধান চালিয়েও সেই শব্দের কারণ বোঝা যায়নি। শব্দটাও থামছে না। অনেক গাড়ির চালক এখন আর ভয়ের চোটে সেই টানেল দিয়ে যায় না। তারা যাচ্ছে সেই উপরের রাস্তা দিয়ে। তাতে সময় বেশি লাগছে, খরচও বেশি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা ওই টানেল কি শেষ পর্যন্ত এমনি-এমনি পড়ে থাকবে?

রুডল্‌ফ আন্তোনিও লিখেছেন যে, তিনি এগারো জনের একটি দল নিয়ে আল্পস পাহাড়ে যাচ্ছেন সামনের মাসে। দরকার হলে অন্তত এক মাস থাকবেন সেখানে। পাহাড়ের কান্না-রহস্যের সমাধান না করে ফিরবেন না। তাঁর খুব ইচ্ছে, রাজা রায়চৌধুরী এই দলে যোগ দিন। রাজা রায়চৌধুরী হিমালয়ের দেশের মানুষ। হিমালয়ের তুলনায় আল্পস তো বাচ্চা ছেলে। রুডল্‌ফ জানেন যে, রাজা রায়চৌধুরী হিমালয়ে অনেক ঘুরেছেন। সুতরাং তিনি পাহাড়ের রহস্য ভাল বুঝবেন।

চিঠিটা পেয়ে কাকাবাবু খুব খুশি হলেন। রুডল্‌ফের সঙ্গে তিনি একবার একটি অভিযানে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায়। মানুষটি খুবই মজাদার, সবসময় হাসি-ঠাট্টা করতে ভালবাসেন। ওঁর সঙ্গে খুব চমৎকার সময় কাটে। পাহাড়ের কান্নার রহস্যটা জানারও খুব ইচ্ছে কাকাবাবুর।

চিঠি লেখার বদলে এখন ই-মেলেই চট করে উত্তর দেওয়া যায়। সম্মতি জানিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য কাকাবাবু কম্পিউটার খুলে বসার পর তাঁর একটা খটকা লাগল। তিনি এখন ইতালি চলে গেলে কর্নেলের চ্যালেঞ্জের কী হবে? সে নির্ঘাত ভাববে যে, কাকাবাবু দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ভয়ে! নাঃ, আগে ওটার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

সন্তু এখন পুরোপুরি সুস্থই হয়ে উঠেছে বলা যায়। সে কলেজেও যেতে শুরু করেছে। শিগগিরই তার পরীক্ষা। কিন্তু হাঁটার বদলে দৌড়োবার চেষ্টা করলেই সন্তুর বুকে একটা তীব্র ব্যথা হয়। সে বুকে হাত চেপে বসে পড়ে। এই ব্যথাটা থাকে প্রায় কুড়ি মিনিট। কোনও ওষুধেই এই ব্যথা সারছে না। এ জন্য কাকাবাবু খুবই চিন্তিত। রিভলভারের গুলির ক্ষত শুকিয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষত কিন্তু রয়েই গিয়েছে। ডাক্তাররাও সেটার কারণ ধরতে পারছেন না। তা হলে কি সন্তুকে এই ব্যথা নিয়েই কাটাতে হবে সারাজীবন? সে আর দৌড়োতে পারবে না। বয়স বাড়লে তো ব্যথাটা আরও বাড়তে পারে।

এ-কথা ভাবলেই কাকাবাবুর সারা শরীর জ্বলে ওঠে রাগে। তখনই আবার প্রতিজ্ঞা করেন, ওই কর্নেলকে শাস্তি দিতেই হবে। জীবনে কখনও তিনি মানুষ খুন করেননি। কিন্তু ওই কর্নেলটাকে মারতে তাঁর হাত কাঁপবে না। ভোপালের সেই জঙ্গলেই তিনি কর্নেলকে মেরে ফেলতে পারতেন। একটুখানি দ্বিধা করেছিলেন। তাই লায়লা নামের মেয়েটা বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে গেল কর্নেলকে নিয়ে।

সন্তুর এই অবস্থা দেখে তিনি ঠিক করেছেন, আর দ্বিধা করবেন না। হয় তিনি নিজে মরবেন, অথবা কর্নেলকে সরিয়ে দেবেন পৃথিবী থেকে। অনেক দিন অবশ্য ওদের দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। কর্নেলের হাতে গুলি লেগেছিল, কিন্তু সেটা কতটা সিরিয়াস? হাতের পাঞ্জায় গুলি লাগলে তো মানুষ মরে না। সেরে উঠতেও বেশি দিন লাগার কথা নয়।

সে কি তবে লুকিয়ে আছে? ভীমবেটকায় কাকাবাবু সারারাত কাটালেন, তখনও সে এল না। ওই জায়গাতেই ওর ভাইকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটাই ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার শ্রেষ্ঠ জায়গা। পুলিশটুলিশ কেউ ছিল না, তাও সে এল না কেন?

কাকাবাবুই ঠিক করেছিলেন যে, কর্নেল যদি কোথাও লুকোবার চেষ্টা করে, তা হলে তিনি ঠিক তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবেন। কিন্তু তার আগে ইতালি আর আল্পস পাহাড় ঘুরে এলে হয় না? এমন লোভনীয় প্রস্তাব!

রুডল্‌ফকে সেদিনই কিছু উত্তর না দিয়ে দু'-তিন দিন চিন্তা করার সময় নিলেন। ঠিক দু'দিন পরে মাঝরাতে এল কর্নেলের টেলিফোন।

গম্ভীর গলায় সে বলল, "রায়চৌধুরী, আমাদের খেলার কথা ভুলে যাওনি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ভুলব কেন? তোমারই তো পাত্তা নেই। এখন কি হাফ টাইম চলছে নাকি?"

কর্নেল বলল, "না, না, সেসব কিছু নয়। তুমি তৈরি থাকো। আবার শিগগির দেখা হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায় দেখা হবে, বলো! আমি নিজেই সেখানে যাব।"

কর্নেল বলল, "আমি জায়গার নাম বলব, আর অমনি তুমি পুলিশকে সেটা জানিয়ে দেবে! ওসব হবে না। তুমি অপেক্ষা করো, হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। হঠাৎ মুখোমুখি আসাটাই এ-খেলার মজা।"

কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, ‘‘আমি দিনের পর-দিন তোমার অপেক্ষায় বসে থাকব? আমার অন্য কাজ নেই?’’

কর্নেল হাসতে হাসতে বলল, ‘‘অত রেগে যাচ্ছ কেন, রায়চৌধুরী? রাগলেই দুর্বল হয়ে যাবে। খেলায় পুরো মনোযোগ দিতে পারবে না। তোমার অন্য কাজ থাকে তো করো না। তাতে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না। তোমার যেখানে খুশি যেতে পারো।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যদি দেশের বাইরে চলে যাই?’’

কর্নেল বলল, ‘‘আর ক’দিন পরেই তো পৃথিবীর বাইরে চলে যাবে!’’

এর পরেই লাইন কেটে দিল কর্নেল।

কাকাবাবু কিছুক্ষণ বিছানার উপর চুপ করে বসে রইলেন। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আর সহজে ঘুম আসবে না। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তিনি উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলেন।

পরদিনই তিনি রুডল্ফকে জানিয়ে দিলেন যে, এখন তাঁর পক্ষে আল্পস পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দুঃখিত। কাকাবাবু ঠিক করলেন, তিনি চুপচাপ বসে থাকবেন না। নিজের কাজ করে যাবেন।

আপাতত তাঁর কাজ একটা বই পড়ে তার ভূমিকা লেখা। তাঁর খুব চেনা একজন ইতিহাসের পণ্ডিত সোমনাথ মন্দিরের উপর একটা বই লিখেছেন, এখনও ছাপা হয়নি। এক হাজার বছর আগে গজনির সুলতান মামুদ এই বিখ্যাত মন্দির আক্রমণ করে লুটপাট করেন। কাকাবাবু নিজে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরির সময় ওই ভাঙা মন্দিরের কাছে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন, অনেক খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কলকাতায় বসে এরকম কাজ করা যায় না। অনবরত মানুষজন দেখা করতে আসে। কোনও নিরিবিলি জায়গায় থাকলে ভাল হয়।

তিন দিন পরেই কাকাবাবু ট্রেনে চেপে চলে এলেন ময়ূরভঞ্জ। সেখান থেকে একটা গাড়িতে চেপে ধুলাগড়, দু’ঘণ্টার মধ্যেই।

পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটায় রয়েছে একটা মস্ত বড় জমিদারবাড়ি। এখনকার দিনে জমিদার বলে কিছু নেই। এইসব বাড়ির মালিকরাও গরিব হয়ে গিয়েছে। তাই বাড়িগুলোও ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ধুলাগড়ের এই বাড়িটা শিমুলতলার সেই ভূতের বাড়িটার চেয়েও বড়, অনেকটা অংশই অটুট আছে। বাড়িতে কিছু লোকজন থাকে, আলো

জ্বলে। তাই এটাকে কেউ ভূতের বাড়ি বলে না।

এই বাড়িটার বর্তমান মালিকরা চার ভাই। তাঁদের দু'ভাই-ই থাকেন ভুবনেশ্বরে, একজন বিলেতে। শুধু একজনই রয়ে গিয়েছেন ধুলাগড়ে। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। গ্রামের মানুষদের বিনা পয়সায় ওষুধ দেন। এই মহেন্দ্র ভঞ্জদেও কাকাবাবুর খুব ভক্ত।

কাকাবাবু আগে দু'বার এখানে এসে থেকেছেন। মহেন্দ্র ভঞ্জদেও তো কাকাবাবুকে দেখে খুব খুশি। তিনি পণ্ডিত মানুষ। ওড়িয়া ভাষা, বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি এরকম অনেক ভাষা জানেন। ইচ্ছে করলে তিনি অন্য ভাইদের মতো বিদেশে কিংবা কোনও বড় শহরে গিয়ে অনেক টাকাপয়সা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু দু'-একবার বাইরে গিয়েও টিকতে পারেননি। এই পাহাড় আর জঙ্গল তাঁকে টানে। গ্রামের গরিব মানুষদের সেবা করার জন্যই তিনি হোমিওপ্যাথি শিখেছেন। গ্রামের লোক তাঁর পুরো নাম জানেও না বোধহয়! সবাই বলে 'মহা-ডাক্তার'।

তিনি কাকাবাবুকে বললেন, ''কী ব্যাপার রাজাবাবু, এবার আপনি একা এলেন? আপনার মন্ত্রী আর সেনাপতি কই?''

কাকাবাবুদের বংশের কেউ কোনওদিন রাজা কিংবা জমিদার ছিলেন না। তবু তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'রাজা'। কেউ রাজাবাবু বলে ডাকলে অনেক সাধারণ লোক ভাবে, সত্যিই বুঝি তিনি রাজা ছিলেন। মহেন্দ্রকে বারণ করলেও শোনেন না। তিনি রাজাবাবু বলে ডাকবেনই।

কাকাবাবু বললেন, ''সন্তু আর জোজোর পরীক্ষা সামনেই। তাই ওদের আনিনি। আমি যদি বেশিদিন থাকি, তখন ওরা বেড়াতে আসবে।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''থাকুন না, এখানে দু'-তিন মাস থাকুন। স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যায়। এখানকার জল এত ভাল যে, পাথরও হজম হয়ে যায়।''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''আমি তো পাথর খাই না। ডাল-ভাত খাই। তা এমনিতেই হজম হয়ে যায়।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''শুধু ডাল-ভাত খাবেন কেন? আপনাকে হরিণের মাংসও খাওয়াব।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি হরিণের মাংসও খাই না। হরিণের মতো একটা সুন্দর প্রাণীকে মারা আমি একেবারেই পছন্দ করি না।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''রাজাবাবু, আপনি শুধু মাছ খেতে ভালবাসেন, তা জানি। এখানে বড় বড় মাছও পাওয়া যায়। আচ্ছা রাজাবাবু, মাছও তো

দেখতে বেশ সুন্দর। কিন্তু তাদের আমরা মেরে খাই।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা ঠিক। কিন্তু কিছু তো খেতে হবে। মাছের স্মৃতিশক্তি খুব কম। ওদের মারার সময় তেমন একটা ব্যথাট্যথাও পায় না। আমরা যে গাছের ফল ছিঁড়ে খাই, পুরো গাছ কেটে কেটে চাল-ডাল হয়, গাছও তো জীবন্ত প্রাণী, তাই না? মাছের চেয়েও গাছের বোধহয় বেশি ব্যথা লাগে।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''সেকথা ভাবলে তো কিছুই খাওয়া যায় না। ঠিক আছে, আপনাকে আমি একদিন খিচুড়ি খাওয়াব। আমি নিজে রান্না করি। ওরকম খিচুড়ি বাঙালিরা রান্না করতে জানে না।''

মহা-ডাক্তারের একটা পুরনো অ্যাম্বাসাডর গাড়ি আছে। সে গাড়ির ড্রাইভারের নাম রাবণ। একালে কারও এরকম নাম শোনাই যায় না। রাবণের বাঁ হাতের তিনটে আঙুল নেই, তবু সে দিব্যি গাড়ি চালাতে পারে। একবার তাকে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঘ আক্রমণ করেছিল, সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সে বেঁচে যায় কোনওক্রমে। শুধু ওই তিনটে আঙুল খোয়া যায়।

ওই গাড়িতে চেপে মহা-ডাক্তার গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করতে যান। কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন একদিন। গ্রামের মানুষ মহা-ডাক্তারকে খুব ভক্তি করে। তিনি ওষুধ দিয়েও কোনও পয়সা নেন না। তবু তারা জোর করে লাউ, কুমড়ো, কাঁচাকলা কিংবা মাছ তুলে দেয় গাড়িতে। চিকিৎসা করা ছাড়া অন্য সময় তিনি নিজের হাতে রান্না করেন নানারকম। আর বই পড়েন। কথা বলার সঙ্গী বিশেষ কেউ নেই। কাকাবাবুকে পেয়ে সর্বক্ষণই গল্প করতে চান।

দিনতিনেক থাকার পরই কাকাবাবু বুঝলেন, এখানে থাকলে তাঁর নিজের কাজ হবে না। মহা-ডাক্তার ছাড়াও গ্রামের কিছু কিছু বয়স্ক লোক হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে কথা বলতে। এ-বাড়িতে মাটির তলায় দু'খানা ঘর আছে। লোহার গেট লাগানো। বোধহয় এককালের জমিদাররা ওসব ঘরে দুষ্ট প্রজাদের বন্দি করে রাখত। বাইরের লোককে এড়িয়ে নিরিবিলিতে থাকার জন্য কাকাবাবু একদিন মাটির তলায় একটা ঘরে কিছুক্ষণ কাটালেন। ভেবেছিলেন, ওখানে বসেই লেখাপড়া করবেন। কিন্তু সে-ঘরে অসহ্য গরম। বাইরের কোনও হাওয়া আসে না। আগেকার দিনের লোকেরা এসব ঘরে থাকত কী করে?

কাকাবাবু কয়েকদিন পর মহা-ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, ''মহেন্দ্র,

তোমাদের একটা আউট হাউজ় ছিল না মোষমুণ্ডি পাহাড়ের উপরে? আমি একবার দেখেছিলাম।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''হ্যাঁ, আছে এখনও। সেটা বিক্রি করার খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু খদ্দের পাচ্ছি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''সেখানে গিয়ে আমি কয়েকটা দিন থাকতে পারি না? বেশ নিরিবিলিতে লেখাপড়া করব?''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''না, না, ওখানে থাকবেন কী করে? কাছাকাছি জন-মনিষ্যি নেই। কিছু নেই। আগেকার দিনে বাপ-দাদারা যখন জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন, তখন ওই বাড়িটা বানানো হয়েছিল। তাঁরা সঙ্গে অনেক দলবল নিয়ে যেতেন। রান্নার লোক, জল তোলার লোক, পাহারাদার সবই থাকত। এখন আর শিকারে যাওয়া হয় না, ওখানেও কেউ থাকে না। সেই জন্যই তো বাড়িটা বিক্রি করতে চাইছি।''

কাকাবাবু বললেন, ''ধরো, আমি যদি বাড়িটা কিনতে চাই, তা হলে একবার দেখে আসতে হবে তো!''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''আপনি কিনতে চাইলেও আপনাকে বিক্রি করব না। কারণ, আমি জানি, আপনি ওখানে থাকতে পারবেন না। কেউ যদি কারখানা টারখানা বানাতে চায়, তার পক্ষে সুবিধেজনক। এখনও ওখানে কিছু কিছু হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে। একা থাকা ওখানে অসম্ভব।''

কাকাবাবু বললেন, ''জানো তো, নেপোলিয়ন বলতেন, অসম্ভব বলে কোনও কিছুই তাঁর ডিকশনারিতে নেই। ইচ্ছে করলে সব কিছুই সম্ভব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, যে রান্নাবান্না করে দেবে। তাতেই আমি ঠিক থেকে যেতে পারব।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''ঠিক আছে, চলুন, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। রান্নার লোক, কাজের লোকও যাবে। কয়েকটা দিন হইহই করে কাটিয়ে আসা যাবে। হরিণ না হোক, দু'-একটা বুনো শুয়োর শিকারও করে ফেলতে পারি।''

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, এই রে, দলবল মিলে গেলে তো তাঁর নিজের কাজ কিছুই হবে না। সারাক্ষণ হইচই করে কাটবে। তিনি মুখে বললেন, ''না, না, মহেন্দ্র, তোমাকে যেতে হবে না। তোমাকে অনেক রোগী দেখতে হয়, সে বেচারারা অসুবিধেয় পড়ে যাবে।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''হ্যাঁ, রোজ রোগী দেখতে হয়। কিন্তু রাজাবাবু,

ডাক্তারদের কি ছুটির দরকার নেই? পৃথিবীতে আর সকলেই ছুটি পায়, শুধু ডাক্তাররাই ছুটি পাবে না! সারা বছর ধরে রোজ রোগী দেখতে হবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''তাও তো বটে। ডাক্তারদের ছুটি অবশ্যই দরকার। তা হলে এক কাজ করা যাক। প্রথমে আমি একাই যাই, আমার কাজ শেষ করি। তারপর তোমাকে খবর দেব। তখন তুমি চলে এলে কয়েকটা দিন একসঙ্গে কাটানো যাবে। এর মধ্যে তুমি রোগীদের তোমার ছুটির কথা জানিয়ে দাও।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''খবর দেবেন কী করে? ওখানে কি টেলিফোন আছে? ইলেকট্রিসিটিও নেই। বাসটাস চলে না, সেরকম রাস্তাও নেই। আগেকার দিনে বাড়ির কর্তারা ঘোড়ায় চেপে যেতেন। আপনাকেও ঘোড়া নিয়েই যেতে হবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তাই যাব। এই খোঁড়া পা নিয়েও আমার ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হয় না। আর খবর দেওয়ার ব্যাপারে, এটা তো মোবাইল ফোনের যুগ। সেই ফোন একটা সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার কাজ শেষ হলেই ফোন করব তোমাকে।''

কাকাবাবুর জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন মহা-ডাক্তার।

পরদিনই ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলেন কাকাবাবু। সঙ্গে আর একটি ঘোড়ায় পিছন পিছন চলল যদু, তার সঙ্গে চাল-ডাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র। সে রান্নাবান্না আর কাকাবাবুর দেখাশোনা করবে। পাহাড়ি উঁচু-নিচু আর এবড়োখেবড়ো রাস্তা। জোরে ঘোড়া ছোটানো যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল। দূর থেকে, টিলার উপরে বাড়িটাকে দেখায় একটা ভাঙা দুর্গের মতো। পাশাপাশি দুটো গম্বুজ। ঘোড়া থামিয়ে সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাকাবাবু আপন মনে হেসে উঠলেন। নিজেকে তাঁর মনে হল, এক বিখ্যাত গল্পের বইয়ের চরিত্রের মতো। তিনি যেন ডন কুইকজোট (অন্য উচ্চারণে ডনকুহাটি) আর যদু হচ্ছে সাঙ্কো পাঞ্জা। একটা ভাঙা বাড়িকে দুর্গ ভেবে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। হাতে একটা বর্শা থাকলেই মানিয়ে যেত!

তিনি যদুকে জিজ্ঞেস করলেন, ''যদু, এ-বাড়ির যা অবস্থা দেখছি, এখানে থাকা যাবে তো? খুব অসুবিধে হবে?''

যদু বলল, ''না, আইজ্ঞা। থাকা যাবে। শুধু একটাই অসুবিধা। পানির বড় অভাব। বাড়ির মধ্যে পানি নাই।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা হলে পানি কোথায় পাওয়া যাবে?''

যদু বলল, ''তিলং ঝরনা আছে। সেখান থেকে সব পানি আনতে হয় আইজ্ঞা।''

কাকাবাবু বললেন, ''রান্নার জল আর খাবার জলটুকু শুধু নিয়ে এসো। এখনও তো মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বৃষ্টির জলে স্নান সেরে নেব।''

গেটের কাছে যেতেই শোনা গেল ফোঁস ফোঁস শব্দ। একটা নয়, তিন-তিনটে কালো রঙের সাপ। যদু অবশ্য সাপ দেখে ঘাবড়াল না। পা দিয়ে ধপাধপ করে আওয়াজ করতেই সাপ তিনটে সরসরিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, ''এই সাপেরা বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল নাকি? যাই হোক, আমাদের তো রাস্তা ছেড়ে দিল দেখছি। দোতলার কোনও ঘরে থাকা যাবে?''

যদু বলল, ''যাবে আইজ্ঞা। দুইখান ঘর ভাল আছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তা হলে চিন্তা নেই। সাপেরা দোতলায় ওঠে না। নীচে নামার সময় একটু সাবধানে নামলেই হবে। সাপের গায়ে পা না পড়লে তো কামড়ায় না।''

যদু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, ''না, না, কোনও ভয় নাই।''

গেটের বাইরে এবং ভিতরেও ঝোপ-জঙ্গল হয়ে আছে। বেশ কয়েকটা ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাল। উপরে ওঠার সিঁড়িটার একপাশও বিপজ্জনক ভাবে ভাঙা। অনেক দিন এ-বাড়িতে কেউ থাকেনি, বোঝা যায়। মহেন্দ্র কেন আপত্তি করছিলেন, তাও বোঝা গেল। তবু, দোতলায় এসে কাকাবাবুর বেশ পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা। ঘরের জানলাগুলো যদিও ভাঙা, কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঢেউ খেলানো পাহাড়, বড় বড় গাছ, আর অনেকখানি আকাশ।

কাকাবাবু সঙ্গে অনেক বইপত্র এনেছেন। সারাদিন এখানে লেখা ও পড়ার জন্য সময়ের কোনও অভাব হবে না। তবে রাতে অসুবিধে হবে। হারিকেন আনা হয়েছে, তাতে পড়াশোনা করা যায় না। তবে, ব্যাটারিচালিত টু-ইন ওয়ান আনা হয়েছে, তাতে রেডিয়ো শোনা যাবে, গানও শোনা যাবে।

প্রথম রাতটা ভালই কেটে গেল।

পরদিন সকালে কাকাবাবু বেরিয়ে পড়লেন আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখতে। ঘোড়া নিয়ে আসায় সুবিধে হয়েছে, পাহাড়ের উপর কাকাবাবুকে

হাঁটতে হবে না। ক্রাচ দুটো রেখে যাবেন ভেবেও সঙ্গে নিলেন। কখন কী কাজে লাগবে, তার ঠিক নেই।

গরম কমে এসেছে অনেকটা। আকাশ প্রায় নীল, মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় সাদা রঙের মেঘ। যখন-তখন দু'-এক পশলা বৃষ্টি হলেও শরৎকাল এসে গিয়েছে বোঝা যায়। যদিও টিলার উপরে বাড়ি, তবু সামনের খানিকটা জায়গা সমতল। বড় বড় গাছ রয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। পাশের পাহাড়টা একেবারে ঘন সবুজ বনে ঢাকা। সমতল জায়গাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বিরাট গাছ। ঠিক দেওয়ালের মতো সেই দিকটা খাড়া নেমে গিয়েছে। পাছে কেউ হঠাৎ পড়ে না যায়, তাই আগেকার জমিদাররা এখানে অনেকটা পাঁচিল গেঁথে দিয়েছিলেন। সে-পাঁচিল অবশ্য এখন অনেকটাই ভাঙা।

দুটো হরিণ কাকাবাবুর ঘোড়ার সামনে দিয়ে জোরে দৌড়ে চলে গেল। একটা ময়ূরও দেখা গেল একটু পরে। এখনও এখানে কিছু কিছু বন্য প্রাণী আছে। একসময় বাঘও ছিল। মহা-ডাক্তার বলেছেন, কয়েকটা বাঘ মাঝে মাঝেই দেখা যায়। কাকাবাবু হরিণ আর ময়ূর দেখে খুশি হলেও মনে মনে ভাবলেন, বাঘটাঘ না দেখাই ভাল।

বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর কাকাবাবু ফিরে এলেন বাড়িটায়। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। এই বাড়িটাকে সারিয়ে টারিয়ে একটা টুরিস্ট লজ কিংবা হোটেল বানালে অনেক লোক এখানে এসে থাকতে পারে। কিন্তু তার আগে রাস্তা বানাতে হবে, জলের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করলে হরিণ-ময়ূররাও আর থাকবে না।

এখানে তিনদিন কেটে গেল কাজের মধ্যে। সোমনাথ মন্দির নিয়ে বইটার ভূমিকা লিখতে গিয়ে ক্রমশই বড় হয়ে যাচ্ছে। এই কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আল্পস পাহাড়ে যাওয়া হল না! চমৎকার সুযোগ ছিল। সে জন্য একটু একটু মনখারাপ হয়। তখন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। এখানকার পাহাড়ে বরফ জমে না বটে, কিন্তু অন্যরকম সুন্দর। কত বড় বড় গাছ। পাহাড়ের আড়ালে যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন মনে হয়, ওই দিকটাতেই যেন স্বর্গ। আর চার-পাঁচদিন কাটাতে পারলেই কাকাবাবুর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

আরও দু'দিন পর সকালবেলা কাকাবাবু ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজকের বাতাসে একটু একটু ঠান্ডা ভাব। কাকাবাবু একবার ঘড়ি দেখলেন। ঘোড়াটা চলছে দুলকি চালে। কাকাবাবু নানারকম পাখির ডাক শুনতে শুনতে এগোচ্ছেন খাদের দিকে। ওখান থেকে উপত্যকা অনেক অনেক নীচে। তাকিয়ে থাকলে গা শিরশির করে, তবু দেখতে ভাল লাগে।

আর-একটা ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ শুনে কাকাবাবু ভাবলেন, যদু বুঝি ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসছে। যদুর যত্নের কোনও ত্রুটি নেই, প্রতিদিন তিন-চারবার জল এনে দেয়। রান্নাও বেশ ভাল।

কয়েকটা বড় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অন্য এক অশ্বারোহী। তার মুখে একটা কালো রঙের মুখোশ। কাকাবাবুর চিনতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেরি হল। এ তো সেই কর্নেল!

কাকাবাবু বললেন, ''খুঁজে পেয়েছ জায়গাটা? আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।''

কর্নেল বলল, ''খুঁজে পাওয়া এমন কী শক্ত ব্যাপার? আমি কালকেই এসে লক্ষ করছিলাম, তুমি কোনও পুলিশের ব্যবস্থা করেছ কিনা!''

কাকাবাবু বললেন, ''সেই জন্যই এত দূরে এসেছি। এখানে কোনও পুলিশ আসবে না। অন্য কেউ আসবে না। তুমি মুখোশ পরেছ কেন?''

কর্নেল বলল, ''বেশ করেছি। শোনো রায়চৌধুরী, আজই হবে শেষ ডুয়েল। দ্যাখো, আমি আড়াল থেকে কিংবা পিছন থেকে আক্রমণ করিনি। সামনাসামনি এসেছি। তুমি রেডি? আগেই ঠিক ছিল, যখন-তখন দেখা হয়ে যাবে।''

কাকাবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, আমি রেডি।''

কর্নেল বলল, ''এবারে অস্ত্র বেছে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। যার যেমন খুশি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।''

কর্নেল আস্তে আস্তে কথা বলছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, ''স্টার্ট।''

তারপরেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে একটা বোমা ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু পকেট থেকে রিভলভার বের করেও গুলি চালানোর সময় পেলেন না। বোমাটা এসে লাগল তাঁর গায়ে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

লড়াইটা শুরু হতে না-হতেই শেষ।

কর্নেল ঘোড়া থেকে না নেমে অপেক্ষা করতে লাগল খানিকটা দূরে। যে-বোমাটা কাকাবাবুর গায়ে লেগেছে, সেটা একটা গ্যাস বোমা। সেটা থেকে এখনও গলগল করে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। বোমার আঘাতে নয়, গ্যাসেই জ্ঞান হারিয়েছেন কাকাবাবু।

ধোঁয়া শেষ হয়ে গেলে কর্নেল কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কাকাবাবুর কাছে। তাঁর নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে চাইল এখনও নিশ্বাস পড়ছে কিনা। পকেট থেকে বের করল নীল রঙের দড়ি। প্রথমে কাকাবাবুর দু'হাত, তারপর দু'পা, সারা শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল। ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ছিটিয়ে দিতে লাগল কাকাবাবুর মুখে।

একটু পরেই চোখ মেলে কাকাবাবু প্রথমে ভাবলেন, বৃষ্টি পড়ছে বুঝি। তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। তারপর পুরোপুরি চোখ মেলে দেখলেন, আকাশ। বৃষ্টি নেই। তাঁর মনে পড়ল, ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি পড়ে গিয়েছেন। সেই জন্যই কি জ্ঞান হারিয়েছেন? ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁর সারা শরীরে ব্যথা। হাত-পা বাঁধা। নড়াচড়ারও ক্ষমতা নেই।

সামনে দু'পা ফাঁক করে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল।

সে হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল, ''রায়চৌধুরী, দ্যাখো, আমি ভদ্রলোক। সামনাসামনি ডুয়েল লড়ে তোমাকে হারিয়েছি।''

কাকাবাবু কোনওক্রমে বললেন, ''তুমি ভদ্রলোকও নও, ইংরেজিও ভাল জানো না। ডুয়েল মানে বুঝি বোমা ছোড়া?''

কর্নেল বলল, ''আর্মিতে আমার শার্প শুটার হিসেবে সুনাম ছিল। রিভলভার, বন্দুকে তুমি আমার সঙ্গে পারতে না। কিন্তু আমার ডান হাতটায় একটা চোট লেগেছে, কিছুদিন অস্ত্র ধরতে পারব না। তাই তোমাকে আগেই বলে নিয়েছি, যে-কোনও উপায়ে ...। আসলে তুমি কীভাবে মরবে, তা জানো না এখনও। তোমাকে আমি পাহাড়ের উপর থেকে খাদে ফেলে দেব। তুমি গড়াতে গড়াতে নামবে, সেটা আমি দেখব। পাথরে লেগে তোমার মাথাটা ছাতু হয়ে যাবে, হাত-পা ভেঙে একটা মাংসপিণ্ড হয়ে পড়বে নীচে। তাতে আমার গায়ের জ্বালা মিটবে।''

কাকাবাবুর নড়াচড়ার উপায় নেই। কর্নেল তাঁকে মাটি থেকে তুলে একটা ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল একটা আলুর বস্তার মতো। ঘোড়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল খাদের কাছে। সেখানে এসে আবার এক ধাক্কা

দিয়ে কাকাবাবুকে ফেলে দিল মাটিতে। ভাঙা দেওয়ালের এক জায়গায় কাকাবাবুকে টেনে এনে শুইয়ে দিল, কাকাবাবুর মাথাটা ঝুলে রইল খাদের দিকে।

সে কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে হিংস্র গলায় বলল, ''রায়চৌধুরী, এই তোর শেষ মুহূর্ত। আর তোর বাঁচার কোনও উপায় আছে? ভগবানকে ডাক।'' তার মুখটা কাকাবাবুর মুখের একেবারে কাছে। সে তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, ''এই তো ভুল করলে! আমার এত কাছে আসা উচিত হয়নি। আমার আর-একটা অস্ত্রের কথা তুমি জানো না।''

কর্নেল বলল, ''অস্ত্র? আর কী অস্ত্র!''

কাকাবাবু বললেন, ''আমার চোখ। তাকাও চোখের দিকে। তুমি তো জগমোহন!''

চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে দারুণ অবাক হয়ে কর্নেল বলল, ''হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি সব জানি। জগমোহন, তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমিয়ে পড়ো।''

কর্নেল বলল, ''তুমি কি আমাকে হিপনোটাইজ় ...'' সে আর কথা শেষ করতে পারল না। তার চোখ বুজে এল। সে বসে পড়ল কাকাবাবুর পায়ের কাছে। তার থুতনিটা ঠেকে গেল বুকে।

এত সহজে যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যাবে, কাকাবাবু আশাই করেননি। তিনি এবার ছটফট করতে লাগলেন। শরীরের বাঁধন খুলবেন কী করে? হাতও নাড়তে পারছেন না। বেশিক্ষণ কর্নেলের ঘোর থাকবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাকাবাবু নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে কর্নেল আবার জেগে উঠবে। যদুকে এখান থেকে চিৎকার করে ডাকলেও সে শুনতে পাবে না। তবু কাকাবাবু তাকে ডাকলেন দু'বার। কোনও লাভ হল না।

কাকাবাবু অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছেন। পাঁচ মিনিট পরেই কর্নেল আবার মাথাটা সোজা করল। আস্তে আস্তে বলল, ''কী হল? আমার মাথা ঘুরছিল!''

সে আর-একবার কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, ''তুমি জগমোহন? তুমি জগমোহন?''

কর্নেল বলল, ‘‘হ্যাঁ।’’

কাকাবাবু এবার আদেশের সুরে বললেন, ‘‘জগমোহন, আমি যা বলব, তুমি তাই-ই শুনবে?’’

কর্নেল বলল, ‘‘হ্যাঁ, শুনব।’’

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তোমার কাছে ছুরি আছে?’’

কর্নেল বলল, ‘‘ছুরি? জানি না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘দ্যাখো, তোমার পকেট খুঁজে দ্যাখো।’’

কর্নেল সব পকেট খুঁজেও ছুরি পেল না। বুকপকেট থেকে বের করে আনল একতাড়া চাবি। সেই চাবির রিং-এ একটা ছোট্ট লাল রঙের ভাঁজ করা ছুরি।

কাকাবাবু আবার আদেশের সুরে বললেন, ‘‘জগমোহন, ওই ছুরি দিয়ে কাটো।’’

কর্নেল বলল, ‘‘কী কাটব? গলা?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘না, ইডিয়েট। আমার গলা কাটতে বলিনি। বাঁধন কাটো। আগে হাতের।’’

কাকাবাবুর গায়ের উপর ঝুঁকে কর্নেল দড়ি কাটতে শুরু করল। অত ছোট ছুরি দিয়ে শক্ত দড়ি কাটতে অনেক সময় লাগার কথা।

কাকাবাবু ধৈর্য ধরতে পারছেন না। তিনি জানেন, বেশিক্ষণ কর্নেলকে সম্মোহিত করে রাখা যাবে না। ওর জ্ঞান ফিরে এলেই বিপদ।

একটা রোবটের মতো আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে ছুরিটা দিয়ে দড়ি কাটছে কর্নেল। ছোট হলেও ছুরিটায় বেশ ধার আছে।

হঠাৎ একটু পরেই থেমে গিয়ে মাথা সোজা করল কর্নেল। এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার।

তারপর সে আপন মনে বলল, ‘‘এটা আমি কী করছি? রায়চৌধুরীর ফাঁদে পা দিয়েছি? ওই চোখ দিয়ে ও আসলে হিপনোটাইজ় করছিল! ওর চোখ দুটো আমি গেলে দেব।’’

সে কাকাবাবুর চোখ গেলে দেওয়ার জন্য ছুরি তুলল।

হাতের বাঁধন প্রায় কেটে এসেছিল, এবার জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারতেই ছিঁড়ে গেল। ঠিক সময়ে কর্নেলের ছুরি সমেত হাতটা ধরে ফেললেন কাকাবাবু।

শুয়ে থাকলে বেশি জোর পাওয়া যায় না, নইলে কাকাবাবুর হাতের জোর

সাংঘাতিক। কর্নেল প্রায় হাতটা নামিয়ে আনছে, কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে ওর নাকে একটা ঘুসি কষালেন। এত শক্তিশালী ঘুসি কর্নেল জীবনে খায়নি। সে আঁক করে আওয়াজ করে উঠল। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল তার নাক দিয়ে।

সেইটুকু সময়ের অমনোযোগেই কাকাবাবু ছুরিটা কেড়ে নিলেন ওর হাত থেকে। সেটা ওর গলায় ঠেকিয়ে বললেন, "ছোট হলেও এ-ছুরিটা তোমার গলা ফুটো করে দিতে পারবে।"

কর্নেল ঘেন্নার ভঙ্গি করে বলল, "এঃ, এত মারামারির পর শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটা ছুরি! কাটো দেখি আমার গলা। কাটো!"

কাকাবাবু সেই ধারালো ছুরিটা একবার বুলিয়ে দিলেন ওর গলায়। উপরের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

কর্নেল বলল, "ওসব আমি গ্রাহ্য করি না! এবার আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব। আর দেরি নয়!"

কাকাবাবুর মাথাটা খাদের দিকে ঝুলছে এখনও। জোরে ধাক্কা দিলেই তিনি গড়াতে শুরু করবেন। এইটুকু ছুরি দিয়ে কর্নেলকে ঘায়েল করা যাবে না, তিনি বুঝেছেন। তিনি উঠে বসতেও পারছেন না। কর্নেলেও তাকাচ্ছে না তাঁর চোখে চোখে।

সে কাকাবাবুকে ঠেলা শুরু করতেই কাকাবাবু প্রথমটা এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি আর পারছেন না। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শত্রুপক্ষকে অসাবধান করে দেওয়ার এটা একটা উপায়।

কর্নেল বলল, "পাঁচ গুনব, তুমি শেষ হয়ে যাবে, রায়চৌধুরী। এক, দুই..."

কাকাবাবু প্রাণপণে খানিকটা মাথা তুলে দু'হাতে চেপে ধরলেন কর্নেলের মাথা। ওর মাথা ধরেই তিনি উঠে বসলেন।

কর্নেল দারুণ চেষ্টা করে কাকাবাবুর দু'হাতের মুঠি থেকে নিজের মাথা ছাড়িয়ে নিতে গেল, পারল না। তখন সে-ও দু'হাতে টিপে ধরল কাকাবাবুর গলা। যেন দু'জন আদিম মানুষ। এখনও কোনও অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। এখনও হাত দিয়ে লড়াই করে। কাকাবাবুর এক পা খোঁড়া বলেই হাতে জোর বেশি। তিনি কর্নেলের মাথাটা কয়েক বার ঠুকে দিলেন পাশের পাঁচিলে। কয়েক বারের পর কর্নেলের হাত আলগা হয়ে এল। মাথায় অত আঘাতে তার জ্ঞান চলে গেল।

কাকাবাবু একটুক্ষণ হাঁপালেন জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে। তারপর নিজের সব বাঁধন খুলে কর্নেলকে বাঁধলেন।

একটু আগে যা ছিল, এখন ঠিক যেন তার উলটো হয়ে গেল।

কর্নেলের ঘোড়ার পিঠের ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে কাকাবাবু প্রথমে নিজে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন, খানিকটা জল ঢেলে দিলেন কর্নেলের মুখে।

কর্নেল চোখ মেলে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, "এবার সত্যিই খেলা শেষ। তুমি আমাকে এই খাদে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছিলে, তাই না? এবারে দ্যাখো, আমি তোমাকে আরও কত কঠিন শাস্তি দেব। তুমি একটু একটু করে শেষ হয়ে যাবে।"

পা থেকে গলা পর্যন্ত দড়ি বাঁধা অবস্থায় কর্নেলকে কাকাবাবু শুইয়ে দিলেন ওরই ঘোড়ায়। তারপর বাড়িটার কাছে এসে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলেন একটা গাছের সঙ্গে।

যদুকে ডেকে তিনি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন। ফিরে যেতে হবে।

মহা-ডাক্তার তো মহা অবাক। কোনও খবর না দিয়ে ফিরে এসেছেন কাকাবাবু, সঙ্গে একজন বন্দি!

কাকাবাবু বললেন, "একে রাখতে হবে মাটির তলার ঘরে। কী ব্যাপার পরে বলব। আজ আমার শরীর ও মনের উপর অনেক চাপ পড়েছে। আজ আমি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ঘুমোব।"

ঘোড়া থেকে নামিয়ে কর্নেলকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সে কাতরভাবে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আমি হার মেনে নিচ্ছি। আমার অনুরোধ, একটা গুলি চালিয়ে আমাকে শেষ করে দাও। আমাকে আর অপমান কোরো না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার অনুরোধ আমি শুনব কেন? তুমিও তো আমাকে গুলি করে মারার বদলে গড়িয়ে দিয়ে মারতে চেয়েছিলে। আমার চুলের মুঠি চেপে ধরেছিলে। আমি তোমাকে আপাতত একটা লোহার দরজা দেওয়া ঘরে আটকে রাখব জন্তুর মতো। অপমানই তোমার আসল শাস্তি।"

মাটির তলায় একটা ঘরের দরজা খুলে কর্নেলকে ছুড়ে দেওয়া হল।

পরদিন সকালবেলা কাকাবাবু অনেকটা সুস্থ, স্বাভাবিক বোধ করলেন। একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে অসম্ভব চাপ পড়ে মনের উপর। কয়েকদিন ভাল করে নিশ্বাসও ফেলতে কষ্ট হয়।

কফি খেতে খেতে কাকাবাবু মহা-ডাক্তারকে কর্নেলের সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শোনার পর মহা-ডাক্তার বললেন, ''ছি ছি ছি ছি। আপনি আমাকে আগে কেন বলেননি, যদি উলটো কিছু হয়ে যেত! এ তো সাংঘাতিক লোক! এত গোঁয়ার। আপনি ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী নন, তবু আপনাকে মারবেই মারবে! রাজাবাবু, এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করবেন? ওকে তো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত!''

কাকাবাবু বললেন, ''পুলিশের হাতে দিলে অনেক কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। ওর ঠিক শাস্তি হবে না। ওর শাস্তি আমিই দেব। এখন ওই ঘরেই ও থাকবে। কেউ যেন ওর সঙ্গে কোনও কথা না বলে।''

দুপুরবেলা মহা-ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, ''রাজাবাবু, আপনার বন্দিকে কিছু খাবার দিতে হবে তো? কী দেব?''

কাকাবাবু বললেন, ''খাবার দিতেও পারো, না দিতেও পারো। একই কথা।''

মহা-ডাক্তার বললেন, ''সে কী, সব জেলখানাতেই বন্দিদের খাবার দেয়!''

কাকাবাবু বললেন, ''তুমি কয়েকখানা রুটি-তরকারি দিয়ে দেখতে পারো। বোধহয় খাবে না। ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ো। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। কেউ যেন কোনও উত্তর না দেয়। আমি কয়েকদিন ওর মুখ দেখতেও চাই না।''

পরদিন মহা-ডাক্তার বললেন, ''খাবার দেওয়া হয়েছিল, ও তো কিছুই খায়নি। দিনের পর-দিন যদি না খেয়ে থাকে, কতদিন ওকে আটকে রাখবেন? আমারও যে একটা দায়িত্ব এসে যাচ্ছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''তোমার তো কোনও দায়িত্ব নেই। ও যদি কিছু না খেয়ে মরেই যায়, তা হলে তো ভালই হয়। ওকে আমরা মারধর করছি না, ওকে ছুরি দিয়ে কিংবা গুলি করে মারছি না। ও না খেয়ে মরলে কিন্তু আমাদের কোনও দোষ হবে না। পুলিশ কিছুই বলবে না।''

মহা-ডাক্তার কাচুমাচুভাবে বললেন, ''আপনি সত্যিই ওকে না খাইয়ে মারতে চান?''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ইয়েস! চিড়িয়াখানার একটা জন্তুকে কিছু না খেতে দিলে যেমন হয়, ওর ঠিক সেই অবস্থা হবে।’’

সন্তুর সঙ্গে একদিন টেলিফোনে কথা হল। সন্তুর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। জোজোকে নিয়ে সে বেড়াতে আসতে চায়, ডাক্তার অনুমতি দিয়েছে। কাকাবাবু সেই ডাক্তারকেও ফোন করলেন। সত্যি, তাঁর আপত্তি নেই।

দু' দিনের মধ্যে এসে গেল সন্তু আর জোজো।

এতদিন কর্নেলের গল্প কিছুই বলেননি ওদের। এবার কাকাবাবু বললেন, ‘‘সন্তু, যা, নীচে গিয়ে একটা লোককে দেখে আয়। সে তোকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি তার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি।’’

সন্তু বলল, ‘‘কাকাবাবু, তোমাকে একটা খবর জানানো হয়নি। আমার সেই ব্যথাটা একদম সেরে গিয়েছে। এখন আমি লাফাতে পারি। দৌড়োতেও পারি।’’

জোজো বলল, ‘‘আমি উড়তে পারি!’’

মাটির তলায় বন্দি কর্নেলকে দেখে এসে সন্তু করুণভাবে বলল, ‘‘কাকাবাবু, সত্যিই লোকটা না খেয়ে মরে যাবে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘মরুক না, তাতে ক্ষতি কী। ওরকম মানুষরা না বাঁচলে কী হয়?’’

জোজো বলল, ‘‘শুধু মাটির নীচে নয়, ওকে নরকে পাঠানো দরকার।’’

মহা-ডাক্তার বললেন, ‘‘মুশকিল কী জানো, সন্তুবাবু, আমি চুপিচুপি লোকটাকে ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম। রাজাবাবুকে কিছু না জানিয়ে। কিন্তু ছেড়ে দিলে তো ও আবার তোমার কাকাবাবুকে মারবার চেষ্টা করবে। ও তো ছাড়বে না।’’

কাকাবাবু একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, ‘‘এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে সন্ধে হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং চা আর মুড়ি-তেলেভাজা খেতে খেতে গল্প করা যাক। ভোপালে এবার কী হল, তা তো তোদের বলিনি।’’

মহা-ডাক্তার বললেন, ‘‘এগারো দিন হয়ে গেল। লোকটা কিছু খায়নি। ভাবতেই কেমন লাগছে।’’

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''না খেয়ে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?''

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, ''একদিনও না। মানে, আমি বাঁচব না।''

কাকাবাবু বললেন, ''যতীন দাস নামে একজন বিপ্লবী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তিনি জেলের মধ্যে অনশন করেছিলেন। মারা যান বাষট্টি না তেষট্টি দিন পর।''

সন্তু করুণ মুখ করে বলল, "মানুষটা সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে যাবে? আমাদের চোখের সামনে? ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই লোকটা তোকে খুন করার জন্য গুলি করেছিল। তোর প্রায় বাঁচায় আশা ছিল না। তবু তুই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। কাকাবাবু, তুমি এবার ওকে ছেড়ে দাও!"

জোজো বলল, "ছেড়ে দিলেই তো ও আবার কাকাবাবুর মারার চেষ্টা করবে যে!"

কাকাবাবু রাগে গরগর করে বললেন, "নাঃ, আমি আর ওর বদমায়েশি সহ্য করব না! এবার ওকে আমি শেষ করে দেবই দেব! ওর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই!"

তারপর কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখে বললেন, ''চলো। উপরে বসি। কাল সকালে আমি লোকটাকে চরম শাস্তি দেব।''

পরদিন সকালে কাকাবাবু নামলেন মাটির নীচে। যদুকে দিয়ে এক গেলাস লেবু-চিনির শরবত বানিয়ে নিয়েছেন হাতে।

এই বারো দিন কর্নেল যে শুধু কিছু খায়নি, তা নয়। বোধহয় একদিনও ঘুমোয়নি। এরই মধ্যে রোগা হয়ে গিয়েছে বেশ। চোখের নীচে কালি।

মেঝেতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''রায়চৌধুরী, প্লিজ, প্লিজ, আমাকে গুলি করে মারো। এভাবে মেরো না।''

কাকাবাবু বললেন, ''এই শরবতটা খেয়ে নাও।''

কর্নেল ঘৃণার সঙ্গে বলল, ''শরবত! আমার হাতে দিলে ছুড়ে ফেলে দেব। তোমাদের কোনও কিছু আমি খাব না।''

কাকাবাবু বললেন, ''এতদিন খাওনি। আজ খেলে ক্ষতি নেই। অনশন

ভাঙার সময় প্রথম এই শরবত খেতে হয়। অন্য কিছু খেলে বমি হয়ে যায়।''

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বলল, ''কেন, আজ খেলে ক্ষতি নেই কেন? আজ কোনও পুজোর দিন? আমি ওসব মানি না।''

কাকাবাবু ঘড়ি পরা হাতটা ওর মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''এটা দ্যাখো।''

কাকাবাবুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে সে বলল, ''আমি ঘড়ি দেখে কী করব? সময় জেনে আমার কী হবে?''

কাকাবাবু বললেন, ''ঘড়িতে সময় ছাড়া অন্য জিনিসও দেখা যায়। তারিখ দেখা যায়। দ্যাখো, আজ কত তারিখ। তেরো। এটা কোন মাস!''

কর্নেল বলল, ''জানি না। আমার সব গুলিয়ে গিয়েছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''অক্টোবর মাস। আর ক'দিন পরেই পুজো। শোনো কর্নেল, তেরো অক্টোবর মানে কী? ছ'মাস আগে আমাদের ডেথ-ডেথ খেলা শুরু হয়েছিল। সেটা কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি বলেছিলে, তুমি জেন্টলম্যান। ছ'মাস কেটে গেলে আর কেউ কারও শত্রু থাকব না। ঠিক কিনা?''

দারুণ অবাক হয়ে কর্নেল বলল, ''ছ'মাস শেষ হয়ে গেল?''

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, ''এটা পড়ে দ্যাখো। তোমার বাবা একজনকে খুন করে জেল খেটেছিলেন। সে-ও প্রতিশোধের ব্যাপার ছিল। তুমিও সেই একই কারণে আমাকে মারতে এসেছিলে। অথচ তুমি জানতেও পারোনি, আর্মিতে থাকার সময় তোমার ভাই নষ্ট হয়ে যায়। স্মাগলিং, ডাকাতিও করেছে।''

কাগজটা পড়তে পড়তে কর্নেল অবিশ্বাসের সুরে বলল, ''সত্যি তাই? আমার ভাইয়ের এই অবস্থা হয়েছিল?''

কাকাবাবু বললেন, ''এসব পুলিশ রেকর্ডে আছে। এই ধরনের ক্রিমিনালরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মরে। নাও, কর্নেল, শরবতটা খেয়ে ফেলো। তুমি এখন থেকে নতুনভাবে জীবন শুরু করো।''

এবার আর আপত্তি করল না সে। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল শরবত। তারপর কাকাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, ''আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।''

কাকাবাবু তাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

সন্তু, জোজোরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার তারা হাততালি দিয়ে উঠল।
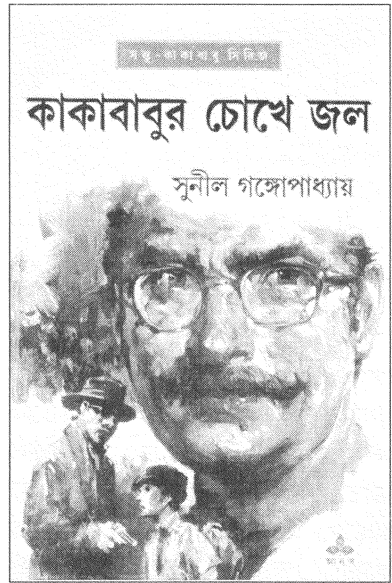
কাকাবাবুর চোখে জল

হঠাৎ সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় একটা দারুণ ভাল খবর পাওয়া গেল। আজকাল সত্যি সত্যি আনন্দের খবর তো পাওয়াই যায় না! খবরের কাগজে শুধু মারামারি, এ দলে ও দলে ঝগড়া। এই তো কালই শিয়ালদা স্টেশনে যাত্রীরা কী কারণে যেন খেপে গিয়ে অফিসঘর আর জানলা-দরজা ভাঙচুর করল। আজ সকালেই বাবা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোড়ালির হাড় মচকে ফেললেন, এখন সেই পায়ে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ। দুপুরবেলা বুলবুলিপিসির ভাতের থালায় হঠাৎ থপাস করে একটা টিকটিকি এসে পড়ল উপর থেকে। তা দেখে বুলবুলিপিসি আঁতকে উঠে এমন চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন বাড়িতে ভূতেরা এসে নাচ শুরু করেছে!

বুলবুলিপিসি থাকেন ত্রিপুরায়। বেড়াতে এসেছেন তিন-চারদিনের জন্য। তাঁরই ভাতের থালায় পড়ল টিকটিকি? অথচ এ বাড়িতে আগে কখনও কারও ভাতের থালায় টিকটিকি পড়েনি। কোনও টিকটিকি ধারেকাছেই আসে না।

মেয়েরা সকলে টিকটিকি ভয় পায়। মা, ছোড়দি আর বুলবুলিপিসি ভাতের থালা ছেড়ে দৌড়ে পালালেন। বুলবুলপিসি বমি করতে লাগলেন বাথরুমে গিয়ে।

সন্তু টিকটিকি দেখলে ভয়ও পায় না, ঘেন্নাও করে না। টিকটিকি অতি নিরীহ প্রাণী। সব বাড়িতেই থাকে কিন্তু মানুষকে কামড়ায় না কখনও। বরং দেওয়ালে-দেওয়ালে ঘুরে পোকামাকড় খেয়ে মানুষের উপকারই করে। সন্তু মাঝে মাঝে টিকটিকির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবে, ঘরের খাড়া দেওয়ালে কিংবা ছাদের সিলিং-এ ওরা কী করে লেপটে থাকে? ওরা কি মাধ্যাকর্ষণ মানে না?

সেই টিকটিকিটা ভাতের থালার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়েই আছে, নড়ছে-চড়ছে না। মরেনি, তা অবশ্য বোঝা যায়।

সন্তু থালাটার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বলল, ‘‘এই, যাঃ! যা।’’

সেটা নড়ল না। মুখ ঘুরিয়ে সন্তুর দিকে তাকাল। কেমন যেন ফ্যালফেলে অসহায় দৃষ্টি।

সন্তু একটা চামচে নিয়ে ওর গায়ে না ছুঁইয়ে থালায় লাগিয়ে টংটং শব্দ করল। এবার সে একটু এগোবার চেষ্টা করল। তখন বোঝা গেল, ওর একটা পা ভাঙা। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে।

উপর থেকে পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেল? কিংবা আগেই একটা পা ভাঙা ছিল। তাই পড়ে গিয়েছে! সন্তু আগে কখনও খোঁড়া টিকটিকি দেখেনি। আজ সকালেই বাবার পা মচকাল আর একটা টিকটিকিও খোঁড়া হল, এ যেন কীরকম আজব ব্যাপার।

সন্তু থালাসুদ্ধ টিকটিকিটাকে তুলে নিয়ে চলে এল বারান্দায়। টিকটিকিটা অমনই এক লাফে চলে এল রেলিং-এ। তারপর ডিগবাজি খেয়ে মিলিয়ে গেল যেন কোথায়।

যাক, বেঁচে তো গিয়েছে! কিন্তু এর পর কেউ আর খেতে বসলেন না।

বিকেলবেলা কথা নেই, বার্তা নেই, আচমকা ঝড় উঠল। সারাদিন আকাশ দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। প্রথমে কয়েকবার গুড়গুড় শব্দ, তারপরই চড়াত করে একটা লম্বা বিদ্যুৎ আর একটু পরেই দশখানা কামানের আওয়াজে বজ্রপাত।

গরমকালে ঝড়-বৃষ্টি সকলেরই ভাল লাগে। সন্তু খুবই ভালবাসে বৃষ্টি দেখতে, ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে খানিকটা ভিজেও নেয়। বুলবুলিপিসিও বেশ বৃষ্টি পছন্দ করেন, ছাদে এসে ভিজতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। মা ছাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, ‘‘এই বুলবুলি, তুইও দেখছি মেতে উঠেছিস সন্তুর সঙ্গে। শিগগির চলে আয়, এই বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর হবে!’’

তা শুনে বুলবুলিপিসি একপাক নেচে নিয়ে গান ধরলেন, ‘‘ওরে ঝড় নেমে আয়। আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে...’’

এই পর্যন্ত বেশ ভালই। তারপরই একটা খারাপ ঘটনা ঘটল।

কাকাবাবু সকাল থেকেই বাড়িতে নেই। তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছেন এক হোটেলে। তারপর দু'জনে যাবেন ডায়মন্ড হারবার, কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

সারাদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলে কাকাবাবুর ঘরের জানলাটানলা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়নি। একটা জানলার আবার ছিটকিনি আলগা। ঝড়ের দাপটে দুটো জানলা দড়াম করে খুলে গিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছে সব কাগজপত্র। কেউ আগে খেয়াল করেনি। বাড়ির কাজের লোক রঘু একসময় সে ঘরে ঢুকে, ''ও মা গো, কী সব্বোনাশ হয়েছে গো!'' বলে কেঁদে উঠেছে। বৃষ্টির ছাঁট এসে বেশ কিছু বই-কাগজ ভিজিয়ে দিয়েছে।

টেবিলের উপর ছড়ানো ছিল দুটো ম্যাপ। সে দুটোই ভিজেছে বেশি। এই ম্যাপ কাকাবাবুর খুব প্রিয়। তিনি দেশ-বিদেশের বহু ম্যাপ সংগ্রহ করেন। সেই সব ম্যাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তিনি ভ্রমণের আনন্দ পান। অনেক ম্যাপ তিনি কিনে আনান বিদেশ থেকে।

সন্তু ছুটে এসে দেখল, অনেক কাগজ আর বইয়ে জল লেগেছে তো বটেই, ম্যাপদুটোই ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছে। পুরনো ম্যাপ, ছিঁড়ে যাচ্ছে তুলতে গেলেই।

বৃষ্টি থেমে গেল। তবু সকলের মুখ থমথমে। কাকাবাবু ফিরে এসে তাঁর প্রিয় কাগজপত্র ও ম্যাপের অবস্থা দেখে চটে লাল হবেনই। তখন কী উত্তর দেওয়া হবে?

সবচেয়ে মুশকিল এই, কাকাবাবু খুব রেগে গেলেও কাউকে তো বকাবকি করবেন না। কিছু বলবেনই না, শুধু উৎকট গম্ভীর হয়ে যাবেন। তাঁর সেই গাম্ভীর্যকেই সকলে ভয় পায়।

সারাদিনটাই তো কাটল এইরকম গন্ডগোলে। তারপর এল সুসংবাদ।

সন্ধেবেলা লুচি আর মোহনভোগ খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার জন্য বুলবুলিপিসি বললেন, ''মুড়ি-বেগুনি আর পাঁপড়ভাজা খাওয়া হবে। ত্রিপুরায় ভাল বেগুন পাওয়া যায় না, কলকাতার বেগুনের স্বাদ চমৎকার।''

বৃষ্টির তেজ আস্তে আস্তে কমে যাওয়ার পর একসময় একেবারেই থেমে গেল। উনুনে বেগুনি ভাজা শুরু হয়েছে। মা পেঁয়াজকুচি, লঙ্কাকুচি আর সর্ষের তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন, এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

সেই আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সন্তু। কারণ, কাল থেকে টেলিফোনটা একেবারে বোবা হয়ে ছিল। টেলিফোন অফিসে খবর দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। কোনও মিস্তিরি আসেনি। এখন সেটা নিজে নিজে ভাল হয়ে গেল?

সন্তু খুব ব্যগ্রভাবে রিসিভারটা তুলে বলল, "হ্যালো, হ্যালো..."

ওদিক থেকে শোনা গেল রিনির গলা।

রিনি ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই সন্তু, তোদের ফোনটা এত এনগেজ্ড থাকে কেন রে? কার সঙ্গে এত গল্প করিস? সকাল থেকে তিনবার চেষ্টা করছি..."

সন্তু বলল, "কী করব, ইংল্যান্ডের রানি বারবার ফোন করে কাকাবাবুকে খুঁজছেন। এদিকে কাকাবাবু কোথায় গিয়েছেন জানি না। রানির ফোন মানে জানিস তো, প্রথমে একজন সেক্রেটারি, তারপর আর-একজন, তারপর রানি নিজে..."

রিনি বলল, "ভ্যাট! তুই বুঝি জোজো সাজবার চেষ্টা করছিস? তুই মোটেই জোজোর মতো পারবি না। ইংল্যান্ডের রানি কেন কাকাবাবুকে খুঁজবেন, কাকাবাবু কি বোম্বাগড়ের রাজা?

"শোন, রিনি..."

"তুই আগে আমার কথাটা শোন। এখনই টিভিটা খোল। দিল্লি দূরদর্শন চ্যানেল।"

"কেন, এখন টিভি দেখতে যাব কেন? বেগুনি ভাজা হচ্ছে..."

"বেগুনি? বেগুনি খেতে খেতে বুঝি টিভি দেখা যায় না? শিগগির যা, আমার বেশি কথা বলার সময় নেই। বাড়িসুদ্ধ সকলকে দেখতে বল।"

রিনি রেখে দেওয়ার পর সন্তু ভাবল, হঠাৎ এখন টিভি দেখতে হবে কেন? এই সময় তো খবরটবর হয়। সন্তুর অত খবর শোনার আগ্রহ নেই। কিন্তু রিনি যখন বলেছে, তখন তা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। ও নিশ্চয়ই একটু পরে আবার ফোন করে চেক করবে।

বুলবুলিপিসি মায়ের পাশে বসে গল্প করছেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "পিসি, তুমি টিভি দেখবে?"

বুলবুলিপিসি লালচে রঙের ঠোঁট উলটে বললেন, "টিভি? আমার দু'চোখের বিষ। সব সময় খালি বকবক। কলকাতায় এসেছি কি টিভি দেখতে?"

সন্তু দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল।

দোতলায় বড় ঘরটাই কাকাবাবুর। অন্য দিকের ঘরটা ছিল ছোড়দির। তার বিয়ের পর ঘরটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। সন্তু থাকে ছাদের ঘরের নিজস্ব রাজ্যে। দোতলায় দুটো ঘরের মাঝখানে অনেকটা চওড়া জায়গায়

কয়েকটা চেয়ার পাতা। এখানে মাঝে মাঝে বাড়ির লোকের আড্ডা বসে। এখানেই রয়েছে একটা টিভি, আর-একটা টিভি একতলায়, বাবা-মায়ের ঘরে। কাকাবাবু নিজের ঘরে টিভি রাখেন না। শুধু ক্রিকেট দেখার জন্য বাইরে এসে বসেন। দোতলাতেও একটা টেলিফোন রিসিভার আছে। সন্তু এসে টিভি খুলতে না-খুলতেই আবার বেজে উঠল ফোন।

এবারও রিনি। সে বলল, ‘‘উপরে উঠেছিস? দেখেছিস টিভি?’’

সন্তু বলল, ‘‘হ্যাঁ, দেখেছি তো, দিল্লি থেকে খবর হচ্ছে হিন্দিতে। ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প হয়েছে আর হংকং-এ হাজার হাজার মুরগি মরে যাচ্ছে! এসব খবর দেখতেই হবে কেন?’’

রিনি বলল, ‘‘চুপ করে দেখে যা। একদম ছটফট করবি না। এই খবর শেষ হওয়ার পরেই দেখবি একটা দারুণ, দারুণ খবর!’’

হিন্দি খবর চলল দশ মিনিট। তাতে নতুনত্ব কিছুই নেই। মাঝে মাঝে নেতাদের মুখ, তাঁরা কী বলছেন বোঝাই যায় না। রোজ যেন একই রকম। এরপর শুরু হল বিজ্ঞাপন। একবার বিস্কুট, তারপর বাড়ির রং, তারপর মোটরসাইকেল। তারপর শব্দ একেবারে থেমে গেল। শুধু পরপর ছবি। হাতে আঁকা। আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশে ছোট ছোট বাড়ি, আকাশে চিল আর ঘুড়ি উড়ছে। নদীর উপরে দুটো নৌকো, ছাতা মাথায় একটা মোটা লোক, কুঁজো হয়ে হাঁটছেন মহাত্মা গাঁধী, গোরুর দুধ খাচ্ছে একটা বাছুর, এইরকম। দেখলেই বোঝা যায়, কমবয়সি ছেলেমেয়েদের আঁকা। এইসব ছবি দেখে কী হবে? রিনি যে বলল, একটা কিছু দারুণ খবর আছে! সেটা কি আরও পরে?

ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে ক্যামেরা একটা ছবির উপর থেমে গেল। সেটা একটা বাঘের ছবি। বাঘটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। একটু পরে সেই ছবিটার পাশে এসে দাঁড়াল কমলা রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা একটি মেয়ে। হাতে মাইক্রোফোন। সে ইংরেজিতে বলল, ‘‘এতক্ষণ আপনারা খুদে শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখছিলেন। সাত থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই ছবি এঁকেছে। সারা ভারতের এই বয়সি ছেলেমেয়েদের ছবির প্রতিযোগিতা এই প্রথম। মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, চণ্ডীগড়, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, কানপুর এই সব শহরে হয়েছে প্রথম প্রতিযোগিতা। তারপর প্রত্যেক শহর থেকে তিনটি করে ছবি এসেছে দিল্লিতে। মকবুল ফিদা হুসেন, সতীশ গুজরাল আর যোগেন চৌধুরী, এই

তিনি বিখ্যাত শিল্পী বিচার করেছেন ছোটদের আঁকা এই ছবিগুলোর। দু'দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর...।

এই পর্যন্ত শুনে সন্তু ভাবল, রিনি তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মজা করেছে। এ আর এমন কী শোনার মতো খবর!

সে টিভিটা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখনই সেই মেয়েটি বলল, ''বিচারকদের মতে সবচেয়ে ভাল হয়েছে এই বাঘের ছবিটি। এই ছবিটি এঁকে সারা ভারতের খুদে শিল্পীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কলকাতার নীলধ্বজ চক্রবর্তী, বয়স আট বছর চার মাস...''

সন্তুর হাতটা থেমে গেল। কলকাতার একটা ছেলে ফার্স্ট হয়েছে? বাঃ, সেটা তো ভালই খবর। কিন্তু রিনি আগে থেকে জানল কী করে? রিনির চেনা কেউ নাকি?

সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি বলল, ''আসুন, এবার আপনাদের সঙ্গে লিট্‌ল চ্যাম্পিয়ন নীলধ্বজ চক্রবর্তীর পরিচয় করিয়ে দিই। সে দারুণ স্মার্ট ছেলে, চটপট সব কথার উত্তর দিতে পারে।''

এবারে দারুণ চমকে গেল সন্তু। এ যে বিল্টু! রিনির ছোট ভাই। তার ভাল নাম যে নীলধ্বজ, তা সন্তু জানত না। আমাদের বিল্টু সারা ভারতের মধ্যে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছে, এ তো সত্যিই খুব ভাল খবর! বিল্টুটা দারুণ দুষ্টু আর গুন্ডা স্বভাবের। সে আবার ছবি আঁকতেও পারে?

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, ''মা, বুলবুলিপিসি, শিগগির এসো, টিভি দেখবে এসো...''

এই সময় সিঁড়িতে খটখট শব্দ করে উঠে এলেন কাকাবাবু।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''কী হয়েছে রে সন্তু?''

সন্তু বলল, ''কাকাবাবু দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের বিল্টু, সে ছবি এঁকে ফার্স্ট হয়েছে!''

বিল্টু এ বাড়িতে প্রায়ই আসে তার দিদির সঙ্গে। কাকাবাবু তার দুরন্তপনা খুব পছন্দ করেন। এই তো গত সপ্তাহেই সে কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে একটা কাচের গ্লোব মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিল। রিনি তাকে শুধু বকুনিই নয়, তার কান ধরেও টেনেছিল। কাকাবাবু খুব রাগ করবেন ভেবে সন্তুও ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কাকাবাবু কিন্তু রিনিকেই ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ''অ্যাই, ওর কান ধরেছিস কেন রে? নিজের ভাইকে তুই শাসন করবি, কিন্তু অন্যদের সামনে

নয়। তাতে ছোটদের খুব অপমান হয়। আমার জিনিস ভেঙেছে, আমি বুঝব।''

বিল্টুর কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''বিল্টুবাবু, তুমি ইচ্ছে করে গ্লোবটা ভাঙলে কেন বলো তো? নাকি হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল?''

বিল্টু বলেছিল, ''জিয়োগ্রাফি বইয়ে যে লেখা আছে, পৃথিবীর পেটের মধ্যে গরম লাভা থাকে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম।''

কাকাবাবু হেসে বলেছিলেন, ''ও, এই জন্য? তা বেশ করেছিস, ভেঙেছিস!''

এখন টিভির দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু সন্তুর মতোই অবাক হয়ে বললেন, ''বিল্টু আবার ছবিও আঁকতে পারে নাকি?''

ক্রাচদুটো রেখে তিনি একটা চেয়ারে বসলেন।

এখন বিল্টুর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে অন্য একটা মেয়ে। তার পোশাক ছেলেদের মতো, চুলও খুব ছোট করে ছাঁটা। তবে সাক্ষাৎকারটা দিল্লিতে নয়, নেওয়া হয়েছে কলকাতায়। বোঝা যায়, আগে থেকে রেকর্ড করা। রিনিদের বাড়িটাও চেনা যাচ্ছে, ঘরের এক কোণে একটা বড় বুদ্ধমূর্তি। বিল্টুর মাকেও দেখা গেল একঝলক।

এই বয়সেই বিল্টু বেশ ইংরেজি বলতে পারে। ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলে। স্কুলে তো ইংরেজি বলেই সব সময়, বাড়িতেও বাংলার বদলে ইংরেজি বলা শুরু করেছিল। ওর ঠাকুরমা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে বলেছিলেন, ''আমি তো দাদুভাই ইংরেজি জানি না। তোমার সঙ্গে তা হলে আর কথা বলাই হবে না।'' বিল্টু ঠাকুরমাকে খুব ভালবাসে। রোজ রাতে তাঁর কাছে গল্প শোনে। তাই ঠাকুরমার সঙ্গে সে আবার বাংলা বলতে শুরু করেছে। ঠাকুরমা অবশ্য ইংরেজি জানেন না তা নয়, তিনি একসময় একটা স্কুলের হেডমিসট্রেস ছিলেন।

ক্যামেরার সামনে একটুও ঘাবড়ায়নি বিল্টু। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, ''তুমি ছবি আঁকা কার কাছে শিখেছ?''

বিল্টু উত্তর দিল, ''ফ্রম মাই এল্ডার সিস্টার। রিনি চক্রবর্তী। শি ইজ় আ গুড সিঙ্গার অলসো। আই কান্ট সিং!''

''ছবি আঁকা ছাড়া তুমি আর কী পারো?''

''দৌড়োতে পারি।''

"দৌড়োতে পারো? কোথায় দৌড়োও?"
"পাঁচতলা থেকে একতলা। সিঁড়ি দিয়ে।"
"কেন সিঁড়িতে দৌড়োও?"
"যারা লিফ্‌টে নামে, তাদের চেয়েও আমি তাড়াতাড়ি নামতে পারি।"
"বাঃ! তুমি এই বাঘের ছবিটা এঁকেছ কেন?"
"হাতির ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে না বলে।"
"কেন হাতির ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে না?"
"হাতির ছবি আঁকা সোজা!"
"তাই বুঝি? আর মানুষের ছবি?"
"দিদি মানুষের ছবি আঁকে। আমি দিদির মতো ভাল পারি না।"
"এই পুরস্কার পেয়ে তোমার কেমন লাগছে? ইন্ডিয়ার মধ্যে তুমি ফার্স্ট হয়েছ।"
"পুরস্কার, কই পাইনি তো?"
"পাবে। তোমাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে।"
"ট্রেনে না প্লেনে? আমি প্লেনে চেপে যাব।"
কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "কী স্মার্টলি উত্তর দিচ্ছে বিল্টু। ওইটুকু ছেলে!"
সন্তু বলল,"পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। অত টাকা দিয়ে ও কী করবে?"
কাকাবাবু বললেন, "এখন জমিয়ে রাখবে। বড় হয়ে ওই টাকায় বেড়াতে যাবে। আমার এত ভাল লাগছে, ইচ্ছে করছে এখনই বিল্টুর সঙ্গে দেখা করতে!"
টিভি-তে এখন অন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে। সন্তু সেটা বন্ধ করতেই আবার বেজে উঠল ফোন।
রিনি জিজ্ঞেস করল, "কী রে সন্তু, দেখলি?"
সন্তু বলল, "হ্যাঁ। তুই ভাগ্যিস ফোন করলি। তার ফলে কী হল বল তো? সারাদিন ফোনটা খারাপ ছিল, তুই কল করলি বলেই সেটা ঠিক হয়ে গেল! আর সেইজন্যই প্রোগ্রামটা দেখতে পেলাম! দুর্দান্ত ব্যাপার, বিল্টু যে এত ভাল ছবি আঁকতে পারে..."
রিনি বলল, "সারাক্ষণ তো ছটফট করে। যদি আর-একটু মন দিত, তা হলে ভবিষ্যতে..."

সন্তু বলল, "বিল্টু তোর কাছাকাছি আছে? কাকাবাবু ওর সঙ্গে কথা বলতে চান।"

রিনি বলল, "বিল্টু পাশের বাড়ি খেলতে গিয়েছে। আমি বরং কাল সকালে বিল্টুকে নিয়ে যাব তোদের বাড়ি। কাকাবাবুকে প্রণাম করতে!"

আজ সারাদিন পরপর কয়েকটা বাজে ব্যাপার ঘটছিল। বিল্টুর এই সুসংবাদে সব যেন ধুয়ে মুছে গেল। বাড়ির সকলে বারবার বলতে লাগলেন বিল্টুর কথা। এমনকী, কাকাবাবুও ম্যাপ ভিজে যাওয়ার জন্য তেমন কিছু মেজাজ খারাপ করলেন না। শুধু বললেন, "ইস! যাক গে, খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।"

২

বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই, তাই অনেক সময়ই কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আর বিল্টুর মতো কেউ যদি আসে, তা হলে এক মুহূর্তে বাড়ি একেবারে সরগরম হয়ে ওঠে!

এসেই বিল্টু প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দ করে উঠে এল তিনতলায়। খয়েরি হ্যাফপ্যান্ট আর লাল শার্ট পরা।

সন্তু পড়াশোনা করছে, তার ঘরের দরজা ভেজানো। সেই দরজা এক ধাক্কায় খুলে বিল্টু বলল, "সন্তুদাদা, টুকি!"

বই থেকে চোখ তুলে বিল্টুকে দেখেই খুশি হল সন্তু। সে বলল, "আয়, আয়, ভিতরে আয়!"

বিল্টু বলল, "না, ভিতরে যাব না। তুমি আমার সঙ্গে কম্পিটিশন দেবে, কে আগে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে পারে?"

সন্তু বলল, "না, তোর সঙ্গে কম্পিটিশন দেব না। তুই তো চুরি করিস! তুই আমার সামনে এসে দু'হাত ছড়িয়ে আমাকে আটকে দিস।"

বিল্টু বলল, "তুমি কেন একলাফে তিনটে সিঁড়ি যাও?"

সন্তু বলল, "বেশ করি। তুই কেন রেলিং-এ চড়ে সরসরিয়ে যাস?"

বিল্টু হি হি করে হেসে উলটো দিকে ফিরল। তারপর একছুটে নেমে গেল দোতলায়।

কাকাবাবু রকিং চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে একটা বই পড়ছেন আর একটু-

একটু দুলছেন। তিনি পরে আছেন একটা খয়েরি-সাদা ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউন।

বিল্টু বলল, ‘‘কাকাদাদু, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং?’’

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, ‘‘রিডিং।’’ তারপর বললেন, ‘‘কাকাদাদু কী রে ব্যাটা! মনে হয়, জাপানি নাম। শুধু কাকাবাবু বলবি।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমার মা বলেন কাকাবাবু, আর আমিও বলব কাকাবাবু?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, তাই বলবি। সকলে আমাকে কাকাবাবু বলে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘বাবু তো বলতে হয় অচেনা লোকদের!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘কাকাবাবুটাই আমার নাম। শুধু কাকা কিংবা কাকু বলে না কেউ।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমার একখানা মামা আছে, তাকে আমি মামাবাবু বলি না, বলি শুধু মামু।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা বেশ করিস! কিন্তু মামা তো একখানা হয় না।’’

বিল্টু বলল, ‘‘কেন? হি ইজ় মাই ওনলি মামা।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বাংলায় একখানা জামা, একখানা বই, একখানা মাউথ অর্গান হয়। কিন্তু জ্যান্ত মানুষ সম্পর্কে বলতে হয় একজন। একজন মামা, একজন কাকা।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমার তিনখানা কাকা, নো, নো, তিনজন কাকা।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘রাইট! এই তো ঠিক বলেছিস। শোন বিল্টু, তুই হারমোনিকা বাজাতে ভালবাসিস?’’

বিল্টু বলল, ‘‘কখনও তো বাজাইনি। হারমোনিকা কাকে বলে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘মাউথ অর্গান। তোকে আমি একটা সুন্দর হারমোনিকা কিনে দেব।’’

বিল্টু চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কেন কিনে দেবে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুই অল ইন্ডিয়ার মধ্যে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছিস। সেইজন্য আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, গর্ব হয়েছে।’’

বিল্টু অবহেলার সঙ্গে ঠোঁট উলটে বলল, ‘‘ও তো সবাই ফার্স্ট হতে পারে!’’

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, ‘‘সবাই কী করে ফার্স্ট হবে? ফার্স্ট কথাটার মানেই তো যে সবার উপরে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘ফার্স্টেরও উপরে কিছু হয় না?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘না।’’

বিল্টু একটু চিন্তিতভাবে বলল, ‘‘মনে করো, ঝিল্লি...ঝিল্লিকে চেনো তো, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে, আমার চেয়ে মোটে দু’বছরের বড়, সেই ঝিল্লি যদি আরও ভাল একটা ছবি এঁকে ফেলে, তা হলে সে কী হবে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তা হলে ঝিল্লিই হবে ফার্স্ট আর তুই হবি সেকেন্ড!’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও।’’ তারপরই সে বিষয় পালটে বলল, ‘‘আচ্ছা কাকাবাবু, বলো তো, টিনটিন আর অ্যাসটেরিক্সের মধ্যে কার বেশি বুদ্ধি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমি টিনটিনের কথা জানি, কিন্তু অ্যাসটেরিক্সের গল্প পড়িনি।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমি তোমায় পড়তে দেব।’’

আবার সে অন্য কথা শুরু করল।

কাকাবাবু মজা লাগল দেখে যে, বিল্টু এত বড় একটা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে, তা নিয়ে তার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আর-একটু বেশি বয়সের ছেলে হলে সে কত গর্ব করত!

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুই তো পুরস্কার আনতে প্লেনে চেপে দিল্লি যাবি। এই প্রথম তোর প্লেনে চাপা হবে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘প্লেন তো মেঘের উপর দিয়ে যায়, তাই না?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘অনেক উপর দিয়ে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘প্লেন যখন মেঘের মধ্যে দিয়ে উঠবে, তখন জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে একটুখানি মেঘ খেয়ে নেওয়া যায় না?’’

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, ‘‘দুর বোকা! প্লেনের জানলা খোলা যায় নাকি? তা হলেই সর্বনাশ।’’

বিল্টু বলল, ‘‘কেন খোলা যাবে না? আমি খুলব!’’

সন্তু নেমে এসে বিল্টুর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী খুলবি তুই?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘দ্যাখ না, ও বলছে, প্লেনের জানলা খুলে মেঘ খাবে!’’

সন্তু বলল, ‘‘প্লেনের জানলা তো খোলা যায় না। তবে গ্যাংটকে গেলেই তো মেঘ খাওয়া যায়। গায়ের উপর দিয়ে মেঘ চলে যায়।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুমি খেয়েছ?’’

সন্তু বলল, "কতবার!"

বিল্টু আবার জিজ্ঞেস করল, "কীরকম খেতে?"

সন্তু বলল, "গ্যাংটকের মেঘ টক টক!"

কাকাবাবু বললেন, "বৃষ্টি পড়লে মিষ্টি হয়ে যায়।"

বিল্টু বলল, "আমি তা হলে গ্যাংটক যাব। আমায় নিয়ে চলো না!"

সন্তু বলল, "এখন তো হবে না। আগে তোকে দিল্লি যেতে হবে।"

বিল্টু বলল, "না, আমি দিল্লি যাব না। আমি গ্যাংটক যাব।"

সন্তু বলল, "সে কী রে! দিল্লিতে তোকে ফার্স্ট প্রাইজ় দেবে। অনেক টাকা পাবি।"

বিল্টু বলল, "আমার অনেক টাকা আছে। আমি জমিয়েছি। দেখবে?" হাফপ্যান্টের পকেট থেকে সে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল। সেটার মুখ খুলে হাতে ঢেলে দেখাল কয়েকটা এক টাকা-দু'টাকার নোট আর বেশ কিছু খুচরো পয়সা।

বিল্টু গম্ভীরভাবে বলল, "থার্টি ওয়ান রুপিজ়।"

সন্তু বলল, "সত্যিই তো অনেক টাকা!"

কাকাবাবু বললেন, "এই একত্রিশ টাকার দাম পঁচিশ হাজারের চেয়েও বেশি। কারণ, এই টাকাটা ও নিজে জমিয়েছে।"

সন্তু বিল্টুকে বলল, "তোর নিজের টাকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তোর প্রাইজ়ের টাকাটাও নিতে হবে।"

বিল্টু বলল, "কেন? এই টাকায় গ্যাংটক যাওয়া যাবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "যত দিন মানুষ টাকার হিসেব না বোঝে, তত দিনই সে আসলে সুখী!"

রিনি উপরে এসে বলল, "অ্যাই বিল্টু, তোকে জ্যাঠামণি একবার ডাকছেন। চল, নীচে চল।"

সন্তুর বাবা পা মচকে বিছানায় শুয়ে আছেন। সকলে মিলে চলে এল তাঁর ঘরে।

বুলবুলিপিসি বললেন, "ও মা, এইটুকু ছেলে ছবি আঁকায় ফার্স্ট হয়েছে?"

রিনি বলল, "এইটুকু আবার কী! ও ফার্স্ট হয়েছে ছোটদের গ্রুপে। সকলে ওর মতোই ছোট।"

বুলবুলিপিসি বললেন, "তবু অতজনের মধ্যে ফার্স্ট হওয়া কি সোজা

কথা? ওর নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধি!''

সন্তু বলল, ''ওর মাথায় অনেক দুষ্টুবুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি থাকলেই ছবি আঁকা যায় না। ছবি আঁকা শিখতে হয়। ও যে ধৈর্য ধরে ছবি আঁকা শিখেছে, সেটাই আশ্চর্যের!''

কাকাবাবু বললেন, ''শিখলেও সকলে শিল্পী হতে পারে না। আঁকার হাত থাকা দরকার। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, আমার হাতে ছবি একেবারেই আসে না।''

মা চাবি দিয়ে একটা দেওয়াল-আলমারি খুললেন। তার থেকে একটা নীল রঙের ভেলভেটের বাক্স বের করে দিলেন বাবার হাতে।

বাবা বললেন, ''বিল্টুবাবু, গভর্নমেন্ট তো তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছেই। তার আগে আমরা তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। একবার আমি একটা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে এই মেডেলটা পেয়েছিলাম। এটা এখন তোমার।''

বাক্সটা খুলে দেখালেন। বেশ বড় একটা গোল সোনার মেডেল।

বিল্টু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, ''এটা নিয়ে আমি কী করব?''

বাবা বললেন, ''বাড়িতে রেখে দেবে। এরপর তুমি নিশ্চয়ই আরও অনেক মেডেল পাবে। তার মধ্যে এটাই হবে প্রথম। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি আর মেডেল দিয়ে কী করব?''

বিল্টু তবু জিজ্ঞেস করল, ''তুমি এটা সন্তুদাদাকে দাওনি কেন?''

বাবা বললেন, ''সন্তুকে? সন্তু তো কিছুতে ফার্স্ট টার্স্ট হয়নি।''

বিল্টু বলল, ''হ্যাঁ, সন্তুদাদা সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামায় ফার্স্ট হয়!''

সকলে হেসে উঠল।

বাবা বললেন, ''সে জন্য না হোক, অন্য কোনও কারণে ওর কাকাবাবু ওকে কী সব পুরস্কার-টুরস্কার দেন মাঝে মাঝে। সন্তু, তুই বোধহয় একবার অল বেঙ্গল সুইমিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলি, তাই না?''

সন্তু বলল, ''ফার্স্ট না, সেকেন্ড।''

বাবা বললেন, ''সে যাই হোক, বিল্টুবাবু, তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দেবে?''

বিল্টু বলল, ''আমি তো মানুষের ছবি আঁকতে পারি না। দিদি পারে।''

বাবা বললেন, ''তোমার দিদি তো ভাল ছবি আঁকে জানিই। সন্তুর একটা চমৎকার ছবি এঁকে দিয়েছে। তুমি মানুষের ছবি আঁকো না কেন?''

বিল্টু বলল, ''মানুষগুলো যে সব আলাদা আলাদা।''

বাবা বললেন, ‘‘তা ঠিক। তুমি যে বাঘের ছবি আঁকলে, বাঘ দেখলে কোথায়? চিড়িয়াখানায়?’’

বিল্টু বলল, ‘‘বাঘ তো ইচ্ছে করলেই সব সময় দেখা যায়।’’

বাবা বললেন, ‘‘কী করে? কী করে? ছবিতে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘না, না। তুমি চোখ বোজো, তারপর মনে মনে ভাবো, বাঘ বাঘ! অমনই বাঘ দেখতে পাবে। চোখ বুজে যে-কোনও জিনিসের কথা ভাবলেই সেটা দেখা যায়!’’

কাকাবাবু বিল্টুর পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘‘বাঃ বাঃ! এ যে একেবারে পাক্কা আর্টিস্টের মতো কথা। এ ছেলে অবশ্যই ভবিষ্যতে খুব বড় আর্টিস্ট হবে।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘ভবিষ্যৎ মানে ফিউচার?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘কতদিনে ফিউচার হয়?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একদিন পরেও ফিউচার, আবার একশো বছর পরেও! তবে তোর সম্পর্কে যা বলছি, তা আরও দশ-বারো বছর পরেই বোঝা যাবে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘মাই গড। আমার ফিউচার এত দূরে?’’

৩

বিল্টুদের পাশের বাড়ির দুটি মেয়ে পড়ে মর্ডান হাই স্কুলে। আর পার্কের দু’পাশে বাড়ির দুটি ছেলে পড়ে সেন্ট লরেন্সে। বিল্টু ডন বস্কোতে। এই পাঁচজন একসঙ্গে স্কুলে যায়। একটা ভাড়ার গাড়ি ওদের তুলে নিয়ে যায়, ছুটির পরে ফিরিয়ে আনে। কোনওদিন ভুল হয় না। তিনটে স্কুলেরই ছুটির সময় মোটামুটি এক। কোনওদিন কারও একটু আগে ছুটি হয়ে গেলে সে অপেক্ষা করে গাড়ির জন্য।

বিকেল সাড়ে চারটের কাছাকাছি সময় বাড়ির সামনে একবার হর্ন বাজলেই বিল্টুর মা বুঝতে পারেন যে বিল্টু এসে গিয়েছে। সেই সময় সদর দরজা খোলাই থাকে। একটু পরেই মা শুনতে পান সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ। রিনি কলেজে পড়ে। তার ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। বাবা অফিস থেকে ফেরেন সাতটার পর।

বিল্টুর মা জয়ন্তী শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। রিনিকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি বইটা সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে?"

রিনি বলল, "তাড়াতাড়ি? এখন পৌনে ছ'টা বাজে।"

জয়ন্তী ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, "পৌনে ছ'টা? বিল্টু যে এখনও ফেরেনি!"

রিনির ভুরু কুঁচকে গেল। সে আপনমনে বলল, "বিল্টু এখনও ফেরেনি?"

সে চলে এল বারান্দায়। রেলিং-এ একটু ঝুঁকে ডাকল, "খুশি, এই খুশি!"

দু'-তিনবার ডাকার পর পাশের বাড়ির বারান্দায় একটি লম্বামতো ছেলে এসে দাঁড়াল। সে বলল, "কী বলছেন, দিদি?"

রিনি বলল, "শিবু, খুশি আর টুসি ফিরেছে স্কুল থেকে?"

শিবু বলল, "না গো দিদি, ওদের স্কুলের গাড়ি এখনও আসেনি।"

রিনি বলল, "এখনও আসেনি? প্রায় ছ'টা বাজে। এত দেরি হবে কেন?"

শিবু বলল, "আমরাও তো তাই ভাবছি। হয়তো ট্রাফিক জ্যামে আটকেছে। টিভির খবরে বলছিল, পার্ক সার্কাসে নাকি কীসের একটা মিছিল বেরিয়েছে।

রিনি জিজ্ঞেস করল, "ওই ভাড়া গাড়ির ড্রাইভারের কাছে মোবাইল নেই?"

শিবু বলল, "আছে তো। কিন্তু আমি তো নম্বর জানি না। দিদিমণিরা জানেন।"

রিনি বলল, "আমার মোবাইলে বোধহয় নম্বরটা তোলা আছে। আচ্ছা, আমি দেখছি।"

ঘরের ভিতরে এসে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে মোবাইলটা খুঁজতে খুঁজতে রিনির মনে পড়ল, আগের সপ্তাহেই তার পুরনো মোবাইলটা হারিয়ে গিয়েছে। এটা নতুন। এটার মধ্যে কোনও নম্বরই সেভ করা নেই।

জয়ন্তী এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। এই রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। বিল্টুদের জন্য ভাড়া গাড়িটা সাদা রঙের। ডান দিক দিয়ে কোনও সাদা গাড়ি আসতে দেখলেই জয়ন্তী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাচ্ছেন। কিন্তু কোনও গাড়িই থামছে না।

একটু পরেই জয়ন্তী অস্থির হয়ে বললেন, ‘‘রিনি, এখনও তো এল না। কী করা যায় বল তো!’’

রিনি বলল, ‘‘ওরা পাঁচজন একসঙ্গেই তো আছে। চিন্তার কিছু নেই। তবু আমি স্কুলে একটা ফোন করে দেখছি।’’

ডন বস্কো স্কুলে ফোন বেজে গেল। অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গিয়েছে। অফিসে কেউ নেই।

এবার একটা সাদা গাড়ি থামল পাশের বাড়ির গেটের কাছে। রিনি এসে দাঁড়াল বারান্দায় মায়ের পাশে। গাড়ি থেকে নামল খুশি আর টুসি। বিল্টু তো নামল না! খুশি আর টুসি নিজেদের বাড়িতে না ঢুকে তাকাল এই বারান্দার দিকে।

জয়ন্তী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু নামছে না? ও গাড়ির মধ্যে বসে আছে কেন?’’

খুশি বলল, ‘‘বিল্টু গাড়িতে নেই। ও বাড়ি ফিরে আসেনি?’’

রিনি বলল, ‘‘না তো! ও একলা ফিরবে কী করে? ও তো তোদের সঙ্গেই ফেরে।’’

গাড়ির ড্রাইভার বিমল রাস্তায় নেমে বলল, ‘‘আমি উপরে আসছি মাসিমা।’’

পাশের বারান্দা থেকে শিবু দেখছে। তার দিকে হাত নেড়ে খুশি আর টুসিও বিমলের সঙ্গে চলে এল এ বাড়ির দোতলায়।

বিমল বলল, ‘‘মাসিমা, বিল্টু তো স্কুলে নেই।’’

জয়ন্তী বললেন, ‘‘নেই মানে? কোথায় বিল্টু?’’

খুশি বলল, ‘‘আমাদের যেতে একটু দেরি হয়েছে। গেটের দরোয়ান বলল, বিল্টু ওখানেই ছিল, হঠাৎ কোথায় যেন চলে গিয়েছে!’’

টুসি বলল, ‘‘আর-একজন দরোয়ান বলল, রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকে গিয়েছে বোধহয়। দ্যাখো গিয়ে পার্কে।’’

জয়ন্তী বললেন, ‘‘ও নিজে নিজে রাস্তা পেরোবে? ওই রাস্তায় কত গাড়িটাড়ি চলে!’’

বিমল বলল, ‘‘আমরা বারণ করেছি ও শোনেনি। পার্কে তো ফুটবল খেলা হয়। ও রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সেই খেলা দ্যাখে।’’

টুসি বলল, ‘‘আজও সেখানে খেলা হচ্ছে। আমরা সকলে মিলে গেলাম। কিন্তু সেখানেও বিল্টু নেই। অনেক খুঁজলাম।’’

জয়ন্তী ঝাঁঝালো গলায় বললেন, ''তারপর তোমরা বিল্টুকে না নিয়ে চলে এলে?''

বিমল বলল, ''আমরা ভাবলাম, বিল্টু নিজেই বাড়ি চলে এসেছে।''

রিনি ধমক দিয়ে বলল, ''এ কথা তোমরা ভাবলে কী করে? ওইটুকু ছেলে একা একা বাড়ি ফিরতে পারে?''

বিমল এবার টুসি আর খুশির মুখের দিকে তাকাল। তারপর কাঁচুমাচুভাবে বলল, ''একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি। কয়েক দিন আগে...''

টুসি বলল, ''গত সোমবার...''

বিমল বলল, ''গত সোমবার, আমরা বাড়ি ফিরছি, আপনাদের ছেলে তো যেমন জেদি, তেমনই সাহসী, কী নিয়ে যেন টুসির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। গাড়িটা যখন একটা সিগনালের লাল আলোয় থেমেছে, বিল্টু অমনই বলল, 'আমি টুসির সঙ্গে বাড়ি যাব না!' বলে সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।''

জয়ন্তী একটা ভয়ের শব্দ করে উঠলেন।

বিমল বলল, ''নেমেই সে ছেলে উঠে পড়ল একটা রিকশায়। রিকশাওয়ালাকে বলল, 'অ্যাই, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। সোজা রাস্তা। অন্য কোনওদিকে গেলে স্কেল দিয়ে তোমায় মারব!' রিকশাটা চলতে শুরু করেছিল। আমি সামনে গিয়ে সেটাকে আটকালাম। কিন্তু যতই কাকুতি-মিনতি করি, কিছুতেই সে শুনতে চায় না। সে রিকশাতেই বাড়ি ফিরবে।''

খুশি বলল, ''বিল্টুর হাতে একটা স্কেল। সেই স্কেল দিয়ে সে সকলকে মারবে!''

বিমল বলল, ''রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছিল!''

টুসি বলল, ''তারপর কী হল জানো তো মাসি? আমার সঙ্গে তো বিল্টুর ঝগড়া হয়েছিল। আমিও টপ করে সেই রিকশায় উঠে পড়ে বললুম, 'আমার উপর রাগ করেছিস তো? ঠিক আছে, ওই স্কেল দিয়ে আমাকে মার। কিংবা আমিও তোর সঙ্গে এই রিকশায় যাব!' ''

খুশি বলল, ''তাতেও ছেলের রাগ যায় না। সে একাই বাড়ি ফিরবে। তখন আমি আর টুসি দু'দিক থেকে যে-ই কাতুকুতু দিলাম, অমনই হাসতে হাসতে...''

বিমল বলল, ''তাই ওকে না পেয়ে ভাবলুম, একা রিকশায় বাড়ি ফেরার

সাহস যখন ওর হয়েছে, আজও আমাদের দেরি দেখে ও বাড়ি চলে আসতে পারে।''

রিনি জিজ্ঞেস করল, ''তোমাদের যেতে দেরি হল কেন?''

বিমল বলল, ''পার্ক সার্কাসের কাছে মিছিলে অনেক গাড়ি আটকে গিয়েছিল, রাস্তা জ্যাম।''

জয়ন্তী উতলা হয়ে বললেন, ''কিন্তু রিকশায় এলেও তো এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। একেবারে সোজা রাস্তা।''

বিমল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ''আমি গোটা রাস্তা খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এলুম। কোনও রিকশাতেই বিল্টুবাবু নেই।''

রিনি বলল, ''চলো তো বিমল, তোমার গাড়িতেই আমি স্কুল পর্যন্ত একবার ঘুরে আসি। দেখি যদি কোথাও...''

জয়ন্তী বললেন, ''আমিও যাব তোর সঙ্গে।''

রিনি বলল, ''না, মা, তুমি থাকো। তুমি বরং সিদ্ধার্থদাকে একটা ফোন করো। না, থাক, এখনই ফোন করার দরকার নেই। আমি ফিরে আসি, তখনও যদি কোনও খবর না পাই...'' রিনি নেমে গিয়ে বিমলের গাড়িতে উঠে বসল।

এর মধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। সব বাড়িতেও আলো জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে অনেক মানুষ, প্রচুর গাড়িও চলছে স্বাভাবিকভাবে। সব কিছুই অন্য দিনের মতো। শুধু বিল্টুর দেখা নেই!

রিনি স্কুল পর্যন্ত গেল। গেট একেবারে বন্ধ। উলটো দিকের পার্কেও ফুটবল খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা হলে বিল্টু কোথায় গেল? সে এমনিতে যতই দুষ্টুমি করুক, একা-একা বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না।

রিনি ফিরে এসে দেখল, জয়ন্তীর দু'পাশে বসে আছে খুশি, টুসি, আর ওদের মা শিখা টেলিফোন করছেন। বিল্টুর ক্লাসের কয়েকটা ছেলের কাছে জানা গিয়েছে যে, বিল্টু শেষ পর্যন্ত ক্লাসেই ছিল। ছুটির পর সে কোথায় গিয়েছে, তারা জানে না। রিনির বাবার অফিস সল্টলেকে। এক-একদিন তাঁর ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। আজ তিনি বলে গিয়েছেন, তাঁর জরুরি মিটিং আছে। এখনই তাঁকে খবর দিলে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কাজ শেষ না করেই নিশ্চয়ই চলে আসবেন। তার আগে রিনি ফোন করল তার দিদির বাড়িতে।

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করল, ''কী রে রিনি, হাঁফাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে? সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিস?''

রিনি বলল, ''না, দিদি, শোনো, একটা ব্যাপার হয়েছে, আগেই ভয় পেয়ে যেয়ো না। মানে, বিল্টু এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, আর সকলে ফিরে এসেছে।''

স্নিগ্ধা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ''অ্যাঁ, কী বলছিস? বিল্টু? কী হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্ট?''

স্নিগ্ধার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ''কী হয়েছে রে রিনি? তোর দিদির তো মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হবে! বিল্টু কোথায়? কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?''

রিনি বলল, ''অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা জানি না। যে গাড়িটা বিল্টুকে স্কুল থেকে আনতে যায়, সে গাড়িতে বিল্টু আসেনি। ওরা তাকে খুঁজে পায়নি।''

সবটা শোনার পর সিদ্ধার্থ বলল, ''শোন, এখন মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। অনেক কিছুই হতে পারে, আবার হয়তো কিছুই হয়নি। এখনই হয়তো কেউ বিল্টুর হাত ধরে পৌঁছে দিতে পারে। এরকম হয়। আমি তোর দিদিকে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে তোদের বাড়িতে পৌঁছে যাব। তার আগে দু'-একটা হাসপাতালে খোঁজ নিতে হবে।''

সিদ্ধার্থ রেখে দেওয়ার একটু পরেই আবার বেজে উঠল ফোন।

এবার একটি অচেনা কণ্ঠ প্রথমেই বলল, ''পুলিশে খবর দেননি তো? দিলেও অবশ্য পুলিশ এত তাড়াতাড়ি কোনও অ্যাকশন নেয় না। শুনুন।''

রিনি জিজ্ঞেস করল, ''আপনি কে বলছেন?''

ভদ্রলোকটি বললেন, ''আমার নাম সুপ্রিয় রায়। আপনার ভাই আমার কাছে আছে। চিন্তার কিছু নেই। একটু পরেই ফেরত যাবে।''

রিনি আবার জিজ্ঞেস করল, ''আমার ভাই আপনার কাছে গেল কী করে? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না!''

সুপ্রিয় রায় বললেন, ''আমায় চিনবেন কী করে? আমিও তো আপনাকে চিনি না। একটু আগে আপনার ভাইয়ের কাছে আপনার নাম শুনলাম। ফোন নম্বরটাও জেনে নিলাম।''

রিনি বলল, ''আমার ভাই, আমার ভাইকে আপনি আগে চিনতেন?''

সুপ্রিয় বললেন, ''না। আজ বিকেলবেলা ছেলেটি একটি পার্কের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল, এমন সময় একটা স্কুটারের সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগে। যে চালাচ্ছিল, তার খুব দোষ নেই। ছেলেটি হঠাৎ দৌড়ে এসে পড়েছিল। ধাক্কা লেগে ছেলেটি ছিটকে পড়ে যায়, তাতে ওর মাথা ফেটে... আরে শুনুন,

শুনুন, তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে ওরকম মাথা ফাটে। তাতে এমন কিছু হয় না। খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল, এখন জ্ঞান ফিরেছে। দিব্যি কথা বলছে, এক গেলাস গরম দুধও খেল।''

রিনি বলল, ''বিল্টু আপনার কাছে আছে। আপনার বাড়ি কোথায়?''

সুপ্রিয় বললেন, ''এই তো বেকবাগানে। আমি ডাক্তার, এখানেই আমার চেম্বার। সেই স্কুটার চালকই আমার কাছে পৌঁছে দিল। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, সব ঠিকঠাক আছে, হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি, চিন্তা করবেন না। অকারণ থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। এখনই আমার চেম্বার বন্ধ হবে, আমি নিজে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে।''

রিনি বলল, ''আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন। আপনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। আপনি ঠিকানাটা বলুন, আমরাই ওকে নিয়ে আসছি।''

সুপ্রিয় বললেন, ''কষ্টের কী আছে? আমি ওই পথ দিয়েই যাব। ছেলেটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।''

রিনি বলল, ''ডাক্তার রায়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাদের জন্য যা করলেন!''

সুপ্রিয় হেসে বললেন, ''দাঁড়ান, আগে পৌঁছে দিই। তারপর তো ধন্যবাদ দেবেন। শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না, মিষ্টি খাওয়াতে হবে। ঠিক আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে...''

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর রিনির চোখে জল এসে গেল। খুব আনন্দের সময় এরকম হয়। জয়ন্তী অন্য একটা রিসিভারে সব শুনেছেন, তিনি এসে জড়িয়ে ধরলেন রিনিকে।

রিনি বলল, ''দ্যাখো, পৃথিবীতে এখনও কত ভাল মানুষ আছেন। এই ডাক্তারটি বিল্টুকে সুস্থ করে তুলেছেন, আবার নিজে পৌঁছে দিতে আসছেন। বিল্টুকে দুধও খাইয়েছেন।''

জয়ন্তী বললেন, ''বাড়িতে তো কিছুতেই দুধ খেতে চায় না। ওখানে খেয়ে নিল?''

রিনি বলল, ''ডাক্তাররা জানেন কী করে খাওয়াতে হয়!''

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলেন, ''হ্যাঁরে, কতটা মাথা ফেটেছে? অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?''

রিনি বলল, ''খুব বেশি নয় নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরেছে। গত

মাসেও তো বিল্টুর একবার মাথা ফেটেছিল। এ ছেলেকে আরও শক্ত করে সামলে রাখতে হবে মা।''

জয়ন্তী বললেন, ''আমার এখনও বুক কাঁপছে। ভাবতেই পারছি না। স্কুটারের ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ছেলেটা...এখন সে কী অবস্থায় আছে?''

রিনি বলল, ''আর আধঘণ্টার মধ্যেই তো দেখতে পাবে।''

এরপর শুধু প্রতীক্ষা। এখন প্রতিটি মিনিটই মনে হয় খুব লম্বা। রাস্তায় যে-কোনও গাড়ি থামলেই দৌড়ে যেতে হয় বারান্দায়। এর মধ্যে আবার লোডশেডিং হয়ে গেল। সমস্ত পাড়া জুড়েই অন্ধকার। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। আলোর চেয়ে অন্ধকারকে আরও বেশি লম্বা মনে হয়।

ঘরের মধ্যে গরম, তাই মা আর মেয়ে দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। একসময় বেজে উঠল ফোন। অন্ধকারে ঝনঝন শব্দটাও যেন বেশি জোরালো।

এবারে ফোন ধরলেন জয়ন্তী। তিনি হ্যালো বলতেই একটি গম্ভীর কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, ''এ বাড়িতে কি পুরুষমানুষ কেউ নেই?''

জয়ন্তী বললেন, ''আপাতত কেউ নেই। আপনি কী বলতে চান, আমাকে বলতে পারেন।''

সেই গম্ভীর কণ্ঠ বলল, ''আপনাকে বললে ঠিক কাজ হবে না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার। আপনাদের ছেলে এখন আমাদের কাস্টডিতে আছে। আপনারা তাকে ফিরে পেতে চাইলে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে।''

জয়ন্তী চমকে উঠে বললেন, ''আপনি কে বলছেন? আপনি ডাক্তার সুপ্রিয় রায়?''

গম্ভীর কণ্ঠ বিরক্তভাবে বলল, ''কে সুপ্রিয় রায়?''

জয়ন্তী বললেন, ''আপনি একটু আগে ফোন করেননি? আপনি যে বললেন, আপনি আমার ছেলেকে নিয়ে আসছেন?''

লোকটি বলল, ''কে ওই সব বলেছে, আমি জানি না। আপনার ছেলে এখন আমার কাছে। তাকে এখন ফেরত পাওয়া যাবে না।''

জয়ন্তী চিৎকার করে বলে উঠলেন, ''অ্যাঁ? এসব কী বলছেন? কে আপনি?''

লোকটি বলল, ''এই জন্যই মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। আপনার হাজ়ব্যান্ড কখন ফিরবেন?''

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। রেলিং থেকে ঝুঁকে রিনি দেখতে

চাইল, সেই গাড়ি থেকে বিল্টু নামছে কিনা। তারপর চেঁচিয়ে বলল, ''মা, দিদি-সিদ্ধার্থদারা এসে গিয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।''

টেলিফোনের লোকটি বলল, ''ঠিক আছে। আমি আবার দু'ঘণ্টা পরে ফোন করব।''

জয়ন্তী বললেন, ''না, না, ধরুন, ধরুন, এসে গিয়েছে!''

লোকটি বলল, ''কে এসে গিয়েছে? আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আমি কথা বলব না।''

জয়ন্তী বললেন, ''এ আমাদের বাড়ির জামাই। বাড়ির ছেলেরই মতো। ও সব কিছুর দায়িত্ব নিতে পারে।''

লোকটি বলল, ''আমি আর ঠিক তিরিশ সেকেন্ড ফোন ধরে থাকব।''

জয়ন্তী চেঁচিয়ে বললেন, ''সিদ্ধার্থ, তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি এসো।''

এক-এক লাফে দু'-তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে সিদ্ধার্থ উঠে এল দোতলায়। অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেল একবার।

জয়ন্তীর উঁচু করা হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সে বলল, ''হ্যালো, সিদ্ধার্থ ঘোষ স্পিকিং।''

গম্ভীর গলার লোকটি বলল, ''আমি একটা বিজনেস কোম্পানি থেকে বলছি। প্রথম কথাই হল, আপনাদের বাড়ির ছেলে বিল্টু আমাদের কাছে আছে। সে বেশ ভাল আছে। তার জন্য চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।''

পাশ থেকে জয়ন্তী বললেন, ''ওর মাথা ফেটেছে!''

লোকটি বলল, ''না, মাথাটাথা ফাটেনি। হঠাৎ মাথা ফাটবে কেন? গায়ে একটু ধুলোও লাগেনি। শুনুন, বেশি সময় নেই...''

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ''আপনাদের কীসের বিজনেস?''

লোকটি বলল, ''অর্ডার সাপ্লাই। অনেক কিছু সাপ্লাই করি। তার মধ্যে ছোট ছেলেদের বাজারদর খুব ভাল।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''বাজারদর মানে? আপনারা ছোট ছেলেদের ধরে ধরে বিক্রি করেন?''

লোকটি বলল, ''আমরা ধরি না। ওসব ঝামেলায় আমরা যাই না। অন্য লোকেরা ধরে, তারপর আমাদের কাছে বিক্রি করতে দিয়ে যায়। আমরা কমিশন নিই। আর প্রশ্ন করবেন না, পরপর যা বলি শুনে যান। কাগজ-কলম থাকলে লিখেও নিতে পারেন।''

রিনি দৌড়ে পাশের ঘর থেকে একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার এনে নিঃশব্দে রাখল ফোনের পাশে।

সিদ্ধার্থ বলল, ''কাগজ-কলম লাগবে না। আপনি বলুন, আমার মনে থাকবে।''

লোকটি বলল, ''প্রথম কথা হল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি, তা কোনওক্রমেই খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনও পুলিশই পারবে না। সুতরাং, এখানকার পুলিশদের জানালে কোনও লাভই হবে না। দু'নম্বর, পুলিশকে জড়ালে আপনাদের বিপদই হবে। পুলিশকে কিছু জানাবেন না। তিন, যে বেশি দাম দেবে, তাকেই আমরা জিনিস বিক্রি করব। এটাই তো ব্যাবসার নিয়ম। ছোট ছেলেদের বিদেশে খুব চাহিদা। তবে কম বয়সের ছেলে হলে আগে আমরা বাবা-মায়ের কাছেই অফার দিই। এ ছেলের দাম ধরা হয়েছে কুড়ি লাখ টাকা। আগামী পাঁচদিনের মধ্যে পুরো টাকা দিয়ে দিলে ছেলেকে আমরা নিখুঁত অবস্থায় ফেরত দেব। কোয়ালিটি গ্যারান্টিড। ছেলে হাসতে হাসতে ফিরে আসবে। চার, টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোনও গন্ডগোল করলে কিংবা পিছনে পুলিশ নিয়ে এলে আপনাদের ছেলের প্রাণের দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। ও কে? এটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। ছেলেকে ফিরে পেতে হলে টাকাটা দিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও অল্টারনেটিভ নেই।''

সিদ্ধার্থ এর মধ্যে বলে উঠল, ''কিন্তু এত টাকা আমরা দেব কী করে? আমরা কী দোষ করেছি?''

লোকটি বলল, ''নো কোয়েশ্চেন, নো কোয়েশ্চেন! আমি যা বলব, শুনে যান। টাকাটা কবে, কখন আর কোথায় দিতে হবে, তা আমরা দু'দিনের মধ্যে জানিয়ে দেব। কুড়ি লাখ টাকা!''

সিদ্ধার্থ বলল, ''শুনুন, শুনুন, এর মধ্যে যদি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তা হলে কোথায় যোগাযোগ করব? বিল্টুর বাবা এখনও কিছু জানেন না। তিনি যদি কথা বলতে চান আপনাদের সঙ্গে, কোন নম্বরে আপনাদের পাব?''

লোকটি ঠিক দু'বার শুকনোভাবে হা হা করে হাসল। তারপর বলল, ''খুব চালাক, তাই না? আমরা একটা নম্বর দেব, অমনই একঝাঁক পুলিশ গিয়ে সেখানে হাজির হবে? না, না, না, না, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও দরকার নেই। আমরাই যোগাযোগ করব। এবার শেষ দরকারি কথা।

আপনাদের এক খোঁড়া আত্মীয় আছে, রাজা রায়চৌধুরী, অনেকে তাকে কাকাবাবু বলে। সে লোকটা যেন কোনওক্রমেই এর মধ্যে মাথা না গলায়। তাকে আপনারা জানিয়ে দেবেন, তার উপর আমরা নজর রাখছি। সেই রাজা রায়চৌধুরী কোনওরকম কায়দাকানুন করতে গেলে ছোট ছেলেটির জীবন সম্পর্কে আমাদের আর দায়িত্ব থাকবে না। প্রথমে তার ডেডবডি ডেলিভারি দেওয়া হবে। তারপর রাজা রায়চৌধুরী খুন হবে। ক্লিয়ার? বুঝলেন তো? আপনাদের ভালর জন্যই রাজা রায়চৌধুরীকে দূরে রাখুন। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত।''

ফোন বন্ধ হয়ে গেল!

৪

জয়ন্তী কাঁদতে শুরু করলেন।

রিনি বলল, ''মা, তুমি ঠিক দশ মিনিট কাঁদতে পারো। তারপর আর কাঁদবে না। বাবার সামনে একদম কান্নাকাটি করবে না।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''এখন কান্নাকাটি করলে আমরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারব না।''

স্নিগ্ধা বলল, ''এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বিল্টু! তাকে অন্য লোক ধরে রেখেছে! খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই পড়ি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে...''

সিদ্ধার্থ বলল, ''লোকটায় কী আস্পর্ধা! বলে কিনা ব্যাবসার ব্যাপার! আগে ছিল ছেলেধরা, রাস্তা থেকে ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে পালাত। তারপর শুরু হল অ্যাবডাকশন।''

রিনি বলল, ''অপহরণ আর মুক্তিপণ।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''আর এখন একেবারে খোলাখুলি ছেলে বিক্রির ব্যাবসা! আগে বাবা-মায়ের কাছে টাকা চাইবে, বাবা-মা টাকা দিতে না পারলে বাইরে বিক্রি করে দেবে!''

স্নিগ্ধা বলল, ''পুলিশ কিছুই করতে পারে না?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''ওই যে পুলিশে খবর দিলেই মেরে ফেলার ভয় দেখায়। সেই ভয়েই বাবা-মায়েরা পুলিশের কাছে যায় না।''

স্নিগ্ধা বলল, ‘‘দু’-একটা বাচ্চাকে তো সত্যি সত্যি মেরেও ফেলে। কাগজে যে বেরোল, গত সপ্তাহেই সোনারপুরে...’’

রিনি বলল, ‘‘আঃ দিদি, ওসব কথা এখন ছাড়ো...’’ সে মায়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল।

জয়ন্তী কান্না থামিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, ‘‘কুড়ি লাখ টাকা আমরা কোথায় পাব? অত টাকা! দিতে না পারলে...আমার সব গয়না বিক্রি করে দেব, তাতে কত টাকা হবে?’’

স্নিগ্ধা বলল, ‘‘আমার গয়নাও সব বিক্রি করে দেব মা।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘গয়না বিক্রি করেও হবে না। আরও অনেক টাকা লাগবে।’’

রিনি বলল, ‘‘এখন তো বাবাকে ফোন করতেই হয়।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘হ্যাঁ কর। তবে সবটা বলার দরকার নেই। শুধু জিজ্ঞেস কর, উনি কখন ফিরবেন। আর বলতে পারিস, মায়ের একটু শরীর খারাপ হয়েছে। কিংবা বলতে পারিস, আমরা এসেছি।’’

ফোন করতেই অমিতাভ বললেন, ‘‘এই তো আমি বেরোচ্ছি। আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। কিছু খাবারটাবার নিয়ে আসব। বিল্টু চাইনিজ় খেতে চেয়েছিল।’’

রিনি বলল, ‘‘না, বাবা, খাবার আনতে হবে না। আজ বাড়িতে অনেক রান্না হয়েছে।’’

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু কী করছে? পড়ছে না ছবি আঁকছে?’’

রিনি বলল, ‘‘বিল্টু, ইয়ে এই একটুখানির জন্য পাশের বাড়ি গিয়েছে!’’

ফোনটা রেখে দিয়েই রিনি ওড়না দিয়ে চোখ চাপা দিল।

স্নিগ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ‘‘এবার তুই কাঁদছিস? মনটাকে শক্ত কর।’’

ওড়নাটা সরিয়ে রিনি ধরা গলায় বলল, ‘‘বাবার কাছে আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘এক কাজ কর, রিনি। ওই টেপটা চালা তো! কথাগুলো আর-একবার শুনি।’’

রেকর্ডিং বেশ পরিষ্কার হয়েছে। টেলিফোনের লোকটার গলা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সবটা শোনার পর সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, ‘‘জানিস রিনি, লোকটা যখন এইসব ভয় দেখাচ্ছে, তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এখনই কাকাবাবুকে খবর দিতে হবে। কাকাবাবু ঠিক একটা কিছু উপায় বের করবেন। তখনই লোকটা যেন ঠিক আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল, ‘রাজা রায়চৌধুরীকে খবর দেওয়া চলবে না!’ ভাব তো ব্যাপারটা, এরকম একটা কাণ্ড হচ্ছে, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনাও করতে পারব না?’’

রিনি বলল, ‘‘আমরা কাকাবাবুকে কোনও খবর দেব না। কিন্তু উনি নিজেই যদি জেনে যান!’’

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করল, ‘‘নিজে থেকে কী করে জেনে যাবেন?’’

রিনি বলল, ‘‘সন্তু এ পাড়ায় প্রায়ই আসে। ওর বন্ধু জোজোর বাড়ি তো পাশের রাস্তায়। যদি কালই এসে পড়ে সন্তু? জোজোকে সঙ্গে নিয়েও আসতে পারে। তখন নিশ্চয়ই বিল্টুকে দেখতে চাইবে! কাল শনিবার, বিল্টুর স্কুল ছুটি। তখন সন্তুকে আমরা কী বলব?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘সন্তু বুদ্ধিমান ছেলে। আমাদের ব্যবহার দেখেই বুঝে যাবে যে, কিছু গন্ডগোল হয়েছে।’’

রিনি বলল, ‘‘প্রাইজ় নিতে বিল্টুর দিল্লি যাওয়ার কথা। কাকাবাবু বলেছিলেন, তিনিও ঠিক ওই সময় কী-একটা কাজে দিল্লি যাবেন। কাকাবাবু বিল্টুর সঙ্গে একই প্লেনে যেতে চান।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘সন্তু বুঝে যাক কিংবা কাকাবাবু জেনে যান, যাই-ই হোক, তখন কাকাবাবুকে স্পষ্ট বলে দিতে হবে, তিনি যেন কোনওক্রমেই এর মধ্যে মাথা না গলান। আগে বিল্টুকে ফিরিয়ে আনতে হবে।’’

জয়ন্তী বললেন, ‘‘স্কুল থেকে ফিরলেই বিল্টুর খিদে পায়। আজ এখনও কিছু খায়নি।’’

রিনি বলল, ‘‘ওরা নিশ্চয়ই খেতে দিয়েছে।’’

জয়ন্তী এবার রক্তচক্ষে বললেন, ‘‘ওরা খেতে দেবে? ওরা অমানুষ! শয়তান! একটা ছোট ছেলেকে তার মা’র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়!’’

এবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল।

অমিতাভ উপরে এসে দেখলেন, বসার ঘরের মেঝেতে সকলে বসে আছে। সকলে একসঙ্গে তাকাল তাঁর দিকে।

কোটটা খুলতে খুলতে অমিতাভ বললেন, ‘‘খুব আড্ডা হচ্ছে বুঝি তোমাদের? বিল্টু এখনও ফেরেনি পাশের বাড়ি থেকে?’’

সিদ্ধার্থ অমিতাভকে 'স্যার' বলে ডাকে। কারণ, অমিতাভ একসময় সিদ্ধার্থদের কলেজে পড়াতেন। সিদ্ধার্থ বলল, "স্যার, আপনি আগে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আপনি কি চা খাবেন?"

অমিতাভ ভুরু কুঁচকে বললেন, "না, চা খাব না। জরুরি কথা? কী বলো তো?"

রিনি তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে দিল বাবার হাতে।

সিদ্ধার্থ বলল, "আমার কিছু টাকা দরকার।"

অমিতাভ আবার বললেন, "টাকার দরকার? কেন ব্যাবসা ট্যাবসা করবে নাকি? কত টাকা?"

সিদ্ধার্থ বলল, "বেশ কিছু টাকা। অন্তত কুড়ি লাখ!"

অমিতাভ এবার হেসে ফেললেন। জলের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? কুড়ি লাখ টাকা তো আমাকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না! গতমাসেই বাড়িটা সারালাম, হাতে প্রায় কিছুই নেই। বড়জোর এক-দেড় লাখ টাকা দিতে পারি।"

রিনি বলল, "বাবা, কুড়ি লাখ টাকা জোগাড় করতেই হবে।"

এবার অমিতাভ বেশ অবাক হলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে রিনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই আবার টাকার কথা কী বলছিস? কী ব্যাপার বল তো!"

রিনি বলল, "বাবা, আমি একটা টেপ শোনাচ্ছি। আগে মন দিয়ে শোনো।"

সে টেপটা চালিয়ে দিল।

অমিতাভ একটুখানি শুনেই বললেন, "এটা কী? কোনও নাটক নাকি? এটা এখন শুনতে হবে কেন?"

সিদ্ধার্থ বলল, "স্যার, একটু শুনুন প্লিজ়। প্লিজ়।"

এবার শুনতে শুনতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টেপটা শেষ হতেই তিনি গর্জন করে বলে উঠলেন, "কী, বিল্টুকে এরা ধরে রেখেছে? এরা কোন রাস্কেলের দল? আমি এখনই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করব। পুলিশ দিয়েই ওদের শায়েস্তা করতে হবে।"

জয়ন্তী বললেন, "না, না, আগে পুলিশ না, পুলিশ না। আগে বিল্টুকে বাঁচাতে হবে। তারপর ওদের শাস্তি। এখন যেমন করে হোক, টাকা জোগাড় করতেই হবে।"

অমিতাভ খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতে

লাগলেন। আপন মনে বললেন, ‘‘অত টাকা...বিল্টু...এখন আমি কী করব?’’

এক মিনিট সকলে চুপ।

তারপর জয়ন্তী বললেন, ‘‘আমাদের সব গয়না বিক্রি করে দেব। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে যা আছে, অফিস থেকে যা পাও, আর বাকিটা ধার করতে হবে।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘কে টাকা ধার দেবে?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘অনেক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা ধার পাওয়া যায় শুনেছি।’’

অমিতাভ রিনিকে বললেন, ‘‘কাগজ-কলম নিয়ে আয়, হিসেব করে দেখি।’’

এই সময় ফোন বেজে উঠল।

স্নিগ্ধা ফোনটা ধরেই বলল, ‘‘হ্যালো।’’ তারপরই বলল, ‘‘আপনি এক মিনিট ধরুন,’’ ফোনে হাত চাপা দিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, ‘‘কাকাবাবু! কাকাবাবু!’’

সকলে পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে চেয়ে রইল!

কাকাবাবু নিজে থেকে সাধারণত ফোন করেন না। কখনও তাঁর ফোন এলে সকলেরই কত আনন্দ হয়। আজ ভয় হচ্ছে।

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘কথা বলো। কতক্ষণ ধরে থাকবেন উনি, কিছু একটা বলে দাও!’’

স্নিগ্ধার কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে রিনি বলল, ‘‘হ্যালো কাকাবাবু, কেমন আছ তুমি?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ভাল আছি। ফোনটা কে ধরেছিল রে?’’

রিনি বলল, ‘‘আমার দিদি। তোমার গলা চিনতে পারেনি।’’

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু কোথায় রে? আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলব।’’

রিনি বলল, ‘‘বিল্টু? ইয়ে, ও তো পাশের বাড়িতে...ওকে ডাকতে পাঠিয়েছি। কখন আসবে কে জানে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ও তো দেখছি পাশের বাড়িতেই বেশি সময় থাকে!’’

রিনি বলল, ‘‘পাশের বাড়ির একটি মেয়ে তো বিল্টুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সে-ও ছবি আঁকে। বিল্টু তাই...’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘বিল্টুর দিল্লি যাওয়া কবে ঠিক হল?’’

রিনি বলল, "এখনও দিন ঠিক হয়নি। খুব সম্ভবত সামনের সপ্তাহে, দিল্লি থেকে টিকিট পাঠাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তারিখটা আমার জানা দরকার। আমিও সেদিন দিল্লি যাব। আর শোন, বিল্টুকে আমি একটা মাউথ অর্গান উপহার দেব বলেছিলাম। সেটা আমি কিনে ফেলেছি। সেটা আমি বিল্টুকে নিজের হাতে দিতে চাই। কাল সকালে আমি বেরোব, কাল আমি তোদের বাড়ি যাব।"

রিনি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাল সকালে? না, না, কাকাবাবু, কাল সকালে এসো না।"

ঘরের সকলে একেবারে চুপ, যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গিয়েছে। সকলে তাকিয়ে আছে ফোনটার দিকে।

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই রিনি গলার আওয়াজ বদলে ফেলে বলল, "মানে, কাকাবাবু বলছি কী, কাল সকালবেলা আমরা সকলে মিলে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি তো, তাই তোমাকে আসতে বারণ করলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, বিকেলবেলা যাব।"

রিনি বলল, "বিকেলবেলা, মানে, দুপুরে তো দিদির বাড়ি নেমন্তন্ন, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি তোমাকে ফোন করব।"

কাকাবাবু কী বুঝলেন, কে জানে! আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিলেন।

রিনি দু'হাত জোড় করে বলল, "কাকাবাবু, আমাকে ক্ষমা করো। এত মিথ্যে কথা আমি জীবনে বলিনি। কিন্তু...

তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

৫

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, বিল্টু বাড়িতে নেই। এরকম আগে কখনও হয়নি। কাল রাত থেকে এ বাড়ির কেউ কিছু খায়নি, কেউ শুতেও যায়নি। শুধু শেষ রাতে বসে বসেই ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। অন্য কাউকে কিছু জানানো চলবে না। পাশের বাড়ির মেয়ে দুটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিল্টুর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে আছে তার মামাবাড়িতে।

রান্না করে দেওয়ার জন্য এক রান্নামাসি আসে রোজ সকালে। আজ তাকে ছুটি করে দেওয়া হয়েছে। কখন কোন কথা সে শুনে ফেলবে, তারপর বাইরে গিয়ে বলে দেবে, তাই দরকার নেই। সেইজন্য রান্নাও বন্ধ। বাড়িতে পাউরুটি আছে, ফ্রিজে আছে ডাল। দুপুরের দিকে স্নিগ্ধা ডাল গরম করে এনে সকলকে জোর করে একটু একটু খাওয়াল। অমিতাভ আর সিদ্ধার্থ অনবরত আলোচনা করে যাচ্ছে, কোথা থেকে টাকা জোগাড় করা যাবে। টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

মাঝে মাঝেই ফোন বেজে উঠছে। প্রতিদিনই তো কত ফোন আসে। আজ ফোন বাজলেই সকলে প্রথমে ভয়ে কেঁপে উঠছে! ওরা আবার কী বলবে কে জানে!

এ পর্যন্ত সবই অন্য লোকদের ফোন। কারও সঙ্গেই বেশি কথা বলা হচ্ছে না।

রিঙ্কুমাসি প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা জয়ন্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেন, অন্তত চল্লিশ মিনিট। আজ জয়ন্তী দু'-চারটি কথা বলেই বললেন, "দিদি, আজ আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তোমাকে আমি পরে ফোন করব। হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।"

ফোনটা খালি রাখতে হবে। কখন ওদের ফোন আসবে ঠিক নেই।

সেই ফোন এল সন্ধেবেলা। গম্ভীর গলা শুনেই সিদ্ধার্থ ফোনটা দিয়ে দিল অমিতাভকে।

গম্ভীর গলা জিজ্ঞেস করল, "কে কথা বলছেন?"

অমিতাভ বললেন, "আমি বিল্টুর বাবা।"

লোকটি বলল, "গুড! হেড অফ দ্য ফ্যামিলির সঙ্গে কথা বলা দরকার। টাকার কথাটা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই।"

অমিতাভ বললেন, "আগে বলুন, আমার ছেলে কেমন আছে?"

লোকটা বলল, "কী যেন নাম ছেলেটার? গেরুয়া ধ্বজা?"

অমিতাভ বললেন, "নীলধ্বজ।"

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "এত শক্ত নাম রাখেন কেন?"

অমিতাভ বললেন, "ওর একটা ডাকনামও আছে।"

লোকটি বলল, "যতবার ওকে জিজ্ঞেস করি, তোর ডাকনাম কী, ততবার বলে কুশগাজি!"

অমিতাভ বললেন, ‘‘কুশগাজি? সে আবার কী, ওর নাম নীলধ্বজ। অচেনা লোক ওর ডাকনাম ধরে ডাকলেও ও উত্তর দেয় না। কাল থেকে ও কিছু খেয়েছে?’’

লোকটি বলল, ‘‘টোস্ট খেয়েছে। আলুভাজা খেয়েছে। একটা চকোলেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা খায়নি, নিতেই চায়নি।’’

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘রাতে ঘুমিয়েছে?’’

লোকটি আবার ধমক দিয়ে বলল, ‘‘ঘুমোবে না কেন? সব ছোট ছেলেই রাত্তিরে ঘুমোয়। একবারও কান্নাকাটি করেনি।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘ও সহজে কাঁদে না, তা আমরা জানি।’’

লোকটি বলল, ‘‘এসব বাজে কথা থাক। আমার বেশি সময় নেই। এবার কাজের কথা হোক। টাকার জোগাড় হয়েছে?’’

অমিতাভ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ‘‘অত টাকা এত তাড়াতাড়ি কী করে জোগাড় করব বলুন তো? আমি তো ব্যবসায়ী নই, একটা মোটামুটি চাকরি করি।’’

লোকটি বলল, ‘‘সকলেই প্রথমে এই কথা বলে। আরে মশাই, টাকা ছাড়া কি পৃথিবী চলে? আপনি কী করেন, তা আমরা ভালই জানি। সব খোঁজ নিয়েছি। লোকে আপনাকে ধার দেবে। শুনুন, ঠিক তিনদিন সময়। টাকা ভরতি সুটকেস নিয়ে একজন মাত্র লোক যাবে। ঠিক ক’টার সময় আর কোথায়, তা পরশুদিন বলে দেব।’’

অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘মাত্র তিনদিন? তার মধ্যে যদি পুরো টাকাটা জোগাড় করতে না পারি?’’

লোকটি জোরে ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আবার ওই কথা? এক পয়সাও কমাব না। আপনার ছেলেকে ফেরত চান কি চান না, বলুন!’’

অমিতাভ অমনই ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘‘নিশ্চয়ই ফেরত চাই। তার যেন কোনও ক্ষতি না হয়।’’

লোকটি বলল, ‘‘ও ছেলেকে এখনই আরব দেশে বিক্রি করে দিলে অনেক বেশি দাম পাব। উটের দৌড়ের জন্য ওরা ছোট ছেলে চায়। তবে আমরা বাবা-মাকেই প্রথম অফার দিই। সেইজন্যই আর তিনদিন সময় দিয়েছি। দেরি হলে ও ছেলেকে আর জীবনেও দেখতে পাবেন না!’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘না, না, না, আমি চেষ্টা করছি।’’

লোকটি বলল, ‘‘তাই করুন। আপনারা পুলিশে খবর দেননি, তা আমরা

জানি। কিন্তু ওই খোঁড়া লোকটা, রাজা রায়চৌধুরী, তাকে খবর দেননি তো?''

অমিতাভ বললেন, ''না, তিনি কিছুই জানেন না।''

লোকটি বলল, ''গুড! ও লোকটার সব কিছুতে মাথা গলানো অভ্যেস। এবার মাথা গলাতে এলে ওর মাথাটাও কেটে ফেলব আর আপনার ছেলেরও! ঠিক আছে, পরশুদিন আবার কথা হবে!''

ফোনটা রেখে দিয়ে অমিতাভ অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আর মোটে তিনদিন সময় দিয়েছে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''যেভাবেই হোক টাকাটা জোগাড় করতেই হবে। আপনার মনে নেই, গত বছর একটা কোম্পানির বড়সাহেব একদিন মর্নিংওয়ার্কে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে কয়েকজন কিডন্যাপ করে। ঠিক এইরকমই, পুলিশে খবর দিতে ভয় দেখানো হয়েছিল। ওঁর বাড়ির লোক মোটা টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ভদ্রলোককে উদ্ধার করেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কয়েকজনকে ধরেছে, কিছু টাকাও ফেরত পাওয়া গিয়েছে। আমাদেরও সেরকম করতে হবে।''

অমিতাভ হতাশভাবে বললেন, ''আগে টাকা চাই! অত টাকা!''

রিনি বলল, ''একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ডাক্তার সুপ্রিয় রায় নামে আগে যে একজন ফোন করেছিল, বিল্টুকে একটু পরেই ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিল, সে কোথায় গেল?''

জয়ন্তী বললেন, ''সে ধাপ্পা দিয়েছে!''

রিনি বলল, ''কিন্তু সে বিল্টুর কথা জানে। কোন স্কুলে পড়ে তাও জানে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''সে লোকটাও ওদেরই দলের। তোমাকে ফোন করে ওই কথা বলেছিল কেন জানো? যাতে তোমরা আগেই পুলিশে খবর না দাও! ততক্ষণে বিল্টুকে ওরা অনেক দূরে সরিয়ে ফেলেছে।''

অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''বদমাইশের দল! আমি এখন বেরোচ্ছি। দেখি, কোথায় কোথায় টাকা পাওয়া যায়!''

জোজো দোতলায় উঠে এসে দেখল, কাকাবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। সে বাইরে থেকে দু'বার ডাকল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু!"

কোনও উত্তর নেই।

সে আবার বলল, "কাকাবাবু, আমি জোজো।"

তাও কোনও উত্তর নেই!

জোজো আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আপনি ব্যস্ত আছেন?"

এবারে ভিতর থেকে শোনা গেল কাকাবাবুর গলা। তিনি বললেন, "না, ব্যস্ত নেই। কিন্তু দরজা খুলতে ইচ্ছে করছে না। তুমি পরে এসো।"

জোজো অবাক হয়ে কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। তারপর পা টিপে টপে উঠে গেল উপরে।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বুকের উপর বই রেখে পড়ছে সন্তু আর একটা গান বাজছে মিউজ়িক সিস্টেমে।

জোজো ঘরে ঢুকে বলল, "ব্যাড হ্যাবিট, ব্যাড হ্যাবিট। শুয়ে শুয়ে বই পড়া মোটেই ভাল নয়। তা হলে আর চেয়ার-টেবিল বানানো হয়েছে কেন?"

সন্তু বলল, "তুই যে বিছানায় বসে বসে ব্রেকফাস্ট খাস? তা হলে খাওয়ার টেবিল থাকে কেন বাড়িতে?"

জোজো বলল, "ওটা হচ্ছে রোমান স্টাইল। রোমের বড় বড় লোকেরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে খেত আর বিরাট বিরাট ঢেকুর তুলত। আমার অবশ্য ঢেকুর ওঠে না।"

সন্তু বলল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুয়ে শুয়ে লিখতেন আর পড়তেন।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তুই বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শুয়ে শুয়ে পড়তে দেখেছিস?"

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তুই বুঝি সেকালের রোমের লোকদের শুয়ে শুয়ে খেতে দেখেছিস?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ দেখেছি, সিনেমায়!"

সন্তু উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুই আমার শরদিন্দু গ্রন্থাবলিটা ফেরত এনেছিস?"

জোজো বলল, "এখনও শেষ হয়নি। আস্তে আস্তে পড়ছি।"

সন্তু বলল, ‘‘তোর কাছে আমার অনেক বই জমে যাচ্ছে, জোজো।’’

জোজো বলল, ‘‘আমি একসঙ্গে তিন-চারটে বই পড়ি। একবার এ বইয়ের দু’পাতা, আবার বিকেলে আর-একটা বইয়ের তিন পাতা...’’ হঠাৎ কথা থামিয়ে জোজো সন্তুর দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ‘‘কাকাবাবুর কী হয়েছে রে সন্তু?’’

সন্তু বলল, ‘‘কেন, তুই কী দেখলি?’’

জোজো বলল, ‘‘দরজা বন্ধ। এই সময় কোনওদিনও তো দরজা বন্ধ থাকে না। আমাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, ‘নতুন খবর কী জোজোসাহেব? আজ আমি ডাকলাম, তবু দরজা খুললেন না!’ ’’

সন্তু বলল, ‘‘আজ কাকাবাবুকে ডিস্টার্ব করা চলবে না। ওঁর খুব মনখারাপ। আমাদের বাড়িসুদ্ধ সকলেরই মনখারাপ। কাকাবাবু কারও সঙ্গে কথাই বলতে চাইছেন না।’’

জোজো ভুরু কুঁচকে বলল, ‘‘বাড়িসুদ্ধ সকলেরই মনখারাপ? কেন রে? কী হয়েছে?’’

সন্তু বলল, সেটা আর কাউকে জানানো নিষেধ। তোকে বললে তো তুই দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিবি।’’

জোজো বলল, ‘‘আই প্রমিস।’’

সন্তু বলল, ‘‘তুই বিল্টুকে চিনিস তো? আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে।’’

জোজো বলল, ‘‘বিল্টুকে চিনব না কেন? ও তো ছবি এঁকে একটা দারুণ প্রাইজ় পেয়েছে। কী হয়েছে বিল্টুর?’’

সন্তু বলল, ‘‘বিল্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মানে, তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সাংঘাতিক একদল লোক কুড়ি লাখ টাকা চেয়েছে। টাকাটা ঠিক সময় না পেলে...’’

জোজো বলল, ‘‘এই ব্যাপার? এ জন্য কাকাবাবু শুধু শুধু মনখারাপ করবেন কেন? তিনি তো ইচ্ছে করলেই লোকগুলোকে ধরে ফেলতে পারেন।’’

সন্তু বলল, ‘‘না, শোন। আজ ভোরবেলা সিদ্ধার্থদা ফোন করেছিলেন। আমাকে বললেন, খবরটা জানাননি বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু লোকগুলো শর্ত দিয়েছে, পুলিশে খবর দেওয়া চলবে না। আর কাকাবাবুকে কিছুতেই এর মধ্যে জড়ানো যাবে না। এমনকী কাকাবাবু এখন বিল্টুদের বাড়িতে যেতেও

পারবেন না। কাকাবাবু কিছু করতে গেলেই ওরা বিল্টুকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছে। সিদ্ধার্থদা আমাকে বললেন, কাকাবাবুকে এইসব কথা বুঝিয়ে বলতে। ওঁরা টাকা দিয়েই বিল্টুকে ছাড়িয়ে আনতে চান। এইসব কথা শুনেই কাকাবাবু কেমন যেন হয়ে গেলেন। একটা কথাও বললেন না। তারপর... জোজো, তুই কখনও কাকাবাবুকে কাঁদতে দেখেছিস?''

জোজো বলল, ''কোনওদিন না। কাকাবাবু কেঁদেছেন?''

সন্তু বলল, ''প্রথমে চোখ দিয়ে জল নেমে এল। তারপর কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। একটু পরে সেই যে দরজা বন্ধ করলেন, আর কারও ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না! কাকাবাবু বিল্টুকে খুব ভালবাসেন।''

জোজো বলল, ''কাকাবাবু সব ছোট ছেলেমেয়েদেরই ভালবাসেন। ছোটদের কষ্ট উনি সহ্য করতে পারেন না। এখন কী হবে?''

সন্তু বলল, ''সিদ্ধার্থদা বলেছেন, আগে যেভাবেই হোক বিল্টুকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর ওদের শাস্তির ব্যবস্থা।''

জোজো বলল, ''ইস, আমার বাবা এখন এখানে নেই। তিব্বতে গিয়েছেন বিশেষ কাজে।''

সন্তু বলল, ''তোর বাবা থাকলে কী হত?''

জোজো বলল, ''বাবা কার্লোসকে বলে দিতেন। কার্লোস এক ধমক দিলেই ওরা সুড়সুড় করে এসে বিল্টুকে ফেরত দিয়ে যেত।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''কার্লোস কে?''

জোজো বলল, ''তুই কার্লোসের নাম শুনিসনি? পৃথিবীতে যত কিডন্যাপিং-এর দল আছে, কার্লোস হচ্ছে তাদের হেড। তাকে সকলে ভয় পায়। সে যে কোন দেশের লোক, কী জাত, তা কেউ জানে না। সে আঠাশ রকম ছদ্মবেশ ধরতে পারে! আঠাশ রকম ভাষাও জানে! তার মধ্যে বাংলাও বলে ঝরঝর করে!''

সন্তু আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, ''তোর বাবা তাকে চিনলেন কী করে?''

জোজো বলল, ''এইসব লোকের একটা কিছু দুর্বলতা থাকে। এমনিতে লোকটা দারুণ সাহসী, সাতবার মিলিটারির হাতে ধরা পড়েও পালিয়েছে। দু'হাতে রিভলভার চালাতে পারে। এমন লোকও ঘুমোলেই খুব ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে! দারুণ ভয়ের স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তারপরই ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুমোতে পারে না। জেগে বসে থাকে। অনেক

চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই এই ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়ার অসুখ সারেনি, বুঝলি? তারপর কার্লোস একবার কলকাতা এসে আমার বাবার নাম শুনে দেখা করতে আসে। না, ভুল বললাম, আমার বাবার নাম আগেই শুনে তারপর কলকাতায় এসেছিল। বাবা তাকে বিশল্যকরণী গাছের কয়েকটা শিকড় রোজ চিবিয়ে খেতে বলেন। তাতে কী হয় বল তো? অনেক স্বপ্ন দেখা যায়! অনেক স্বপ্ন আর ভাল ভাল স্বপ্ন। তাই ভয়ের স্বপ্ন আর পাত্তা পায় না। ভাল স্বপ্নগুলো গুঁতোগুঁতি করে খারাপ স্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দেয়। আর কার্লোস আরাম করে ঘুমোয়। ইস, কার্লোসকে একটা খবর দিতে পারলে কত ভাল হত। ও কলকাতায় সব গুন্ডা-বদমাইশদের চেনে। ও বাবাকে কথা দিয়েছে, বাঙালিদের কখনও ক্ষতি করবে না।''

সন্তু বলল, ''তোর কাছে কার্লোসের কথা এই প্রথম শুনলাম।''

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, ''এরকম আরও কত আছে! শুনবি আস্তে আস্তে। এখন কথা হচ্ছে, কাকাবাবু মাথা না গলালেও বিল্টুকে উদ্ধার করার জন্য তুই আর আমি কিছু করতে পারি না?''

সন্তু বলল, ''কী করতে পারি বল? এক তো, কার্লোসকে পাওয়া গেল না।''

জোজো বলল, ''দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি।''

তখনই বুলবুলিপিসি এসে ঢুকলেন ঘরে। চিন্তিতভাবে বললেন, ''এ কী ব্যাপার হচ্ছে রে সন্তু? ছোড়দা যে কিছুতেই দরজা খুলছেন না। ব্রেকফাস্ট খেলেন না, কফি খেলেন না, শরীরটরির খারাপ হল নাকি?''

সন্তু বলল, ''শরীর খারাপ নয়, মনখারাপ।''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''তা তো জানি। কিন্তু মনখারাপ থেকেই শরীর খারাপ হয়। কিছু না খেলে চলে? সন্তু, একটা কিছু ব্যবস্থা কর।''

সন্তু খানিকটা অসহায়ভাবে বলল, ''আমি কী করব বলো তো পিসি?''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''তুই গিয়ে ডাক। তোর কথা শুনবেন। দরজা খুলবেন।''

সন্তু বলল, ''তোমরা কাকাবাবুকে সব সময় হেসে হেসে কথা বলতে দ্যাখো। ওঁর রাগ তো দ্যাখোনি। ওরে বাবা, ওঁর রাগের সময় আমিও সামনে দাঁড়াতে ভয় পাই।''

জোজো বলল, ''আমি একটা কথা বলব? চলো, সকলে মিলে একসঙ্গে যাই। তিনজন একসঙ্গে ডাকব। তা হলে কাকাবাবু ঠিক দরজা খুলতে বাধ্য

হবেন। আমি একেবারে সামনে দাঁড়াব। যদি আমার উপর বেশি রাগ করেন, তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। আমি ফটাস করে হেসে দেব।''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''ফটাস করে হাসি মানে? সেটা আবার কেমন?''

জোজো বলল, ''আছে, আছে, দেখলে বুঝবে।''

তিনজনই নেমে এল নীচে।

কাকাবাবুর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনেই একসঙ্গে ডাকল, ''কাকাবাবু! ছোড়দা!''

কোনও উত্তর নেই।

সন্তু এবার জোজোর কানে কানে কী যেন বলে দিল।

জোজো চেঁচিয়ে বলল, ''কাকাবাবু, তুমি যদি দু'মিনিটের মধ্যে দরজা না খোলো, তা হলে তোমার দাদা পায়ের ব্যথা নিয়েও উপরে উঠে আসবেন বলেছেন।''

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল!

কাকাবাবুর ভুরু কোঁচকানো গম্ভীর মুখ দেখে সন্তু সরে গেল পিছনে।

কাকাবাবু বললেন, ''আঃ, তোমরা কেন আমাকে বিরক্ত করছ?''

জোজো বলল, ''সকলে ভিতরে চলে এসো, ভিতরে চলে এসো।''

জোজো প্রথমে কাকাবাবুকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। সন্তুরও হাত ধরে টেনে আনল।

বুলবুলিপিসি নিজেই ভিতরে এসে জোজোর দিকে তাকালেন।

জোজো বলল, ''এখনও ফটাস হাসির সময় হয়নি। এখনও কাকাবাবু আলাদা করে আমাকে বকেননি।''

কাকাবাবু বুলবুলিপিসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,'' কী ব্যাপার তোমাদের?''

বুলবুলিপিসি বললেন, ''বিল্টুর জন্য আমাদের সকলেরই খুব মনখারাপ। কিন্তু সকাল থেকে উপোস করে থাকলে কি কোনও লাভ হবে? ছোড়দা, তুমি কফিও খাওনি!''

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''শুধু মনখারাপ নয় রে বুলবুল। এখন অসহ্য রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, রিভলভারটা নিয়ে এখনই বেরিয়ে গিয়ে ওদের গুলি করে মেরে ফেলি!''

বুলবুলিপিসি জিজ্ঞেস করলেন, ''ওদের মানে কাদের?''

কাকাবাবু বললেন, ‘‘যারা বিল্টুর মতো ছোট ছেলেদের চুরি করে নিয়ে যায়। মেরে ফেলার ভয় দেখায়, তাদের!’’

বুলবুলিপিসি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তাদের তুমি পাবে কোথায়?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তাদের যে আমি খুঁজে বের করব, তারও তো উপায় নেই। বিল্টুর বাবা-মা তা চায় না। আমি কিছু না করে ঘরের মধ্যে বসে থাকব? ওঃ, অসহ্য! অসহ্য!’’

জোজো বলল, ‘‘কাকাবাবু, আপনি সত্যি সত্যি তাদের দেখতে পেলেও গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? আপনি তো কাউকেই শেষ পর্যন্ত মারেন না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আগে পারতাম না। অনেক অপরাধীকেই শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তাদের মতো খারাপ মানুষ আর হয় না। তারা মানুষ নয়, অমানুষ। তাদের একেবারে মেরে ফেলাই উচিত।’’

কাকাবাবুর পিঠে হাত রেখে বুলবুলিপিসি বললেন, ‘‘ছোড়দা, রাগে তোমার শরীর কাঁপছে। একটু শান্ত হও! বসো, আমি তোমার ব্রেকফাস্ট এনে দিচ্ছি।’’

কাকাবাবু ইজ়িচেয়ারে বসে পড়ে চোখের সামনে খবরের কাগজ তুলে নিলেন।

সন্তু ফিসফিস করে জোজোকে বলল, ‘‘চল, আমরা উপরে যাই!’’

টোস্ট, অমলেট আর কফি খাওয়ার পর কাকাবাবু বাইরে বেরোনোর পোশাক পরে নেমে এলেন নীচে।

বুলবুলিপিসি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘ছোড়দা, তুমি বেরোচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?’’

কাকাবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিলেন, ‘‘কোথায় যাচ্ছি মানে? আমি পুলিশের কাছে যাব না, বিল্টুদের বাড়ির দিকেও যেতে পারব না। তা হলে কি আমাকে নিজের বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকতে হবে? এই একটু ঘুরে আসছি।’’

দরজা খুলে কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। বাড়ি থেকে কোথাও যেতে হলে তিনি সাধারণত ট্যাক্সি নেন। বাসের ভিড়ে তাঁর অসুবিধে হয়। আজ ট্যাক্সি না ডেকে খানিকটা হেঁটে এলেন পার্কের কাছে। একটু দাঁড়াতেই সেখানে একটা দোতলা বাস এসে থামল।

এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। তবু বাসে বেশ ভিড়। কাকাবাবু ক্রাচদুটো নিয়ে সাবধানে বাসে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন বাসের হাতল ধরে।

কিছু দূর গিয়ে বাস বদল করে আর-একটা বাসে উঠলেন কাকাবাবু। তারপর নামলেন খিদিরপুরের কাছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝতে চাইলেন, কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কিনা। কেউ নেই। খানিকটা হেঁটে একটা গলির মুখে এসে তিনি একটা বাড়ির গেটের কাছে থামলেন। বেশ উঁচু লোহার গেট, ভিতরে মোরাম ঢালা একটু রাস্তা, তারপর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়িটি বেশ বড় আর পুরনো আমলের। এক পাশ দিয়ে দেখা যায় গঙ্গা নদী।

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেশ লম্বা চেহারার, পাগড়িপরা দরোয়ান। কাকাবাবু শার্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দরোয়ানকে দিয়ে বললেন, ‘‘আমি জগৎ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই কার্ডে আমার নাম লেখা আছে।’’

দরোয়ান গেট না খুলে কার্ডটা নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল সঙ্গে আর-একজন লোক নিয়ে।

ধুতির উপর সাদা শার্ট পরা সেই লোকটি কাছে এসে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘আপনি সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী? মল্লিকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?’’

কাকাবাবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘‘সত্যি না তো মিথ্যে হবে কেন? হ্যাঁ, আমিই রাজা রায়চৌধুরী। মল্লিকবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়ই?’’

লোকটি দরোয়ানকে গেট খুলে দেওয়ার ইঙ্গিত করে কাকাবাবুকে বলল, ‘‘আসুন।’’

একটা মস্ত বড় বসার ঘরে কাকাবাবুকে বসিয়ে লোকটি ভিতরে চলে গেল। কাকাবাবু দেওয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলেন।

খানিক পরে লোকটি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘বাবু আছেন তিনতলার ঘরে। এখন নামতে পারবেন না। আপনি সেখানে যেতে চান?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, যেতে চাই। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অসুবিধে হবে, আস্তে আস্তে উঠব।’’

বাইরে একটা লম্বা বারান্দা, একপাশে উঠোন। সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে লোকটি বলল, ‘‘আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। লিফ্‌ট আছে পাশেই।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘এটা নতুন। আগে ছিল না।’’

উপরে উঠে এসে কাকাবাবুকে লোকটি নিয়ে এল আর-একটি ঘরে। এটাও একটা বসার ঘর, সোফা দিয়ে সাজানো। জানলা দিয়ে দেখা যায়, গঙ্গা দিয়ে যাচ্ছে স্টিমার। ঘরে কেউ নেই। কাকাবাবুকে বলা হল কোণের দিকে একটা সোফায় বসতে।

কাকাবাবু বসতে যেতেই লোকটি হঠাৎ পিছন থেকে জাপটে ধরল কাকাবাবুকে। তারপর এক হাতে কাকাবাবুর গলাটা পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতটা ঢুকিয়ে দিল তাঁর প্যান্টের পকেটে। কাকাবাবুও চোখের নিমেষে লোকটির সেই হাতটা ধরে এমন জোরে মুচড়ে দিলেন যে লোকটি যন্ত্রণায় 'আঁ আঁ' করে উঠল।

কাকাবাবু লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ''ছিঃ, অন্য লোকের পকেটে ওরকমভাবে হাত দিতে নেই। আমার রিভলভারটা বের করে নেওয়ার তাল করছিলে তো? সেটা মুখে বললেই হত। পাছে রাগের চোটে কাউকে আজ গুলি করে ফেলি, তাই রিভলভারটা আমি সঙ্গেই আনিনি। এই দ্যাখো!'' কাকাবাবু সব পকেট উলটে দেখালেন।

তখনই একদিকের পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন জগৎ মল্লিক। খুব ফরসা রং, লম্বা-চওড়া চেহারা। পুরুষ্টু গোঁফ আছে, একটু একটু টাক পড়তে শুরু করেছে। কোঁচানো ধুতি আর ফিনফিনে সাদা পাঞ্জাবি পরা।

জগৎ মল্লিক দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, ''আমি এখনও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না! সত্যি সত্যি রাজা রায়চৌধুরী এসেছেন, নিজের ইচ্ছেতে, এই বাঘের গুহায়?''

কাকাবাবু হেসে বললেন, ''না, না, বাঘের গুহা কেন হবে? এটা আপনার মতো একজন বনেদি মানুষের বাড়ি। এ বাড়িতে তো আমি আগেও এসেছি। তাই না?''

জগৎ মল্লিক বিদ্রূপের সুরে বললেন, ''আপনাকে এখনই যদি মেরে ফেলি, কে আপনাকে বাঁচাতে আসবে? রিভলভারও তো সঙ্গে আনেননি শুনলাম।''

কাকাবাবু বললেন, ''অমনভাবে কি মানুষকে মেরে ফেলা যায়? আপনি বড়জোর চেষ্টা করতে পারেন। চেষ্টা করলেই যে পারবেন, তারও তো কোনও মানে নেই। আমার আবার বেঁচে থাকার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। যাই হোক, বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে কাজের কথা আছে।''

জগৎ মল্লিক ধমক দিয়ে বললেন, ''বাজে কথা ছাড়ুন। আপনার সঙ্গে

আবার কাজের কথা কী! আপনাকে দেখেই রাগে আমার গা জ্বলছে। আপনাকে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।''

কাকাবাবু বললেন, ''মৃতদেহ হয়ে গঙ্গার জলে ভাসার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। এখন আমার কথা শুনুন। তা হলে আপনার রাগ কমে যাবে।''

জগৎ মল্লিক গর্জন করে বললেন, ''রাগ কমবে মানে? আপনার জন্য আমি পাঁচ বছর জেল খেটেছি। ছাড়া পেয়েছি মাত্র সাতদিন আগে। জেলে বসে প্রতিটা দিন আমি ভেবেছি, রাজা রায়চৌধুরীর উপর আমি প্রতিশোধ নেবই নেব। প্রাণে না মারলেও আর-একটা পা খোঁড়া করে দেব।''

কাকাবাবু বললেন, ''সে যখন দেওয়ার তখন দেবেন। আপনি জেল খেটেছেন। দামি দামি সব মূর্তি বিদেশে পাঠাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন বলে।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনি আমাকে আর আমার ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছেন।''

কাকাবাবু বললেন, ''ওই সব অসৎ কাজ না করলে ধরা পড়ার কিংবা জেল খাটার প্রশ্নও ছিল না। যাই হোক, মল্লিকবাবু, আপনারা কি কখনও ছোট ছেলেমেয়েদের বিদেশে বিক্রির ব্যাবসা করেছেন? কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে তাদের মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করার কারবার করেছেন?''

রাগে জগৎ মল্লিকের ফরসা মুখখানা লাল হয়ে গেল! আবার তিনি গর্জন করে বলল, ''কী, আমরা ওসব নোংরা কাজ করি? কখনও না। বিদেশ মূর্তি চালান দেওয়া আমাদের অনেক দিনের ব্যাবসা। তার মধ্যে কোনটা চোরাই কিংবা কোনটা পাঠানো বেআইনি তা আমরা জানব কী করে? ছোট ছেলেমেয়ে বিক্রির মতো কুৎসিত কাজ আমরা কখনও করি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমারও তাই ধারণা। টাকার জন্য আপনারা অত নীচে নামবেন না। কিন্তু কারা ওই সব নোংরা কাজ করে, তাদের নিশ্চয়ই আপনারা চেনেন?''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''ওরকম দু'-একটা দলের কথা জানি বটে।''

কাকাবাবু বললেন, ''একটা ছোট ছেলে, আট-সাড়ে আট বছর বয়স, সে আমার খুবই প্রিয়। ছেলেটি খুবই গুণীও বটে। তাকে ওইরকম একটা দল ধরে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেটির কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। কোন দল ওই ছেলেটিকে ধরে রেখেছে, সে খবর আপনারা

নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে জানতে পারবেন। আজকের মধ্যেই সে দলটার নাম আমাকে জানালে আমার খুব উপকার হয়।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনার উপকার হয়? চেষ্টা করলে খবরটা আমরা জানতে পারি। কিন্তু আপনার সেই উপকার আমরা করব কেন?''

কাকাবাবু বললেন, ''তার বদলে আমিও আপনাদের এমন একটা উপকার করতে পারি।''

এমন সময় কে যেন হুংকার দিয়ে বলে উঠল, ''কই, কই কোথায় সে?'' পরদাটা সরিয়ে ঢুকল আর-একজন লোক। ঠিক থিয়েটারের মতো! লোকটির চেহারা হুবহু জগৎ মল্লিকের মতো। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে প্যান্ট-শার্ট পরা। বোঝাই যায়, এরা যমজ ভাই। এঁর নাম মাধব মল্লিক।*

মাধব মল্লিকের হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ার! সেই তলোয়ার তুলে তিনি বললেন, ''এই যে, সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী। এবার ঘচাং করে ওর মুন্ডুটা এক কোপে কেটে ফেলব!''

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, ''নমস্কার মাধববাবু। বসুন, কথা আছে।''

মাধব মল্লিক বিকৃত গলায় বললেন, ''কথা? কোনও কথা নেই। এখন আমি রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব! এঁর জন্য আমরা দু'ভাই জেল খেটেছি!''

মাধব মল্লিক খুব কাছে এগিয়ে আসছে দেখে কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে আটকালেন মাধব মল্লিকের হাতের উদ্যত তলোয়ার। মাধব মল্লিক আবার মারার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু আটকালেন। এরকম দু'-তিনবারের পরই কাকাবাবু ওর ডান হাতের কবজিতে এত জোরে মারলেন যে তলোয়ারটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাকাবাবু সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ''মাধববাবু, তলোয়ার শুধু হাতে ধরলেই হয় না, ভাল করে চালানো শিখতে হয়। ওসব না শিখে রাজা রায়চৌধুরীকে আক্রমণ করা যায় না। বসুন, এখন কাজের কথা হবে!''

এবার জগৎ মল্লিকও বললেন, ''বোসো মাধব। উনি কী বলছেন, একবার শুনে নিই।''

মাধব মল্লিক ডান হাতটা নাড়তে নাড়তে ফুঁ দিতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, ''ছেলেটির নাম বিল্টু। ভাল নাম নীলধ্বজ। তিনদিন

---

*এই দুই যমজ ভাইয়ের কথা আছে 'কলকাতার জঙ্গলে' বইয়ে।

আগে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কারা তাকে চুরি করেছে, কোথায় তাদের আসল ঘাঁটি, এসব আমার জানা দরকার।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''ধরুন আপনাকে জানালাম। তার বদলে আপনি আমাদের কী উপকার করবেন?''

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার ছেলে বিশ্বজিৎ এখন কোথায়?''

জগৎ মল্লিকের মুখখানা একটু যেন ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, ''সে কোথায়, তা তো আমি জানি না।''

কাকাবাবু বললেন, ''সে কোথায়, তা আপনারা ঠিকই জানেন। আমিও জানি। আপনারা তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। এত অল্প বয়সে সে লেখাপড়া ছেড়ে বাজে দলের সঙ্গে মিশে একেবারে বখে গিয়েছে। তিনটে পেট্রোল পাম্প ডাকাতির ব্যাপারে সে জড়িত। কোচবিহারের বিখ্যাত মদনমোহন মূর্তি সে চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। সেখানকার মন্দিরের এক পুরোহিতের সে তিনখানা দাঁত ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে হন্যে হয়ে। ঠিক বলছি কিনা?''

দুই ভাই, জগাই-মাধাই চুপ করে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, ''বেশিদিন সে ফেরার হয়ে থাকতে পারবে না। ধরা সে পড়বেই। মাত্র তেইশ বছর বয়স। এই বয়সে সে জেলে গিয়ে পাকা পাকা ক্রিমিনালের সঙ্গে মিশে নিজেও পাকা ক্রিমিনাল হয়ে উঠবে! আপনারা তাই চান?''

জগৎ মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনি কী বলতে চান, খুলে বলুন না।''

কাকাবাবু বললেন, ''আমি তাকে সৎপথে ফেরাতে চাই। জেলে পাঠালে সেটা হবে না। বরং এবারের মতো তাকে ক্ষমা করে দিলে আপনারা চেষ্টা করে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেখানে আবার পড়াশোনা শুরু করতে পারবে। অন্যরকম পরিবেশে সে আর অপরাধের পথে যাবে না। আমি ব্যবস্থা করব, যাতে পুলিশ তাকে না ধরে এবারের মতো। শুধু মদনমোহনের মূর্তিটা ফেরত দিলেই তাকে ক্ষমা করা হবে।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আপনি সত্যিই সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? আপনি বাঁচাতে পারবেন আমার ছেলেটাকে?''

কাকাবাবু বললেন, ''মানুষকে শাস্তি দেওয়ার বদলে তাকে ভাল পথে ফেরানোর আনন্দই তো বেশি। আমি কথা দিচ্ছি, পুলিশ তাকে এবার ধরবে

না। তবে, আবার যদি সে কোনওরকম কুকাজ করে, তবে তার ডবল শাস্তি হবে, এটাও ঠিক।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''না, না, তাকে আমরা জার্মানি পাঠিয়ে দেব। আপনার এই কথার উপর নির্ভর করা যায়?''

কাকাবাবু বললেন, ''রাজা রায়চৌধুরী কোনও কথা দিলে তার খেলাপ করে না কখনও। বিশ্বজিৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার ওই খবরগুলো আজই বিকেলের মধ্যে চাই।''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''আজই বিকেলের মধ্যে পারব কিনা জানি না। কিছুটা সময় তো লাগবেই। কালকের মধ্যে সব জেনে যাব আশা করি।''

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''একেবারে পাকা খবর চাই। দলের পাণ্ডা কে আর কোথায় তাদের ঘাঁটি?''

জগৎ মল্লিক বললেন, ''যেমন ভাবেই হোক, সেসব খবর আমি জোগাড় করবই। আমার ছেলেটাকে আপনি বাঁচান।''

কাকাবাবু মাধব মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আপনার কবজিতে একটা কিছু মলম লাগান। নইলে কিন্তু ওই জায়গাটা ফুলে যাবে আর খুব ব্যথা হবে।''

৭

গাড়ি ছুটছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। গাড়ি চালাচ্ছে সিদ্ধার্থ, পাশে বসে আছেন অমিতাভ। দু'জনেরই মুখে কোনও কথা নেই। অমিতাভর হাতে মোবাইল। মাঝে মাঝেই সেই ফোনে নির্দেশ আসছে।

একটু পরেই আবার ফোন বেজে উঠল।

অমিতাভ 'হ্যালো' বলতেই একটা গম্ভীর কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, ''আপনারা এখন কোথায়?''

অমিতাভ বললেন, ''শক্তিগড়ের কাছাকাছি এসেছি।''

সেই লোকটি বলল, ''সামনে যেখানে ঘোরার জায়গা দেখবেন, সেখান দিয়ে গাড়ি ফেরাবেন। ইউ টার্ন। বাড়ির দিকে ফিরবেন।''

অমিতাভ দারুণ অবাক হয়ে বললেন, ''বাড়িতে ফিরে যাব?''

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আমি সে কথা বলেছি? বাড়ির দিকে, তার মানেই বাড়িতে ফেরা নয়।’’

ধমক খেয়েও অমিতাভ বললেন, ‘‘আচ্ছা। বুঝেছি।’’

লোকটি বলল, ‘‘টাকা রেডি আছে?’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘হ্যাঁ।’’

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ‘‘সব হাজার টাকার নোট?’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘হ্যাঁ। আমার ছেলে ভাল আছে?’’

লোকটি বলল, ‘‘সে ভালই আছে। তবে তার মাথার কাছে একটা রিভলভার ধরা আছে। আপনাদের সঙ্গে পুলিশ দেখলেই গুলি চালাব।’’

অমিতাভ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, ‘‘না, না, আমরা পুলিশে খবর দিইনি। আর কেউ জানে না।’’

লোকটি বলল, ‘‘গুড! এখন যা বলছি, সেইমতো চলুন। গাড়ি ঘোরান!’’

লাইন কেটে গেল।

মোবাইল ফোনে সাধারণত যে ফোন করে, তার নম্বর ফুটে ওঠে। ওরা কিছু একটা কায়দা করেছে, যাতে শুধু দেখা যায় ‘প্রাইভেট নম্বর’। তার মানে, অমিতাভ ইচ্ছে করলেও ওদের ফোন করতে পারবেন না।

তিনি সিদ্ধার্থকে বললেন, ‘‘গাড়ি ঘোরাতে বলেছে।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘কোন জায়গায় থামতে হবে, তা এখনও জানাতে চায় না।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। কতক্ষণে বিল্টুকে দেখব!’’

সিদ্ধার্থ গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কোথায় যেতে হবে, তা জানা না থাকলে গাড়ি চালাতে খুব অসুবিধে হয়। গাড়ি ঘোরাবার জায়গা পাওয়ামাত্র আবার বেজে উঠল ফোন।

সেই গম্ভীর গলা বলল, ‘‘মিনিটদশেক পর বাঁ দিকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা পাবেন। সেটা ধরবেন।’’

সেটা মেমারির রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে খানিকটা যাওয়ার পর আবার ফোন। এবার হুকুম হল, ‘‘গাড়ি আবার ঘোরান। হাইওয়েতে চলে আসুন।’’

প্রতিবাদ করার উপায় নেই। ওরা যা বলবে, তা মানতেই হবে!

শক্তিগড়, বর্ধমান বাইপাস পেরিয়ে যাওয়ার পর ফোনে ফের নির্দেশ

এল, ‘‘এবার বাঁ দিকে একটা পেট্রল পাম্প দেখতে পাবেন। সেখানে গাড়িটা ঢুকিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ওখানে কিন্তু পেট্রল পাওয়া যায় না।’’

পেট্রল পাম্পে পেট্রল পাওয়া যায় না! এ-কথাটার ঠিক মানে বোঝা গেল না। কাছে এসে বুঝতে পারা গেল যে, পেট্রল পাম্পটা তৈরি হচ্ছে, এখনও খোলাই হয়নি! অন্ধকার, কোনও লোকজন নেই।

গাড়ি থামিয়ে চুপ করে বসে রইল দু’জন।

মিনিটপাঁচেক পর ফোনে আবার শোনা গেল, ‘‘ঠিক আছে, একজন গাড়িতে বসে থাকবেন, আর-একজন টাকার ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসবেন। অফিসঘরটা ফাঁকা, তার দরজার সামনে ব্যাগটা রেখে ফিরে যাবেন। অপেক্ষা করবেন দশ মিনিট গাড়িতে বসে। ততক্ষণ টাকাটা মিলিয়ে দেখা হবে। সব ঠিক থাকলে তারপর আপনাদের ছেলেকে ফেরত পাবেন।’’

অমিতাভ সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়লেন। সেটা বেশ ভারী। জয়ন্তী আর স্নিগ্ধার সব গয়না বিক্রি করে আর তিন জায়গা থেকে ধার নিয়ে জোগাড় করতে হয়েছে এই টাকা! অমিতাভ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে এলেন সেই অফিসঘরটার কাছে। তিনি আশা করেছিলেন, সেখানে ওদের দলের সঙ্গে বিল্টুকে দেখতে পাবেন। কেউ নেই। অন্ধকার, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। আকাশে একটু একটু জ্যোৎস্না আছে। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না। টাকার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে তাঁকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। তাই অমিতাভ আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না।

গাড়িতে ওঠার পর সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ‘‘কেউ ছিল ওখানে?’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘কেউ না। আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি তো? অত টাকা। যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়!’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘ওরা যা বলছে, আমরা সেই অনুযায়ী তো এসেছি। এ ছাড়া আর কী করার আছে?’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে! কতক্ষণে দশ মিনিট হয়?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘ছশো সেকেন্ড। আমি গুনছি।’’

অমিতাভ ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন।

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘হয়ে গিয়েছে ছশো সেকেন্ড।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘তুমি তাড়াতাড়ি গুনে ফেলেছ। আরও দু’মিনিট বাকি।’’

ঘড়িতে বারো মিনিট কেটে যাওয়ার পর একটা গাড়ির শব্দ হল। আগে বোঝা যায়নি, একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটা কালো রঙের স্টেশন ওয়াগন। সেটা স্টার্ট দিয়েই চলে গেল হাইওয়ের দিকে। তারপরই দেখা গেল, এই গাড়ির দিকে ছুটে আসছে একটা বাচ্চা ছেলে। বিল্টু! সিদ্ধার্থ আর অমিতাভও গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলেন বিল্টুর দিকে। মাঝপথে অমিতাভ বিল্টুকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন।

আনন্দের চোটে পাগলের মতো বলতে লাগলেন, ‘‘বিল্টু, বিল্টু! তুই ফিরে এসেছিস! তোর মা যে কান্নাকাটি করছে। উফ! তোর কোথাও লাগেটাগেনি তো!’’

বিল্টু মুখ দিয়ে শুধু উঁ উঁ শব্দ করছে আর ছটফটিয়ে নেমে পড়তে চাইছে কোল থেকে।

অমিতাভ বললেন, ‘‘বিল্টু, তুই কথা বলছিস না কেন?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘একটা কালো কাপড় দিয়ে ওর মুখটা বাঁধা দেখছি।’’

তাড়াতাড়ি বিল্টুকে কোল থেকে নামিয়ে তার মুখের বাঁধনটা খুলে দেওয়া হল।

তখন ছেলেটি বলল, ‘‘মুঝে ছোড় দো!’’

অমিতাভ আর সিদ্ধার্থ দু'জনেই যেন আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়লেন! জীবনে কখনও এমন অবাক হননি। এ ছেলেটি তো বিল্টু নয়! একই বয়স। প্রায় একই রকম চেহারা। কিন্তু অন্য ছেলে।

অমিতাভ হতভম্বের মতো হয়ে গিয়ে বললেন, ‘‘ওরা বিল্টুকে ফেরত দিল না। বিল্টু কোথায় গেল?’’

এ ছেলেটি বলল, ‘‘বিল্টু কৌন হ্যায়? মেরা নাম পরমজিৎ সিংহ!’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘ওরা ভুল করেছে। বিল্টুর বদলে অন্য ছেলেকে...স্যার, আপনি শিগগির গাড়িতে উঠে পড়ুন। এখনও যদি ওদের ধরা যায়।’’

এর মধ্যে মিনিটপাঁচেক অন্তত কেটে গিয়েছে। বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অনেক গাড়ি। সিদ্ধার্থ অনেক চেষ্টা করেও সেই কালো গাড়িটাকে আর ধরতে পারল না। ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই ফোন করত। ফোনও এল না।

প্রায় পানাগড় ছাড়িয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সিদ্ধার্থ হতাশভাবে বলল, ‘‘এবার কী হবে?’’

অমিতাভ দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে কেঁদে ফেললেন।

পরমজিৎ জিজ্ঞেস করল, ‘‘ইউ আর নট ব্যাড পিপল! ব্যাড পিপল ডোন্ট ক্রাই!’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘নো পরমজিৎ, উই আর নট ব্যাড পিপল। ডিড ইউ সি অ্যানাদার বয় লাইক ইউ? বিল্টু! ওয়াজ় হি ইন দ্যাট কার?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘নো। আই ডিড নট সি হিম। ইউ স্পিক বাংলা? আমি বাংলা জানি। আমার দু’জন বাংগালি ফ্রেন্ড আছে।’’

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, ‘‘ওই গাড়িতে আর কোনও ছোট ছেলে ছিল না?’’

পরমজিৎ দু’দিকে মাথা নেড়ে বলল, ‘‘না।’’

অমিতাভ চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তোমাকেও ওরা চুরি করে নিয়ে এসেছে?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘ইয়েস। আমি স্কুল থেকে বেরিয়েছি। একটা গাড়ি এল। জোর করে আমাকে তুলে নিল। ওরা খুব খারাপ লোক। আমাকে মেরেছে।’’

অমিতাভ শিউরে উঠে বললেন, ‘‘ওরা বিল্টুকেও মেরেছে নাকি?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘আমি ওদের একজনের হাত কামড়ে দিয়েছি।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘বেশ করেছ।’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘তোমরা ভাল লোক। তোমরা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব। তোমার বাড়ি কোথায়?’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘কালিম্পং! ওখানেই আমাদের স্কুল।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘এই রে? অত দূর! আজ রাতে তো আমরা সেখানে যেতে পারব না।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘আমাদের বাড়ির লোক চিন্তা করছে। ওরা ভাবছে, আমরা বিল্টুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ফিরে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলতে হবে।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘পরমজিৎ, তুমি আমাদের বাড়ি চলো। তোমার ভয় নেই, তোমাকে আর কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘তোমাদের বাড়ি কোথায়?’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘কলকাতায়!’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘ওঃ। আই লাভ ক্যালকাটা। চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখব।’’

সিদ্ধার্থ স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল।

কলকাতায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। এর মধ্যে পরমজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমিতাভ পরমজিৎকে কোলে করে নামলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন জয়ন্তী আর রিনি। ওঁরা তো ধরেই নিলেন যে বিল্টুই ফিরে এসেছে। অমিতাভ উপরে আসার পরে দেখা গেল বিল্টুর বদলে অন্য একটা ছেলেকে!

সব কথা শোনার পর জয়ন্তী ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মাথা এলিয়ে দিলেন। মনে হল, অজ্ঞান হয়ে যাবেন। টাকাপয়সা, যথাসর্বস্ব গেল, অথচ ছেলেও ফেরত এল না। তার বদলে এল একটা অন্য ছেলে! এ ছেলেকে নিয়েও তো সমস্যা হবে। এখন যদি ওরা ফোন করে বলে যে, ভুল করে ছেলে বদলা-বদলি হয়ে গিয়েছে! পরমজিৎকে কোনও একটা জায়গায় নামিয়ে দিলে তারপর বিল্টু ফেরত আসবে! তখন কী করা হবে?

রিনি বলল, ‘‘জেনেশুনে একটা ছেলেকে কি চোর-ডাকাতদের হাতে তুলে দেওয়া যায়! ওরা যদি কোনও কারণে পরমজিৎকে মেরে ফেলে, তার জন্য আমাদেরও তো দায়ী হতে হবে।’’

অমিতাভ বললেন, ‘‘এ ছেলেটাকে ওদের কাছে পৌঁছে না দিলে ওরা কি বিল্টুকে ফেরত দেবে? মোটেই দেবে না।’’

রিনি বলল, ‘‘তাও হয়তো ঠিক।’’

সিদ্ধার্থ বলল, ‘‘আমাদের বিল্টুকে আমরা যে-কোনও উপায়ে হোক ফেরত চাইব, তা অবশ্যই ঠিক কথা। কিন্তু অন্যের একটা ছেলেকে জেনেশুনে ওই শয়তানদের হাতে তুলে দেওয়াও ঠিক হতে পারে না।’’

রিনি বলল, ‘‘তা হলে এখন কী করা হবে?’’

অনেক রাত পর্যন্ত ভেবে ভেবেও এর উত্তর পাওয়া গেল না!

পরদিন সকালে আগে ঘুম ভাঙল পরমজিতের। সে রিনিদের সঙ্গে শুয়েছিল। জেগে উঠে পরমজিৎ রিনির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ‘‘হেই, হু আর ইউ?’’

রিনি বলল, ‘‘আমার নাম রিনি। আমি বিল্টুর দিদি। আমি তোমারও দিদি হতে পারি।’’

পরমজিৎ বলল, ‘‘আমারও দুটো দিদি আছে। দাদা না আছে। মা আছেন, বাবা আছেন। তুমি কালিম্পং দেখেছ?’’

রিনি বলল, ‘‘অনেক দিন আগে। ভাল মনে নেই।’’

পরমজিৎ বলল, “চলো আমাদের বাড়ি। অনেক বরফ দেখাব। আমি কখন বাড়ি যাব?”

রিনি বলল, “যাবে। সন্ধেবেলা। কেন, আমাদের বাড়ি তোমার ভাল লাগছে না?”

পরমজিৎ বলল, “এটা একটা পচা বাড়ি। দেওয়ালে সৌরভ গাঙ্গুলির ছবি কে রেখেছে?”

রিনি বলল, “আমার ভাই বিল্টু। কেন, সৌরভ গাঙ্গুলিকে তোমার ভাল লাগে না?”

পরমজিৎ বলল, “নো। সচিন তেন্ডুলকর আমার মোস্ট ফেভারিট।”

রিনি বলল, “ঠিক আছে, তোমাকে সচিনের ছবিও দেখাব। এখন তুমি কী খাবে? কাল রাতে ঘুমিয়ে ছিলে, কিছু খাওনি।”

পরমজিৎ বলল, “কর্নফ্লেক্স খাব। আমি কলা খাই না। জ্যাম-জেলি আর দুধ দিয়ে খাব।”

রিনি বলল, “ঠিক আছে, তাই খাবে।”

দরজার বাইরে থেকে খবরের কাগজটা এনেই চমকে উঠে অমিতাভ বললেন, “এই রে!”

রিনি জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে বাবা?”

অমিতাভ কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “পরমজিৎকে দেখা। ওর ছবি বেরিয়েছে প্রথম পাতায়।”

সত্যিই পরমজিতের ছবি। সেই সঙ্গে বড় করে লেখা খবর — ‘কালিম্পং-এর বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরজ সিংহের ছেলে নিখোঁজ। সে অপহরণকারীদেরই হাতে পড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিশ চারিদিকে খুঁজছে ছেলেটিকে।’

রিনি বলল, “এবার তো পুলিশকে খবর দিতেই হবে। পুলিশকে জানাতে হবে যে, পরমজিৎ আছে আমাদের বাড়িতে। না জানালে সেটা বেআইনি হবে।”

অমিতাভ বললেন, “তখন তো বিল্টুর কথাও বলতে হবে পুলিশকে। না জানিয়ে আর উপায় নেই।”

রিনি বলল, “তা হলে তো এখন কাকাবাবুকেও সব জানানো যায়। পুলিশের চেয়েও কাকাবাবুই বেশি সাহায্য করতে পারবেন।”

সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল। সন্তু জানাল, কাকাবাবু ভোরবেলাই বেরিয়ে গিয়েছেন, কাউকে কিছু না বলে! সন্তুকেও কিছু জানাননি!

জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ি। চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হয়তো একসময় ছোটখাটো একটা দুর্গ ছিল। এখন দু'-এক জায়গা ভেঙে পড়েছে, সেখানে গাছ গজিয়ে গিয়েছে। একটা ভাঙা জায়গায় কয়েকটা বড় বড় শিংওয়ালা গোরু বাঁধা থাকে। দুটো বাছুরও রয়েছে। একজন দুধওলা আর তার বউ সেই গোরুর দুধ দোয়। কাছাকাছি গ্রামে দুধ বিক্রি করে আসে। লোকের ধারণা, ওই দুধওলা আর তার বউই ভাঙা বাড়িটা দখল করে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে বেশি রাতে সেখানে গাড়ি আসে! ভিতরে কয়েকটা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাট-বিছানা পাতা। সামনে একটা সরু বারান্দা। সেটা বেশ লম্বা, কিন্তু খাঁচার মতো লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। বোধহয় জঙ্গল থেকে কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে হঠাৎ না ঢুকে পড়ে, তাই এই জাল দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা। মাঝখানের একটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরোনো যায়। এখন সেই দরজাটায় তালা ঝুলছে। বাইরের উঠোনের মাঝখানে একটা কুয়ো। তার পাশে বসে আছে একজন মাঝবয়সি মানুষ। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সে একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। সে সারাদিনই মুড়ি খায়। তার পাশে রাখা আছে একটা বন্দুক!

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিল্টু। ছাই রঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা। এই পোশাকে সে স্কুলে গিয়েছিল, পাঁচদিনের মধ্যে আর খোলা হয়নি! মাথার চুলও আঁচড়ানো নেই।

তালা লাগানো দরজাটার কাছে এসে বিল্টু বাইরের লোকটাকে বলল, ''অ্যাই, দরজাটা খুলে দাও। আমি উঠোনে যাব।''

লোকটি একবার মুখ তুলে শুধু বিল্টুকে দেখল। উত্তর না দিয়ে মুড়ি খেতে লাগল আবার।

বিল্টু বলল, ''এই লটপট সিংহ, তালাটা খুলে দাও না!''

লোকটির ভুরু কুঁচকে গেল। বোঝাই গেল যে, তার নাম লটপট সিংহ নয়! তবু সে কোনও কথা বলল না।

বিল্টু বলল, ''তা হলে কিন্তু আমি দুধ খাব না।''

কোনও উত্তর নেই।

বিল্টু বলল, ‘‘রুটিও খাব না। ওই গোল গোল রুটি খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি পাউরুটি খাই। আমাকে পাউরুটি দেবে!’’

লোকটি আর মুখও তুলছে না।

বিল্টু বলল, ‘‘আমি মুড়িও খাই না। এই বোবা সিংহ, তালা খুলে দেবে কিনা বলো! না হলে কিন্তু আমি এখানেই হিসি করে দেব।’’

লোকটি এবার তাড়াতাড়ি উঠে এসে কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে তালাটা খুলতে লাগল।

বিল্টু তার দিকে জিভ ভেঙিয়ে বলে উঠল,

> ‘‘হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা
> মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?
> নাই তার মানে কী? কেউ তাহা জানে কি?
> কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?’’

দরজাটা খোলা হতেই বিল্টু এক দৌড়ে উঠোনের এক কোণে চলে গেল। তারপর হিসি করতে লাগল একটা ঝোপের মধ্যে। সেখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘‘এই যে হুঁকোমুখো সিংহ, আমার কাগজ আর রং-পেনসিল চাই।’’

লোকটি এবার চিৎকার করে বলল, ‘‘মেরা নাম শিবু সর্দার। কোই সিংহ মিংহ নেহি হ্যায়।’’

বিল্টু বলল, ‘‘শিবু সর্দার? তোমার নাম না বললে আমি জানব কী করে? আমার নাম নীলধ্বজ। বলতে পারবে? না উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে? ‘বিল্টু’ বলেও ডাকতে পারো।’’

শিবু সর্দার বলল, ‘‘যাও, ভিতর যাও।’’

বিল্টু বলল, ‘‘ইস! বললেই আমি যাচ্ছি আর কী! এখন আমি গাছে চড়ব!’’

শিবু সর্দার ধমক দিয়ে বলল, ‘‘নেহি! যাও, ভিতর যাও!’’

বিল্টু ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে নেড়ে বলল, ‘‘যাব না! যাব না!’’

এবার শিবু সর্দার দৌড়ে ওকে ধরতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিল্টু চলে এল কুয়োটার অন্য দিকে।

তারপর শিবু সর্দার যতই ওকে ধরার চেষ্টা করে, ততই জোরে বিল্টু ঘোরে কুয়োর চারপাশে। শিবু সর্দার ওকে ধরতে পারে না, বিল্টু খিলখিল করে হাসে।

খানিক পরে হাঁফিয়ে গেল শিবু সর্দার। সে বিল্টুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, ''একবার পকড়নে সে বহুত মারব তুমাকে!''

বিল্টু আবার জিভ ভেঙিয়ে বলল,

''রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
''হাসব না-না-না-না!''
সদাই মরে ত্রাসে, এই বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশেপাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি বসে-বকে
আপনারে কয়, ''হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে!''

শিবু সর্দার দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলল, ''উফ, পাগল কর দেগা এ লেড়কা!''

বিল্টু হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল।

শিবু সর্দার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ''তুমার বাবা-মা তুমসে ওয়াপস নেহি লেগা। তুম ঘর নেহি জায়েগা।''

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ''ওয়াপস মানে কী?''

শিবু সর্দার বলল, ''তুমাকে বাবা-মা ফিরত চায় না। তুমাকে এখানেই থাকতে হবে।''

বিল্টু হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, ''এখানেই থাকতে হবে? কী মজা! কী মজা! রোজ রোজ স্নান করতে হবে না। স্কুল যাওয়ার জন্য মোজা পরতে হবে না। মাল্টি ভিটামিন খেতে হবে না, কী মজা! এই জঙ্গলে বাঘ আছে?''

শিবু বলল, ''হ্যায়। বাঘ তুমাকে খাবে।''

বিল্টু বলল, ''আমার আগে তোমাকে খাবে। তোমার গায়ে বেশি মাংস।''

শিবু বন্দুকটা দেখিয়ে বলল, ''হাম গোলি মার দেগা। শের খতম হো যায়েগা।''

বিল্টু বলল, ''না, বাঘ মারবে না! বাঘ আমার বন্ধু। আমি বাঘের ছবি আঁকি। তুমি বন্দুক রাখো কেন? তোমরা বুঝি ডাকাত?''

শিবু সর্দার বলল, ‘‘বকবক মাত করো। যাও, অভি ঘরে যাও!’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও, কথা বলতে গিয়ে অনেকক্ষণ বুঝি মুড়ি খাওয়া হয়নি? খাও, একটু খেয়ে নাও। আমি মোটেই এখন ঘরে যাচ্ছি না। তুমি চোর-পুলিশ খেলতে জানো?’’

শিবু সর্দার দারুণ চমকে উঠে বলল, ‘‘পুলিশ? পুলিশকা নাম মাত করো।’’

বিল্টু তবু বলল, ‘‘আমি পুলিশ আর তুমি চোর। ডাকাত আর চোর তো একই!’’

শিবু সর্দার রেগে গিয়ে বলল, ‘‘ঝুট বাত। চোর লোক ছোটালোক। ডাকাত সব বড়া আদমি।’’

বিল্টু আবার হি হি করে হেসে উঠল।

রাগ করে মুড়ি খেতে শুরু করল শিবু সর্দার। এ ছেলেটা কিছুতেই ভয় পায় না, ভয় দেখালেও হাসে।

পাশের জঙ্গলে কীসের যেন একটা হুড়মুড় করে শব্দ হল। এ উঠোন থেকে কিছু দেখা যায় না। ডেকে উঠল একটা গোরু।

বিল্টু বলল, ‘‘বাঘ এসেছে? আমি দেখব, আমি দেখব!’’

সে পাঁচিলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই শিবু সর্দার খপ করে চেপে ধরল তার একটা হাত। সে বলল, ‘‘শের নেহি, শোর হো সকতা। দিনকা টাইম মে শের!’’

বিল্টু বলল, ‘‘শোর মানে কী?’’

শিবু বলল, ‘‘শোর মানে শোর। ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করে।’’

বিল্টু বলল, ‘‘ও বুঝেছি। শূকর। কিংবা যদি বানর হয়?’’

শিবু বলল, ‘‘হাঁ হাঁ, বান্দর। তুমহার মতন।’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমি বান্দর? মোষকে হিন্দিতে কী বলে? তুমি একটা হিন্দি মোষ। হাত ছাড়ো!’’

শিবু ওর হাত ছাড়ল না। টানতে টানতে নিয়ে গেল বারান্দাটায়। দরজা বন্ধ করে লাগিয়ে দিল তালা।

বিল্টু বলল,

‘‘লটপট সিং ঝটপট সিং
শিং শিং দুটো শিং

মুড়ি খায় ভুঁড়ি দাস
গান গায়, ইয়ে, কী যেন, হাঁসফাস
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক
ভুঁড়ি দাস প্যাঁক প্যাঁক
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক''

শিবু সর্দার রেগেমেগে তালা খুলে বিল্টুকে মারতে আসতেই বিল্টু দৌড়ে ঢুকে গেল একটা ঘরে। সেখানে খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর-একটি লোক। শিবু সেই ঘরে ঢুকল না।

৯

দুপুরে বেশ গরম ছিল, বিকেলে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হল। বিল্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের জানলা খোলা, বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগতেই বিল্টুর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে এসে সে জানলা বন্ধ করল না। দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল বাইরের বৃষ্টি। তার জামা ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো বারণ করার কেউ নেই। মা কিংবা দিদি দেখতে পেলে তাকে বকুনি দিত। তাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূরে? ওরা বিল্টুকে ধরে আনার পর বিল্টু একবারও কাঁদেনি। শুধু রাত্তিরবেলা তার খুব মন কেমন করে। রাতে সে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমোয়। মা তার চুলে বিলি কেটে দেন। এখানে এসে তার ছবি আঁকতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু কাগজ নেই, রং-পেনসিল নেই, আঁকবে কী দিয়ে? একটা গোরুর বাছুর যখন দুধ খায়, সেই ছবিটা আঁকলে বেশ হত। বিল্টু তার একটা আঙুল দিয়ে হাওয়ার মধ্যে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করে। হাওয়ার ছবি আর তো কেউ দেখতে পাবে না, বিল্টু নিজে শুধু দ্যাখে। এখানে একটা বইও নেই। 'আবোল তাবোল'-এর সব কবিতা তার মুখস্ত। সেইগুলোই সে মনে মনে বলে বারবার।

ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। তবু কুয়োর ধারে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছে শিবু সর্দার। বসে বসেই ঘুমে ঢুলছে।

বিল্টু চেঁচিয়ে বলল, ''ও শিবুদাদা, তালাটা খুলে দাও!''

শিবু শুনলই না!

বিল্টু আবার ডাকল, "ও শিবুদাদা, শিবুদাদা। আমি আর তোমায় লটপট সিংহ বলব না। প্যাঁক প্যাঁক বলব না।"

শিবুর ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে, তবু সে সাড়া দিচ্ছে না। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। এর নাম তিলকরাম। শিবু আর তিলকরাম, এই দু'জনই এখানে থাকে সব সময়। এরা দু'জন পাহারা দেয় বিল্টুকে। শিবু দিনের বেলা, আর তিলকরাম রাতে। তিলকরামের ক্ষমতা বেশি, তাকে শিবু ভয় পায়। তিলকরাম মাঝে মাঝে শিবুর মাথায় চাঁটি মারলেও সে কিছু বলে না! মাঝে মাঝে রাতের দিকে আসে অন্য লোকেরা।

তিলকরাম হেঁকে বলল, "এ শিব্বু, শিব্বু! তালা খোল দে।"

শিবু অমনি ধড়মড় করে ছুটে এসে তালা খুলে দিল।

তিলকরাম তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "চায় কা টাইম হো গয়া। আর এ খোঁকাকে দুধ পিলাতে হবে না? দুধের বর্তন কঁহা?"

শিবু দৌড়ে গিয়ে এক কোণের রান্নাঘর থেকে একটা বড় ঘটি নিয়ে এল।

তিলকরাম বলল, "চলো খোঁকা, মেরা সাথ চলো।"

বিল্টু বলল, "আমি যদি এক দৌড়ে পালিয়ে যাই?"

তিলকরাম মাথা নেড়ে বলল, "না, তুমি পালাবে না। তুমি যদি পালাও, তবে হামাদের নোকরি চলে যাবে। মেরেও ফেলতে পারে।"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কে মারবে?"

তিলকরাম বলল, "বড়াবাবু। রাত মে যো আতা হ্যায়।"

বিল্টু বলল, "তুমি তাকে মারতে পারো না?"

তিলকরাম বলল, "আরেব্বাস! বড়াবাবুর বহুত পাওয়ার!"

উঠোন পেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে গেল দেওয়ালের ভাঙা অংশটার দিকে।

একজন দুধওলা সেখানে একটা ধবধবে সাদা রঙের গোরুর দুধ দুইছে।

তিলকরাম ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভরতি কর দেও!"

বিল্টু আগে কখনও এমন সামনে থেকে গোরুর দুধ দোয়া দেখেনি। চ্যাঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে, গোরুটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে দেখছে বিল্টু। একটুক্ষণের মধ্যেই ঘটিটা ভরে গেল।

তিলকরাম ঘটিটা হাতে নিয়ে বলল, "আজ বড়াবাবু আ সকতা। চলো খোঁকা।"

বিল্টু বলল, ‘‘তোমাকে কতবার বলেছি, আমার নাম খোঁকা নয়। নীলধ্বজ। বিল্টুও বলতে পারো।’’

তিলকরাম বলল, ‘‘বল্টু? ঠিক হ্যায়?’’

বিল্টু বলল, ‘‘বল্টু নয় বিল্টু। তুমি যদি আমায় বল্টু বলো, তা হলে আমিও তোমার নাম বলব, তেলাপোকা, আরশোলা!’’

তিলকরাম বলল, ‘‘হামি তব তুমাকে বলব, পেরেক!’’

বিল্টু বলল, ‘‘আমি তোমাকে বলব বকচ্ছপ! কিংবা হাঁসজারু!’’ বলেই হেসে ফেলল বিল্টু।

তিলকরামও হাসল। তারপর বলল, ‘‘তুমাকে ইঁহা পর কিতনা দিন রাখনে হোগা তা কৌন জানে! তুমহার কোষ্টো হচ্ছে না?’’

বিল্টু বলল, ‘‘না তো!’’

তিলকরাম বলল, ‘‘বহুত লেড়কা দেখা, লেকিন তোমার মতন অউর নেহি দেখা।’’

বিল্টু বলল, ‘‘তিলকদাদা, আমাকে জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবে?’’

তিলকরাম বলল, ‘‘আজ রাতে বড়াবাবু আনেসে কাল সকালে লৌট যাবে। অউর দো-তিনদিন নেহি আয়েগা। তব তুমাকে জঙ্গলমে নিয়ে যাব। ঠিক হ্যায়?’’

উঠোনে এসে সে শিবু সর্দারকে দুধের ঘটিটা দিয়ে বলল, ‘‘খোঁকাকো দুধ পিলা দেও। ম্যায় গ্রামসে ঘুমকে আতা হ্যায়।’’

শিবু বলল, ‘‘থোড়া ঠাহর যাও। এ লড়কা ইধার উধার কঁহা ভাগে গা।’’ দুধ গরম করতে সে ঢুকে গেল রান্নাঘরে।

বিল্টু তিলকরামকে বলল, ‘‘তুমি আবার আমাকে খোঁকা বললে? তা হলে আমি দুধ খাব না।’’

তিলকরাম বলল, ‘‘আচ্ছা, আচ্ছা, তুমহার নাম বল্টু।’’

বিল্টু ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আবার বল্টু বলছ? তুমি একটা আরশোলা। তুমি গ্রামে যাবে, গ্রাম কত দূরে?’’

তিলকরাম বলল, ‘‘ছে-সাত মাইল হোবে।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুমি হেঁটে হেঁটে যাবে?’’

তিলকরাম বলল, ‘‘নেহি। সাইকেল হ্যায়। তুরন্ত ঘুমকে আনা হ্যায়।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘তুরন্ত মানে কী?’’

তিলকরাম বলল, ‘‘তুরন্ত মানে, ইয়ে হ্যায়, মানে তাড়াতাড়ি।’’

বিল্টু বলল, "আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ় নিয়ে চলো। আমি সাইকেলের পিছনে চাপব। প্লিজ়।"

তিলকরাম বলল, "পাগল! পিলিজ ফিলিজ মাত বোলো।"

শিবু একবাটি দুধ নিয়ে আসতেই সে বলল, "লেড়কা কো ঠিক সে দেখভাল কর না।"

সে চলে গেল উঠোন পেরিয়ে।

শিবু বলল, "দুধ পি লেও।"

বিল্টু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না। দুধ খাব না।"

শিবু জিজ্ঞেস করল, "কিঁউ খাবে না? বড়াবাবু আকেই পুছে গা, বাচ্চা কেয়া-কেয়া খায়া অউর পিয়া।"

বিল্টু বলল, "ও কেন আমাকে সাইকেলে নিয়ে গেল না? আমি তোমাদের এখানে আর কিছু খাব না।"

শিবু বলল, "ইয়ে কেয়া তুমহারা মামাবাড়ি হ্যায়? খাও!"

সে দুধের বাটিটা বিল্টুর মুখের কাছে আনতেই বিল্টু হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিতে গেল। তখনই পিছন থেকে কে যেন বলল, "দুধটা খেয়ে নে বিল্টু। আমাদের এখনই যেতে হবে।"

বিল্টু চমকে পিছন ফিরে তাকাল। কাকাবাবু!

শিবু সর্দারও দারুণ অবাক হয়ে বলল, "ইয়ে কৌন হ্যায়?"

সে কুয়োর গায়ে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকটা ধরতে যেতেই কাকাবাবু বাঁ হাতের ক্রাচটা দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিলেন দূরে। তাঁর ডান হাতের রিভলভারটা শিবুর কপালের দিকে তাক করা। কাকাবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে শিবুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ঠিক আছিস তো রে বিল্টু?"

বিল্টু বলল, "হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। এবার কী হবে? ডিসুম ডিসুম?"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ না কী হয়!" তিনি শিবুকে বললেন, "ওহে, তুমি কিন্তু একদম নড়াচড়া করবে না। তা হলে তোমার বেশি বিপদ হবে। এখন হাঁ করো তো, বেশ বড় করে।"

কাকাবাবু কোটের এক পকেট থেকে একটা কালো রঙের উলের বল বের করলেন। তার দু'পাশে ফিতে বাধা। সেই উলের বলটা তিনি শিবু সর্দারের মুখে ঢোকাতে যেতেই সে কাকাবাবুর ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি কষাল। কাকাবাবুর ডান হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলভারটা!

সে সেটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করার আগেই কাকাবাবু তাঁর একটা ক্রাচ তার গলায় চেপে ধরে বললেন, ''ইসকা ভিতর মে একঠো ছুরি হ্যায়। খুব ধার। তুমি একটু নড়াচড়া করলেই তোমার গলাটা কুচ করে কেটে যাবে।''

বিল্টু দৌড়ে গিয়ে রিভলভারটা ধরতে যেতেই কাকাবাবু বলে উঠলেন, ''অ্যাই ধরিস না, ধরিস না। বন্দুক-পিস্তল ধরার তোর এখনও বয়স হয়নি। তুই বরং এক কাজ কর। এই উলের বলটা ওর মুখে ভরে দে তো!'' ক্রাচটা সরিয়ে এনে কাকাবাবু বললেন, ''তুমি আমার হাতে লাথি মেরেছ। এবার আমি উলটে তোমাকে মারতে পারি? আমি নিজে থেকে কাউকেই আগে মারি না। এই ক্রাচের এক ঘায়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি। তুমি তাই চাও, না হাঁ করবে!''

এবার শিবু সর্দার হাঁ করতেই বিল্টু তার মুখে বলটা ভরে দিল। তারপর হাসতে লাগল হি হি করে।

কাকাবাবু বললেন, ''এবার ফিতে দুটো ওর মাথার পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেল খুব টাইট করে।''

বাঁধতে বাঁধতে বিল্টু বকুনি দিয়ে বলল, ''অ্যাই, মাথা নাড়াচ্ছ কেন? গাঁট্টা খাবে!''

কাকাবাবু সঙ্গের একটা ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা লম্বা দড়ি বের করে বললেন, ''এবার ভালয়-ভালয় হাতদুটো সামনে এগিয়ে দাও তো! এখনও কিন্তু আমি তোমাকে মারিনি।''

শিবু সর্দার হাতদুটো এগিয়ে দিল। কাকাবাবু শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধলেন পা দুটো। তারপর রুমাল দিয়ে হাত মুছে বললেন, ''ব্যস, ওকে নিয়ে আর চিন্তা নেই।'' রিভলভারটা পকেটে ভরে নিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''হ্যাঁরে বিল্টু, একটা লোক তো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। এখন ভিতরে আর কেউ আছে?''

বিল্টু বলল, ''না তো। আর কেউ থাকে না।''

কাকাবাবু বললেন, ''তবে তো ভালই হল! তা হলে চল, আমরা বাড়ি যাই।''

বিল্টু বলল, ''বাড়ি যাব? আমরা এই জঙ্গলে বেড়াতে যাব না?''

কাকাবাবু হেসে ফেললেন। বিল্টুর কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, ''এখন কি বেড়াতে যাওয়ার সময় রে! তোর মা-বাবা কত চিন্তা করছেন।''

শিবু সর্দার মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘তুমি এইভাবেই থাকো। তোমার লোকজন এসে বাঁধন খুলে দেবে। চল রে বিল্টু!’’

ক্রাচ বগলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন কাকাবাবু। তাঁর আগে আগে বিল্টু চলল লাফাতে লাফাতে।

সে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কাকাবাবু, তুমি এই জায়গাটা কী করে চিনলে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এলাম। তোকে এখানে খেতেটেতে দিয়েছে তো ঠিকমতো?’’

বিল্টু বলল, ‘‘শুধু দুধ আর দুধ! আমার ভাল্লাগে না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘শুধু দুধ? আর কিছু দেয়নি?’’

বিল্টু বলল, ‘‘রুটি, আর কিছু না।’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘আমি দুপুর থেকে এখানে লুকিয়ে আছি। ভিতরে ক’জন লোক আছে, তা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তারপর ভাবলাম, রাত হওয়ার আগেই একটা কিছু করতে হবে। বেশ সহজেই কাজটা মিটে গেল, কী বল!’’

বিল্টু এক জায়গায় থেমে গিয়ে বলল, ‘‘কাকাবাবু, দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর একটা প্রজাপতি!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘হ্যাঁ, খুব সুন্দর। কিন্তু আমাদের তো আর দেরি করলে চলবে না। বেশি অন্ধকার হওয়ার আগেই বড় রাস্তায় পড়তে হবে।’’

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, ‘‘বড় রাস্তায় কী আছে?’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ওখান দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। আমরা একটা গাড়িতে উঠে পড়ব।’’

দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল।

কিছুটা যেতেই দেখা গেল, জঙ্গলের দিক থেকে আসছে একজন দুধওলা। তার মাথায় শুকনো গাছের ডালের বোঝা।

সে ওদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাই, তুম লোগ কাঁহা যাতা হ্যায়? এই লেড়কা, রোকো, রোকো!’’

বিল্টু বলল, ‘‘এই রে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘একজন মোটে? ঠিক আছে, ম্যানেজ হয়ে যাবে।’’

দুধওলাটি মাথার কাঠের বোঝাটা মাটিতে ফেলে দিল। তারপর একটা ডাল তুলে ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রাচ তুলে সেটাকে আটকালেন। লোকটি আরও একটি ডাল ছুড়লে সেটিও আটকালেন কাকাবাবু।

বিল্টু হাততালি দিয়ে বলল, ‘‘কী মজা! কী মজা! ওই যে কাকাবাবু, আবার!’’

ঠিক যেন ক্রিকেট খেলা। কাকাবাবুর হাতে ব্যাটের বদলে ক্রাচ। আর লোকটি বলের বদলে গাছের ডাল ছুড়ছে। কয়েকবার আটকানোর পর কাকাবাবুর মনে হল, তাঁর ক্রাচ ভেঙে যেতে পারে। এই খেলা বেশিক্ষণ চালানো যাবে না।

লোকটিকে ভয় দেখানোর জন্য তিনি কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘাড়ে ঠেকল একটা ঠান্ডা নল। একজন গম্ভীর গলায় বলল, ‘‘রায়চৌধুরী, তোমার খেলা শেষ। একটুও নড়বে না। নড়লেই অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে তোমার মাথার ঘিলু বেরিয়ে যাবে।’’

কাকাবাবু মাথা না নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘বিল্টু, আমার পিছন দিকে ক’জন লোক রে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘দু’জন।’’

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘দু’জনের হাতেই বন্দুক আছে?’’

বিল্টু বলল, ‘‘হ্যাঁ আছে। লম্বা লম্বা।’’

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘‘তা হলে তো ধরা দিতেই হয়। বলো, এবার কী করতে হবে।’’

কালো চশমা আর টুপি পরা একজন লোক কাকাবাবুর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিল। তারপর তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল কাকাবাবুর পেটে। কাকাবাবু অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারেন। কিন্তু পেটের ওই আঘাতে তিনি ‘উঃ’ করে উঠলেন।

বিল্টু চেঁচিয়ে উঠল, ‘‘অ্যাই, অ্যাই, দুষ্টু লোক, তোমরা কাকাবাবুকে মারছ কেন?’’

কালো চশমা পরা লোকটা অন্য লোকটাকে বলল, ‘‘বাচ্চাটার মুখ চেপে ধর, শক্ত করে ধরে রাখ।’’ সে আবার মারতে লাগল কাকাবাবুর পেটে।

কয়েকবার আঘাতের পর কাকাবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কালো চশমা পরা লোকটা মুখ বেঁকিয়ে বলল, ‘‘আজ এই রায়চৌধুরীর সব লীলাখেলা শেষ। ওর মুন্ডুটা কেটে জলে ফেলে দেব আর বডিটা খাবে জঙ্গলের শিয়ালে।’’

কাকাবাবুর একটা পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সে নিয়ে চলল উঠোনটার দিকে।

১০

সকাল ন'টাতেই পুলিশ এসে হাজির। ডেপুটি কমিশনার অশেষ দত্ত সিদ্ধার্থকে দেখে বললেন, "আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো? চেনা চেনা লাগছে!"

সিদ্ধার্থ বলল, "কাকাবাবুর বাড়িতে দেখেছেন। সেখানে একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।"

অশেষ দত্ত বললেন, "দ্যাট্স রাইট। কাকাবাবু আপনার খুব প্রশংসা করেছিলেন। একবার কাশ্মীরে আপনি খুব সাহায্য করেছিলেন ওঁকে। কাকাবাবু কোথায়? তিনি খবর পাননি?"

সিদ্ধার্থ বলল, "আগে আমরা ওঁকে কিছু বলিনি। আজই একটু আগে ফোন করতে গিয়ে জানা গেল, উনি কলকাতায় নেই। কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানে না।"

অশেষ দত্ত বললেন, "আপনারা পুলিশেও তো আগে খবর দেননি।"

অমিতাভ বললেন, "ওরা বারণ করেছে। ওরা ভয় দেখিয়েছে যে, পুলিশকে জানালে বিল্টুর ক্ষতি হবে। আচ্ছা মিস্টার দত্ত, এখন কী হবে বলুন তো?"

অশেষ দত্ত বললেন, "অনেক কিডন্যাপিং কেসের কথা জানি। কিন্তু আপনাদের মতো এমন পিকিউলিয়ার কেসের কথা কখনও শুনিনি!"

অমিতাভ বললেন, "ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে টাকা চাইল। অত টাকা! আমাদের পক্ষে জোগাড় করা কি সহজ কথা? যাই হোক, যথাসর্বস্ব খুইয়ে তো টাকাটা জোগাড় করা হল। ওদের কথামতো দিয়েও দেওয়া হল। কিন্তু আমার ছেলেকে ফেরত পাওয়া গেল না।"

সিদ্ধার্থ বলল, "তার বদলে পেলাম অন্য একটা ছেলেকে!"

অশেষ দত্ত বললেন, "এ ছেলেটির বাবা খুব বড়লোক। ছেলেকে ফেরত পাওয়ার পর সব কথা শুনে হয়তো আপনাদের টাকাটা দিয়ে দেবেন।"

অমিতাভ জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "সে টাকা পেয়েই বা আমাদের লাভ কী? আমরা বিল্টুকে ফেরত পাব কী করে?"

অশেষ দত্ত বললেন, ''আমাদের দিক থেকে আমরা তাকে উদ্ধার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, তা হলে খুঁজে বের করতে একটু মুশকিল হবে। আমরা সব স্টেটকেই জানিয়ে দিচ্ছি। ওরা আর ফোনটোন করেনি?''

সিদ্ধার্থ বলল, ''নাঃ, কোনও সাড়াশব্দ নেই!''

অশেষ দত্ত বললেন, ''চলুন, একবার পরমজিৎকে দেখি।''

পরমজিৎ রিনির ঘরে বসে ছবি আঁকা শিখছে। তার ছবি আঁকার একেবারেই হাত নেই।

রিনি মাত্র কয়েকটা টানে এক-একজন মানুষের মুখ এঁকে ফেলছে দেখে সে খুব অবাক! রিনি পরমজিতেরও একটা সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছে।

অশেষ দত্ত একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই সব ছবি দেখে বললেন, ''বাঃ! তোমার ভাই ছবি এঁকে অল ইন্ডিয়া ফার্স্ট প্রাইজ় পেয়েছে শুনলাম। তোমরা ভাই-বোন দু'জনেই ছবি আঁকো?''

রিনি বলল, ''আমার মা-ও ছবি আঁকতে পারেন।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আর্টিস্ট ফ্যামিলি!''

রিনি জিজ্ঞেস করল, ''আপনি আমার ভাইকে এনে দিতে পারবেন তো? এই শনিবার তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার কথা।''

অশেষ দত্ত বললেন, ''আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট। নাউ মাস্টার সিংহ, লেট আস গো।''

পরমজিৎ জিজ্ঞেস করল, ''হোয়্যার?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''পুলিশ স্টেশন। বড় থানায়।''

পরমজিৎ বলল, ''কেন, আমি থানায় যাব কেন?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''তোমার বাবা আসবেন, থানা থেকে তোমায় নিয়ে যাবেন। উনি বিকেলের মধ্যেই এসে পড়বেন প্লেনে।''

পরমজিৎ বলল, ''আমি থানায় যাব না। আমি এখানে থাকব।''

রিনি বলল, ''আমার ভাইকে ফেরত না পেলে আমরাও ওকে ছাড়ব না!''

অশেষ দত্ত বললেন, ''এ তো বড় মুশকিল হল!''

রিনি বলল, ''কেন, আমি অন্যায় কিছু বলেছি?''

অশেষ দত্ত বললেন, ''না, তুমি অন্যায় কিছু বলোনি। কিন্তু পুলিশের নিয়ম হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া কারও খবর পেলেই তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে রাখতে হয়।''

সিদ্ধার্থ বলল, "থানায় চোর-ডাকাতদের মধ্যে বসিয়ে রাখার চেয়ে আমাদের এখানে ওর থাকাটাই কি ভাল নয়? ও নিজেও তো তাই চাইছে।"

অশেষ দত্ত চিন্তিতভাবে বললেন, "না, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে নয়। আমার ঘরেই ওকে বসিয়ে রাখতে পারি। অবশ্য, আমার ঘরে অতক্ষণ একটা ছোট ছেলের ভাল লাগবে কেন? আপনাদের এখানে থাকলে...যদি কেউ এখান থেকে ওকে আবার চুরি করে নিয়ে যায়? তখন ওর বাবার কাছে কী কৈফিয়ত দেব?"

সিদ্ধার্থ বলল, "বাড়ির মধ্যে ঢুকে কে চুরি করে নিয়ে যাবে?"

অশেষ দত্ত বললেন, "বলা যায় না। ঠিক আছে, ছেলেটা এখানেই থাক। বাড়ির সামনে দু'জন পুলিশকে পাহারায় রেখে যাচ্ছি। ছেলেটাকে নিয়ে একদম বাইরে যাবেন না। ওর বাবা এসে পৌঁছোন, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "এর মধ্যে যদি ওরা ফোন করে? যদি বলে, পরমজিৎকে কোনও একটা জায়গায় রেখে এলে ওরা বিল্টুকে ফেরত দেবে? তখন আমরা কী করব?"

অশেষ দত্ত বললেন, "তখনই আমাদের জানাবেন।"

সিদ্ধার্থ বলল, "যদি ওরা বিল্টুকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়?"

রিনি বলল, "আমরা বিল্টুকে চাই। কিন্তু পরমজিৎকেও কোনও বিপদের মুখে ফেলতে চাই না। তা হলে কী করা যায় বলুন?"

অশেষ দত্ত বললেন, "এখনই কিছু বলতে পারছি না। ওরা ফোন করে কী বলে, আগে সেটা দেখা যাক। যদি বিল্টুর বদলে পরমজিৎকে ফেরত চায়, তা হলে খানিকটা সময় চেয়ে নেবেন। বলবেন, দিনের বেলা তো পুলিশের সামনে দিয়ে পরমজিৎকে বের করা যাবে না। বরং ভোর রাতে..."

একটু থেমে গিয়ে অশেষ দত্ত বললেন, "ইস, এই সময় যদি কাকাবাবুর সাহায্য পাওয়া যেত! তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতেন!"

১১

দিনের বেলা এখানে একটু একটু গরম পড়লেও রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। উঠোনের একপাশে কিছু চ্যালা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। সেই আগুন ঘিরে বসে আছে ওরা কয়েকজন। বিল্টুর একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে শিবু সর্দার। কাকাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। কালো চশমা পরা লোকটা অন্ধকারেও চশমা খোলেনি। বোধহয় তার চোখের অসুখ আছে। সে-ই বড়বাবু। আর তার পাশের লোকটির নাম বলরাম। তার চেহারাটা ভীমের মতো। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফ, কিন্তু মাথাটা ন্যাড়া।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বড়বাবু জিজ্ঞেস করল, "আরে শিবু, সত্যি করে বল, তিলকরাম কোথায় গিয়েছে?

শিবু সর্দার বলল, "গাঁও মে গিয়া বড়াসাব।"

বড়বাবু ভেঙিয়ে বলল, "গাঁও মে গিয়া? কাঁহে গিয়া। নাকি একেবারেই কেটে পড়েছে?"

শিবু বলল, "সে তো হামি জানি না বড়াসাব।"

বড়বাবু বলল, "আমার হুকুম, তোমরা দু'জনে কেউ এক মিনিটের জন্যও বাইরে যেতে পারবে না। সর্বক্ষণ পাহারা দেবে। এই খোঁড়া লোকটা যদি আজ ছেলেটাকে নিয়ে পালাত? এই ডেরার খবর জেনে যেত! বলরাম আর আমি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি ভাগ্যিস!"

বলরাম বলল, "রায়চৌধুরীকে এবার বাগে পাওয়া গিয়েছে। ওকে খতম করে দিতে হবে।"

বড়বাবু বলল, "অনেকক্ষণ নড়াচড়া করছে না, টেঁসেই গেল নাকি?"

বলরাম বলল, "পেটে খুব জোর আঘাত লাগলে অনেক সময় কিডনি ফিডনি ফেটে যায়, তাতে মানুষ বাঁচে না।"

বড়বাবু বলল, "দেখা যাক আর কিছুক্ষণ। জ্ঞান ফিরলে ওকে জেরা করে জানা যেত, ও এখানে এল কী করে? আর যদি জ্ঞান না ফেরে, তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য রায়চৌধুরীর মাথায় গোটাচারেক গুলি চালিয়ে দিতে হবে!"

বলরাম বলল, "তিলকরাম বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ও তো বুঝেছে, ওকে আজ শাস্তি পেতেই হবে। ওর ভুলের জন্যই তো এই গোলমালটা হল। এই ছেলেটার বদলে অন্য ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে দিল।"

বড়বাবু বলল, "তুমিই বা ভাল করে দেখে নিলে না কেন?"

বলরাম বলল, "তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুটো ছেলেই একবয়সি, একইরকম চেহারা। মুখ বাঁধা ছিল বলে কথাও শুনিনি। তাই বুঝতে পারিনি। তার জন্য যদি আমায় কিছু শাস্তি দিতে চান, মাথা পেতে নেব।"

বড়বাবু বলল, "সেটা পরে দেখা যাবে। কালিম্পং-এর ছেলেটার জন্য কত টাকা পাওয়া যেত, তা হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায়। ফেরত দেওয়াও তো শক্ত। পুলিশ সব জেনে গিয়েছে। এই বাচ্চাটাকে পেলে ওর মুখ থেকে আমাদের খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।"

বলরাম বলল, "এখন আর ফেরত দেওয়া যাবে না। ভেরি রিস্কি। ইট ইজ় বেটার টু কিল হিম।"

বিল্টু বলল, "আই নো ইংলিশ। ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি? ইঃ, অত সোজা নয়। কাকাবাবু তোমাদের এমন মারবেন।"

শিবু সর্দার বিল্টুর একটা কান ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, "আরে যাঃ! তুমহার কাকাবাবু খতম হো চুকা!"

বিল্টু বলল, "তুমি আমার কান ধরেছ কেন? আমিও তোমার কান ধরব।"

সে হাত তুলতেই শিবু খপ করে সেই হাতটা ধরে মুচড়ে দিল।

ব্যথা লাগলেও বিল্টু কাঁদল না। সে বলল, "ইউ আর এ পাজি লোক। পাজি লোকরা হাত মুচড়ে দেয়।"

বড়বাবু বিরক্ত হয়ে বলল, "অ্যাই, ছেলেটাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়ে আয় না। এখন কাজের কথা হচ্ছে।"

শিবু বলল, "ওকে খেতে দিয়েছি, কিছু খায়নি স্যার।"

বড়বাবু বলল, "এ ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে এখন কিছুদিনের জন্য আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। নো অ্যাক্টিভিটি। তারপর সব চাপা পড়ে গেলে আবার অ্যাকশন শুরু করব।"

বলরাম বলল, "দেখুন, দেখুন স্যার, রায়চৌধুরীর হাতদুটো আগুনের মধ্যে পড়েছে, তবু লোকটা একটুও নড়ছে না!"

বড়বাবু বলল, "এখনও জ্ঞান ফেরেনি?"

বলরাম বলল, "আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে তো অজ্ঞান লোকেরও জ্ঞান ফিরে আসে।"

বড়বাবু বলল, "যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো চুকেই গেল।"

সত্যিই কাকাবাবুর বাঁধা হাতদুটো পড়েছে আগুনের মাঝখানে। প্রথমে

দুটো হাতই কালো হয়ে গেল, তারপর পুড়তে লাগল চামড়া। পটপট করে শব্দ হতে লাগল। সকলেরই নাকে এল মড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধ।

বড়বাবু বলল, "মনে হচ্ছে সত্যিই মরেছে লোকটা। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে দ্যাখ তো বলরাম, নিশ্বাস পড়ছে কিনা। যদি এখনও নিশ্বাস পড়ে, তা হলে মাথার খুলিতে চারটে গুলি চালিয়ে দে।"

বলরাম উঠে এসে পা দিয়ে ঠেলে কাকাবাবুর দেহটা উলটে দিল। উপুড় থেকে চিত হয়ে গেল। এতদিনে একবারও কাঁদেনি বিল্টু। এইবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর বলতে লাগল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু!" তার ক্ষুদ্র হৃদয় বুঝেছে যে, কাকাবাবু আর বেঁচে নেই।

বলরাম কাকাবাবুর শরীরটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেলটা নামিয়ে রাখল। তারপর একটা আঙুল কাকাবাবুর নাকের কাছে নিয়ে একটুক্ষণ দেখে বলল, "নাঃ, নিশ্বাস পড়ছে না। শেষ!"

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু হাতদুটো দু'দিকে ছড়িয়ে উঠে বসলেন! আগুনে যেমন তাঁর হাত পুড়েছে, তেমন দড়ির বাঁধনটাও পুড়েছে! এখন খসে পড়ে গেল।

দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে বলরাম বলে উঠল, "এ কী? ভূ-ভূ-ভূত?"

কাকাবাবু বিকৃত গলায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি ভূত হয়েছি। এবার তোদের সবক'টার সর্বনাশ করব।"

তিনি দু'হাতে বলরামের গলা টিপে ধরলেন। বলরামের অত বড় শক্তিশালী চেহারা, কিন্তু কাকাবাবুর হাতে যে এত জোর, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি! একমাত্র ভূতের হাতেই এমন জোর থাকতে পারে। ছটফট করে সে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে পাশে ফেলে দিয়েই রাইফেলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শিবু সর্দার তার রাইফেলটা তুলে ঠিক করার আগেই কাকাবাবু তার দিকে দুটো গুলি চালিয়ে দিলেন। সে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। বড়বাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারপর সে বুঝে গেল, ভূত নয়, রায়চৌধুরী এখনও বেঁচেই আছেন, আর তাঁর হাতে রাইফেল!

সে ঝট করে বিল্টুকে তার বুকের কাছে টেনে এনে বলল, "রায়চৌধুরী, তোমার রাইফেলটা ফেলে দাও। তুমি আর কোনও চালাকি করতে গেলেই আমি এ ছেলেটার কানের মধ্যে দিয়ে গুলি চালাব। আমার হাতের রিভলভারটা দ্যাখো!"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে রইলেন সেই বড়বাবুর দিকে।

জায়গাটায় যদি আলো থাকত, তা হলে কাকাবাবু ওই লোকটাকে হিপনোটাইজ় করতে পারতেন। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তা সম্ভব নয়। কাকাবাবুর দু'হাত দিয়ে এখনও একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু মুখে একটুও ব্যথার চিহ্ন নেই। বরং রাগে গনগন করছে মুখ।

তিনি কর্কশ গলায় বললেন, "তুমি ওই ছেলেটাকে গুলি করে মারবে? মারো দেখি! নিতান্ত গাধা না হলে তুমি তা করবে না। তারপর তুমি বাঁচবে কী করে? সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা পাগলা কুকুরের মতো তোমার শরীর ঝাঁঝরা করে দেব গুলি চালিয়ে!"

লোকটি একটু থমকে গেল। বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, "তুমি এত সহজে মরবে, এটা ভাবাই আমার ভুল হয়েছিল। তখনই যদি গুলি চালিয়ে দিতাম!"

কাকাবাবু বললেন, "তখন গুলি চালাওনি, এখন তোমার প্রাণ আমার হাতে। যদি বাঁচতে চাও, ছেলেটাকে ছেড়ে দাও আর রিভলভারটা ফেলে দাও!"

লোকটি বলল, "ছেলেটাকে ছেড়ে দিলেই তুমি আমাকে মারবে। তোমার কথায় কোনও বিশ্বাস নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে প্রাণে মারব না! রাজা রায়চৌধুরীর কথার দাম আছে।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তাও নিয়ে যাব না। সে অনেক ঝামেলা। আমি শুধু বিল্টুকে নিয়ে চলে যাব।"

লোকটি বলল, "প্রমিস?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রমিস!"

লোকটি বিল্টুকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "রিভলভারটা ফেলে দাও!"

সে সেটা ফেলে দিতেই কাকাবাবু সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরলেন। তারপর বিল্টুকে বললেন, "বিল্টু, তুই উঠোনের বাইরে গিয়ে দাঁড়া তো।"

বিল্টু বলল, "না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "যা বলছি, কথা শোন। বাইরে দাঁড়া। রান! ওয়ান, টু, থ্রি।"

বিল্টু দৌড়ে চলে গেল।

কাকাবাবু এবার লোকটিকে বললেন, ‘‘তোমাকে প্রাণে মারব না কথা দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে শাস্তি তো পেতেই হবে। ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে তাদের প্রাণ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তারা অমানুষ! তাদের ক্ষমা নেই।’’

কাকাবাবু সেই বড়বাবুর দুই ঊরুতে দুটি গুলি চালিয়ে দিলেন। লোকটি আর্তনাদ করে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘পায়ে গুলি করলে কেউ মরে না। চিকিৎসা করালে সেরে উঠবে। বড়জোর খোঁড়া হয়ে থাকবে আমার মতো। আর এখন আমাকে তাড়াও করতে পারবে না।’’

বলরাম এর মধ্যে অনেকটা সামলে উঠেছে। কাকাবাবু তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন। সে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ছুড়ে মারল কাকাবাবুর দিকে। জ্বলন্ত কাঠটা কাকাবাবুর মাথায় লাগলে সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারত। কিন্তু সেটা লাগল কাকাবাবুর পিঠে!

তিনি অমনই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘তুমিই বা বাদ যাবে কেন!’’ তারও দুই ঊরু ফুঁড়ে গেল দুই গুলিতে! কাকাবাবু গায়ের কোটটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে মাটিতে চাপড়ে আগুন নেভালেন। ওদের তিনজনের দু’ পায়ে গুলি লেগেছে। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, ‘‘থাকো এইভাবে। আমি তোমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।’’

বিল্টু উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবুর এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতটা বিল্টুর কাঁধে রেখে বললেন, ‘‘চল রে বিল্টু।’’

বিল্টু বলল, ‘‘তোমার হাত জ্বালা করছে না? কতটা পুড়েছে!’’

কাকাবাবু বললেন, ‘‘ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে!’’

ভাঙা জায়গাটা পার হওয়ার পর সেই দুধওলাকে দেখা গেল, পাশে আর-একটা লোক।

কাকাবাবু তাদের ভয় দেখাবার জন্য শূন্যে একটা গুলি ছুড়লেন। অমনই দৌড় লাগাল তারা!

কাছেই রয়েছে একটা জিপ। কাকাবাবু বিল্টুকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন। আধঘণ্টা পর রাস্তার ধারে একটা থানা দেখে থামলেন কাকাবাবু।

ভিতরে ঢুকে একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, ''কাছাকাছি কোনও ডাক্তারের চেম্বার কিংবা হাসপাতাল আছে? আমার হাতের চিকিৎসা করাতে হবে।''

কাকাবাবুর দু'হাতের কবজির অবস্থা দেখে শিউরে উঠে পুলিশটি বলল, ''ওরেব্বাস, এই হাত নিয়ে আপনি গাড়ি চালালেন কী করে?''

কাকাবাবু যে এই হাতে রাইফেলও চালিয়েছেন, তা সে জানবে কী করে!

ডাক্তারের কথা জেনে নিয়ে কাকাবাবু পুলিশটিকে বললেন, ''জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা বাড়িটায় যান। এখনই। সেখানে তিনজন ক্রিমিনালকে পাবেন!''

১২

গাড়ি চালাচ্ছে সিদ্ধার্থ। সামনের সিটে কাকাবাবু আর বিল্টু। পিছনের সিটে সন্তু আর জোজো আর রিনি। যাওয়া হচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে। কাকাবাবুর সঙ্গে বিল্টু আর রিনি যাবে দিল্লি। কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার বাড়িতে থাকা হবে। কাকাবাবুর দু'হাতেই ব্যান্ডেজ।

জোজো বলল, ''এবার বিল্টুই হিরো। আমি আর সন্তু কোনও চান্সই পেলাম না!''

কাকাবাবু বললেন, ''বিল্টু আসল হিরো তো হবে আগামীকাল। দিল্লিতে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ফার্স্ট প্রাইজ় নেবে।''

সিদ্ধার্থ বলল, ''রিনি এত ভাল ছবি আঁকে, ও কোনও প্রাইজ়ই পেল না। আর বিল্টু ফার্স্ট প্রাইজ় পেয়ে গেল!''

রিনি বলল, ''আমি ওকে শিখিয়েছি। ও পাওয়া মানেই তো আমারও পাওয়া।''

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ''কাকাবাবু, বিল্টুকে যেখানে আটকে রেখেছিল, সেই জায়গাটা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, ''বিহারে। ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গলের জায়গা।''

বিল্টু বলল, ''আমাদের বাঘ দেখা হল না। কাকাবাবু, আমরা কিন্তু পরে বাঘ দেখতে যাব।''

কাকাবাবু বললেন, ''যাব তো নিশ্চয়ই। তবে, বাঘ তো চোখ বুজলেই দেখা যায়, তাই না?''

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, বিল্টু যে বলল, ওদের পালের গোদাটাকে অন্যরা বড়বাবু বলে ডাকছিল, ও কীসের বড়বাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!"

সন্তু বলল, "বোধহয় হেড অফিসের বড়বাবু!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতে পারে! ওর গোঁফ ছিল নাকি রে বিল্টু?"

বিল্টু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "*হেড অফিসের বড়বাবু, লোকটি বড় শান্ত!* মোটেই শান্ত নয়, খুব পাজি!"

কাকাবাবু বললেন, "*তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত*।"

সন্তু বলল, "*দিব্যি ছিলেন খোশমেজাজে চেয়ারখানি চেপে।*"

বিল্টু বলল, "*একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে*।"

কাকাবাবু বললেন, "*আঁতকে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে চক্ষু করে গোল*।"

সন্তু বলল, "*হঠাৎ বলেন, গেলুম গেলুম আমায় ধরে তোল!*"

কাকাবাবু বললেন, "*তাই শুনে কেউ*... ইয়ে, তারপর কী যেন? অনেক দিন পড়িনি তো, মনে পড়ছে না। কী রে, সন্তু, তোর মনে আছে?"

সন্তু বলল, "বিল্টু সব জানে!"

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "তুমি পারবে কিনা বলো।"

সন্তু বলল, "নাঃ, আমারও মনে নেই।"

বিল্টু গড়গড়িয়ে বলল, "*তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ, কেউ বা বলে, "কামড়ে দেবে, সাবধানেতে তুলিস!*" আরও দু' লাইন বলে থেমে গিয়ে বিল্টু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "তোমরা পারলে না তো! হেরে গেলে, আমার কাছে হেরে গেলে!"

সিদ্ধার্থ বলল, "এটাতেও বিল্টু ফার্স্ট!"

কাকাবাবু মনে মনে হাসলেন। তিনি ভাল করে জানেন যে, তাঁর সবটা মনে না থাকলেও সন্তুর পুরোটা মুখস্ত। সে ইচ্ছে করে বলল না। ছোটদের কাছে হেরে গিয়েও যে বড়দের কত আনন্দ হয়, তা ছোটরা জানতেও পারে না।

বিল্টু পকেট থেকে মাউথঅর্গান বের করে বাজাতে লাগল। আকাশ থেকে একটা প্লেন নামছে এয়ারপোর্টে।
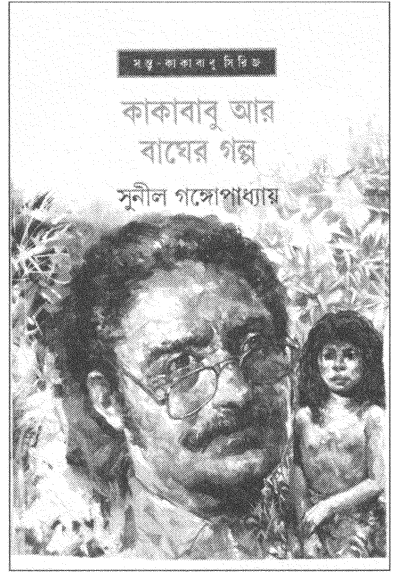
কাকাবাবু আর বাঘের গল্প

বিকেলবেলা কাকাবাবু বাথরুমে দাড়ি কামাচ্ছেন, সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে হন্তদন্তভাবে উঠে এসে সন্তু ডাকল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু..."

আজকাল কাকাবাবু রোজ দাড়ি কামান না। আগে প্রত্যেকদিন সকালে দাড়ি কামিয়ে নিতেন দাঁত মাজার সঙ্গে সঙ্গে। এখন যেদিন বাড়ি থেকে বেরোবার দরকার না থাকে, সেদিন দাড়ি কামানোও বাদ দিয়ে দেন।

কোথাও বেড়াতে গেলে পরপর তিন-চারদিনও মনে থাকে না। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজায়, তাতে হাত বুলিয়ে তিনি মুচকি মুচকি হাসেন।

গোঁফটা অবশ্য একরকমই আছে।

এখানেও তো বেড়াতেই এসেছেন, কোনও কাজ নেই। শুধুই বেড়ানো। তাই তিনদিন তিনি গালে ব্লেড ছোঁয়াননি। তা হলে, আজ বিকেলবেলা দাড়ি কামাতে শুরু করলেন কেন?

কারণ, আজ সন্ধেবেলা রাজবাহাদুর প্যালেসে গান-বাজনার আসর বসবে, সেখানে যেতে হবে। গানের আসরে দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট পোশাক পরে যেতে হয়। না হলে গায়ক বা গায়িকাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাঁরা ভাবেন, যে লোকটি দাড়ি না কামিয়ে, প্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরে এসেছে, সে তাঁদের প্রতি সম্মান জানাচ্ছে না।

সবেমাত্র আধখানা গাল কামানো হয়েছে, অন্য গালটায় ফেনা মাখানো। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে সন্তু, হাঁপাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?"

সন্তু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "আজ আবার বাঘ বেরিয়েছে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আবার গুজব? তুই বাঘটা দেখেছিস, না ডাক শুনেছিস?"

সন্তু বলল, "না, আমি শুনিনি। কিন্তু লোকে বলছিল...।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকে তো অনেক কথাই বলে। কোথায় শুনলি লোকের কথা?"

সন্তু বলল, "আমি আর জোজো ইকো পয়েন্টে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকেই বলল, বাঘের ডাক শুনেছে। সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল। দোকান টোকানও সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "কালও তো কত লোক 'বাঘ আসছে, বাঘ আসছে' বলে হল্লা তুলেছিল। আমাদের মান্টো সিংহ বলল, সে নিজের কানে বাঘের ডাক শুনেছে। অথচ আমরা কেন শুনলাম না বল তো? আমরা কি কানে কম শুনি?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওখানে দুটো লোক জোর দিয়ে বলল, কাল রাত্তিরে নাকি বাঘটা বাজারের কাছে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছে। ওরাও ডাক শুনেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাজারে? জঙ্গলে খাবারদাবার ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই বাঘ শহরে এসেছে বাজার করতে। দাঁড়া, দাড়ি কামানোটা শেষ করে নিই। তারপর এসব গল্প শুনব।"

একটু পরে মসৃণ গালে আফটার শেভ মাখতে মাখতে কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে।

আগেরদিন সন্ধেবেলা পর্যন্ত খুব গরম ছিল। অক্টোবর মাস, কিন্তু এখনও এইসব জায়গায় শীত আসার নাম নেই। সারাদিন অসহ্য গরমের পর হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছিল সাড়ে ছ'টার সময়। আধঘণ্টা বৃষ্টির পর, যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎই থেমে গেল। তারপর বইতে শুরু করল ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া।

কিন্তু তখনও ঘরের মধ্যে বসে থাকলে গরম লাগে, বাইরেটাই মনোরম। তাই কাকাবাবু কেয়ারটেকার মান্টো সিংহকে বলেছিলেন, "সামনের চাতালে দু'-একটা শতরঞ্চি পেতে দাও না, আমরা ওখানে বসে হাওয়া খাব।"

বাংলোর ঠিক পাশেই মস্ত বড় খাদ। তার ওপাশে পাহাড়। সেই পাহাড়ের আড়াল থেকে একসময় চাঁদ উঠে আসে। দিনেরবেলা এমন কিছু মনে হয় না, তবে রাত্তিরবেলা পাহাড়টাকে খুব রহস্যময় দেখায়। ওখানকার জঙ্গলে

কোনও বাড়িঘর নেই। একটা ঝরনা আছে, খুব বড় নয়। তাই দিনেরবেলা সেটার আওয়াজ শোনা যায় না, শুধু চোখে দেখা যায়। আর রাত্তিরবেলা ঝরনাটা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আওয়াজ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মান্টো সিংহ প্রথমে বাইরে শতরঞ্চি পেতে দিতে রাজি হয়নি।

সে বলেছিল,"সাহাব, এখানে কেউ রাত্তিরে বাইরে বসে না। হঠাৎ শের এসে পড়তে পারে।"

কথাটা শুনে কাকাবাবু হেসে উঠেছিলেন।

কাকাবাবু এখানে দু'বার এসেছেন। মাণ্ডুতে কখনও বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি। উলটো দিকের পাহাড়ের জঙ্গলটাতেও তিনি জিপগাড়িতে ঘুরেছেন, কিছু হরিণ আর খরগোশ আর ময়ূর আছে বটে, বাঘের কোনও চিহ্ন নেই।

বাইরে এমন সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া, জ্যোৎস্না ফুটেছে, এই সময় ঘরের মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয়?

কাকাবাবু জোর করেই শতরঞ্চি পাতিয়েছিলেন।

এই বাংলোর একটা ঘরে আরও একটি বাঙালি দম্পতি আছে, নির্মল রায় আর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী রায়। আর ওঁদের চার বছরের ছেলে টিটো। স্বামী আর স্ত্রী দু'জনেই ইঞ্জিনিয়ার, দু'জনেই বেশ ভাল গান করেন। ওঁরা এসেছেন ভিলাই থেকে, সন্তু-জোজোর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

ওঁরাও এসে বাইরের চাতালের সেই আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন। একটুক্ষণ গল্পের পরই শুরু হল গান। সন্তু ভাল মাউথঅর্গান বাজাতে পারে, কিন্তু গান গাইতে পারে না। জোজো বরং ভালই গান জানে। কিন্তু এমনিতে সে খুব বাক্যবীর হলেও গান গাইতে বললেই লজ্জা পায়। মাথা নুইয়ে ফেলে বলতে থাকে, "না, না, আমি গাইতে পারি না!"

নির্মল আর জয়ন্তী রায় পরপর চারখানা গান গেয়ে ফেললেন। কাকাবাবু বললেন, "বাঃ চমৎকার। আর-একটা হোক!"

তখনই মান্টো সিংহ উত্তেজিতভাবে এসে বলেছিল, "সাহাব, সাহাব, অন্দর মে চলা যাইয়ে! সত্যি আজ বাঘ বেরিয়েছে। একবার এই বাংলোর সামনে থেকে বাঘ একটা মেমসাহেবকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল!"

কাকাবাবু তবু তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "যাঃ, এখানে বাঘ কোথা থেকে আসবে? এ তল্লাটে বাঘ আছে নাকি?"

মান্টো সিংহ বলল, "হাঁ সাব, আছে। জঙ্গল থাকলে বাঘ থাকবে না? মাঝে মাঝে এদিকে এসে পড়ে!"

জয়ন্তী তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, “অ্যাঁ, বাঘ বেরিয়েছে? আর আমরা এমন খোলা জায়গায় বসে আছি? আমি বাবা ঘরে যাচ্ছি!”

টিটো বলল, “মা, বাঘ এসেছে? কোথায়, কোথায়?”

জোজো তাকে বলল, “তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি টিটো? বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে না?”

টিটো বলল, “লড়াই করব, আমার বন্দুক কোথায়? বন্দুক তো আনিনি!”

জোজো বলল, “কেন, খালি হাতে বুঝি বাঘ মারা যায় না? এই যে সন্তু, ও এক ঘুসিতে বাঘকে অজ্ঞান করে দিতে পারে। আর আমার আসল নাম কী জানো? ভোম্বল দাস। সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস/দেড়খানা বাঘ আমার এক এক গেরাস!”

টিটো বলল, “তার মানে কী? তার মানে কী?”

জোজো একটা হাত তুলে বলল, “ভাত খাওয়ার সময় এক গেরাস করে খেতে হয়? আমি এক গেরাসে দেড়খানা বাঘের মুড়ো খেয়ে ফেলতে পারি!”

মান্টো সিংহ এর মধ্যে শতরঞ্চির এক কোনা ধরে টানতে শুরু করেছে। সে বলল, “উঠুন, উঠুন, নইলে আমার নামে দোষ পড়বে!”

সবাইকে এবার উঠতেই হল।

কাকাবাবু রাগ দেখালেন না বটে, কিন্তু তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে।

এবার সবাই মিলে বসলেন ডাইনিং রুমে।

বেশ বড় এই ঘরটা খানিকটা উঁচুতে। এর তিন দিকের দেওয়াল কাচের। বাইরের দিকটা সব দেখা যায়। কিন্তু এখন তো খাদের উলটো দিকের পাহাড়টার কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে, কয়েকটা বড় বড় গাছ যেন লেগে আছে আকাশের গায়ে।

টিটোকে নিয়ে সন্তু আর জোজো কাচের দেওয়ালের কাছে কিছুক্ষণ বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে এসে জোজো বলল, “কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় বাঘ দেখেছেন? একটা বাঘের গল্প বলুন!”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, বাঘ দেখেছি অনেক জায়গায়। এই মধ্যপ্রদেশে বেশ কয়েকটা রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। সেসব জঙ্গলে গেলেই দেখা যেতে

পারে বাঘ। কিন্তু আমরা হলাম সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশের মানুষ! ওদের মতো অত বড় হিংস্র বাঘ তো আর কোথাও নেই! রয়াল বেঙ্গল টাইগারের তুলনায় এখানকার বাঘেরা ছেলেমানুষ! এই বাঘেরাই মানুষ দেখলে ভয় পায়! আমি সুন্দরবনে বেশ কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বাঘ দেখতে পাইনি। লোকে বলে, সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে একবার যার চোখাচোখি হয়, সে আর প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পারে না।”

এইটুকু বলে কাকাবাবু থেমে যেতেই জয়ন্তী বললেন, “ও মা, বাঘের গল্প হল কোথায়?”

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, “আসল গল্প বলতে পারবে জোজো। ও নিশ্চয়ই নিজের চোখে অনেকবার বাঘ দেখেছে!”

সন্তু বলল, “জোজো, তুই তো রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে একটা চিতাবাঘ দেখেছিলি, তা জানি। তুই কখনও সুন্দরবনের বাঘ দেখেছিস?”

জোজো বলল, “পৃথিবীর সব দেশ থেকেই তো বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাই ‘সেভ দ্য টাইগার’, অর্থাৎ ‘বাঘ বাঁচাও সমিতি’ নামে একটা সমিতি হয়েছে। সেই সমিতির প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন প্রিন্স আলফ্রেড, মানে সুইডেনের যুবরাজ। গত বছর তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।”

সন্তু বলল, “তোর সঙ্গে বুঝি যুবরাজের আলাপ আছে?”

জোজো বলল, “আমার সঙ্গে থাকবে কী করে? তবে আমার বাবাকে চেনেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, সুইডেনের রাজকুমার ইংরেজি বলতে পারেন না। তিনি সুইস ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষা জানেন না।”

সন্তু বলল, “সুইডেনের ভাষা তো সুইস নয়। সুইডিশ!”

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস! সুইডিশ, সুইডিশ! কলকাতা শহরে আমার বাবা ছাড়া তো আর কেউ সুইডিশ ভাষা জানে না। তাই রাজকুমারকে কলকাতায় এলে বাবার সাহায্য নিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বাবাকেই রাজকুমারের কথা বুঝিয়ে বলতে হয়।”

সন্তু বলল, “তুইও তখন সঙ্গে ছিলি নিশ্চয়ই? রাজকুমার কী বললেন মুখ্যমন্ত্রীকে?”

জোজো বলল, “আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাইনি। বাবার মুখে শুনেছি। রাজকুমার তো বাঘ বাঁচাও সমিতির সভাপতি। তিনি রিপোর্ট পেয়েছেন যে, সুন্দরবনের সব বাঘ দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তারা ঠিকমতো খেতে

পায় না। তাই তিনি নিজের চোখে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেহারা দেখতে চান।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কোথায় রয়াল বেঙ্গল টাইগার দেখবেন? চিড়িয়াখানায়?”

জোজো বলল, “ধ্যাত! চিড়িয়াখানার বাঘরা তো গান্ডেপিন্ডে খায় আর পেট মোটা হয়। উনি আসল জঙ্গলের বাঘ দেখবেন ঠিক করেছেন।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু যে বলল, সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ দেখা খুবই শক্ত। আর একবার চোখোচোখি হলে...”

জোজো বলল, “কাকাবাবু ঠিকই বলেছেন। সুন্দরবনের জঙ্গল তো আর অন্য জঙ্গলের মতো নয়। নামে সুন্দর, আসলে ভয়ংকর। ভিতরে গাড়ি চলে না। পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কখন যে বাঘ খুব কাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, তা বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে একজনকে টেনে নিয়ে যায়। কাগজে পড়িসনি, ক’দিন আগেই তো কয়েকজন লোক ওখানকার নদীর ধারে কাঁকড়া ধরছিল, হঠাৎ একটা বাঘ এসে বিশ্বনাথ বলে একটা ছেলেকে টেনে নিয়ে গেল!”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “রাজকুমার পায়ে হেঁটে যেতে রাজি হলেন?”

জোজো বলল, “পাগল নাকি? মানে, রাজকুমারের সাহস আছে, কিন্তু তিনি রাজি হলেও আমাদের গভর্নমেন্টের লোক মানবে কেন? যদি কোনও বিপদ হয়ে যায়! তা হলে ইন্ডিয়ার নামে কত বদনাম হয়ে যাবে।”

নির্মল রায় বললেন, “ঠিকই তো। সুইডেনের রাজকুমার, তার সবরকম দেখাশুনো করাই তো আমাদের উচিত।”

টিটো বলল, “সুন্দরবনের বাঘ বুঝি খুব জোরে লাফাতে পারে?”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, একলাফে নদী পেরিয়ে যেতে পারে।”

টিটো বলল, “হনুমান আর বাঘ যদি একসঙ্গে লাফায়, তা হলে কে জিতবে?”

জোজো বলল, “বাঘ তো জিতবেই। কেন বলো তো? বাঘ তো আগেই হনুমানটাকে খেয়ে ফেলবে।”

টিটো এখন হি হি করে খটখটিয়ে হেসে উঠল, যেরকম হাসি শুধু চার বছরের বাচ্চারাই হাসতে পারে।

জয়ন্তী রায় জিজ্ঞেস করলেন, “তারপর কী হল?”

জোজো বলল, “সুন্দরবনের সজনেখালিতে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে।

তিনতলার সমান উঁচু। সেখানে উঠে বসে থাকলে অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়, বাঘও আছে। সেই আমরা দল বেঁধে গিয়ে...।"

জয়ন্তী বললেন, "ওই ওয়াচ-টাওয়ারে আমরাও একবার গিয়ে বসে ছিলাম। তিন ঘণ্টা। কিছু দেখতে পাইনি, শুধু কয়েকটা হরিণ।"

সন্তু বলল, "হরিণ বুঝি কিছু না?"

জয়ন্তী বললেন, "হরিণ তো অনেক দেখা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তুমি থামলে কেন?"

জোজো বলল, "রাজকুমারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। সেই ওয়াচ-টাওয়ার দু'দিন পাবলিকের জন্য বন্ধ! আমরা অনেক খাবারদাবার নিয়ে মোটা গদিপাতা বিছানায় গিয়ে বসলাম।"

নির্মল রায় জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা মানে ক'জন?"

জোজো বলল,"রাজকুমার আলফ্রেড, তাঁর এক বন্ধু কিম, একজন সরকারি অফিসার, বাবা আর আমি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোকে সঙ্গে নেওয়া হল কেন?"

জোজো বলল, "আমার বাবাকে অনেক ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু ওষুধ খেতে ভুলে যান ঠিক সময়। তাই আমাকে সঙ্গে যেতে হয়, ওষুধের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিকই তো। সঙ্গে যাওয়াই ভাল।"

জোজো বলল, "ওয়াচ-টাওয়ারের সামনেটা মোটা জালে ঘেরা থাকে, যাতে বাঘ এসে আক্রমণ করতে না পারে। জালের বাইরে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, আর কাছাকাছি ঝোপঝাড়। ফাঁকা জায়গাটায় একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হল একটা শুয়োরকে। শুয়োর বাঘের খুব প্রিয় খাদ্য। বেঁধে রাখলেই শুয়োর খুব চ্যাঁচায়। সেটাই তো বিজ্ঞাপন। ওই চ্যাঁচানি শুনে বাঘ আসবেই। কিন্তু আমরা সকাল, দুপুর, বিকেল-সন্ধে পর্যন্ত বসে রইলাম। বাঘের দেখা নেই।"

জয়ন্তী রায় বললেন, "আগেই তো বলেছি, ওই টাওয়ারে বসে বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের বাঘ খুব চালাক।"

জোজো বলল, "আমরা কিন্তু বাঘ দেখেছি।"

জয়ন্তী বললেন, "তবে যে বললে সারাদিন বসে থেকেও...।"

জোজো বলল, "আপনি তো আমাকে পুরোটা বলতে দিচ্ছেন না।"

নির্মল রায় বললেন, "আঃ জয়ন্তী, ওকে বলতে দাও।"

জোজো বলল, "মুশকিল হচ্ছে কী, দিনেরবেলা তো বাঘ বেরোয় না সাধারণত। ওরা নিশাচর প্রাণী। রাত্তিরবেলা এসে শুয়োরটাকে ধরে নিয়ে গেলেও অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাব না। তাই শুয়োরটাকে খুলে নিয়ে আমরাও নেমে গেলাম গেস্ট হাউসে। সেখানে রাত্তিরে বেশ ভালই খাওয়া দাওয়া হল। তারপর আড্ডা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী খেলি রে জোজো?"

জোজো বলল, "টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল, মুর্গ মুসল্লম, তার মানে মুর্গির পেট কেটে তার মধ্যে চাল আর ডিম ঢুকিয়ে সেলাই করে রান্না, আর কাঁকড়ার ঝোল, চিংড়ির মালাইকারি।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "রাজকুমার খেলেন এত কিছু?"

জোজো বলল, "রাজকুমারের জন্যই তো কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল কুক নিয়ে গিয়ে এত কিছু রান্না করা হয়েছিল। কিন্তু খেতে বসে তিনি বললেন, তিনি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, এখন শুধু নিরামিষ খান। তাই খেলেন শুধু ভাত-ডাল-বেগুনসেদ্ধ আর দই। তাঁর বন্ধুটা অবশ্য চেটেপুটে খেল সবই। ইলিশ খেয়ে বলতে লাগল, এরকম ভাল মাছ সে জীবনে খায়নি।"

সন্তু বলল, "পরদিন সকালে আবার গেলি?"

জোজো বলল, "সারারাত আমার ভাল করে ঘুমই হল না। মাঝে মাঝে জানলার দিকে চেয়ে দেখছি, কখন ভোর হয়। কিছুতেই ভোরের আলো ফুটছে না। একসময় আলো জ্বেলে দেখি, সাড়ে সাতটা বাজে। তবু রোদ্দুর ওঠেনি কেন? জানলার কাছে গিয়ে দেখি, সারা আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে, আর একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। বাবা আগেই জেগে উঠেছিলেন, বাবা বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও সবাই। এইটাই ভাল সময়। এইরকম অন্ধকার থাকলে বাঘ বেরোতে পারে।'

"আমরা সবাই গিয়ে আবার ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে বসলাম। শুয়োরটাকেও খুঁটিতে বেঁধে রাখা হল। তারপর অপেক্ষা। রাজকুমারের হাতে দূরবিন। কেউ কোনও কথা বলছে না। খুব বেশিক্ষণ না, ঘণ্টাখানেক মোটে কেটেছে।"

জয়ন্তী উদগ্রীব হয়ে বললেন, "দেখা গেল বাঘ?"

জোজো বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, বাঘ দেখা অত সহজ নাকি? এ কি সার্কাসের বাঘ যে, খেলা দেখাবে? খুব কাছেই একটা ময়ূর পাঁও পাঁও করে ডেকে উঠল। কয়েকটা বাঁদর কিচিরমিচির করতে করতে এক ডাল থেকে

আর-এক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল, তিনটে হরিণ ছুটে গেল খুব জোরে। এতেই বোঝা যায়, কাছাকাছি কোথাও বাঘ এসেছে। শুয়োরটাও ভয় পেয়ে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা জোজো একদম ঠিক বলেছে। বাঘ বেরোলেই জঙ্গলের অন্য প্রাণীরা ভয় পেয়ে পালায়! জোজোর গল্প একেবারে নিখুঁত।"

জোজো বলল, "কয়েকটা ঝোপে কড়কড় শব্দ হল। মনে হল, ওইদিক দিয়ে বাঘটা আসছে। অবশ্য অন্য কোনও প্রাণীও হতে পারে। তারপর খুব কাছের একটা ঝোপ নড়ে উঠল। রাজকুমার দূরবিনে দেখে বললেন, 'একটু হলুদ হলুদ রং দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভবত একটা বাঘ এসেছে।' বাবা বললেন, 'একটা মুশকিল হবে। বাঘটা দেখে নিচ্ছে শুয়োরটার কাছে কোনও ফাঁদ পাতা আছে কিনা। কিন্তু তারপর তো বাঘটা হেঁটে হেঁটে আসবে না, সেটা ওদের স্বভাব নয়। ও একলাফে এসে শুয়োরটাকে তুলে নিয়েই আর-একলাফে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চোখের নিমেষে ঘটবে ঘটনাটা। ভাল করে দেখাই যাবে না। তা হলে কী করে বোঝা যাবে, বাঘটা রোগা না মোটা?'

"রাজকুমার বললেন, 'আমি কিন্তু বাঘটাকে ভাল করে দেখতে চাই, ক্যামেরায় ফোটোও তুলতে চাই!' "

সন্তু বলল, "মেসোমশাই নিশ্চয়ই একটা কিছু উপায় বের করলেন?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। বাবা রাজকুমারের বন্ধুকে সুইডিশ ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করলেন। সেও কী যেন উত্তর দিল। বাবা তখন বললেন, 'ঠিক আছে!' আরও খানিক পরে বাঘটা ঝোপ থেকে একটু মাথা বের করতেই বাবা বললেন, 'এবার!' রাজকুমারের বন্ধুটি চিৎকার করে বলে উঠল, 'স্ট্রাটাস, স্ট্রাটাস!' আর বাবাও হাত তুলে খুব জোরে বললেন, 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ!' ব্যস, বাঘটা লাফাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেখানেই থেকে গেল, শরীরটা অর্ধেক উঁচু, একেবারে নট নড়নচড়ন!"

জোজো একটু চুপ করল। কাকাবাবু একটু একটু হাসছেন, আর সকলের চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী হল? বাঘটা লাফাতে পারল না?"

জোজো বলল, "লাফাবে কী করে? ছেলেবেলা স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলিসনি? কারও দিকে তাকিয়ে জোরে স্ট্যাচু বললে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়। নড়াচড়া করে না, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলে না। বাঘটারও সেই অবস্থা!"

সন্তু বিরক্তভাবে বলল, "আমরা ছেলেবেলায় স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলেছি ঠিকই, কিন্তু বাঘ কি খেলেছে? বাঘ কি স্ট্যাচু কথাটার মানে জানে?"

জোজো হো হো করে হেসে উঠে বলল, "দুর বোকারাম। খেলার কথা তো এমনিই বললাম, তাও বুঝলি না? বাঘের সঙ্গে কি খেলা করা যায়? তবু যে বাঘটা আর নড়তে চড়তে পারছে না, তার কারণ কী?"

জয়ন্তী বললেন, "আমরা কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।"

জোজো বলল, "আমার বাবা যে বললেন, তিষ্ঠ! তার মানে কী? থামো! এই বনে বাবা বাঘটাকে হিপনোটাইজ করলেন, তারপর তো ওর আর নড়াচড়ার ক্ষমতাই রইল না। অবশ্য মাত্র দু'মিনিট।"

নির্মল রায় অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "বাঘকে হিপনোটাইজ করা যায়?"

জোজো বলল, "সবাই পারে না। ওই অবস্থায় বাঘটার ফোটো তোলা হয়েছিল, কলকাতায় গেলে দেখাতে পারি। দিব্যি মোটাসোটা চেহারা।"

জয়ন্তী রায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর দু'মিনিট পরে কী করল বাঘটা?"

এর পরের অংশটা আর শোনা গেল না।

মান্টো সিংহ দৌড়ে এ-ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "সাহাব, অপলোগ শুনা?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কী শুনব?"

মান্টো সিংহ বলল, "বাঘটা ডাকল। দু'বার। সে কাছেই এসে পড়েছে!"

কাকাবাবু বললেন, "কই, আমরা তো কিছু শুনিনি।"

মান্টো সিংহ বলল, "বহুত আদমি শুনেছে। দু'বার ডেকেছে।"

জয়ন্তী রায় বললেন, "আমরা গল্প শুনছিলাম, তাই শুনতে পাইনি?"

কাকাবাবু ছাড়া আর সবাই ছুটে গেল জানলার কাছে।

গেস্ট হাউসের দরজাটরজা সব বন্ধ, বাঘ এলেও ভিতরে ঢুকতে পারবে না। কাচের দেওয়াল কি ভেঙে ফেলতে পারে? খুব পুরু কাচ, আর অনেকটা উঁচুতে। এত দূর বাঘ লাফাতে পারবে না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও আর বাঘের ডাক শোনা গেল না। দেখা গেল না কিছু। গল্প আর জমল না।

আজ আবার সেই বাঘের কথা। সন্তুরা বাইরে থেকে শুনে এসেছে।

কাকাবাবুর তবু বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, কেউ গুজব ছড়াচ্ছে। বাঘ

অনেক সময় জঙ্গলের কাছাকাছি কোনও গ্রামে ঢুকে পড়ে। খিদের জ্বালায় গোরু-মোষ মারে। সামনে কোনও মানুষ পড়ে গেলে তাকেও মেরে দিতে পারে। কিন্তু এটা তো প্রায় একটা শহর। এখানে বাঘ আসবে কেন? বাঘের প্রাণের ভয় নেই?

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "দাঁড়া, কর্নেল সরকারকে ফোন করে দেখি, কী ব্যাপার। উনি নিশ্চয়ই জানবেন।"

কর্নেল প্রিয়ব্রত সরকার আর্মিতে ছিলেন বেশ কিছুদিন। আগে আগে রিটায়ার করে এখানেই বাড়ি করে থেকে গিয়েছেন। বেশ জবরদস্ত চেহারা, তবে হাসিখুশি মানুষ। আজ রাজবাহাদুর প্যালেসে গান-বাজনার আসর বসার কথা। কর্নেল সরকারই সেই ব্যবস্থা করে কাকাবাবুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কর্নেল সরকার ফোন ধরার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী সরকারসাহেব, গান-বাজনা কখন শুরু হবে? আপনি গাড়ি পাঠাবেন বলেছিলেন।"

কর্নেল সরকার বললেন, "রায়চৌধুরীমশাই, বাংলায় একটা কথা আছে জানেন তো? বর্ষাকালে কেন কোকিল ডাকে না? কারণ, তখন চতুর্দিকে ব্যাঙেরা ডাকাডাকি করে, তাই কোকিল চুপ করে থাকে। আজ এখানে সেই অবস্থা। বাঘ এসে যদি ডাকাডাকি করে, তা হলে গায়িকা গান করবেন কী করে? আজকের অনুষ্ঠান ক্যানসেল্ড!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই বাঘ ডাকাডাকি করছে? আপনি শুনেছেন নাকি?"

কর্নেল বললেন, "না, আমি শুনিনি। তবে অনেকেই আমাকে বলছে যে, কাল রাত থেকে নাকি বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে!"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কি সত্যি বাঘ আসতে পারে? আগে কখনও এসেছে?"

কর্নেল বললেন, "বছর পাঁচেক আগে নাকি একটা বাঘ কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়েছিল। একজন বৃদ্ধ লোককে মেরেও ছিল। তবে তখন আমি এখানে ছিলাম না। কতটা সত্যি তা বলতে পারব না। আজ আর কেউ ভয়ে বাইরে বেরোচ্ছে না। রাস্তা একেবারে শুনশান।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরাও তা হলে সারা সন্ধে গেস্ট হাউসেই বসে থাকব?"

কর্নেল বললেন, "আমি আসছি আপনাদের ওখানে। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোব। ঘুরব অনেক জায়গায়। আর তার মধ্যে যদি হঠাৎ বাঘটার দেখা পাওয়া যায়, তা হলে বেশ মজাই হবে।"

॥ ২ ॥

কর্নেল সরকার এসে পৌঁছোলেন ঠিক আধঘণ্টা পরে।

তাঁর একটা জিপগাড়ি তিনি নিজেই চালান। বিয়ে করেননি, তাই তাঁর বউ-ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একাই থাকেন, গান-বাজনার খুব শখ, তাতেই সময় কাটে।

জোজো আর সন্তু এর মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছে। ওদের নিয়ে কাকাবাবু উঠলেন জিপে। তিনি বসলেন কর্নেলের পাশে, সন্তু আর জোজো পিছনে।

কর্নেলের সিটের পাশে একটা রাইফেল।

কাকাবাবু বললেন, "একেবারে বন্দুক সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন?"

কর্নেল বললেন, "বলা তো যায় না, সত্যিই যদি একটা বাঘ এখানে ঘোরাঘুরি করে, আর আমাদের দেখলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসে, তখন একটা কিছু তো করতেই হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বাঘকে তো মারতে পারবেন না। বাঘ মারা নিষেধ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "কী মজার ব্যাপার বলুন তো! আমরা তো আর বাঘ মারি না। কিন্তু বাঘেরা তো আর সেকথা জানে না। তারা দিব্যি মানুষ মারে!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কখনও বাঘ শিকার করেছেন?"

কর্নেল বললেন, "করেছি। অনেক বছর আগে। একসময় জঙ্গলে জঙ্গলে খুব ঘুরতাম। এখন বাঘ তো দূরের কথা, কোনও জন্তু-জানোয়ারই মারতে ইচ্ছে করে না। রাইফেলটা সঙ্গে রেখেছি, যদি বাঘ আসে, তাকে ভয় দেখাবার জন্য।"

জিপটা রাস্তায় বাঁক নেওয়ার পর কর্নেল বললেন, "আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, এই জায়গাটা পুরোটাই একটা দুর্গ ছিল। মাঝে কয়েকটা রাজপ্রাসাদ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। হিন্দু রাজাদের আমল থেকেই এটা তৈরি হয়, তারপর

মুসলমানরা এসে দখল করে নেয়। তারাও অনেক সুন্দর সুন্দর মহল বানিয়েছে। হাতবদলও হয়েছে অনেকবার।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা রাস্তার নাম 'হাতি চড়াও' কেন? ওখানে কি হাতি ঘুরে বেড়াত?"

কর্নেল বললেন, "বুনো হাতি নয়। রাজা-বাদশাদের তো পোষা হাতি থাকতই। ওখানে রাস্তাটা ঢালু, আর পাশেই হিন্দোলা মহল। লোকে বলে, বেগমরা হাতির পিঠে চেপে ওই পথ দিয়ে আসতেন, সোজা মহলের উপরে পৌঁছে যেতেন।"

সন্তু বলল, "সত্যিই, রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। গাড়িও চলছে না।"

কর্নেল বললেন, "বাংলায় একটা কথা আছে না, 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়'। এখানেও সন্ধে হতে না-হতেই সবাই বাঘের ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে।"

সন্তু বলল, "আমরা যদি হঠাৎ বাঘটাকে দেখতে পাই, তা হলে ভালই হয়। বাঘটা তো আমাদের আক্রমণ টাক্রমণ করতে পারবে না। সঙ্গে জোজো আছে। ও ঠিক একটা কিছু করে বাঘটাকে ভয় পাইয়ে দেবে।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমায় কিছু করতেই হবে না। কাকাবাবু বাঘটাকে হিপনোটাইজ করে দেবেন! ব্যস!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘকে হিপনোটাইজ করার ক্ষমতা তো আমার নেই।"

কর্নেলসাহেব বললেন, "বাঘকে হিপনোটাইজ! কখনও শুনিনি! হা হা হা...।"

তিনি খুব হাসতে লাগলেন।

গাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে লাগল নির্জন রাস্তা দিয়ে। মাঝে মাঝে পুরনো আমলের বড় বড় গেট। কোনওটার নাম আলমগির দরওয়াজা, কোনওটার নাম ভাঙ্গি দরওয়াজা, রামপাল দরওয়াজা, জাহাঙ্গির দরওয়াজা। কর্নেলসাহেব এই গেটগুলোর ইতিহাস শোনাতে লাগলেন, "একসময় এই মাণ্ডুর এত সুনাম ছিল যে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির আর তাঁর বিখ্যাত বেগম নুরজাহান এখানে এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে।"

জোজো বলল, "এই নুরজাহানের নামেই তো তাজমহল বানানো হয়েছিল, তাই না?"

সন্তু বলল, "যাঃ! তাজমহল তো বানিয়েছেন শাহজাহান। তাঁর বেগম মমতাজ মহলের নামে। তুই ইতিহাসের কিচ্ছু জানিস না!"

জোজো বলল, "ওসব পুরনো কথা মুখস্থ করে কী লাভ! আমি জানি ভবিষ্যতের কথা। বল তো মঙ্গলগ্রহের জল তেতো না মিষ্টি?"

কাকাবাবু এবং কর্নেল দু'জনেই কৌতূহলের সঙ্গে তাকালেন জোজোর দিকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "মঙ্গলগ্রহে জল আছে বুঝি?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই আছে। দারুণ তেতো। নিমপাতার রসের মতো। তাই তো মানুষ মঙ্গলগ্রহে গিয়ে থাকতে পারবে কি না, তাই নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।"

সন্তু বলল, "মঙ্গলগ্রহে যদি জল থাকেও, তা তেতো না মিষ্টি, তা বোঝা যাবে কী করে? মানুষ তো এখনও মঙ্গলগ্রহে নামেনি?"

জোজো বলল, "মানুষকে খেয়ে দেখতে হবে কেন? কম্পিউটার বলে দিয়েছে। এখন তো কম্পিউটারই সব কিছু বলে দেয়!"

কর্নেল হেসে বললেন, "খুব ইন্টারেস্টিং! জোজোর কাছে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে হবে তো!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর কাছ থেকে এমন অনেক কিছু জানতে পারবেন, যা কোনও বইয়ে লেখা নেই!"

একটু পরে কর্নেল বললেন, "বাঘের তো সাড়াশব্দ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। চলুন, আমরা অন্য কোনও জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি। যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ভালই হয়। এখনই গেস্টহাউসে ফেরার ইচ্ছে নেই। কোথায় যাওয়া যায়?"

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা উজ্জয়িনী গিয়েছেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা তো প্রথমেই উজ্জয়িনী এসেছি। সেখানে একটা কাজ ছিল। তারপর এই মাণ্ডুতে তিন-চারদিন থেকে যাওয়া।"

কর্নেল বললেন, "আর এখানে সবচেয়ে নাম করা জায়গা হচ্ছে 'বাঘ গুহা'। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক দিন আগে আমি বাঘ গুহা দেখতেও গিয়েছিলাম। সন্তু আর জোজো দেখেনি। ওদের ভাল লাগতে পারে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "বাঘ গুহায় কি বাঘ আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, বাঘটাঘ নেই। ওখানে পরপর কয়েকটা গুহার মধ্যে ছবি আঁকা আছে, অনেক পুরনো জন্তুর। অজন্তা গুহার কথা জানো তো? সেইরকম, তবে অত বড় নয়, অত বেশিও নয়।"

সন্তু বলল, "ওই গুহার নাম বাঘ গুহা কেন?"

কর্নেল বললেন, "সেটা আমি বলতে পারি না। তবে ওখানে যে বাঘ থাকে না, সেটা একেবারে শিয়োর।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে তো বাঘকে কেউ বাঘ বলে না। হিন্দিতে বলে 'শের'। কর্নেল, ওখানে একটা ছোট নদীও আছে, সেটার নামও বাঘ নদী,আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই!"

জোজো বলল, "এখন থাকুক বা না থাকুক, একসময় নিশ্চয়ই ওখানে অনেক বাঘ ঘুরে বেড়াত। এখনও দু'-একটা থাকলেও থাকতে পারে।"

সন্তু বলল, "আগেকার দিনের বইয়ে লেখা হত 'ব্যাঘ্র'। সেটা সংস্কৃত, তাই না? তার থেকে বাংলায় হয়েছে বাঘ। কিন্তু হিন্দিতে 'শের' কী করে হল?"

কাকাবাবু বললেন, "অতশত তো জানি না। পরে জেনে নিতে হবে।"

জোজো বলল, "আমরা বাঘ গুহায় যাব। চলুন, চলুন!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু সে তো খুব কাছে নয়। আজ পৌঁছোব কী করে?"

কর্নেল বললেন, "আমি গাড়ি চালিয়ে আপনাদের নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই রাত্তিরে তো গুহার মধ্যে কিছু দেখা যাবে না। তবে এখন তিরিশ-পঁয়তিরিশ কিলোমিটার দূরে গেলে 'ধার' নামে একটা ছোট শহর পাওয়া যাবে। সেখানে হোটেলে টোটেলে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে দেখতে যাব বাঘ গুহা।"

জোজো বলল, "রাত্তিরে আমাদের গেস্টহাউসে ফেরা হবে না? তা হলে তো কিছু জামা-কাপড় নিতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো ঠিকই বলেছে। আমরা তো তৈরি হয়ে আসিনি। সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে নিতে হবে। কর্নেলসাহেব, খানিকক্ষণের জন্য গেস্টহাউসে ফিরে গেলে হয় না? খুব কি দেরি হয়ে যাবে?"

কর্নেল বললেন, "না, না, দেরির কী আছে? আমি সারারাতও গাড়ি চালাতে পারি। তবে আমার বিশেষ কিছু লাগে না। এই এক জামা-প্যান্টেই আমার তিন-চার দিন চলে যায়।"

গাড়ি ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরা হল। অন্য একটা রাস্তা, শর্টকার্ট হবে।

জামি মসজিদের কাছে এক জায়গায় দেখা গেল বেশ কিছু লোককে। তারা উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলাবলি করছে!

কর্নেল সেই ভিড়ের কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি থামালেন।

কর্নেলকে এখানে অনেকেই চেনে। গাড়ি দেখে ছুটে এসে কয়েকজন লোক চিৎকার করে এখানকার ভাষায় কী যেন বলতে লাগল।

কর্নেল কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "মনে হচ্ছে সত্যিই পালে বাঘ পড়েছে। নামুন, দেখা যাক, কী ব্যাপার।"

সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

রাস্তার একপাশে খানিকটা উঁচু-নিচু মাঠের মতন। তার মধ্যে একটা ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির সামনে আরও কিছু মানুষের জমায়েত হয়েছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে একটা কোনও প্রাণীর আর্ত চিৎকার।

রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে কর্নেলসাহেব সদলবলে হাজির হলেন সেই বাড়িটার কাছে। জনতা দু'ভাগ হয়ে তাঁর রাস্তা করে দিল।

একটা বড় ছাগল কিংবা ভেড়া মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, তার সারা গায়ে রক্ত।

সেটা একটা রামছাগল। শোনা গেল যে, বাঘ এসে ওটাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু অত বড় প্রাণীটাকে নিয়ে যেতে পারেনি। খানিকটা মাংস খুবলে নিয়েছে শুধু। পাশের খাঁচায় চারটে হাঁস ছিল, দুটো হাঁস নেই। ছাগলের বদলে হাঁস দুটোকেই নিয়ে গিয়েছে বাঘ।

তা হলে বাঘ যে এসেছিল,এবার তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কেউই বাঘটাকে চোখে দেখেনি। তিন-চারজন অবশ্য বলল, তারা বাঘের গর্জন শুনেছে, তারপরই লাঠিফাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের কথা কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে, তা বোঝা মুশকিল।

এই ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র আধঘণ্টা আগে।

দু'-তিনজন বলল, "বাঘটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। হাঁস খেয়ে কি তার পেট ভরবে? নিশ্চয়ই আবার রামছাগলটার মাংস খেতে আসবে। বাঘের তো সেরকমই স্বভাব।"

কাকাবাবু বললেন, "এত লোকজন দেখে আর বাঘ আসবে না। তার কি প্রাণের ভয় নেই? বাঘটা যখন এসেছিল, তখন রাস্তায় তো কোনও লোকই ছিল না নিশ্চয়ই!"

দু'-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, "ছিল স্যার। একজন চোর ছিল।"

কর্নেল বললেন, "তার মানে? চোর ছিল? তাকে কে দেখেছে?"

এবার কয়েকজন লোক কর্নেলদের নিয়ে গেল বাড়িটার ডান পাশে।

এখানে একটা মুদির দোকান। দরজায় তালা বন্ধ। কিন্তু পিছনের জানলা ভাঙা। সেই জানলা দিয়ে একটা চোর ঢুকেছিল ভিতরে। ক্যাশবাক্সে বেশ কিছু টাকা ছিল, চোর কিন্তু তা নিতে পারেনি। কয়েক প্যাকেট বিস্কুট আর দু'প্যাকেট গুঁড়ো দুধ নিয়েছে শুধু। ওইসব নিতে নিতেই বাঘটা এসে পড়ায় সে টাকাপয়সা না নিয়েই পালিয়েছে।

চোর আর বাঘ যে একই সময়ে এসেছিল, তা কী করে বোঝা গেল?

মুদিদোকানের মালিক এগিয়ে এসে বলল, "সাহেব, আমি নিজে সাতটার সময় দোকান বন্ধ করেছি। তখন সব ঠিক ছিল।"

আর-একজন বলল, "জানলা ভেঙে চোর ঢুকবে, আর টাকাপয়সা না নিয়ে পালাবে, তা কখনও হয়? নিশ্চয়ই সে সময়ই বাঘ এসে পড়ে, তাই সে ভয়ে পালিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিংবা চোরটাকে বাঘও দেখে ফেলে। তাই সেও ভয় পেয়ে রামছাগলটাকে পুরোপুরি খেতে পারেনি।"

জোজো বলল, "কিংবা চোর আসেনি, বাঘটাই কাচের জানলা ভেঙে মুদিখানার ভিতরে ঢুকেছে। বাঘের তো টাকাপয়সার দরকার নেই। তাই শুধু বিস্কুট আর দুধ নিয়েছে।"

সন্তু বলল, "রোজ মাংস খেয়ে খেয়ে বাঘের অরুচি হয়ে গিয়েছে। তাই একদিন দুধ আর বিস্কুট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।"

কর্নেল বললেন, "এখন আর এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। একটা সত্যিকারের বাঘ এসে ঢুকেছে এখানে। সে একটা ছাগল মেরেছে, এরপর মানুষও মারতে পারে। এর তো একটা ব্যবস্থা করতেই হয়।"

তিনি রাইফেলের নলটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে একবার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেন। সেই শব্দ কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়ে দিল সবাইকে।

রাইফেলটা নামিয়ে কর্নেল বললেন, "যদি কোনও কারণে বাঘটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকে, তা হলে এই শব্দ শুনে সে পালাবার চেষ্টা করবেই।"

সেরকম কিছু ঘটল না, বাঘের আর কোনও চিহ্ন নেই।

কর্নেল বললেন, "তা হলে আমাদের আর আজ রাত্তিরে বেরোনো হচ্ছে না। বাঘটাকে এই মাণ্ডু থেকে তাড়াবার একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আমারও কিছুটা দায়িত্ব আছে।"

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে আছেন। যেন কিছু একটা ব্যাপার তাঁর পছন্দ হচ্ছে না।

তবু তিনি বললেন, "তা ঠিক, আজ আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।"

জোজো হতাশভাবে বলল, "এখানকার একটা বাঘের জন্য আমাদের বাঘ গুহায় যাওয়া হবে না?"

এই সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে সেখানে থামল।

॥ ৩ ॥

এই অঞ্চলের পুলিশের বড়কর্তার নাম সুলতান আলম। তাঁর চেহারাটা দেখার মতো। ছ'ফুটের বেশি লম্বা, তেমনই স্বাস্থ্যবান, বেশ ফরসা গায়ের রং। তাঁর গোঁফটা কাকাবাবুর চেয়েও অনেক বেশি মোটা আর দু'দিকে সূচলো, মাথার চুল থাক থাক করা।

তাঁকে দেখলে ইতিহাস বইয়ের কোনও ছবির কথা মনে পড়ে।

তিনি কর্নেলসাহেবকে আগে থেকেই চেনেন। কাকাবাবুর নাম শোনার পর খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী? মানে, আপনি কি সেই রাজা রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "সেই মানে কী?"

সুলতান আলম বললেন, "আপনি আরকিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার খুব বড় অফিসার ছিলেন না একসময়?"

কাকাবাবু বললেন, "সে অনেক দিন আগেকার কথা।"

সুলতান আলম বললেন, "আপনার কি সেলিম রহমান নামে কাউকে মনে আছে? আপনার আন্ডারে কাজ করতেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। সে খুব আমুদে লোক ছিল আর ভাল গান গাইত।"

সুলতান বললেন, "সেই সেলিম রহমান আমার মামা। তাঁর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। আপনিই তো সম্রাট কনিষ্কর মুন্ডু খোঁজার জন্য কাশ্মীরের সোনমার্গ গিয়েছিলেন।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাকাবাবু ইজিপ্টের ফেমাস পিরামিডের মধ্যেও ঢুকেছিলেন।"

সন্তু চোখ দিয়ে জোজোকে বকুনি দেওয়ার চেষ্টা করল। কাকাবাবু এসব বলা পছন্দ করেন না।

সুলতান এবার কর্নেলের দিকে ফিরে বললেন, "কী কর্নেলসাহেব, কী দেখলেন এখানে? সত্যি সত্যি বাঘ এসেছিল?"

কর্নেল বললেন, "এখন আর অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না। একটা রামছাগলকে থাবা মেরেছে। দুটো হাঁসও নিয়ে গিয়েছে।"

জোজো বলল, "একটা চোরও এসেছিল। বিস্কুট আর দুধ চুরি করেছে।"

সুলতান একটু অবাক হয়ে বললেন, "চোর? চোরের সঙ্গে বাঘের কী সম্পর্ক?"

জোজো বলল, "চোর আর বাঘটা একসঙ্গে এসেছিল!"

এটাকে একটা হাসির কথা মনে করে পুলিশসাহেব হা হা করে হাসলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন বাড়িটার কাছে।

ছাগলটা এখনও ছটফট করছে আর প্রচণ্ড জোরে চ্যাঁচাচ্ছে। একটুক্ষণ সেটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, "এমনভাবে কামড়েছে, এ প্রাণীটা তো আর বাঁচবে না মনে হচ্ছে। শুধু শুধু আর একে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?"

কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে তিনি একবার মাত্র গুলি চালালেন। ছাগলটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

কয়েকজনের অনুরোধ শুনে সুলতান পাশের দোকানটাও দেখতে গেলেন। ভাঙা জানলা আর ভিতরের জিনিসপত্র ছড়ানো উঁকি মেরে দেখলেন শুধু। তারপর জনতাকে বললেন, "এখানে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে হল্লা করার দরকার নেই। এখনই দারোগাবাবু আসছেন আরও পুলিশ নিয়ে। তারা পাহারা দেবে। আপনারা ভয় পাবেন না, বাড়ি যান। সামান্য একটা বাঘ, কালকেই আমরা ওকে ধরে ফেলব।"

কাকাবাবুদের কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, "পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপারই না ঘটে। মাণ্ডুতে বাঘ? বুঝলেন, কর্নেল, আমি আগে বিশ্বাসই করিনি। আমার তো এখানে থাকার কথা নয়। আমি গতকালই এসেছি এক আত্মীয়র বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে। একজন যে-ই খবর দিল, অমনই আমি নিজের চোখে দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। এসব ব্যাপার নিয়ে তো আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। স্থানীয় পুলিশ ভার নেবে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকদের ডাকতে হবে। আমি এসেছি শুধু নিজের কৌতূহলে।"

কর্নেল বললেন, "এটা টুরিস্ট সিজন। বাঘের ভয়ে যদি সব টুরিস্ট পালিয়ে যায়, তা হলে কিন্তু লোকজনদের খুব ক্ষতি হবে। বাঘটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরে ফেলা দরকার।"

সুলতান বললেন, "ধরে ফেলাটা সহজ নয়। বরং মেরে ফেলা সহজ। কিন্তু বাঘ মারা যে এখন নিষেধ? আগে ধরারই চেষ্টা করতে হবে। সেটা বনবিভাগের দায়িত্ব।"

কর্নেল বললেন, "এ ব্যাপারে আমি বনবিভাগকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি বোধহয়।"

সুলতান বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার সঙ্গে যখন দেখাই হয়ে গেল, চলুন না, কোথাও বসে গল্প করি। এই কর্নেলের বাড়িতেই যাওয়া যেতে পারে। উনি খুব ভাল রান্না করেন, চটপট অনেক কিছু বানিয়ে ফেলতে পারেন। আপনার সঙ্গের ছেলে দুটিকে বরং ঘরে ফিরে যেতে বলুন। ওরা যদি ভয় পায়, আমার বডিগার্ড সঙ্গে যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। আপনারাই বরং আমাদের গেস্টহাউসে চলুন। আমি অন্য কোথাও গেলে আমাকে তো আবার পৌঁছে দিতে আসতে হবে কাউকে।"

একটু পরে সবাই চলে এলেন গেস্টহাউসে। বসা হল ডাইনিং রুমের একটা টেবিলে। বাইরেটা আজও অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে ঝরনার জলের শব্দ।

সুলতান আলম কাকাবাবুকে বললেন, "আপনাকে এই ছোট্ট জায়গায় দেখতে পাব, এটা আশাই করিনি। এখানেও কি কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছেন নাকি? খুব পুরনো জায়গা, কোথাও কোনও গুপ্তধন টুপ্তধন থাকতেও পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ওসব কিছু না। আমি এসেছিলাম উজ্জয়িনীতে একটা কাজে। আমার ভাইপো সন্তু আর তার বন্ধু জোজো আমার সঙ্গে অনেক জায়গায় যায়। তাই ভাবলাম, ওদের এই মাণ্ডু জায়গাটাও দেখিয়ে নিয়ে যাই। কয়েকদিন থাকার পক্ষে তো এটা খুব সুন্দর জায়গা।"

সুলতান বললেন, "তা ঠিক। উজ্জয়িনীতে আপনার কী কাজ ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও ঠিক কাজ বলা যায় না। আসল কারণটা শুনলে আপনারা হাসবেন।"

সন্তু আর জোজোর মুখে এর মধ্যেই হাসি ফুটে উঠেছে।

কর্নেল বললেন, "শুনি, শুনি, আসল কারণটা শুনি।"

কাকাবাবু বললেন, "উজ্জয়িনীতে আমার এক পিসিমা থাকেন। পিসেমশাই হাইকোর্টের জজ ছিলেন, মারা গিয়েছেন অনেক দিন। আর পিসিমাও ছিলেন

এক কলেজের অধ্যক্ষা, তাও রিটায়ার করেছেন বহু বছর আগে, এখনও নানারকম কাজটাজ করেন।”

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, “কী নাম আপনার পিসিমার?”

কাকাবাবু বললেন, “সুপ্রভা রায়। চেনেন?”

সুলতান ভুরু উঁচিয়ে বললেন, “কী বলছেন আপনি? সুপ্রভা রায়কে এ তল্লাটে কে না চেনে? সবাই তাঁকে ডাকে ‘বড়কাদিদি’। গরিব মানুষদের জন্য অনেক কিছু করেন, বস্তির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান। কত বয়স হবে এখন, এইট্টি ফাইভ? তবু সারাদিন ব্যস্ত। তবে মহিলার খুব কড়া মেজাজ। একবার আমাকেও ডেকে খুব ধমকে ছিলেন।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, আমার পিসিমা খুব মেজাজি মানুষ। তিনি একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন, ‘আমি আর কতদিন বাঁচব ঠিক নেই। রাজা, তোকে একবার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, তুই শিগগিরই এখানে চলে আয়। তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথাও আছে।’ সেই টেলিগ্রাম পেয়ে আমি ভাবলাম, সত্যিই তো পিসির অনেক বয়স হয়েছে, কখন কী হয় ঠিক নেই। একবার দেখা করাই উচিত। তাই চলে এলাম।”

সুলতান বললেন, “কিন্তু সুপ্রভা রায়ের তো কোনও অসুখবিসুখ করেনি? তিনদিন আগেও আমি দেখেছি, একটা বস্তির মধ্যে হেঁটে-হেঁটে ওষুধ বিলি করছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “আমিও এসে দেখলাম, পিসিমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। এই বয়সেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারেন। যাই হোক, তবু দেখা হয়ে গেল। এমনিতে তো আর এদিকে আসা হয় না। সন্তুদের এখন কলেজ ছুটি, ওরাও কোথাও বেড়াতে যেতে চাইছিল।”

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, “উনি আপনাকে জরুরি কথা কী বললেন?”

কাকাবাবু হেসে বললেন,“ সেটাও এমন কিছু জরুরি নয়। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হ্যাঁরে রাজা, তুই কি আর বিয়ে করবি না?’ আমি বললাম, ‘না পিসিমা, আমারও তো যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছে, আর আমি বিয়ের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না!’ তা শুনে পিসিমা বকুনি দিয়ে বললেন, ‘ঝঞ্ঝাট আবার কী? বিয়ে মানে কী ঝঞ্ঝাট! এই বয়সেও অনেকের বিয়ে হয়।’ ”

সুলতান বললেন, “ঠিকই তো বলেছেন বড়কাদিদি। আপনার বয়সে অনেক মানুষের বিয়ে হয়। বলুন, পাত্রী দেখব নাকি?”

কাকাবাবু বললেন, “মাথা খারাপ! ওসবের আর প্রশ্নই ওঠে না। যাই

হোক, খানিকক্ষণ বকাঝকার পর পিসিমা বললেন, 'শোন, আমার এই যে বাড়ি, বাগান, ব্যাঙ্কের সব টাকাপয়সা, এই সব আমি রামকৃষ্ণ মিশনের নামে উইল করে দিয়েছি। আমার ছেলেমেয়ে নেই, তোদেরও এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু কয়েকজনের নামে কয়েকটা জিনিস আমার কাছে আছে। যেমন, আমার শাশুড়িমা একটা খুব দামি হিরের আংটি আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা রাজার বিয়ের সময় তার বউকে দিবি।' সেই আংটিটা আমার কাছে রয়ে গিয়েছে। তুই বিয়ে করলি না, এখন সেই আংটি নিয়ে আমি কী করব? সেটা তোকে নিতে হবে।' আমি বললাম, 'পিসি, আমি তো আংটি পরি না। ওটা নিয়ে আমি কী করব? তুমি আংটিটাও দান করে দাও।' তাতে পিসি বললেন, 'আমার শাশুড়িমা তোর নাম করে রেখে গিয়েছেন। তা আমি কী করে অন্য লোককে দেব? ওটা তোকে নিতেই হবে!' জোর করে সেটা তিনি আমায় গছিয়ে দিলেন।"

কর্নেল বললেন, "তা হলে তো স্যার, ওই আংটির জন্যই আপনার একটা বিয়ে করে ফেলা উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "যা বলেছেন! ও আংটি আমি সন্তুকে দিয়ে দেব ঠিক করেছি!"

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "আমিও আংটি পরি না। আমি আংটি চাই না, আংটি চাই না!"

কর্নেল বললেন, "তুমি পরবে না। তোমার তো একসময় বিয়ে হবে, তোমার বউ পরবে!"

সন্তু তবু বলল, "না, আমি আংটিফাংটি চাই না।"

সুলতান বললেন, "এ যে দেখছি একটা আংটি-সমস্যা হয়ে গেল! যাই হোক, দামি আংটি বলছেন, সাবধানে রাখবেন। এখানে তো চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

কর্নেল বললেন, "আংটিটা চুরি গেলে 'আংটি-রহস্য' নামে বেশ একটা গল্প হয়ে যাবে।"

জোজো বলল, "আংটি-রহস্য নিয়ে সত্যজিৎ রায় গল্প লিখে ফেলেছেন। আর সে গল্প জমবে না।"

সুলতান বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, যখন এখানে এসেই পড়েছেন, তখন এই বাঘের রহস্যটা সমাধান করে দিন। শহরের মতো জায়গায় বাঘ ঢুকবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, এর মধ্যে আমি নেই। বাঘের রহস্য সমাধান করার ক্ষমতাই আমার নেই। বাংলায় একটা কথা আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা'। আমি সেধে সেধে সে ঘা করতে চাই না। আপনারাই কিছু করুন, আমরা গল্প শুনব।"

সুলতান বললেন, "আমার বাবা চারখানা বাঘ মেরেছিলেন। আমিও বাঘ শিকার করতে পারি। কিন্তু ফাঁদ পেতে বাঘ ধরা আমার দ্বারা হবে না। কাল আমি উজ্জয়িনী ফিরে যাচ্ছি। কর্নেলসাহেব যা করার করবেন।"

কর্নেল বললেন, "বাঘের কথাটা প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে নাকি এরকম একটা বাঘ ঢুকে পড়েছিল মাণ্ডুতে। সেবারে দু'জন মানুষকেও মেরেছিল। তাই এখানকার লোক বাঘের কথা শুনলেই এত ভয় পায়।"

সুলতান বললেন, "মাস দুয়েক আগে 'ধার' শহরেও একটা বাঘ এসেছিল নাকি। গুজব কি না জানি না। একটা মোষ আর একটা শুয়োর মেরেছিল। কিন্তু কেউ বাঘটাকে স্বচক্ষে দেখেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, ঘটনাটা আমারও কানে এসেছে। তবে তখন আমার গুজব বলেই মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, সেটাও সত্যি হতে পারে। এদিকে তো অনেক ছোট ছোট পাহাড় আর কিছু কিছু জঙ্গলও আছে। জন্তু-জানোয়ার অনেক কমে গিয়েছে, বড় জানোয়ার কিছু নেই-ই বলতে গেলে। তবু দু'-একটা বাঘ-ভালুক থেকে যেতেও পারে।"

সুলতান বললেন, "বাঘের দেখা না পাওয়া গেলেও ভালুক তো এখনও আছে যথেষ্ট। আমি নিজেও তিন-চারবার দেখেছি। বুনো ভালুক শহরে ঢোকে না। কিন্তু হাইওয়ের উপরে এসে পড়ে কখনও কখনও!"

কর্নেল বললেন, "জন্তু-জানোয়ার যে কখন কোথায় হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাবে, তার কোনও ঠিক নেই। আপনার মনে আছে, গতবছর ঠিক এই সময় উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের সামনে হঠাৎ একটা মস্ত বড় পাইথন ধরা পড়েছিল। অত বড় সাপটা ওখানে এল কী করে বলুন তো?"

সুলতান বললেন, "সাপ যে কোথায় কী করে ঢুকে পড়ে, তা বলা মুশকিল। একবার ইন্দোরে আমাদের বাড়ির বেডরুমে একটা সাপ দেখেছি!"

কর্নেল বললেন, "ছোটখাটো সাপ সুড়ুত করে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু অত বড় একটা পাইথন, কোথা থেকে এল, কেউ দেখতে পেল না?"

সুলতান বললেন, "আকাশ থেকে তো পড়েনি, নিশ্চয়ই শিপ্রা নদীর

পানিতে ভেসে এসেছে। খুব বন্যার সময় বাঘও ভেসে আসতে পারে।"

কর্নেল বললেন, "এখন তো সেরকম কোনও বন্যা হয়নি। তা ছাড়া, পাহাড়ের উপর দিকে তো বন্যা হতে পারে না, বন্যা হয় নীচের দিকে।"

সুলতান বললেন, "যাই হোক, দেখতে হবে, এই বাঘটা যাতে মানুষ না মারে। মানুষ মারলেই খবরের কাগজে হইচই পড়ে যাবে!"

একটু পরে আড্ডা ভঙ্গ হল।

কর্নেল আর সুলতান আলম চলে যাওয়ার পর মান্টো সিংহ এসে বলল, "সাহাব, আজ অনেক দোকান বন্ধ ছিল, তাই মুরগি পাওয়া যায়নি। আপনাদের আজ নিরামিষ খেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কোনও আপত্তি নেই। বেগুন আছে তো? বেগুনভাজা করে দাও!"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আন্ডা হ্যায় তো? অমলেট করকে দেও।"

মান্টো সিংহ বলল, "আন্ডা ভি নেহি। আলুভাজা হবে।"

জোজো বলল, "বাঘটা তো মহাপাজি! ওর জন্য আমাদের নিরামিষ খেতে হবে? আর ও নিজে দিব্যি হাঁসের মাংস খাবে?"

সন্তু বলল, "আমাদের কী সুবিধে বল তো! আমরা নিরামিষও খেতে পারি, আবার মাছ-মাংসও ভাল লাগে। বাঘ-সিংহরা নিরামিষ খেতে জানেই না!"

পরদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। সূর্য দেখাই গেল না। বৃষ্টি কখনও বেশ জোরে, কখনও টিপিটিপি। দুপুরবেলা কিছুক্ষণের জন্য থামলেও আবার শুরু হল ঝমঝমিয়ে।

এরকম বৃষ্টিতে বাইরে বেরোনোই যায় না। কাকাবাবু বই পড়েই কাটিয়ে দিলেন সারাদিন। সন্তু আর জোজো অনেকটা সময়ই বসে রইল জানলার ধারে। বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে খাদের উলটো দিকের পাহাড়টা।

নির্মল আর জয়ন্তী রায়দের আজ ফিরে যাওয়ার কথা। একটা গাড়ি ভাড়া করা আছে। কিন্তু সেই গাড়িটা আসছে না। ওঁরা ছটফট করছেন। টিটো সেজেগুজে একেবারে রেডি। সে সন্তু আর জোজোর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "বৃষ্টির সময় বাঘেরা কী করে?"

সন্তু বলল, "বৃষ্টিতে ভিজলেই বাঘেদের সর্দি হয়। তাই ওরা গুহার মধ্যে বসে থাকে।"

জোজো বলল, "বসে থাকে না, শুয়ে থাকে। গান গায়।"

চোখ বড় বড় করে টিটো জিজ্ঞেস করল, "বাঘেরা গান করতে পারে?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। আমি শুনেছি। আমি ওদের একটা গান জানি। শুনবে?"

টিটো লাফাতে লাফাতে বলল, "শুনব, শুনব!"

জোজো সুর করে গাইতে লাগল,

"হালুম হুম হা গোঁ গোঁ গোঁ
ঘ্যারর ঘ্যার ঘ্যার ওয়াম হোঁ হোঁ
হালুম হুম হা..."

এই সময় ভাড়ার গাড়িটা এসে গেল। বৃষ্টি এখনও পড়ছে।

টিটো কিন্তু এখন আর যেতে চায় না। সে বাঘের গান আরও শুনবে। সে জোজোকে আঁকড়ে ধরে রইল। শেষ পর্যন্ত তাকে জোর করেই তোলা হল গাড়িতে।

ওরা চলে যাওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জোজো, তুই বাঘের এই গানটা এইমাত্র বানালি? না, আগেই তৈরি ছিল?"

জোজো বলল, "এইমাত্র বানালুম!"

সন্তু বলল, "সুরটুর দিয়ে? সত্যি, এটা তোর অদ্ভুত ক্ষমতা। তোর গল্পগুলোও।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "গল্প নয়। আমি যা বলি, তা সব সত্যি ঘটনা।"

সন্ধের পর কর্নেলসাহেব কাকাবাবুকে ফোন করে বললেন, "আজ সারাদিন বেরোননি তো? বেরোবেন কী করে? পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানোও ডেঞ্জারাস। আমিও তাই বেরোইনি। তবে, আজ সারাদিন এখানে কী ঘটেছে, তা শুনেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, শুনিনি। মান্টো সিংহকে অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। কিছু ঘটেছে নাকি?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। এই বৃষ্টির মধ্যেও বাঘটা বেরিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? কেউ দেখেছে?"

কর্নেল বলল, "পুলিশের খবর অনুযায়ী, দু'জন দেখেছে। বাঘটা একটা খামারবাড়িতে ঢুকে একটা মোষকে অ্যাটাক করেছিল। মোষটা বাঁধা ছিল,

বেশ বড় মোষ, তারও তো গায়ে বেশ জোর, বাঘটা তাকে মারতে পারেনি, খানিকটা মাংস খুবলে নিয়েছে। সে-বাড়ির মালিক উপরের জানলা দিয়ে বাঘটাকে দেখতে পেয়েও ভয়ে নীচে নামেনি। কাছাকাছি আরও একটা বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে বাঘটা একটা বাছুরকে মেরেছে। সেখানে একজন বুড়ি তখন গোয়ালঘরেই ছিল, সে আহত হয়েছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বুড়িকেও কামড়েছে নাকি?"

কর্নেল বললেন, "না। আপনি তো জানেন, এদিককার বাঘ ম্যানইটার হয় না। সাধারণত মানুষকে অ্যাটাকও করে না। বুড়িটা হয়তো অত সামনাসামনি বাঘ দেখে ভয়ের চোটেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। পড়ে গিয়ে তার মাথায় চোট লেগেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা হওয়াই সম্ভব।"

কর্নেল বললেন, "আজও একটা দোকানঘর ভেঙে চুরি হয়েছে। কিন্তু চোর টাকাপয়সা কিছু নেয়নি। নিয়েছে বিস্কুট আর গুঁড়ো দুধের টিন।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? বাঘের চেয়ে এই চোরটাই দেখছি বেশি ইন্টারেস্টিং। বাঘ জন্তু-জানোয়ার মারবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটা চোর টাকাপয়সা খোঁজে না, শুধু দু'-এক প্যাকেট বিস্কুট আর দুধ চুরি করে। এ কি কেউ কখনও শুনেছে? আর এই চোর কি বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়?"

কর্নেল বললেন, "সত্যি, এ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। শুনুন, সেই বুড়ি বলেছে, বাঘ একটা নয়, দুটো।"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ? এর মধ্যে আবার বেড়ে গেল?"

কর্নেল বললেন, "বুড়ির কথা কতটা বিশ্বাস করা যায়, জানি না। ভয়ের চোটে চোখে ডাব্‌ল দেখতে পারে। তবে বুড়ি জোর দিয়ে বলেছে, একটা বড় বাঘ, তার সঙ্গে একটা ছোট বাঘ। তার মানে বাঘের সঙ্গে তার বাচ্চা। বাঘ কি তার বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ে এসে হামলা করে? নাকি বাচ্চাকে বাড়িতে রেখে আসে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বাঘ সম্পর্কে অতশত জানি না। বাঘের বাড়ি কীরকম হয়, তাও দেখিনি।"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, শুনুন স্যার। এখানকার বনবিভাগের এক অফিসারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সামনের পাহাড়টায় একবার তল্লাশ করতে যাব, সম্ভবত বাঘটা ওখানেই ডেরা বেঁধেছে। আপনারা সঙ্গে যেতে চান?"

কাকাবাবু বললেন, "অবশ্যই যেতে চাই। আজ রাত্তিরেই যাওয়া হবে?"

কর্নেল বললেন, "না। এখন গিয়ে লাভ নেই। বৃষ্টি থেমে আসছে। খুব ভোরবেলা বেরোব। আপনাদের আমার গাড়িতে তুলে নেব। তা হলে ছেলে দুটোকে বলুন। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে।"

॥ ৪ ॥

এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। ঠিক যেন একটা পাতলা চাদরের মতো অন্ধকার গুটিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। জেগে উঠছে পাখিরা। কতরকম ডাক তাদের। ছোট্ট ছোট্ট পাখিগুলো কী জোর শিস দিতে পারে।

একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে গাছপালা। কাল সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে গাছগুলো আজ একেবারে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

একটাই রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের উপরের দিকে। পরপর দুটো গাড়ি, সামনেরটা কর্নেলের, পিছনের জিপটা বনবিভাগের। ফরেস্ট রেঞ্জার ত্রিলোক সিংহ উঠেছেন কর্নেলের গাড়িতে। ওঁর জন্ম জলপাইগুড়িতে, তাই ভালই বলতে পারেন বাংলা।

খানিকটা উপরে উঠে দেখা গেল, আকাশ একেবারে নীল, একটুও মেঘ নেই, পুব দিকে লাল রঙের ছোপ ধরেছে। এখনই সূর্য উঠবে।

জোজো বলল, "ওঃ, কতদিন সানরাইজ দেখিনি। হাউ বিউটিফুল!"

সন্তু বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, এখনও তো সানরাইজ হয়নি। আগেই বিউটিফুল বলে ফেললি?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি, অনেক দিন সূর্যোদয় দেখা হয়নি। কর্নেল, গাড়িটা একটু দাঁড় করান। ভাল করে দেখি।"

অনেক দূরেও একটা পাহাড়ের ঢেউ। তার আড়াল থেকে উঠে আসছে প্রথম সূর্যের ছটা। সমস্ত গাছের পাতায় এখন লাল রঙের আভা। প্রতি মিনিটে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে সব কিছু।

অনেক দূরে পিয়াও পিয়াও করে ডেকে উঠল একটা ময়ূর।

কর্নেল বললেন, "ঝরনাটার কাছে কয়েকটা গুহামতো আছে। ওই দিকটায় আগে খোঁজ করতে হবে। বাঘটা দিনেরবেলা ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "কর্নেলসাহেব, আমরা জঙ্গলে এসে শুধু জন্তু-জানোয়ার খুঁজি। প্রত্যেক জঙ্গলের যে নিজস্ব রূপ আছে, তা আমাদের চোখেই পড়ে না।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "স্যার, আজ বোধহয় আমাদের শুধু জঙ্গলের রূপ দেখেই ফিরে যেতে হবে। বাঘ দেখার কোনও আশা নেই।"

কর্নেল বললেন, "সে কী মশাই, আপনি আগেই এই কথা বলছেন কেন?"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "আমি এখানে তিন বছরের জন্য পোস্টেড। এই তিন বছরে কখনও এদিকের কোনও জঙ্গলে বাঘ দেখিনি। বাঘের কথা শুনিওনি। মাঝে মাঝে গুজব ওঠে অবশ্য, তার কোনওটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি। আমার দৃঢ় ধারণা, এ অঞ্চলে কোনও বাঘ নেই। মাণ্ডু শহরে বাঘ ঢুকেছে বলে এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

কর্নেল বললেন, "এখন তো আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই। পরপর দু'দিন বাঘ হানা দিয়েছে, কয়েকটা জন্তু মেরেছে। বাঘ তো শিকারের খোঁজে বহু দূর দূর পর্যন্ত চলে যায়। এক জঙ্গল থেকে আর-এক জঙ্গলে চলে আসে, তাই না! হয়তো সেই রকমই এই বাঘটা অনেক দূর থেকে এসে পড়েছে।"

জোজো বলল, "আমাদের সুন্দরবনে বাঘেরা নদী সাঁতরে ওদিকের বাংলাদেশে চলে যায়। ওদিকেও একটা সুন্দরবন আছে। বাঘ তো সীমান্তটিমান্ত কিছু মানে না!"

ত্রিলোচন সিংহ তবু বললেন, "আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারব না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কী মনে হয় জানেন? ওই যে রহস্যময় চোর, তাকে ধরে ফেলতে পারলে তার কাছ থেকে বাঘটার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "চোর ধরা পুলিশের কাজ। আমাদের সেটা কাজ নয়। আমাদের কারবার বুনো জন্তু-জানোয়ার নিয়ে।"

কর্নেল কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এ কথাটা কেন বলছেন? চোরের সঙ্গে বাঘের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

কাকাবাবু বললেন, "সম্পর্ক থাকবেই, তা আমি বলছি না। তবে, যেখানেই বাঘ, সেখানেই চোর, এটা শুনে আমার মানিকরামের ঘটনা মনে পড়ছে। আপনি জানেন সে ঘটনা? বছর দুয়েক আগে, আমাদের কলকাতার

কাছে সল্টলেকে আর উলটোডাঙায় হঠাৎ খুব চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছিল। রহস্যময় চুরি। ফ্ল্যাটবাড়ির আটতলা, দশতলা। সেই সব ঘর থেকেও চুরি। দরজা বন্ধ, তবু। গরমকালে অনেকেই জানলা কিংবা বারান্দার দরজা খুলে রাখে। অত উঁচুতে তো চোর উঠতে পারে না। তবু চুরি হতে লাগল। টাকাপয়সা, গয়না। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল, চোর একটা বাঁদর। সে পাইপ বেয়ে উপরে উঠে আসে। তারপর কোনও দরজা বা জানলা খোলা পেলে ঢুকে পড়ে। কোনও শব্দও হয় না।"

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "বাঁদর? সে গয়না কিংবা টাকাপয়সা নেবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই হচ্ছে কথা। ওই বাঁদরটার নামই মানিকরাম। আসলে ওটা একটা পোষা বাঁদর। যে-লোকটা পুষেছে, সে বাঁদরটাকে ট্রেনিং দিয়েছে টাকাপয়সা, গয়না চুরি করার।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "তার মানে, আপনি কী বলতে চান, একজন কেউ একটা বাঘ পুষেছে, আর তাকে দিয়ে চুরি করাচ্ছে? অত সোজা নয়। আজ পর্যন্ত কেউ বাঘ পুষতে পারেনি। আর বাঘ কখনও চুরি করতে শিখবেও না। মানুষই চুরি করে, বাঘ চুরিটুরির ধার ধারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ কেন চুরি করবে? চোরটা বাঘ নিয়ে গিয়ে মানুষদের ভয় দেখায়, তারপর নিজেই চুরি করে।"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু এত সব কাণ্ড করে চোরটা শুধু দু'-এক প্যাকেট বিস্কুট আর দুধ নেবে, টাকাপয়সা ছোঁবে না! এ কি চোর না সাধু?"

এবার কাকাবাবু নিজেই হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "এই ধাঁধাটার উত্তর আমি এখনও জানি না। নিশ্চয়ই একটা কিছু উত্তর আছে।"

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করা হল জঙ্গলে। বাঘের কোনও নামগন্ধ নেই। চোখে পড়ল দু'-চারটে খরগোশ আর ময়ূর। এক জায়গায় একদঙ্গল বাঁদর। তারা মনের সুখে লাফালাফি করছে।

ঝরনাটার কাছে গাড়ি থেকে নেমে দেখা হল ভাল করে। সেখানে গুহা ঠিক নেই, কয়েকটা বড় বড় পাথর, মাঝে একটু-একটু ফাঁক। কিছু নেই সেখানে।

ক্রমশ রোদ চড়া হচ্ছে।

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "এবার বোধহয় আমাদের ফিরতে হবে। বেশি রোদে কোনও প্রাণীই বেরোতে চায় না। আর ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, ফেরাই উচিত। আমার কাজের লোক ফ্লাস্কে চা আর

স্যান্ডউইচ দিয়ে দিয়েছে। কোনও একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ফাঁকা জায়গা দেখে থামুন।"

কর্নেল গাড়িটা আস্তে আস্তে চালিয়ে ফাঁকা জায়গা খুঁজছেন, হঠাৎ সামনের রাস্তায় তিড়িং তিড়িং করে দু'বার লাফিয়ে একটা হরিণ এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল।

ত্রিলোচন সিংহ উত্তেজিতভাবে বললেন," দেখলেন, দেখলেন, একটা হরিণ!"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, দেখলাম তো সবাই।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "এই জঙ্গলে হরিণ আছে। তার মানে বাঘের খাবার আছে। বাঘ তা হলে হরিণ না মেরে শহরে ঢুকে ছাগল-মোষ মারার ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? এটা তো বাঘের স্বভাব নয়?"

কর্নেল বললেন, "একটা কারণ থাকতে পারে। যদি বাঘটা বুড়ো হয় কিংবা আহত হয়, তা হলে আর হরিণের সঙ্গে দৌড়ে পারে না। তখন দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা জন্তু-জানোয়ার মারাই তো ওদের পক্ষে সহজ!"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "বুড়ো বাঘ যদি মানুষের কাছাকাছি যায়, তা হলে মানুষ আর কতদিন তাকে ভয় পাবে? মানুষই একদিন তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। তখন আর আমাদের কিছু করার থাকবে না।"

স্যান্ডউইচের প্যাকেটটা খুলে কাকাবাবু বললেন, "এ তো দেখছি অনেক খাবার। পিছনের গাড়ির লোকদেরও ডাকুন। ওরাও খাবে।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "ওরাও নিজেদের খাবার এনেছে। পুরি আর ভাজি। ওদের ডাকার দরকার নেই।"

গাড়িটা থেমেছে সুন্দর জায়গায়। সামনে অনেকখানি খাদ। তারপর নীচে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা। খানিক দূরে রুপোলি রঙের নর্মদা নদী।

সবাই নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। সন্তু আর জোজো লাফিয়ে-লাফিয়ে একটা গাছের ডাল ছোঁওয়ার চেষ্টা করছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাকাবাবু ত্রিলোচন সিংহকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা যে ফাঁদ পেতে বাঘ ধরেন শুনেছি, সেটা ঠিক কী ব্যাপার? মাটিতে গর্ত করতে হয়?"

ত্রিলোচন বললেন, "না, না, ওসবের দরকার হয় না। বাঘটাকে একবার স্পট করতে পারলে আমরা কাছাকাছি কোথাও ওয়েট করি। দলে তিন-চারজন থাকলে ভয়ের কিছু থাকে না। দলের একজন শুয়োরের ডাক নকল

করে ডাকতে পারে। তাই শুনে বাঘটা কাছে এলেই তার উপর জাল ছুড়ে দেওয়া হয়। সেই জালে আটকা পড়লেই বাঘ কাবু হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "যদি জালটা ঠিকমতো বাঘের গায়ে না পড়ে?"

ত্রিলোচন বললেন, "ওই গাড়িতে আছে সুরজমল নামে একজন, সে দারুণ এক্সপার্ট। সুরজমল কখনও মিস করে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এইভাবে আপনারা ক'টা বাঘ ধরেছেন?"

ত্রিলোচন হেসে বললেন, "বললাম না, তিন বছরে এখানে একটাও বাঘ দেখিনি। ধরব কী? তবে, যখন আমি চিত্রকূটে পোস্টেড ছিলাম, সেখানে একটা লেপার্ড ধরেছি, সেটা দারুণ হিংস্র ছিল। এই সুরজমলও ওখানে ছিল তখন, আমার সঙ্গে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘটা ধরার পর কী করেন?"

ত্রিলোচন বললেন, "জালে বেঁধে ওকে গাড়ির মাথায় তোলা হয়। তারপর সোজা চিড়িয়াখানায়।"

কর্নেল খাদের ধার দিয়ে হাঁটছিলেন, এবারে কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কীসের আওয়াজ?"

কর্নেল বললেন, "কেউ যেন চিৎকার করছে। মানুষের গলা।"

কাকাবাবু কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করে বললেন, "আমি শুনতে পাচ্ছি না। কোন দিক দিয়ে আসছে আওয়াজটা?"

কর্নেল বললেন, "ওই খাদের তলা থেকে। কোনও মানুষ নীচে পড়েটড়ে গিয়েছে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "চলুন, দেখা যাক।"

সবাই মিলে খাদের ধারে এসে উঁকি দিলেন।

কর্নেল ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এই দিকে আসুন। এখানে শোনা যাচ্ছে।"

ডান দিকে আরও খানিকটা এগোনোর পর আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হল। কেউ যেন কাঁদছে।

একটা সরু পায়েহাঁটা রাস্তা নেমে গিয়েছে খাদের নীচের দিকে। এখানে খাদটা খুব গভীর নয়, খানিকটা নীচেই কিছুটা সমতল জায়গা, সেখানে কয়েকটা বড় বড় গাছ।

সন্তু সেই রাস্তাটা দিয়ে নেমে গেল। উপর থেকে সবাই দেখছে।

সন্তু এক জায়গায় থেমে একটা হাত তুলে বলল, "আওয়াজটা আসছে ওই বড় গাছটা থেকে। ওখানে কেউ বসে আছে।"

এবার কর্নেল আর ত্রিলোচন সিংহও নেমে গেলেন সেদিকে। কাকাবাবুর পক্ষে ঢালু রাস্তায় নামা মুশকিল, তবু তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে নামতে লাগলেন কষ্ট করে।

বড় গাছটায় অনেক ডালপালা, ওপরের দিকটা পাতায় ঢাকা। সেই গাছের তলা পর্যন্ত গিয়ে সন্তু বলল, "এখন দেখতে পাচ্ছি। একটা ছেলে বসে আছে ওখানে।"

এবার সে আরও জোরে কেঁদে উঠে কী যেন বলতে লাগল। তার ভাষা বোঝা যাচ্ছে না।

ত্রিলোচন সিংহ গাছের তলায় গিয়ে তাকে কী সব জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর কাকাবাবুদের দিকে ফিরে বললেন, "ছেলেটা একটা অদ্ভুত কথা বলছে। ও নাকি একটা শেরের প্রায় সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি গাছে উঠে গিয়েছে। এখন ভয়ে নামতে পারছে না।"

এতক্ষণ জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে বাঘের লেজও দেখা যায়নি। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, বাঘ এখানে নেই। এখন ছেলেটা বলছে...ও কী দেখতে কী দেখেছে কে জানে!

কর্নেল চেঁচিয়ে বলল, "উতরো, উতরো। ডর নেহি। মেরে পাস রাইফেল হ্যায়।"

এবারে ছেলেটা প্রায় সরসর করে নেমে এল নীচে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স, রোগা, কালো চেহারা, শুধু একটা নেংটি পরা, খালি গা।

জোজো কাকাবাবুকে বলল, "ছেলেটা এই জঙ্গলে একা একা ঢুকেছে। ওর সাহস তো কম নয়!"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝতেই তো পারছ, ওরা খুব গরিব। শুকনো কাঠ কুড়োতে জঙ্গলে আসে। সেই কাঠ বিক্রি করে ওরা চাল-ডাল কেনে। সাহস না থাকলে ওরা বাঁচবে কী করে?"

কর্নেল ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কোথায় শের দেখেছিস?"

ছেলেটার মুখ এখনও ভয়ে শুকিয়ে আছে। সে একদিকে হাত দেখাল। সেটা ফাঁকা জায়গা।

এখানে গুহাটুহাও কিছু নেই। শুধু একটা বড় গাছ ঝড়ে উলটে পড়ে আছে একদিকে।

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "আমরা এত চেষ্টা করেও শের দেখতে পেলাম না। আর তুই দেখে ফেললি? শুয়োরটুয়োর কিছু দেখিসনি তো?"

সন্তু বলল, "কাল অত বৃষ্টি হয়েছে, বাঘ এলে তো পায়ের ছাপ থাকবে।"

কর্নেল বললেন, "সবই তো পাথর, এখানে আর পায়ের ছাপ পড়বে কী করে?"

পাথর হলেও এক জায়গায় কিছু ঘাসও আছে। সেখানে পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কি না, সন্তু তা দেখতে লাগল উবু হয়ে।

ত্রিলোচন সিংহ ছেলেটিকে বললেন, "চল আমাদের সঙ্গে। আজ আর তোকে কাঠ কুড়োতে হবে না। আমি তোকে অন্য কাজ দেব।"

হঠাৎ শোনা গেল বুক কাঁপানো বাঘের গর্জন। ভেঙে পড়া গাছটার আড়াল থেকে একলাফে চলে এল একটা বাঘ। সত্যিকারের বাঘ।

সরু রাস্তাটা দিয়ে কাকাবাবু পুরোটা নীচে নামেননি। দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে। জোজো তাঁর পাশে। ত্রিলোচন সিংহ সবেমাত্র কাঠ-কুড়োনো ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছেন, আর একটু নীচে কর্নেল, আর সন্তু বসে আছে সেই ঘাসের পাশে।

এই সময় বাঘের আবির্ভাব।

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য ছবির মতন চুপ। কে কী করবে বুঝতে পারছেন না।

ত্রিলোচন সিংহ ফিসফিস করে বললেন, "এ তো একটা বেশ বড় বাঘ। না, বাঘিনি, বুড়ি হয়ে গিয়েছে। এরা খুব হিংস্র হয়। মানুষকে অ্যাটাক করতে পারে।"

বাঘিনিটা থাবা গেড়ে বসে গর-র গর-র করছে। এত মানুষজন দেখে ভয় পাওয়ার বদলে সে বোধহয় বিরক্ত হয়েছে খুব। তার খুব কাছে সন্তু।

ত্রিলোচন সিংহ এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "সুরজমল, জালটা নিয়ে এসো। জালটা।"

বনবিভাগের লোকরা দাঁড়িয়ে আছে খাদের ওপারে।

সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাঘিনিটা লাফ দিল তার দিকে। সন্তুর ঘাড়ে যদি সে পড়ত, তা হলে আর তার রক্ষে ছিল না। কিন্তু ঠিক সময়ে সন্তুও সরে গিয়েছে অন্য দিকে।

ত্রিলোচন সিংহ এবার আরও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "কর্নেলসাহেব, মারুন, ওকে মারুন।"

কর্নেল এর মধ্যে রাইফেল তাক করেছেন। গুলি চালালেন ঠিক দু'বার।

বাঘিনিটা প্রচণ্ড গর্জন করে দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল একবার, কিন্তু আর লাফাতে পারল না। ধপ করে পড়ে গিয়ে কাঁপল কয়েকবার, ঘোলাটে হয়ে গেল চোখ। তারপর একেবারে নিঃস্পন্দ।

জোজো বলে উঠল, "শেষ? খতম।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "স্যার, আপনার হাতের টিপ তো দারুণ। ঠিক সময় মেরে ফেলেছেন। নইলে, সন্তু ছেলেটিকে বাঁচানো যেত না।"

রাইফেলের নলের ডগায় ফুঁ দিতে দিতে কর্নেল গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি জীবজন্তু মারা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এবারও মারিনি। মিস্টার সিংহ, যে-জিনিস আপনাদের কাছে থাকা উচিত ছিল, তা আমি নিজের কাছে রাখি। ঘুমের বুলেট। বাঘিনিটা মরেনি, দু'-তিন ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত, ও অজ্ঞানের মতো ঘুমোবে।"

সন্তু নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, "ঘুমোচ্ছে?"

কর্নেল বললেন, "কাছে গিয়ে দেখো, নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে কি না! আই অ্যাম শিয়োর, ও ঘুমোচ্ছে।"

জোজো চেঁচিয়ে বলল, "সন্তু, এদিকে চলে আয়।"

সন্তু তবু বাঘিনিটার কাছে গিয়ে নাকে হাত নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, নিশ্বাস পড়ছে।"

ত্রিলোচন সিংহ বললেন, "উফ, যদি গুলি চালাতে একটু দেরি হত...ভাবতেও এখনও ভয় করছে।"

কর্নেল বললেন, "আমরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। বাঘ নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করা উচিত হয়নি। জঙ্গলে সব সময় সাবধানে থাকতে হয়। আমরা ওই কাঠুরে ছেলেটার কথা বিশ্বাস করিনি। এখনই বাঘিনিটাকে জালে বেঁধে গাড়িতে তোলো।"

কাকাবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওদিকের ঝোপটা নড়ছে! সাবধান, সাবধান!"

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

সেই ঝোপটা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা-বাঘ। কয়েক লাফে সে চলে এল বাঘিনিটার কাছে। সন্তুই এখনও সবচেয়ে কাছে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তুর উপরে।

কাকাবাবু বললেন, "কর্নেল, গুলি করবেন না। গুলি করবেন না।"

সন্তু এক ঝটকায় বাচ্চা-বাঘটাকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর সে-ও খুব অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী! এটা তো বাঘ নয়!"

এবারে বোঝা গেল, বাচ্চা-বাঘটা সত্যিই বাঘ নয়। একটা ছেলে। তার গায়ে বাঘের চামড়া জড়ানো। এখন মুখটা বেরিয়ে এসেছে। একটা দশ-বারো বছরের ছেলের মুখ।

ঠিক বাঘেরই মতন গরগর করে সে আবার উঠে সন্তুর একটা হাত কামড়ে ধরল। সন্তু এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমায় কামড়াচ্ছিস? এবার আমিও মারব কিন্তু!"

কর্নেল কাছে গিয়ে বাঘের বাচ্চা নয়, মানুষের বাচ্চাটাকে এক চড় কষিয়ে বললেন, "অ্যাই, তুই কে রে?"

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, "মনে হচ্ছে, এই সেই বিস্কুট-চোর!"

॥ ৫ ॥

বাঘিনিটা সত্যিই বাঘিনি। তার একটা পা খোঁড়া। বয়সও হয়েছে যথেষ্ট। দৌড়ে জঙ্গলের প্রাণী ধরার ক্ষমতা আর নেই বলেই সে মানুষের বসতিতে হানা দিতে শুরু করেছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে জালে বেঁধে বনবিভাগের লোকেরা নিয়ে চলে গেল। কোনও চিড়িয়াখানায় চালান করে দেওয়া হবে।

কিন্তু মানুষের বাচ্চাটাকে রাখা হবে কোথায়?

ছেলেটা ওই বাঘিনির সঙ্গে থাকত কী করে?

ছেলেটার হাতের নখ, পায়ের নখ বড় বড়। বেশ ধারালো। মাথার চুল ধুলো-ময়লা মাখা। জামা-প্যান্ট কিছুই পরা নেই, শুধু একটা বাঘের ছাল জড়ানো ছিল গায়ে। কোনও কথা বোঝে না, কথা বলতেও পারে না, শুধু গ-র-র গ-র-র আওয়াজ করে। চোখের দৃষ্টিও হিংস্র বুনো জন্তুর মতো।

কিন্তু জন্তু তো নয়, দশ-এগারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে।

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ-সিংহদের একটা গুণের কথা শোনা গিয়েছে। তারা বাচ্চা-ছেলেমেয়েদের কখনও মারে না। সম্ভবত খুব ছোট বয়সে এই ছেলেটা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল, এই বাঘিনিটা ওকে নিজের সন্তানের মতন লালন-পালন করে। আগেও এরকম দু'-একটা ঘটনার কথা

কাগজে পড়েছি। তখন ঠিক বিশ্বাস করিনি। এখন দেখছি, এরকম সত্যিই হতে পারে।"

কর্নেল বললেন, "পৃথিবীতে কিছু কিছু এরকম ব্যাপার এখনও আছে, যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কত মানুষ কুকুর-বিড়াল পোষে, বাঘ-ভাল্লুকও পোষার চেষ্টা করে। এখন দেখছি, বাঘও পুষেছে একটা মানুষের বাচ্চাকে।"

ছেলেটা এখন গেস্টহাউসে কাকাবাবুর ঘরে ঘুমোচ্ছে।

বনবিভাগের লোকেরা বলে দিয়েছে, তারা ওর দায়িত্ব নিতে পারবে না। সেটা ওদের কাজ নয়।

পুলিশ বলেছে, ছেলেটা তো ক্রিমিনাল নয়। ওকে জেলে ভরে রাখা যাবে না। যতদিন না ওর বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়, ততদিন ওকে কোনও অনাথআশ্রমে রাখা যেতে পারে।

মাণ্ডুতে কোনও অনাথআশ্রম নেই। ওকে পাঠাতে হবে উজ্জয়িনী কিংবা ভোপালে। তার জন্যও সময় লাগবে, আগে খোঁজখবর নিতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, "যতদিন না কিছু ব্যবস্থা হয়, ও আমাদের কাছেই থাক।"

অনাথআশ্রমে পাঠানোর ব্যাপারেও কাকাবাবুর খুব আপত্তি আছে। সেখানে পাঠালে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। ও কারও কথা বুঝবে না, নিজেও কিছু বোঝাতে পারবে না। ওর স্বভাবটাও হিংস্র। কেউ ওকে বিরক্ত করলে ও আঁচড়ে-কামড়ে দেবে, তখন অন্যরা ওকে মারবে, মারতে মারতে মেরেও ফেলতে পারে।

ছেলেটা সন্তুকে আঁচড়েও দিয়েছে, কামড়েও দিয়েছে। অতটুকু ছেলে, কিন্তু ওর গায়ে বেশ জোর। কিন্তু সন্তুর সঙ্গে পারবে কেন! একটুক্ষণের মধ্যেই সন্তু ওকে মাটিতে চিত করে ফেলে হাত দুটো চেপে ধরেছিল। তখনও গর্জন করছিল রাগে। তারপর কিছুক্ষণের জন্য ওকে বেঁধে রাখা হয়।

এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই খুলে দেওয়া হয়েছে বাঁধন।

ছেলেটা বোধহয় ভেবেছিল, গুলি করে বাঘিনিটাকে মেরেই ফেলা হয়েছে। ও তো জানে, বাঘিনিটাই ওর মা। তাই রাগে-দুঃখে আক্রমণ করেছিল সন্তুকে। সন্তুই সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল বলে।

ছেলেটা ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাইরের বারান্দায় বসে আছেন কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো। অন্যরা একটু আগে ফিরে গিয়েছেন। এখন সকাল সাড়ে দশটা।

আজ আর বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ একেবারে ঝকঝকে নীল। কলকাতায় এরকম নীল আকাশ বড় একটা দেখা যায় না।

জোজো বলল, "দশ-এগারো বছরের ছেলে, কিন্তু কথা বলতে পারে না কেন? ও কি বোবা?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, বোবা নয়, মুখ দিয়ে তো নানারকম আওয়াজ করছে। মানুষের বাচ্চারা তো বাবা-মায়ের কিংবা অন্যদের কথা শুনে শুনে ভাষা শেখে। ও যদি দু'-তিন বছর বয়সে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে যেটুকু ভাষা শিখেছিল, তাও ভুলে গিয়েছে এতদিনে।"

সন্তু বলল, "বাঘেদের নিশ্চয়ই নিজস্ব ভাষা আছে। ও বোধহয় বাঘের ভাষা শিখে নিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতেই পারে। তোরা বোধহয় টারজানের সিনেমা দেখিসনি। আমাদের ছেলেবেলায় টারজানের সিনেমা খুব জনপ্রিয় ছিল। টারজানও জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে মানুষ হয়েছিল, সে ওদের ভাষাও জানত। টারজান মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করলে অমনই দৌড়ে চলে আসত হাতির পাল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "টারজানের সিনেমা এখন পাওয়া যায় না?"

কাকাবাবু বললেন, "খোঁজ করে দেখতে হবে। ডিভিডি পাওয়া যেতে পারে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি যে বললেন, এই ছেলেটাই বিস্কুট চুরি করত, কিন্তু ও বিস্কুট খেতে শিখল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "কী করে শিখল, তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে, মনে হয়, জঙ্গলে তো অনেকে পিকনিক করতে যায়। সেরকমই কোনও দল খাবারদাবার নিয়ে বসেছিল, হঠাৎ বাঘের ডাক শুনে সব ফেলেটেলে ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপর এই বাঘিনি আর ছেলেটা সেখানে এসে পড়ে। বাঘ কখনও নিরামিষ খাবার খায় না। কিন্তু মানুষের পেটে তো নিরামিষও সহ্য হয়। তাই ছেলেটা অন্যদের ফেলে যাওয়া বিস্কুট টিস্কুট হয়তো চেখে দেখেছিল। তারপর ভাল লেগে যায়। এটা আমি মনে মনে কল্পনা করছি।"

জোজো বলল, "আজ আমরা ওকে বিস্কুট খেতে দিয়ে দেখব, খায় কি না!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওর নাম কী হবে? ওর আগে কোনও নাম ছিল

কি না কে জানে! ও নিজে বলতেও পারবে না। ওর একটা নতুন নাম দেওয়া দরকার।”

কাকাবাবু বললেন, “তা ঠিক। তোরা একটা নাম ঠিক কর।”

জোজো বলল, “হারিয়ে যাওয়া ছেলে, ওর নাম হোক ‘হারান’।”

সন্তু বলল, “এটা বড্ড পুরনো ধরনের। আর খুব বাঙালি-বাঙালি। ও তো বাঙালি ছেলে নয়।”

জোজো বলল, “তা হলে নাম হোক ‘বাজবাহাদুর’। এখানে এসে বাজবাহাদুর আর রূপমতীর গল্প খুব শুনছি।”

সন্তু বলল, “ও নামও এখন চলে না।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার এক বন্ধু ছিলেন শার্দূল সিংহ। খুব ভাল বক্সিং জানতেন। এখানে কারও কারও এ নাম হয়, শার্দূল।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “শার্দূল মানে কী?”

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুই জানিস?”

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, “জানি। শার্দূল মানে বাঘ।”

জোজো বলল, “ওরে বাবা, ও নাম চলবে না। ও যখন স্কুলে ভরতি হবে, তখন ওই নাম শুনলেই অন্য ছেলেরা ওকে খেপাবে।”

সন্তু বলল, “তুই ভাবলি, ও স্কুলে যাবে?”

কাকাবাবু বললেন, “যাবে না কেন, যেতেই পারে। প্রথম কয়েকটা মাস ওকে খানিকটা আদর-যত্ন করে রাখতে হবে, স্নেহ-মমতা দিয়ে বোঝাতে হবে যে, মানুষ ওর শত্রু নয়। মানুষ ওর আপনজন। সেটা বুঝে ওর স্বভাবটা একটু নরম হলে, ও মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে, তখন লেখাপড়াও শিখবে!”

সন্তু বলল, “তা হলে ওর নাম হোক ‘আরণ্যক’। এই নামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী চমৎকার একটা বই পড়েছি।”

কাকাবাবু বললেন, “আরও ছোট করে শুধু অরণ্যও হতে পারে। আর পদবি হতে পারে চৌধুরী। বাঙালি, অবাঙালি অনেকেরই চৌধুরী পদবি হয়।”

জোজো বলল, “অরণ্য যদি ভালনাম হয়, তা হলে ডাকনাম হোক ‘বুনো’।”

নাম ঠিক হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। তার দু’চোখে দারুণ অবাক অবাক ভাব।

বাঘের চামড়ার বদলে সন্তুর একটা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে। দুটোই ওর গায়ে ঢলঢল করছে।

জোজো বলল, "অ্যাই শোনো, এখন থেকে তোমার নাম হয়েছে অরণ্য চৌধুরী। আমরা বুনো বলে ডাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "বুনো নামটাও খারাপ নয়। একজন পণ্ডিতের নাম ছিল বুনো রামনাথ।"

ছেলেটা এসব কিছুই বুঝল না। সে যেন খুবই বিরক্ত হল।

মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করে সে দৌড়ে এল বারান্দার কাছে। রেলিংটা ধরে একটা ডিগবাজি খেয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচে তারপর দৌড়োল গেটের দিকে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, ধর, ধর ওকে!"

সেকথা শোনার আগেই সন্তু নীচে নামতে শুরু করেছে।

বয়সের তুলনায় ছেলেটা খুব জোরে ছোটে। কিন্তু সন্তুর সঙ্গে পারবে কেন! ফোর ফর্টি মিটার রেসে সন্তু ফার্স্ট হয়।

গেটের কাছে পৌঁছোনোর আগেই ছেলেটাকে ধরে ফেলল সন্তু।

ছেলেটা সন্তুকে আঁচড়ে-কামড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। সন্তু তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে বলল, "অ্যাই, কামড়াবি না, তা হলে আমিও মারব কিন্তু!"

বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "না সন্তু, মারিস না।"

ছেলেটা একবার সন্তুকে বেশ জোরে কামড়ে দিতেই সন্তু তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। সে আবার ছুটল পাঁইপাঁই করে।

তখনই গেট দিয়ে ঢুকছে মান্টো সিংহ। সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "মান্টো সিংহ, পাকড়ো উসকো।"

মান্টো সিংহ দু'হাতে ছেলেটাকে ধরে উঁচু করে তুলে ফেলল। ছেলেটা হাত-পা ছুড়ছে আর ঠিক বাঘের মতোই গ-র-র গ-র-র আওয়াজ করছে। মান্টো সিংহ তাকে নিয়ে বারান্দায় উঠে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "এবার ওকে ছেড়ে দাও।"

মান্টো সিংহ বলল, "ইয়ে ভাগ যায়গা।"

জোজো দৌড়ে গিয়ে ডাইনিংরুম থেকে এক প্যাকেট মিষ্টি বিস্কুট নিয়ে এসে ছেলেটার সামনে বাড়িয়ে দিল।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুটের প্যাকেটটা প্রায় কেড়ে নিয়ে কচমচ করে খেতে লাগল। একটার পর-একটা।

কাকাবাবু বললেন, "ওর খিদে পেয়েছিল। মান্টো সিংহ, এক গেলাস দুধ নিয়ে এসো তো!"

সন্তু বলল, "ও দুপুরে কী খাবে? আমাদের মতো ভাত-রুটি খেতে পারবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজকেই বোধহয় পারবে না। আস্তে আস্তে অভ্যেস করাতে হবে।"

জোজো বলল, "ওকে কি কাঁচা মাংস দিতে হবে? ও তো রান্না করা মাছ-মাংস খায়নি কখনও।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব খিদে পেলে আমরা যা দেব, তাই-ই খাবে।"

সন্তু নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, "আমি মানুষ।"

তারপর ছেলেটির দিকে আঙুল তুলে বলল, "তুমি মানুষ! আমরা সবাই মানুষ। তুমি বাঘ নও।"

বিস্কুট খেতে খেতে ছেলেটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে রইল।

জোজো বলল, "বল তো, আমি! আমি! আমি!"

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না।

জোজো আবার বলল, "মানুষ! মানুষ! মানুষ!"

মান্টো সিংহ একটা কাচের গেলাস ভরতি দুধ এনে বলল, "লে বাচ্চা, পি লে!"

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল গেলাসটার দিকে। তারপর এক ঝটকায় সেটা ফেলে দিল মান্টো সিংহের হাত থেকে।

গেলাসটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে তো ভাঙলই, খানিকটা দুধ ছিটকে গিয়ে পড়ল কাকাবাবুর প্যান্টে।

মান্টো সিংহ রেগে গিয়ে হাত তুলে বলল, "মারে গা এক ঝাঁপড়!"

কাকাবাবু বললেন, "না, মারবে না। ওকে আস্তে আস্তে শেখাতে হবে।"

সন্তু বলল, "ও দুধের প্যাকেটও চুরি করত। তা হলে দুধ খেতে চাইছে না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ও খেয়েছে গুঁড়ো দুধ চেটে চেটে। গেলাস ভরে দুধ তো কখনও দেখেনি। মান্টো সিংহ তোমার কাছে গুঁড়ো দুধ আছে?"

মান্টো সিংহ বলল, "না, নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "এক প্যাকেট বিস্কুট তো প্রায় শেষ করে ফেলেছে। আপাতত ওকে আর-এক প্যাকেট বিস্কুট দাও।"

মান্টো সিংহ বলল, "সাহাব, একে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসুন। নইলে একে সামলানো যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, এখন ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে ও আর বাঁচবে না। এতদিন বাঘিনিটার সঙ্গে ছিল, বাঘিনিটার ভয়ে অন্য কোনও জানোয়ার ওর ক্ষতি করতে পারেনি। এখন ও তো একটা বাচ্চা ছেলে, একা একা খাবার জোগাড় করবে কী করে?"

সন্তু বলল, "আমরা ওকে ঠিক সামলাতে পারব। কাকাবাবু, আমরা ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি না? আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আগে দেখতে হবে, ওর মা-বাবার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না। ওর মা-বাবা কিংবা কোনও আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাঁদের অনুমতি ছাড়া তো আমরা ওকে আমাদের কাছে রাখতে পারব না?"

জোজো বলল, "একজন বুড়ি মহিলা বলেছিলেন যে বড় বাঘটার সঙ্গে একটা বাচ্চা-বাঘ আছে, কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি।"

সন্তু বলল, "ওর গায়ে একটা বাঘের চামড়া জড়ানো ছিল, সেটা কি ও নিজেই বুদ্ধি করে জড়িয়েছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "ও যদি বাঘের ভাষা শিখে গিয়ে থাকে, তা হলে বাঘিনিটাই বোধ হয় ওকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল।"

জোজো বলল, "ওর কথা বুঝতে হলে, আমাদেরও কি বাঘের ভাষা শিখতে হবে?"

সন্তু বলল, "জোজো, তুই সেটা সহজেই পারবি। কয়েকটা দিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটা বাঘের খাঁচার পাশে বসে থাক।"

জোজো বলল, "আমি 'হালুম' ডাকটার মানে জানি! জানি, কিন্তু এখন বলব না।"

সন্তু বলল, "বাঘের ভাষা শেখার আগে আপাতত ওর হাত আর পায়ের নখ কেটে দেওয়া দরকার। আঁচড়ে আমার রক্ত বের করে দিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক, এখানে ক্ষৌরকার পাওয়া যাবে মান্টো সিংহ?"

মান্টো সিংহ বলল, "বাজারের কাছে একটা সেলুন আছে। সেখানে খোঁজ করতে হবে। এখানে ক্ষৌরকার নেই।"

জোজো বলল, "ওকে সেলুনে নিয়ে গিয়ে ওর চুলে একটা কলকাত্তাই ছাঁট দিলেও তো হয়।"

সন্তু বলল, "সেলুনের লোকদের যদি ও আগেই আঁচড়ে-কামড়ে দেয়? আমি নেলকাটার দিয়ে ওর নখ কেটে দিতে পারি। দেখি চেষ্টা করে।"

একটা নেলকাটার নিয়ে এসে সন্তু প্রথমে ওর সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে কুটুস কুটুস করে নিজের এক হাতের নখ কাটল। তারপর ওর দিকে সেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, মানুষের হাত এরকম হয়। মানুষের অত বড় নখের দরকার হয় না। এবার তোমার হাতটা সুন্দর করে দিই?"

ছেলেটা সন্তুর নখ কাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, সন্তু ওর একটা হাত ধরতে যেতেই ও এক ধাক্কা দিয়ে সন্তুকে সরিয়ে দিল। চেয়ার ছেড়ে আবার দৌড় লাগাল রেলিং-এর দিকে।

কিন্তু এবারে কাকাবাবুই ওকে ধরে ফেললেন হাত বাড়িয়ে।

ছেলেটা কাকাবাবুর ঘাড় কামড়ে ধরল বেশ জোরে।

সন্তু এসে ওর চুল ধরে টেনে সরিয়ে আনল। কাকাবাবুর কাঁধে দাঁতের দাগ বসে গিয়েছে, একটু একটু রক্ত বেরোচ্ছে।

জোজো বলল, "এবার ওকে বেশ করে মারা দরকার। ওকে বোঝাতে হবে যে, কামড়ালে ফামড়ালে শাস্তি পেতে হবে ওকে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, মারলে ও বুঝবে না। ভাল ব্যবহার দিয়ে ওর মন জয় করতে হবে।"

ঘাড়ে রুমাল চেপে ধরে কাকাবাবু ছেলেটির দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, "ওহে অরণ্যকুমার চৌধুরী, তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। মানুষ মানুষকে কামড়ায় না, বুঝলে?"

এই সময় দেখা গেল, গেটের সামনে আট-দশজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মান্টো সিংহ কথা বলছে তাদের সঙ্গে।

কাকাবাবু বললেন, "এই রে, মনে হচ্ছে খবর রটে গিয়েছে। লোকজন দেখতে আসছে ওকে। এখনই লোকজনের সামনে ওকে বের করা ঠিক হবে না। সন্তু, তুই ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা তো। দরজা বন্ধ করে রাখবি।"

সন্তু আর জোজো ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

এর মধ্যেই খবর ছড়িয়েছে যে, জঙ্গল থেকে আনা হয়েছে একটি ছেলেকে, তার শরীরটা বাঘের মতো আর মাথাটা মানুষের মতো। অর্থাৎ অদ্ভুত একটা জন্তু। সুতরাং তাকে দেখার জন্য তো কৌতূহল হবেই।

লোকগুলো উঠে এল বারান্দায়।

কাকাবাবু প্রথমে ভালভাবে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তারা ভুল শুনেছে। অদ্ভুত কোনও প্রাণী নয়। সে একেবারেই স্বাভাবিক মানুষের সন্তান। তাকে দেখার কিছু নেই।

লোকরা তা মানতে চায় না। তারা অন্তত একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। সবাই মিলে সেই দাবি জানাতে লাগল।

এবারে কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, "সে এখন ঘুমোচ্ছে। তাকে কিছুতেই বিরক্ত করা চলবে না। দেখতে চাইলে বিকেলবেলা আসুন।"

মান্টো সিংহকে তিনি বললেন, "বাইরের গেট বন্ধ করে দাও!"

আরও অনেক লোক এসে ফিরে গেল।

দুপুরবেলা কাকাবাবু ছেলেটিকে খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেদের ঘরেই খাবার আনালেন।

কাচের প্লেট ভেঙে ফেলতে পারে, তাই একটা স্টিলের থালায় ওর জন্য সাজিয়ে দেওয়া হল ভাত আর রুটি। খানিকটা ঢেঁড়স আর বেগুনের তরকারি। মুরগির ঝোলের ঝোলটা বাদ দিয়ে কয়েকটা টুকরো রাখা হল একপাশে।

প্লেটটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে ছেলেটি এক টুকরো মুরগি তুলে নিয়ে মুখে দিল।

তারপরই মুখখানাকে বিচ্ছিরি করে সেটা ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

জোজো বলল, "এই বুনো, এভাবে খাবার ফেলতে নেই। ঘর নোংরা করলে তোকেই পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু!"

কাকাবাবু বললেন, "ওর বোধহয় ঝাল লেগেছে। একটুও ঝাল খাওয়া তো ওর অভ্যেস নেই।"

তিনি একটা মুরগির ঠ্যাং নিজের জলের গেলাসে ডুবিয়ে ঝোল-মশলা ভাল করে ধুয়ে ফেললেন। তারপর সেটা ছেলেটির থালায় দিয়ে বললেন, "এবার এটা খেয়ে দ্যাখো।"

সে সেটা নিয়ে দু'-তিন কামড় দিল, তবু ঠিক পছন্দ হল না। ফেলে দিল।

সন্তু বলল, "সেদ্ধ করা খাবার ওর ভাল লাগছে না। কাঁচা মাংস দিলেই হত।"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওকে এই খাবারই অভ্যেস করতে হবে। আয়, আমরা আমাদের মতো খাই, দেখি ও কী করে?"

তিনজনে নিজেদের খাবার খেতে লাগলেন, ও তাকিয়ে দেখল। একটা

রুটি নিয়ে দু'হাত দিয়ে ছিঁড়ল, কিন্তু মুখে দিল না। ভাতও আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল শুধু।

শেষ পর্যন্ত কাকাবাবুদের খাওয়া হয়ে গেল, ছেলেটা খেল না কিছুই।

সন্তু বলল, "তা হলে কি ওকে শুধু বিস্কুট খাইয়ে রাখতে হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই। দেখা যাক না, খিদে পেলে শেষ পর্যন্ত কী করে?"

ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেটি আবার পালাবার চেষ্টা করল। এবার আর তাকে ধরা গেল না।

কাকাবাবু বসে ছিলেন বারান্দায়। সন্তু বাথরুমে, জোজো পাহারা দিচ্ছিল বুনোকে। সে চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঢুলছিল। হঠাৎ একসময় সে চোখ মেলে দেখল, জোজো একা রয়েছে ঘরে।

সে এত জোরে ধাক্কা দিল জোজোকে যে, জোজো চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে গেল মাটিতে। দৌড়ে বাইরে এসে, কাকাবাবু বই থেকে চোখ তুলে কিছু বোঝার আগেই সে বারান্দার রেলিং টপকে লাফিয়ে নেমে গেল নীচে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি তো ছুটতে পারবেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। তিনি ডাকতে লাগলেন, "সন্তু, সন্তু, শিগগির আয়।"

সন্তুর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগল, ততক্ষণে বুনো পৌঁছে গিয়েছে গেটের কাছে। সন্তু তাড়া করে গিয়ে গেটের বাইরে আর তাকে দেখতে পেল না।

সামনের রাস্তাটা আঁকাবাঁকা। ও কোন দিকে যেতে পারে! জঙ্গলের দিকেই যাবে নিশ্চয়ই।

গেস্টহাউসের কর্মচারীদের কয়েকটা সাইকেল সেখানে দাঁড় করানো আছে। এরা তালাটালা দেয় না। সন্তু ঝট করে একটা সাইকেলে চেপে চালাতে লাগল বাঁইবাঁই করে।

ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

খানিকটা গিয়ে সন্তু থেমে গেল। যত জোরেই ছুটুক, ছেলেটা তো এর মধ্যে এত দূর আসতে পারবে না। তা হলে কি উলটো দিকে গিয়েছে?

অথবা ছেলেটা যদি খাদে নেমে যায়?

রাস্তার একটা পাশে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে অনেকখানি। সেখানে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। দু'-একটা বাড়িও আছে। অনেক নীচে একটা সরু নদী, তার ওপাশে

অন্য পাহাড়টায় ঘন জঙ্গল। ছেলেটার পক্ষে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে খাদের মধ্য দিয়ে জঙ্গলে যাওয়াই সহজ।

কিন্তু সন্তু তো সাইকেল নিয়ে খাদে নামতে পারবে না।

সন্তু দেখল, জোজোও আর-একটা সাইকেল নিয়ে আসছে।

সে কাছে আসার পর সন্তু বলল, "এই দেখ, এই খাদ দিয়ে যদি বুনো নেমে গিয়ে ওধারের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, তা হলে তো পুরো জঙ্গলটা আবার খুঁজে দেখতে হবে।"

জোজো বলল, "আমরা দু'জনে গিয়ে খুঁজলে কি পাব?"

সন্তু বলল, "কোথাও লুকিয়ে বসে থাকলে পাওয়া মুশকিল।"

জোজো হতাশভাবে বলল, "আর ওকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। লস্ট কেস। ও তো কিছুতেই আমাদের কাছে থাকতে চাইছে না।"

সন্তু জোর দিয়ে বলল, "ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। ওইটুকু ছেলে জঙ্গলে একা একা বাঁচবে কী করে? আরও লোকজন ডেকে, গাড়ি নিয়ে আবার ওই জঙ্গলে যেতে হবে।"

জোজো বলল, "চল, কাকাবাবুকে গিয়ে বলি।"

এই সময় শোনা গেল একটা কুকুরের ডাক।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্তু দেখতে পেল, খাদের খানিকটা নীচে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কুকুর ডাকছে। আর ল্যাজ নাড়াচ্ছে।

জোজো বলল, "কুকুরটা কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। ঝোপের মধ্যে কী যেন আছে।"

সন্তু বলল, "কী আছে, আমাদেরও দেখতে হবে।"

সাইকেলটা রেখে সে সরসরিয়ে নেমে গেল।

কুকুরটা ঝোপের চারপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে, আর জোরে জোরে ডেকেই চলেছে। বেশ বড় কুকুর।

জোজো বড় সাইজের কুকুর দেখলে একটু ভয় পায়। সন্তুর ভয়ডর নেই। তার নিজেরই একসময় 'রকুকু' নামে পোষা কুকুর ছিল।

সে কুকুরটার পাশে গিয়ে মুখ দিয়ে 'আঃ আঃ' শব্দ করতে-করতে ঝোপটার মধ্যে তাকাল।

সেখানে উবু হয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে বুনো। তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

সন্তু কুকুরটাকে সামলে, হাত বাড়িয়ে বলল, "আয় বুনো, বেরিয়ে আয়।"

ছেলেটা তবু বেরোল না।

সন্তু আরও কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আয়, ভয় নেই। ভয় নেই।"

ছেলেটা এবার বেরিয়ে আসতেই কুকুরটা আরও জোরে ডাকতে লাগল। ছেলেটা জড়িয়ে ধরল সন্তুকে।

সন্তু বলল, "তুই কুকুর দেখে ভয় পাচ্ছিস! এরপর যদি একটা ভাল্লুক এসে পড়ে, তখন তুই কী করবি? তোর বাঘিনি-মা তো তোকে আর বাঁচাতে পারবে না!"

ছেলেটাকে ধরে ধরে সন্তু নিয়ে এল উপরের রাস্তায়। কুকুরটা খানিকটা পিছন পিছন এসে এক জায়গায় থেমে গেল। সম্ভবত নীচের কোনও বাড়ির পোষা কুকুর।

জোজো বলল, "এবার মনে হচ্ছে ছেলেটাকে বেঁধে রাখতেই হবে। কী রে, আর আমাদের কতবার দৌড় করাবি?"

সন্তু বলল, "সাইকেলে চাপবি? কোনওদিন চাপিসনি তো। দ্যাখ, কেমন লাগে।"

সন্তু তাকে সামনের রডে বসিয়ে দিল। ছেলেটা বিশেষ আপত্তি করল না।

এর মধ্যে কাকাবাবু বারান্দা থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন গেটের কাছে। ওদের দেখে বললেন, "পাওয়া গিয়েছে? যাক, খুব চিন্তা হয়েছিল।"

জোজো বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, বাঘ-সিংহরা কি হাসতে পারে?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "হঠাৎ এ প্রশ্ন? আমি ঠিক জানি না। যত দূর শুনেছি, মানুষই শুধু হাসতে পারে, কাঁদতেও পারে। জন্তু-জানোয়াররা ওসব জানে না। হায়েনার হাসির কথা আবার শোনা যায়। ওটাও হাসি নয়, ওরকমই হায়েনার ডাক।"

জোজো বলল, "এ ছেলেটা বাঘের সঙ্গে মিশে মিশে হাসতে শোনেনি। সব সময় মুখটা গোমড়া করে থাকে। কিন্তু মানুষের বাচ্চা হিসেবে ওর তো হাসতে পারা উচিত। একবার পরীক্ষা করে দেখব?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওকে হাসাবে? কিন্তু ও তো তোমার গল্প বুঝবে না।"

জোজো বলল, "সন্তু, ওকে জোর করে চেপে ধর তো।"

সন্তু সাইকেল থেকে ছেলেটাকে নামাতেই জোজো ওর বগলে কাতুকুতু দিয়ে দিল।

ছেলেটা প্রথমে ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

জোজো আরও কাতুকুতু দিতেই ও হি-হি-হি-হি করে হেসে উঠল। ঠিক একটা দশ বছরের সরল ছেলের মতো। মুখে আর হিংস্র ভাবও নেই।

সেই হাসি দেখে সন্তু আর কাকাবাবুও হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, "বাঘকে কাতুকুতু দিলে হাসে কি না সেটা কি কেউ পরীক্ষা করে দেখেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার এক বন্ধু বলেছিল, গন্ডারকে কাতুকুতু দিলে কী হয়?

গন্ডারের চামড়া তো খুব মোটা। তাই আজ কাতুকুতু দিলে সাতদিন পরে হেসে উঠবে!"

॥ ৬ ॥

এরপর তিনদিন কেটে গিয়েছে। কাকাবাবুদের এবার কলকাতায় ফিরতে হবে।

এর মধ্যে ছেলেটার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আরও দু'-তিনবার পালাবার চেষ্টা করেছে বটে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি। এখন ওর একটা হাত দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, সেই দড়ির আর-একটা দিক বাঁধা সন্তুর বাঁ হাতে। সেই দড়ির গিঁট খোলার ক্ষমতা ওর নেই। রাত্তিরেও ওই অবস্থায় শুয়ে থাকে সন্তুর পাশে। দড়িতে টান পড়লেই জেগে ওঠে সন্তু।

দ্বিতীয় দিনেই দু'-তিনজন মিলে ওকে জোর করে চেপে ধরেছিল, সন্তু কেটে দিয়েছে ওর হাত-পায়ের লোম। মাথার চুলও ছেঁটে দেওয়া হয়েছে খানিকটা।

তারপর ওকে চান করানো হয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, চান করাবার সময় কিন্তু ও মোটেই আপত্তি করেনি। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করেছে অনেকক্ষণ। মনে হয়, আগে দু'-একবার ও কোনও ঝরনার জলে মাথা ভিজিয়েছে।

ওর নিজের সাইজের দু'সেট প্যান্ট-শার্ট কিনে আনা হয়েছে। সেই সব পরিয়ে, মাথার চুল আঁচড়ে দিলে ওকে ভালই দেখায়। মুখখানা সুন্দর।

কিন্তু এখনও কোনও কথা বলে না। মাঝে মাঝে বাঘের মতো গরগর শব্দ

করে। সেরকম শব্দ করলেই জোজো ওকে কাতুকুতু দিয়ে হাসায়।

এদিককার অনেক কাগজে ওর খবর আর ফোটো ছাপা হয়েছে। কেউ ওর নাম দিয়েছে 'টাইগার বয়', কেউ বলেছে 'নয়া মুগলি', কেউ বলেছে 'বাচ্চা টারজান'। খবরের কাগজের লোকেরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্পও লিখেছে ওর নামে। ও নাকি এক গাছের ডগা থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলে যেতে পারে, জ্যান্ত ইঁদুর আর খরগোশ ধরে কামড়ে কামড়ে খায়, ওর সারা মুখ রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকে। অবিকল বাঘের মতো ডাকতে পারে।

সেসব কিছু না।

সে মোটেই কাঁচা মাংস খায় না। একদম ঝাল-মশলা না-দেওয়া রান্না করা মাংস খেতে শিখেছে। ভাত খায় না, কিন্তু রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে শুধু শুধু খায়। কলা খায়। তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার আইসক্রিম। একটা আইসক্রিম খেয়েই আর-একটার জন্য হাত বাড়ায়।

এখনও কেউ তার বাবা কিংবা মা কিংবা আত্মীয় বলে দাবি করেনি।

বাঘিনিটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোপালে। ঘুম ভাঙার পর সে কিছুক্ষণ খুব জোরে ডাকাডাকি করেছিল। নিশ্চয়ই খুঁজছিল ছেলেটাকে, তারপর ঝিমিয়ে পড়েছে। সব সময় ঘুম ঘুম ভাব।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বাঘিনিটাকে দূরের কোনও জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বনের প্রাণী বনেই থাকবে।

কিন্তু বনবিভাগের বড় বড় অফিসার ওকে পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন যে, বাঘিনিটা এতই বুড়ি হয়ে গিয়েছে যে, জঙ্গলে গেলে আর বেশিদিন বাঁচবে না। অন্য প্রাণী শিকার করার ক্ষমতা নেই, তাই এখন মানুষ মারার চেষ্টা করবে। আদিবাসীদের সামনে পড়লে তারা ওকে মেরে ফেলতে পারে অনায়াসে। তার চেয়ে চিড়িয়াখানায় আদরযত্ন করলে ও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে।

ছেলেটা থাকবে কোথায়? কাকাবাবু ওকে অনাথআশ্রমে পাঠাবার ঘোর বিরোধী। এর মধ্যে দু'টো অনাথআশ্রম জানিয়েও দিয়েছে যে, তারা জায়গা দিতে পারবে না।

কাকাবাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আইন-কানুনের কিছু ঝামেলা আছে।

সুলতান আলমের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। তিনি বললেন, "আপনি ওর দায়িত্ব নিতে চান, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু ওর কোনও আত্মীয়

খোঁজখবর করে কি না, তার জন্য অন্তত দিনদশেক সময় দেওয়া দরকার।”

কাকাবাবু বললেন, “দশদিন ওকে কোথায় রাখবেন? আমাদের তো কাল ফিরতেই হবে। সন্তু আর জোজোর কলেজ খুলে যাচ্ছে।”

সুলতান বললেন, “তা হলে কয়েকটা দিন ওকে থানাতেই রেখে দিতে হবে। আর তো কোনও উপায় দেখছি না।”

কাকাবাবু বললেন, “ওইটুকু ছেলে, থানায় চোর-ডাকাতদের সঙ্গে থাকবে? তারাই তো ওকে নষ্ট করে দেবে।”

সুলতান বললেন, “না, ক্রিমিনালদের সঙ্গে অত কমবয়সি ছেলেকে রাখা যায় না। সেটা বেআইনি। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতেই হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “যেখানেই রাখুন, সব সময় ওর দিকে মনোযোগ না দিলে ও তো আবার জঙ্গলে পালিয়ে যাবে। আপনার পুলিশ কি ওর খোঁজ করবে? তাদের কী দায় পড়েছে!”

সুলতান বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন রায়চৌধুরীসাহেব। ও পালিয়ে গেলে পুলিশ আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তা হলে কী করা যায় বলুন তো?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি বরং ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। সন্তু আর জোজোর সঙ্গে ওর অনেকটা ভাব হয়ে গিয়েছে। ওরা ছেলেটার দেখাশুনো করবে। এর মধ্যে কেউ যদি এসে ছেলেটাকে দাবি করে, ঠিক প্রমাণট্রমান দেখায়, আমি নিজের খরচে কলকাতা থেকে ওকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। আমার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। আপনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সে আমাকে চেনে। তার কাছ থেকে আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন।”

সুলতান বললেন, “কী বলছেন রায়চৌধুরীসাহেব, আমি এর মধ্যে সুপ্রভা রায়ের সঙ্গে দেখা করে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আপনি তো গ্রেট ম্যান। আপনি আন্দামানে সবুজ দ্বীপের রাজাকে আবিষ্কার করেছিলেন না? আপনি এ ছেলেটির ভার নিতে চাইছেন, এটাও তো একটা খুব বড় কথা। ঠিক আছে, আপনি ওকে নিয়ে যান। আমি লোকাল পুলিশকে বলে দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবে। গাড়ির ব্যবস্থাও ওরাই করবে।”

সন্তু আর জোজো পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এর মধ্যেই ছেলেটার উপর ওদের মায়া পড়ে গিয়েছে। ওকে রেখে চলে যেতে হবে ভেবে ওদের মন খারাপ করছিল।

সন্ধেবেলা বুনোকে আইসক্রিম খাওয়াতে খাওয়াতে ওরা দু'জন ওকে কথা বলাবার চেষ্টা করছে, বারান্দায় বসে। কাকাবাবু একটু দূরে একটা ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন।

এখনও পর্যন্ত বুনো একটাও কথা বলেনি। কিন্তু চোখ বড় বড় করে শোনে।

সন্তু নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, "এটা আমি। আর তুমি।"

তারপর ওর বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, "এটাও আমি। আর এদিকে তুমি।"

জোজো বলল, "ম্যায় আউর তুম!"

সন্তু বলল, "এটা বাড়ি। আর ওটা জঙ্গল।"

জোজো বলল, "ইয়ে কোঠি। আর উয়ো, জঙ্গল, জঙ্গল। অ্যাই সন্তু, জঙ্গলের হিন্দি কী রে?"

সন্তু বলল, "হিন্দিতেও জঙ্গল। ইংরেজিতেও তো জাঙ্গল!"

জোজো বলল, "এখন ইংরেজি শেখানোর দরকার নেই।"

সন্তু বলল, "আমি বাড়ি যাব। আমি জঙ্গলে যাব না।"

জোজো বলল, "আমি রুটি খাব। কাঁচা মাংস খাব না।"

সন্তু বলল, "আমি আইসক্রিম ভালবাসি।"

জোজো বলল, "অ্যাই সন্তু, আইসক্রিমের বাংলা কী?"

সন্তু বলল, "এই রে, আইসক্রিমের বাংলা তো জানি না। মালাই বরফ কি বলা যেতে পারে?"

জোজো বলল, "সেটা তো অন্যরকম।"

সন্তু বলল, "ওসব কথা এখন থাক। আইসক্রিমকে আইসক্রিম বললেই চলবে। বুনো, আমি মানুষ, তুমি মানুষ!"

এইরকমভাবে চলল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর দেখা গেল, সিঁড়ি দিয়ে তিনজন লোক উঠে আসছে উপরের বারান্দায়।

তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার রায়চৌধুরী হ্যায়?"

সন্তু কাকাবাবুকে দেখিয়ে দিল।

সেই লোকটি হাতজোড় করে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আমার নাম মোহনকুমার, আমি এখানকার থানার ওসি। আর এঁরা দু'জন সুরজ সিংহ আর তাঁর সেক্রেটারি বিলাস রাও।"

কাকাবাবু বললেন, “বসুন, বসুন।”

মোহনকুমার বললেন, “এঁরা দু’জন জঙ্গলের ছেলেটিকে নিতে এসেছেন। সুরজ সিংহ এই ছেলেটির কাকা।”

সুরজ সিংহ জোজোর দিকে তাকিয়ে গদগদভাবে বললেন, “আও মেরে লাল, মেরে পাশ মে আও!”

তিনি দু’হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন জোজোকে।

জোজো কুঁকড়ে গিয়ে বলল, “আমি না, আমি না। এ।”

সন্তু বলল, “আগেই ওর গায়ে হাত দেবেন না। ও কিন্তু কামড়ে দিতে পারে।”

এবার সুরজ সিংহই ঘাবড়ে গিয়ে দূরে সরে গেলেন। তাঁর বিশাল চেহারা, ঝলমলে পোশাকপরা, মাথায় পাগড়ি। আর সেক্রেটারিটি সরু ও লম্বা, পায়জামা আর কুর্তা পরা।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ওর কাকা হন? ওর বাবা, মা?”

সুরজ সিংহ বললেন, “আমার বড় ভাই বেঁচে নেই। এই ছেলেটির মা, আমার ভাবী, বেঁচে আছেন। ছেলের শোক তিনি আজও ভুলতে পারেননি। কাগজে ওর ফোটো দেখেই চিনতে পেরেছেন। খুব কান্নাকাটি করছেন।”

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, “ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল কতদিন আগে?”

সুরজ সিংহ বললেন, “সাত বরষ আগে। তখন ওর বয়স ছিল তিন বছর। এই দেখুন, ফোটো।”

তিনি লম্বা জামার পকেট থেকে একটা ফোটো বের করে দেখালেন। একটা বাচ্চার অস্পষ্ট ফোটো। তিন বছরের ছেলের সঙ্গে দশ বছরের ছেলের চেহারার মিল অনেক সময় বোঝাই যায় না। তখন ওর মাথায় চুলই ছিল না বলতে গেলে, এখন মাথা ভরতি চুল।

সুরজ সিংহ বললেন, “ওর নাম ছিল বলবীর। বলবীর সিংহ।”

তিনি ডাকলেন, “বলবীর, বলবীর! ইধার দেখো!”

বুনো তা গ্রাহ্যও করল না।

কাকাবাবু বললেন, “এই সাত বছরে ও সব কিছু ভুলে গিয়েছে! ছেলেটি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল কী করে?”

সুরজ সিংহ বললেন, “আর বলবেন না, সে বড় লজ্জার কথা। আমাদের বাড়ি ইন্দৌর। জয়েন্ট ফ্যামিলি, বাপ-কাকা-জ্যাঠাদের ছেলেমেয়ে মিলিয়ে

চোদ্দোজন। সে বছর ছেলেমেয়েরা সবাই গেল পিকনিক করতে। বলবীর তখন খুবই ছোট, কিন্তু আমার মেয়ে লছমি ওকে খুবই ভালবাসে। সে নিয়ে গেল জোর করে। গিয়েছিল এক জঙ্গলে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ইন্দৌর জঙ্গল আছে?”

সুরজ সিংহ বললেন, “শহর থেকে কিছুটা দূরে, ছোটখাটো জঙ্গল, সেখানে কোনও হিংস্র জন্তু থাকার কথা নয়, মাঝে মাঝে দু’-একটা ভালুক দেখা যায়, তা অত মানুষ থাকলে ভালুক কী করবে? বাচ্চা ছেলে বলবীর ছিল খুব দুরন্ত, দৌড়োদৌড়ি করে চলে যেত এদিক-সেদিক। ওখানেও খেলা করছিল। আর সবাই ফুর্তি করছিল, হঠাৎ শোনা গেল এক বাঘের গর্জন। খুব কাছে। বাঘের ডাক শুনলে কী হয় জানেন তো? অন্যদের কথা মনে থাকে না, সবাই নিজের জান বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা সবাই দৌড় মেরে একটা মিনিবাস ছিল, তাতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারও বাস চালিয়ে দিল জোরে। অনেকটা যাওয়ার পর খেয়াল হল, আর সবাই উঠেছে, শুধু বলবীর নেই। তখন আমার মেয়ে কাঁদতে লাগল।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনার মেয়ের কত বয়স ছিল?”

সুরজ সিংহ বললেন, “চৌদ্দো বছর। এ জন্য আমার মেয়েকে অনেক মেরেছি। সে ভেবেছিল, রণবীর নামে একটা বড় ছেলে ছিল, সে নিশ্চয়ই ছোট্ট বলবীরকে তুলে নেবে। যাই হোক, সে ফিরে যাওয়ার জন্য বলতে লাগল। বাসের ড্রাইভারটি ছিল সাহসী, সে বলল, ‘চলো ফিরে যাই!’ ফিরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি হল। বাঘের চিহ্ন নেই, বাচ্চাটাও নেই। পাশে একটা ছোট নদী ছিল, সেখানেও দেখা হল, কিন্তু বাচ্চাটার আর কোনও খোঁজ মিলল না। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, ছেলেটাকে বাঘেই মেরে ফেলেছে। এখন বুঝতে পারছি, বাঘে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মারেনি। এরকম অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটে। তবে বাঘটাকে ধন্যবাদ। সে আমাদের বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপনাকেও ধন্যবাদ।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি বিশেষ কিছু করিনি। এখানে একজন কর্নেলসাহেব আছেন। তিনিই সার্চপার্টির ব্যবস্থা করেছেন। ঠিক সময়ে বাঘিনিটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।”

সুরজ সিংহ বললেন, “আর দেরি করতে পারব না। বাচ্চাটাকে তা হলে নিয়ে যাই?”

কাকাবাবু বললেন, “আজই নিয়ে যাবেন?”

সুরজ সিংহ বললেন, "আমার ভাবী খুবই উতলা হয়ে আছেন আর কাঁদছেন। তিনি খুবই অসুস্থ, বেশিদিন বাঁচবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "ও তো আপনাদের কাউকে এখন চিনবে না। তাই বলছিলাম, দু'-একদিন আপনি এখানে থাকুন, একটু ওর সঙ্গে ভাব করে নিন।"

সুরজ সিংহ বললেন, "আমার তো অত সময় নেই। নিজের ব্যাবসার কাজ ফেলে এসেছি। তা ছাড়া ও আমাকে চিনতে পারছে না, কিন্তু নিজের মাকে দেখে ঠিক চিনবে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাকে কখনও ভোলে না।"

কাকাবাবু চুপ করে গেলেন।

বুনো এতক্ষণ সন্তু আর জোজোর মাঝখানে বসে ছিল। এত কথা সে কিছুই বোঝেনি। এবার সে উঠে চলে যেতে লাগল ঘরের মধ্যে। সন্তুও উঠে দাঁড়াল।

সুরজ সিংহ বললেন, "বলবীর, অন্দর মাত যাও। ইধার আও। মেরা পাস আও।"

বুনো তবু তা শুনল না।

সুরজ সিংহের সেক্রেটারিটি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন, একটুও নড়াচড়া করেননি। এবার তিনি লাফিয়ে উঠে বুনোর ঘাড়টা চেপে ধরলেন।"

বুনো সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে দিল তাঁর অন্য হাত। তিনি উঃ করে উঠলেন।

কাকাবাবু তাকালেন পুলিশ অফিসারের দিকে।

তিনি বললেন, "স্যার, আমাদের উপর অর্ডার আছে, এর বাড়ির লোক নিতে চাইলে তাদের হাতে দিয়ে দিতে হবে। আমরা দায়িত্ব নিতে পারব না। এই লেড়কা, চল।"

তিনি কাছে যেতেই বুনো তাঁর দিকেও হিংস্রভাবে তাকাল।

মোহনকুমার ঠাস করে এক চড় কষালেন তার গালে। এবারে সেক্রেটারিটিও বুনোর অন্য গালে এক চড় কষিয়ে দিলেন।

কাকাবাবু বলে উঠলেন, "এ কী, মারছেন কেন? মারছেন কেন?"

মোহনকুমার বললেন, "কামড়াতে আসছে, মারব না! দুষ্টু ছেলেদের না মারলে তারা কথা শোনে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই তা নয়। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। একটু একটু করে শেখাতে হবে।"

সুরজ সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না

রায়চৌধুরীসাহেব। আমরা ওর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করব। এতদিন পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে। ওর অত ভাইবোন ওকে এত আদর করবে, তাতেই ও ভুলে যাবে।”

মোহনকুমার একটা হাতকড়া বের করে আটকে দিলেন বুনোর দু’হাতে। সন্তু ওর দড়ির বাঁধনটা খুলে দিল।

মোহনকুমার ওর হাতকড়াটা ধরে টেনে বললেন, “চল এবার!”

বুনো শক্তভাবে দাঁড়িয়ে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

সেক্রেটারি তাকে ঠেলতে লাগলেন পিছন থেকে। বুনো কিছুতেই যাবে না। পুলিশ অফিসারটি জোর করে টানতে টানতে নামাতে লাগলেন বারান্দা থেকে। ঠিক যেন একটা চোরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা বাচ্চা চোর।

বুনোর চিৎকার শুনে গেস্টহাউসের সব কর্মচারী আর অন্য ঘরের লোকরাও বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখছে।

বলির পাঁঠাকে দড়ি বেঁধে হাড়িকাঠের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার সময় সে যেমন চ্যাঁচায়, বুনোও সেরকম চ্যাঁচাচ্ছে।

গেটের বাইরে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে বুনোকে তুলে অন্য সবাই উঠে পড়ল। শোনা গেল গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ।

বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু আর জোজো-সন্তু। একটুক্ষণ তিনজনেই চুপ।

একটু পরে সন্তু বলল, “কাকাবাবু, বুনোকে ওইভাবে জোর করে ধরে নিয়ে গেল...।”

কাকাবাবু বললেন, “কী আর করা যাবে, বল? ওর বাড়ির লোক যদি নিয়ে যেতে চায়? আমরা তো বাধা দিতে পারি না।”

সন্তু বলল, “লোকগুলো খুব নিষ্ঠুর। যদি ওকে আরও মারে?”

কাকাবাবু বললেন, “কিছু লোক আছে এরকম, ছোটদের গায়ে হাত তোলে। অন্যভাবেও যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা বোঝে না। তবে, ওর অনেক ভাইবোন, তাদের মাঝে গিয়ে পড়লে ওর নিশ্চয়ই ভালই হবে। আর জঙ্গলে পালাতে পারবে না।”

সন্তু বলল, “ইন্দৌর অনেক দূর। সেখান থেকে বাঘিনিটা এখানে এসেছে, মাঝখানে তো জঙ্গল নেই, তবু কারও চোখে পড়ল না?”

কাকাবাবু বললেন, “অনেক কিছুরই এখনও ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল।

বাঘেরা এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। রাত্তিরের দিকে ফাঁকা মাঠঘাঠ, নদী, ফসলের খেত দিয়েও আসে। ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। তবু কারও চোখে পড়েনি। সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! তবে, বাঘিনিটা যদি বুড়ি না হয়ে যেত, তা হলে এবারেও বোধ হয় অত সহজে ধরা দিত না।"

একটুক্ষণ আবার সবাই চুপ।

এবারে জোজো বলল, "আচ্ছা সন্তু, ওই বুনোর কাকাটা প্রথমে আমাকেই বুনো ভেবে জড়িয়ে ধরতে এসেছিল কেন বল তো? আমাকে কি দেখে মনে হয় জংলি ছেলে?"

সন্তু বলল, "শুধু তাই নয়। তোকে ভেবেছিল দশ বছরের বাচ্চা!"

জোজো বলল, "ধ্যাত!"

কাকাবাবু বললেন,"কালকের জন্য একটা গাড়ি ঠিক করতে হবে। আর তো আমাদের এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। পুলিশও আমাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করবে না। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও।"

কাকাবাবু মান্টো সিংহকে ডাকতে লাগলেন।

জোজো বলল, "যাই বলুন আর তাই বলুন, ছেলেটার উপর বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ভাব হয়ে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। মনটা খুব খারাপ লাগছে।"

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ ৭ ॥

খানিক পরে এসে পৌঁছোলেন কর্নেল। তাঁর হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। বারান্দায় উঠে টেবিলের উপর রাখলেন সেটা।

কাকাবাবু আবার বই নিয়ে বসেছেন, মুখ তুলে বললেন, "আসুন, কর্নেল।"

কর্নেল বললেন, "বাড়ি থেকে মাট্‌ন দোপিঁয়াজা বানিয়ে এনেছি। একটুও ঝাল নেই। দেখতে হবে, ছেলেটা খেতে পারে কি না। সে কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো নেই।"

কর্নেল বললেন, "নেই মানে? আবার পালিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, পালায়নি। গত দু'দিন সে আর পালাবার চেষ্টা করেনি। কিছুক্ষণ আগে ওকে নিয়ে চলে গেল।"

কর্নেল এবার দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "নিয়ে চলে গেল? কে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওর কাকা। খবরের কাগজে ওর ফোটো দেখে চলে এসেছেন ইন্দোর থেকে। ও তিন বছর বয়সে জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "এল আর নিয়ে চলে গেল? ছেলেটা কি ওর কাকাকে চিনতে পেরেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা চিনবে কী করে? ছেলেটা সহজে যেতেও চায়নি।"

কর্নেল বললেন, "তা তো হবেই। ভদ্রলোককে বললেন না কেন, দু'-তিনদিন এখানে থেকে ধীরেসুস্থে ওকে বুঝিয়ে তারপর নিয়ে গেলেই হত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি সেটা বলেছিলাম। ইনি বললেন, ওঁর সময় নেই, ব্যাবসার কাজ আছে।"

জোজো আর সন্তুও কর্নেলের সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

জোজো বলল, "দেখুন না, ওকে কীরকম বিচ্ছিরিভাবে টানতে-টানতে নিয়ে গেল, হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে।"

কর্নেল বললেন, "হ্যান্ডকাফ পরিয়ে? কেন? ও কি ক্রিমিনাল নাকি?"

সন্তু বলল, "দু'-তিনজন মিলে ঠেলাঠেলি করে নিয়ে গিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যদি দেখতেন সে দৃশ্য। ছেলেটা শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে বাচ্চা বাঘের মতোই হুংকার দিচ্ছিল।"

কর্নেল বললেন, "আমি থাকলে ওকে যেতে দিতামই না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "কী করতেন? ওর নিজের কাকা নিতে এসেছে। মা কান্নাকাটি করছে। আপনি আটকে রাখতেন কোন অধিকারে। সঙ্গে পুলিশও ছিল। পুলিশের উপর তো কথা বলা যায় না।"

কর্নেল বললেন, "পুলিশ অফিসারের নাম কী?"

কাকাবাবু বললেন, "মোহনকুমার। তবে, ওর কাকাকে মনে হল ভাল লোক। তবে আমি বলেছি, দেখবেন, ছেলেটার সঙ্গে যেন কেউ খারাপ ব্যবহার না করে। উনি বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। মাকে দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা তো হতেই পারে।"

একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে কর্নেল বললেন, "সন্তু, জোজো, তোমরাই মাংসটা খাও। একটু কাঁচালঙ্কার ঝাল মিশিয়ে নিতে পারো।"

তারপর তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "রায়চৌধুরীসাহেব, কাল তা হলে আমরা সকালবেলা বেরিয়ে পড়ি? এই দশটা আন্দাজ, কী বলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল সকালে? কোথায় যাব?"

কর্নেল বললেন, "বাঘ-গুহার ছবিটবি দেখতে যাব। আগেই তো সেরকম কথা ছিল। মাঝখানে এই সব ঝঞ্ঝাটের জন্য যাওয়া হল না। এখন ঘুরে আসা যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "সে আর হবে না। কাল সকালেই আমরা ফিরে যাচ্ছি।"

কর্নেল বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কাল সকালেই ফিরে যাবেন? সে কী? কেন, এত তাড়াহুড়োর কী আছে। না, না, কাল আপনাদের যাওয়া হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কর্নেল, আর দেরি করা যাবে না। গাড়ি ঠিক করে ফেলেছি, সকাল সাড়ে দশটায় রওনা হব।"

কর্নেল বললেন, "আপনি না হয় বাঘ-গুহা দেখেছেন, কিন্তু অমন চমৎকার জায়গা এই ছেলে দুটো দেখবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ছেলে দুটোর কলেজ খুলে যাচ্ছে। আমার নিজেরও কিছু কাজ আছে।"

কর্নেল বললেন, "আপনার আবার কাজ কী? আপনাকে তো অফিসটফিসে যেতে হয় না?"

কাকাবাবু এবার হেসে বললেন, "যারা অফিসে যায় না, তারা বুঝি কেউ কোনও কাজ করে না? আমার কিছু কিছু কাজ থাকেই।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, কাজ থাকে, আবার তার থেকে ছুটিও বের করা যায়। আর ওদের কলেজ, দু'-চারদিন ফাঁকি দিলে এমন কিছু ক্ষতি হয় না। আমরাও কলেজ জীবনে এরকম ফাঁকি দিয়েছি। কী, তোমরা বাঘ-গুহা দেখতে চাও না?"

সন্তু আর জোজো কিছু বলল না। কাকাবাবু যা বলবেন, তার উপরে তো ওরা কোনও কথা বলতে পারে না!

কাকাবাবু বললেন, "ওরা পরে আবার আসবে। তখন নিজেরা সব কিছু ঘুরে দেখবে। এবারের মতো বেড়ানো শেষ।"

কর্নেল বললেন, "আশপাশে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আমি ঠিক করেছিলাম, আপনাদের নিয়ে ঘুরব। আমি সব ভাল চিনি, আমার চেয়ে ভাল

করে আর কেউ দেখাতে পারবে না। এমনকী ভাবছিলাম, একবার ইন্দৌরও ঘুরে আসব। ওই ছেলেটার বাড়িটাও দেখে আসা হবে। মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ছেলেটা কী করল, মাকেও চিনতে পারল কি না, তা জানতে আপনাদের ইচ্ছে করে না?"

কাকাবাবু বললেন, "আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? বাড়ির লোক নিয়ে গিয়েছে, ও ছেলে নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবে নিজেকে। আমাদের মতো বাইরের লোকের আর নাক গলানো উচিত নয়।"

হঠাৎ খুব তেড়ে বৃষ্টি এসে গেল। পাহাড়ি জায়গায় যেমন হয়। এত জোর বৃষ্টির ছাঁট যে, বারান্দায় আর বসা যাবে না।

সবাই উঠে গেলেন ঘরের মধ্যে।

কর্নেলসাহেব আরও কিছুক্ষণ ধরে কাকাবাবুকে আর কয়েকটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু কাকাবাবু অনড়।

কিছুক্ষণ অন্য গল্পও হল, তারপর কর্নেল বিদায় নিলেন বৃষ্টির মধ্যেই।

তারপরেই মান্টো সিংহ এসে কাকাবাবুদের ডাকল খাবারের ঘরে যাওয়ার জন্য।

আজই এই গেস্টহাউসে কিছু নতুন লোক এসেছে, তাদের মধ্যে অবশ্য বাঙালি কেউ নেই। তাদের মধ্যেও কয়েকজন কাকাবাবুর কাছে টাইগার বয়ের কথা জানতে চাইল। কিন্তু তাঁর আজ গল্প করার মুড নেই।

খাওয়ার পর নিজেদের ঘরে ফিরে এসে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোদের সুটকেস গুছিয়ে নে। কাল সকালের জন্য ফেলে রাখিস না। আমরা চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব। রাস্তায় কোথাও ব্রেকফাস্ট খাব।"

সারা ঘরেই জিনিসপত্র ছড়ানো।

বড় ঘরটায় একটা খাটে কাকাবাবু, অন্য খাটে জোজো আর সন্তু। এর মধ্যে কয়েক দিন বুনো ছেলেটি শুয়েছে সন্তুর সঙ্গে, আর জোজো গিয়েছে কাকাবাবুর খাটে। বুনো অনেক জিনিস এদিক-সেদিক ছুড়ে দিত। যেসব জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি, যেমন ঘড়ি, টর্চ, সাবান এইসব সে হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখেছে, তারপর ফেলে দিয়েছে।

একটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো থেকে হঠাৎ মানুষের গলা শুনে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার একটা প্যান্ট আর শার্ট পড়ে আছে খাটের নীচে।

সন্তু আর জোজো টপাটপ সব তুলে ভরতে লাগল দুটো সুটকেসে।

প্রায় সবই তোলা হয়ে যাওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে জোজো,

সেই হিরের আংটিটা কোথায় গেল? সেটা তো দেখছি না?"

জোজো বলল, "সেটা তো একটা ভেলভেটের বাক্সে ছিল এখানে এই টেবিলের উপরে। দুপুরেও দেখেছি। তারপর তুই রাখিসনি?"

সন্তু বলল, "না তো?"

জোজো বলল, "তা হলে কাকাবাবু বোধহয় কোথাও সরিয়ে রেখেছেন।" সন্তু বাইরের বারান্দায় এসে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কাছে কি হিরের আংটিটা আছে?"

কাকাবাবু বই থেকে চোখ তুলে বললেন, "উঁহু।"

সন্তু বলল, "সেটা কোথাও পাচ্ছি না।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "কোথায় আবার যাবে? ভাল করে খুঁজে দ্যাখ।"

এরপর আবার দু'জনে মিলে সারা ঘর তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও সে আংটি নেই। এ ঘরের বাইরে তো সেটা কখনও নিয়ে যাওয়া হয়নি।

তা হলে কি চুরি?

তা ছাড়া আর অন্য কিছু তো ভাবা যাচ্ছে না। এবার কাকাবাবুকে আবার বলতেই হল।

কাকাবাবু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন। ঘরের মধ্যে এসে চারদিক তাকিয়ে বললেন, "পাওয়া যাচ্ছে না? অন্য কেউ নিয়েছে নিশ্চয়ই।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কে নিতে পারে?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো বলা মুশকিল। আমরা তো বাইরে বেরোবার সময় দরজায় তালা দিই না। যে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে। আমাদেরই জিনিসটা সাবধানে রাখা উচিত ছিল। যাকে-তাকে সন্দেহ করা আমি পছন্দ করি না। ধরে নাও হারিয়েই গিয়েছে।"

তবু একটু পরে মান্টো সিংহ ঘরে জলের বোতল দিতে এলে, জোজো জিজ্ঞেস করে ফেলল, "মান্টো সিংহ, হিরের আংটি দেখা? হিঁয়া পর থা।"

মান্টো সিংহ বলল, "নেহি তো! নেহি দেখা।"

জোজো বলল, "একটা ভেলভেটের বাক্সে ছিল, কেউ নিয়ে গিয়েছে।"

মান্টো সিংহ বলল, "ওই জঙ্গল কা লেড়কা, ও নিয়ে যায়নি তো?"

কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "যাঃ, বাজে কথা বোলো না। ও ছেলেটা আংটির কিছুই বোঝে না। টাকাও চেনে না। ও কেন নিতে যাবে? গিয়েছে, গিয়েছে, ওই আংটির কথা ভুলে যাও!"

কাকাবাবু ও বিষয়ে আর কাউকে কোনও কথাই বলতে দিলেন না।

পরদিন সকালবেলা চা-বিস্কুট খেয়ে তৈরি হয়ে নিল সন্তু আর জোজো। সুটকেস বন্ধ করা হয়ে গিয়েছে। তবু মন খুঁতখুঁত করছে ওদের দু'জনের। আবার খুঁজে দেখল সব জায়গায়। কোথাও নেই সেই আংটি।

খানিক পরেই এসে গেলেন কর্নেল। বললেন, "আপনাদের বিদায় জানাতে এলাম। আপনারা দেখছি একদম রেডি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, রেডি। একটু পরেই ভাড়ার গাড়ি এসে যাবে।"

কর্নেল একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, "আপনাদের সেই দামি আংটিটা চুরি গিয়েছে শুনলাম?"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে?"

কর্নেল বললেন, "গেটের কাছেই মান্টো সিংহ বলল আমাকে। ও লোকটি খুব বিশ্বাসী, ও চুরি করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে আমরা সন্দেহও করিনি।"

কর্নেল বললেন, "তা হলে কাকে সন্দেহ হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "কাউকেই না। ওইটুকু একটা ছোট্ট জিনিস, কেউ নিয়ে লুকিয়ে রাখলে খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। শুধু শুধু কাউকে সন্দেহ করার তো কোনও মানে হয় না।"

কর্নেল বললেন, "আপনি কত বড় বড় রহস্যের সমাধান করেছেন। আর এই সামান্য একটা আংটি-চোরকে ধরতে পারবেন না?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সামান্য বলেই পারব না। এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। চোর ধরা আমার কাজ নয়।"

কর্নেল বললেন, "তা হলে আমিই চেষ্টা করি। ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছি, যাদের একেবারেই সন্দেহ করা যায় না, তাদের মধ্যে একজন কেউ কালপ্রিট হয়। সেইভাবে শুরু করা যাক। প্রথমেই ধরা যাক আপনি, মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনাকে সন্দেহ করার কোনও উপায়ই নেই, কারণ আংটিটা আপনারই। নিজের জিনিস কেউ চুরি করে না। কী বলো, সন্তু?"

সন্তু একটু হাসল।

কর্নেল বললেন, "সন্তুকেও সন্দেহ করা যায় না, কারণ আংটিটা ওকেই দেওয়ার কথা। ও কেন চুরি করবে শুধু শুধু। তবে, জোজো, তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। সে ইচ্ছে করলে, মানে, তার পক্ষেই আংটিটা নেওয়া সবচেয়ে সুবিধেজনক।"

জোজো ফস করে রেগে উঠে বলল, "কী, আপনি আমাকে আংটি-চোর বলছেন? আমাদের বাড়িতে ওরকম কত আংটি আছে আপনি জানেন? কত রাজা-মহারাজারা এসে আমার বাবাকে উপহার দেন। হিরের আংটি, মুক্তোর আংটি, চুনি-পান্নার আংটি। আমাদের বাথরুমেও ওসব আংটি গড়াগড়ি যায়।"

কর্নেল বললেন, "তোমাদের বাড়িতে অনেক আংটি, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বাথরুমে আংটি গড়াগড়ি যায় কেন?"

জোজো বলল, "আমার মা নতুন নতুন আংটি পরেন। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে আংটি খুলে রাখেন, আর পরে নিতে ভুলে যান। ওগুলো সেখানেই পড়ে থাকে।"

কর্নেল বললেন, "ও।"

জোজো এবার আঙুল তুলে বলল, "আপনাকেও সন্দেহ করা যেতে পারে। আপনিও আমাদের ঘরে এসে বসেছিলেন।"

কর্নেল বললেন, "এটা ঠিক বলেছ। খুব বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। আমাকে তো সন্দেহ করা যেতেই পারে। আমি তো ইচ্ছে করলেই আংটিটা টপ করে পকেটে ভরে নিতে পারতাম!"

তিনি নিজের হাতটা কোটের পকেটে ভরলেন। তারপর ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে হাতটা আবার বের করে বললেন, "এই দ্যাখো! আমিই নিয়েছিলাম। কেন বলো তো?"

সন্তু অস্ফুটভাবে বলল, "ক্রিপটোম্যানিয়াক!"

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, 'ক্রিপটোম্যানিয়াক' মানে তো যারা কোনও দরকার না থাকলেও গোপনে অন্যের জিনিস নিয়ে নেয়, আমি তা নই! আমি আংটিও পরি না। এটা নিয়েছিলাম, যাতে তোমাদের আরও দু'-তিনদিন এখানে আটকে রাখা যায়। কাল অত করে অনুরোধ করলাম, তোমাদের কাকাবাবু কিছুতেই থাকতে রাজি হলেন না। ভেবেছিলাম, এরকম একটা দামি জিনিস হারালে নিশ্চয়ই অনেক খোঁজাখুঁজি করবেন, পুলিশে খবর দেবেন। এমনকী, বুনো ছেলেটাকে সন্দেহ করলে ইন্দৌরও যেতে রাজি হতে পারেন। এখন তো দেখছি, ইনি একজন মহাপুরুষ! এক লাখ-দেড় লাখ টাকা দামের একটা জিনিস হারিয়ে গেল কিংবা চুরি হল, তাও উনি গ্রাহ্যই করলেন না? পুলিশেও খবর দিলেন না?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "মহাপুরুষ টহাপুরুষ কিছু নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে

আমি জানি, আংটি চুরি গেলে পুলিশ কোনও দিনই তা খুঁজে দিতে পারে না। শুধু শুধু আর এখানে বসে থেকে লাভ কী? আর, ওই বুনোকে আমি কিছুতেই সন্দেহ করতাম না। যে কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ মিথ্যে কথাও শেখেনি। যারা মিথ্যে কথা বলতে শেখে না, তারা চুরিও করে না।"

কর্নেল বললেন, "তা বোধহয় ঠিক। যাই হোক, চলেই যখন যাচ্ছেন, আপনাকে দু'-একটা খবর দিই। কাল আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে আমি একবার থানায় গিয়েছিলাম। মোহনকুমার লোকটা ভাল নয়, ঘুষটুষ খায়। যাই হোক, ওর কাছ থেকে আমি সুরজ সিংহের ঠিকানা নিয়ে নিলাম। কারণ, ওই বুনো ছেলেটা কেমন থাকেটাকে, তা আমার একবার দেখে আসার ইচ্ছে আছে। ইন্দৌরের পুলিশ কমিশনার সুজনপ্রসাদ আমার বিশেষ বন্ধু। কাল রাত্তিরেই তাকে ফোন করে বললাম, সে যেন ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে একটু খোঁজখবর নেয়। প্রথম প্রথম কিছু প্রবলেম তো হতেই পারে, পুলিশ যদি সাহায্য করে...।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা আপনি ভালই করেছেন।"

কর্নেল বললেন, "আজ সকালেই সুজন প্রসাদের ফোন পেয়েছি। সে বলল, ইন্দৌর শহরে সুরজ সিংহ নামে কোনও ব্যবসায়ী নেই, যে ঠিকানা সে দিয়ে গিয়েছে, ওই নামে ইন্দৌর কোনও রাস্তা নেই। সবটাই মিথ্যে।"

জোজো বলল, "ও মা, তা হলে ওরা বুনোকে কোথায় নিয়ে গেল?"

কর্নেল বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, ও লোকটা বুনোর কাকা নয়।"

জোজো বলল, "আমারও একবার তাই মনে হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন," যাঃ! ওই বয়সের কত গরিবের ছেলে রাস্তায় থাকে, ভাল করে খেতে পায় না, কেউ কি তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়? তবে এই ছেলেটার জন্য কেন একজন লোক মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এত দূর ছুটে আসবে? হয়তো ঠিক ইন্দৌর নয়, কাছাকাছি অন্য কোনও শহরে ওদের বাড়ি।"

কর্নেল বললেন, "সুরজ সিংহ আপনাকে কোনও কার্ড দিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না। আমিও চাইনি। পুলিশের কাছেই তো ঠিকানা রেখে গিয়েছে। আপনার বন্ধু সুজনপ্রসাদকে আবার খোঁজ নিতে বলুন।"

সন্তু বলল,"দমদম কিংবা বরানগরে যারা থাকে, তারাও তো বাইরে এসে বলে, কলকাতায় থাকি। সেইরকম সুরজ সিংহরাও বোধহয় ইন্দৌরের আশপাশে কোথাও...।

কর্নেল বললেন, "অত তাড়াহুড়ো করে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, ইন্দৌর

ঠিকানাটা মিলছে না, তাই কীরকম যেন রহস্যজনক লাগছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সব কিছুর মধ্যে এমন রহস্য খুঁজে লাভ নেই। ছেলেটা ভালই থাকবে আশা করি। আমাদের তো এর বেশি আর কিছু করার নেই। চল রে সন্তু। এবার আমাদের বেরোতে হবে।”

কর্নেল বললেন, “আপনাদের কিন্তু আবার এখানে আসতে হবে। অনেক কিছুই তো দেখা হল না।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ। দেখা যাক, আবার কবে হয়। আপনি কলকাতায় গেলে অবশ্যই আমাদের বাড়িতে আসবেন। তখন অনেক গল্প হবে।”

কর্নেল একে একে সন্তু আর জোজোকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। তারপর কাকাবাবুর হাত ধরে বললেন, “আবার দেখা হবে। ভাল থাকবেন!”

॥ ৮ ॥

কলেজ থেকে ফিরে সন্তু দেখল, কাকাবাবুর ঘরে দু’জন ফরসা বিদেশি বসে আছেন, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা।

নিশ্চয়ই কোনও দেশ থেকে কাকাবাবুকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। এরকম আজকাল আসছে অনেকেই। কাকাবাবু সহজে যেতে চান না। বিদেশে তাঁর থাকতে ইচ্ছে করে না বেশি দিন।

সন্তুর আজ ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশনের খেলা আছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ছ’টার সময়। সে একটু পরেই বেরিয়ে গেল।

সে ফেরার পর কাকাবাবু তাকে ডেকে বললেন, “কী রে, তোর খেলার রেজাল্ট কী হল?”

সন্তু বলল, “জিতেছি। এবার সেমিফাইনাল। পরশু দিন আবার খেলা।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সেমিফাইনালে কার সঙ্গে খেলতে হবে?”

সন্তু বলল, “একটি জাপানি ছেলে। জুনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “জাপানিরা ব্যাক-হ্যান্ডে খুব ভাল খেলে। কাল একটু প্র্যাক্টিস করে নে।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “আজ বিকেলে যে সাহেবরা এসেছিল, তারা কোন দেশের?”

কাকাবাবু বললেন, "নিউজিল্যান্ডের। ওদের মধ্যে একজন আমার অনেক দিনের চেনা। এবার মনে হচ্ছে একবার যেতেই হবে। কয়েকবার যাব বলে যেতে পারিনি। ওখানে একটা দ্বীপে মাঝে মাঝেই রাত্তিরবেলা আলো জ্বলে ওঠে। নীল রঙের, বেশ জোরালো আলো। কিন্তু সে দ্বীপে কোনও বাড়িঘর নেই। মানুষ থাকে না। জাহাজ থেকে আলোটা দেখা যায়। অথচ জাহাজ থেকে সে দ্বীপে নেমে খুঁজলেও সে আলোর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ফিরে গিয়ে জাহাজে উঠলেই আবার দেখা যায় সেই আলো। ওরা দেশবিদেশ থেকে বেশ কয়েকজনকে ডাকছে, ব্যাপারটা দেখে যদি রহস্য উদ্ধার করা যায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কবে যেতে হবে তোমাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "আর দিন দশেকের মধ্যে।"

সন্তু অমনই আবদারের সুরে বলল, "আমি যেতে পারি না? শুনেছি নিউজিল্যান্ড খুব সুন্দর দেশ।"

কাকাবাবু বললেন, "আহা! তোর এখন কলেজ খোলা, তা ছাড়া খেলা চলছে, তুই যাবি কী করে?"

সন্তু আরও কিছু বলতে গেল, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। কাকাবাবু ইঙ্গিত করলেন সন্তুকে ফোনটা ধরার জন্য।

সন্তু ফোন তুলে গলা শুনে বলল, "কর্নেলকাকা? কেমন আছেন?"

মাণ্ডু থেকে ফিরে আসার পর এক মাস কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝেই ফোন করেন কর্নেল। কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প হয়।

এখন তিনি বললেন, "সন্তু? শোনো, বাঙালিদের সঙ্গে ফোনে কিংবা দেখা হলে প্রথম কথাই হচ্ছে, কেমন আছেন, তাই না? উত্তরে বলতে হয়, ভাল আছি। কিন্তু আমি আজ তা বলতে পারছি না। আমি ভাল নেই।"

সন্তু বলল, "কেন, কী হয়েছে?"

কর্নেল বললেন, "আমাকে বাঘে কামড়েছে!"

সন্তু বলল, "অ্যাঁ! কী বলছেন, আবার ওখানে বাঘ বেরিয়েছে?"

কর্নেল এবার হাসতে হাসতে বললেন, "না! সেরকম কিছু না। আমার পা ভেঙে গিয়েছে। আমি এখন শয্যাশায়ী।"

সন্তু কাকাবাবুকে বলল, "কর্নেলকাকার পা ভেঙে গিয়েছে।"

ফোনটা সে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

কাকাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার কর্নেলসাহেব, পা ভাঙল কী করে?"

কর্নেল বললেন, "সন্তুকে এমনই ভয় দেখাচ্ছিলাম। এমন কিছু হয়নি। যাকে বলে শুকনো ডাঙায় আছাড়। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, পায়ে রবারের চটি, এক পায়ের চটি হঠাৎ খুলে গেল, সেটাকে ধরতে গিয়ে গড়িয়ে গেলাম। একেবারে নীচে। এক পায়ে ফ্র্যাকচার, অন্য পায়েও বেশ লেগেছে। এখন একেবারে শয্যাশায়ী। আপনার মতো ক্র্যাচ বগলে নিয়ে কোনওরকমে বাথরুমে যেতে পারি। তাও নার্স রাখতে হয়েছে। এখন একমাস বাড়িতে বন্দি।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস, দুটো পায়েই লেগেছে!"

কর্নেল বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। কী আর করা যাবে। যে-কোনও লোকেরই হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "কী আর বলব? সাবধানে থাকবেন। বেশি নড়াচড়া করবেন না।"

কর্নেল বললেন, "শুনুন, আমার অ্যাকসিডেন্টের খবর দেওয়ার জন্য আপনাকে ফোন করিনি। আর-একটা খবর দিতে চাই। সেই সুরজ সিংহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সে মোটেই বুনোর কাকা নয়। সে একটা সার্কাসের মালিক। সে বুনোকে দিয়ে তার সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ! ওইটুকু ছেলেকে দিয়ে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে?"

কর্নেল বললেন, "এবার বুঝতে পারছেন, অন্য গরিবের ছেলে কিংবা রাস্তার ছেলের সঙ্গে বুনোর কী তফাত? সে বাঘকে ভয় পায় না? সেই জন্যই ওই সুরজ সিংহ অত দূর থেকে এসে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছে। এখন নিজের কাজে লাগাচ্ছে। আরও খবর পেয়েছি যে, ওর সার্কাসে যে লোকটা বাঘের খেলা দেখাত, সে হঠাৎ মারা গিয়েছে। বাঘের খেলা না দেখালে সার্কাসে টিকিট বিক্রি হয় না, তাই ও বুনোকে সেই কাজে লাগাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু অতটুকু ছেলেকে কাজে লাগানো তো বেআইনি। সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোও এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

কর্নেল বললেন, "ওসব আইনটাইন শহরে মানা হয়। গ্রামের দিকে কেউ ওসব গ্রাহ্য করে না। কত বাচ্চাকে মারধর করে এখনও খাটানো হয়। শুনুন স্যার, খবরটা আপনাকে দিলাম, কিন্তু আপনি এ নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। আপনি আর অত দূর থেকে কী করবেন? আমি একটু সেরে উঠি, তারপর ওই সুরজ সিংহ ব্যাটাকে ধরব। তখন কী হয়, আপনাকে আবার জানাব।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায় সার্কাস দেখাচ্ছে, আপনি জানেন?"

কর্নেল বললেন, "তাও জানি। চিত্রকূটে। সেটা কোথায় আপনি জানেন?"

কাকাবাবু বললেন, "মোটামুটি ধারণা আছে।"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি সেরে উঠেই ওই সুরজ সিংহের গলা টিপে ধরব।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।"

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। সন্তু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "বুনোর কী হয়েছে তুই শুনলি?"

সন্তু বলল, "ওকে দিয়ে সার্কাসের কাজ করাচ্ছে?"

কাকাবাবু বললেন,"হ্যাঁ। কাজটা খুবই অন্যায়। কিন্তু আমরা কী করে দায়িত্ব নেব বল? তা ছাড়া এখন এত কাজ, আমি যে বইটা লিখছি, সেটা শেষ করার জন্য তাড়া দিচ্ছে, এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড যেতে হবে...।"

সন্তু চুপ করে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দায়িত্ব নেই ঠিকই, তবু মনটা কেমন কেমন করছে।"

সন্তু বলল, "আমার খুবই খারাপ লাগছে। ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে দেখি। কাকাবাবু, চলো না যাই চিত্রকূটে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যদি বা কাজ ফেলে যেতে পারি, তুই যাবি কী করে? তোর খেলা, কলেজ।"

সন্তু বলল, "পরেও অনেক খেলা যাবে। কলেজেও কয়েক দিন না গেলে কিছু হবে না। শনি-রবি তো ছুটিই। এটা একটা ছেলের জীবনের ব্যাপার। যদি কিছু করা যায়...!"

কাকাবাবু বললেন, "চল, তা হলে। জোজোকে কিছু জানাবার দরকার আছে?"

সন্তু বলল, "একেবারে কিছু না জানিয়ে গেলে ও দুঃখ পাবে। ওকে ফোন করে দেখি।"

সন্তু ফোন নিয়ে বসল। কাকাবাবু মধ্যপ্রদেশের একটা ম্যাপ নিয়ে দেখতে লাগলেন।

পরদিনই ওরা তিনজন প্লেনে চেপে চলে এলেন গ্বালিয়র। রাত্তিরটা একটা

হোটেলে থেকে, পরদিন একটা গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা শুরু হল।

দিনটা সুন্দর, আকাশে পাতলা-পাতলা মেঘ, গরম কমে এসেছে। এদিককার রাস্তাও ভাল।

কিছুদূর যাওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা যে চিত্রকূটে যাচ্ছি, সেটাই কি রামায়ণের চিত্রকূট?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, রামায়ণে চিত্রকূটের সুন্দর বর্ণনা আছে। চিত্রকূট পাহাড় আর জঙ্গল, এখানেই নাকি রাম-সীতা-লক্ষ্মণ থেকেছেন অনেক দিন। তলায় মন্দাকিনী নদী। তবে রামায়ণের সময়কার মতো অমন শান্ত, সুন্দর জায়গা আর এখন নেই। পাশেই শহর হয়ে গিয়েছে। রেলস্টেশনও হয়ে গিয়েছে।"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই অনেক লোকজনও আছে। নইলে আর সার্কাস চলবে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "এরকম এক-এক জায়গায় তিন-চারদিন সার্কাস চলে, তারপর তাঁবু গুটিয়ে আর-একটা শহরে চলে যায়। এখান থেকেও চলে গিয়েছে কি না দেখতে হবে খোঁজ নিয়ে।"

চিত্রকূট রেলস্টেশনের কাছে পৌঁছে দেখা গেল সার্কাসের বিরাট বিজ্ঞাপন। তলায় লেখা, 'আজই শেষ দিন'।

সন্ধে হয়ে এসেছে। কাকাবাবু বললেন, "চলো, আগেই সার্কাস দেখে আসি। থাকার জায়গা পরে ঠিক করব।"

ড্রাইভারকে যেতে বললেন সার্কাসের ময়দানে।

বেশ মস্ত বড় তাঁবু। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। ভিতরে বাজনা বাজছে খুব জোরে।

গেটের কাছে গিয়ে জানা গেল, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে আধঘণ্টা আগে।

কাকাবাবু বললেন, "তাতে ক্ষতি নেই। বাঘের খেলা শেষের দিকেই হয়।"

টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনজন।

তখন চলছে একজন ক্লাউনের খেলা।

তারপর চারটে ঘোড়া দৌড়োল, তাদের পিঠের উপর দাঁড়িয়ে দু'জন পুরুষ আর দু'জন মেয়ে। এরও পরে ট্র্যাপিজের খেলা, বাঁদরের খেলা।

একটু পরে স্টেজটা একেবারে খালি হয়ে গেল। তারপরই দুমদুম করে খুব

জোরে বেজে উঠল ড্রাম। ভ্যাঁ-পোঁ-পোঁ করে বিউগল। বোঝাই গেল, এবার বিশেষ কেউ আসছে।

একটা চাকা লাগানো বিরাট খাঁচা। ঘরঘর শব্দে সেটাকে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে এল তিনজন লোক। তারপর উপর থেকে তার টেনে খুলে দেওয়া হল সেই খাঁচার দরজা।

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বাঘ। বেশ বড়।

তার পা দুটো মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা।

বাঘকে নিয়ে খেলা দেখাবার কেউ নেই। উইংসের পাশ থেকে একটা লোক একটা লম্বা চাবুক দিয়ে বাঘটাকে মারতে লাগল। সেই চাবুকটায় শব্দ হতে লাগল চটাস-চটাস করে।

সেই চাবুকটা লাগছে আর বাঘটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। চলতেই লাগল এরকম।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "বাঘটাকে শুধু শুধু এরকম কষ্ট দিচ্ছে কেন?"

সন্তু বলল, "কষ্ট না দিলে বাঘটা আওয়াজ করবে না, তাতে লোকে ভয়ও পাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "জন্তু-জানোয়ারদের কষ্ট দিয়ে এরকম খেলা দেখানো এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

একটু পরে আরও একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার শুরু হল।

উইংসের পাশ থেকেই একটা গামলাভরতি মাংস ঠেলে দেওয়া হল বাঘটার সামনে। সেই গামলার একটা আংটায় দড়ি বাঁধা।

বাঘটা যেই মাংসে মুখ দিতে আসছে, অমনি সেটা টেনে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এরকম চলল পাঁচ-ছ'বার।

অর্থাৎ বাঘটা চাবুক খেয়ে রেগে আছে। তার উপর সামনে মাংস দেখেও খেতে পারছে না। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। রাগে সে অনবরত গরগর করছে।

এই সময় উপর থেকে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হল একটা ছেলেকে। তারও পা-দুটো বাঁধা, হাতদুটো খোলা।

দর্শকরা সবাই ভয়ের আওয়াজ করে উঠল। ক্ষুধার্ত, রাগী বাঘটা নিশ্চয়ই ওকে এবার খাবে।

ছেলেটাকে উপর থেকে নামানোর সময় বাঘটা একটা জোর হুংকার

দিয়েছে। ছেলেটা তার কাছে নামার পর সে একটা থাবা তুলেও থেমে গেল। তারপর মুখটা উপরের দিকে তুলে একটা অদ্ভুত অন্যরকম আওয়াজ বের করল।

জোজো বলল, "এই তো আমাদের বুনো।"

ছেলেটার গায়ে একটা কটকটে লাল রঙের জামা আর একটা সবুজ হাফপ্যান্ট। গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধা। এদিক-ওদিক মুখ ফেরালেই টুং টাং শব্দ হচ্ছে।

বাঘটা ছেলেটার গায়ের গন্ধ শুঁকতে এলে সে যেন কী বলে উঠল। বাঘটাও শব্দ করল দু'বার। ঠিক যেন কথা বলছে দু'জনে।

কয়েকবার সেরকম কথা বলার পর বাঘটা বুনোর পিঠে মাথা ঘষে আদর করল একটুখানি। তারপর ঢুকে গেল খাঁচার মধ্যে।

সমস্ত দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। সে হাততালি আর থামতেই চায় না।

একটা বাঘ মানুষকে আদর করছে। এই দৃশ্য কেউ কখনও দেখেছে? মানুষ আর বাঘ কথা বলছে, এরকম কেউ কখনও শুনেছে?

কাকাবাবুর মুখখানা রাগে গনগন করছে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। আর দেখার দরকার নেই। চল বাইরে।"

বাইরে এসে তিনি একজন লোককে জিজ্ঞেস করলেন, "মালিক কোথায় আছে?"

লোকটি হাত তুলে পিছনের একটা ছোট তাঁবু দেখিয়ে দিল।

সেই তাঁবুর সামনে একজন লোক পাহারা দিচ্ছে। সে হাত তুলে বলল, "কাঁহা যাতা?"

কাকাবাবু বললেন, "মালিকের সঙ্গে কথা বলব। এখনই।"

লোকটি বলল, "এখন দেখা হবে না। মালিক ঘুমোচ্ছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ডেকে তোলো। এই অসময়ে ঘুমোবে কেন?"

লোকটি তবু বাধা দিতে গেলে, কাকাবাবু একটা ক্র্যাচ তুলে তার বুকে ঠেকিয়ে বললেন, "হঠ যাও!"

সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখা গেল, সত্যিই একটা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে বিশাল চেহারার সুরজ সিংহ। মেঘের মতো নাক ডাকছে।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে ডাকলেন, "সুরজ সিংহ, উঠুন।"

তাতেই লোকটির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে প্রথমে তিনি খুবই অবাক

হলেন। তারপর উঠে বসে বললেন, "রায়চৌধুরীসাব, আইয়ে, আইয়ে। সার্কাস দেখতে এসেছেন? কেমন লাগল?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব খারাপ!"

সুরজ সিংহ একগাল হেসে বললেন, "আপনার ভাল লাগেনি, এই লেড়কা দু'জনের নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে। এরকম বাঘের খেলা আর কোথায় পাবেন?"

সন্তু আর জোজো চুপ করে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওইটুকু ছেলেকে দিয়ে আপনি খেলা দেখাচ্ছেন, সেটা অন্যায়। সার্কাসে বাঘের খেলা দেখানোই এখন বেআইনি। আপনাকে এ জন্য শাস্তি পেতে হবে। আপনি এ ছেলেটার কাকা নন। আপনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ছেলেটিকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। কেউ আমাকে মিথ্যে কথা বলে ঠকালে আমি তা সহ্য করতে পারি না।"

সুরজ সিংহ বললেন, "আরে বসুন, বসুন। অত রাগারাগি করছেন কেন? আমি ছেলেটির কাকা নই, আপনিই বা ওর কে? কেউ নন, আপনারও কোনও রাইট নেই। আমি বরং ছেলেটাকে চাকরি দিয়েছি, এখানে খেতে-পরতে পাবে, এতে দোষ কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "দশ বছরের ছেলের চাকরি? তাও হাত-পা বেঁধে? ওই বয়সের ছেলে এখন লেখাপড়া শিখবে, আর পাঁচটা ছেলের মতন খেলাধুলো করবে। তারপর আঠেরো বছর বয়স হলে ও বাঘের খেলা দেখাবে না কি অন্য কাজ করবে, তা ও নিজে ঠিক করবে। ওকে জোর করে আটকে রাখার কোনও অধিকার নেই আপনার। ছেলেটাকে ফেরত দিন।"

টেবিল থেকে একটা মোটা খাম তুলে নিয়ে কাকাবাবুর দিকে ছুড়ে দিয়ে সুরজ সিংহ বললেন, "এতে বিশ হাজার রুপিয়া আছে। এটা নিয়ে চুপচাপ চলে যান। কেন ঝামেলা করছেন? ও ছেলেকে আমি ফেরত দেব না, আমার সার্কাস কানা হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু এবার আরও দপ করে জ্বলে উঠলেন। দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কী, আমাকে ঘুষ দেবার চেষ্টা? সুরজ সিংহ, তুমি আমাকে চেনো না। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আমি এখনই তোমার এই সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।"

খামটা তুলে তিনি ছুড়ে মারলেন সুরজ সিংহের মুখে। তাতেও না থেমে তিনি বাঁ-হাতের উলটো পিঠ দিয়ে তাকে এক জোর থাপ্পড় কষালেন। তারপর

বললেন, "ছোট ছেলেদের যারা কষ্ট দেয়, তারা কি মানুষ? তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। তোমার নিজের ছেলেমেয়ে নেই?"

সুরজ সিংহ বললেন, "ওসব বড় বড় কথা ঢের শুনেছি। বাঙ্গালিবাবু, তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ, তুমি এখান থেকে জিন্দা বেরোতে পারবে না। তোমাকে মেরে বালিতে পুঁতে দেব?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি?"

তাঁবুর এক কোণে একটা রাইফেল দাঁড় করানো। সুরজ সিংহ সেটার দিকে হাত বাড়িয়েও ধরতে পারলেন না। কাকাবাবু তার আগেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে তার হাতের তালু ফুটো করে দিলেন।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে সুরজ সিংহ চেঁচিয়ে ডাকলেন, "জগদ্দীশ, কাদের, জলদি ইধার আও!"

সন্তু তড়াক করে টেবিলটা ডিঙিয়ে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল। তার নলটা সুরজ সিংহের বুকে ঠেকিয়ে ধরল।

জোজো বলল, "ও কিন্তু সত্যি রাইফেল চালাতে জানে।"

দু'জন গুন্ডামতো লোক ডান্ডা হাতে নিয়ে ঢুকে এল ভিতরে।

কাকাবাবু তাদের দিকে ফিরে বললেন, "ওসব ডান্ডাফান্ডা ফেলে দাও। আমি যা বলছি শোনো। বাচ্চা ছেলেটিকে দিয়ে বাঘের খেলা দেখিয়ে তোমাদের মালিক অন্যায় করেছে। আমরা তাকে নিয়ে যাব। তোমরা মেনে নাও। আর যদি বাধা দিতে চাও, তোমাদের মালিকও মরবে, তোমাদেরও দু'-চারজন মরতে পারে। এ ব্যাপারে আমার কোনও দয়ামায়া নেই!"

যে লোকটি গালে রং মেখে ক্লাউনের খেলা দেখাচ্ছিল, সে এবার দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। ওই বাচ্চাটাকে দেখে আমাদেরও কষ্ট হয়। ওকে আফিম খাইয়ে রাখে। এই জগদীশ, এই কাদের, হাতিয়ার ফেলে দে।"

সার্কাস শেষ হয়ে গিয়েছে। গুলির আওয়াজ শুনে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় উঁকিঝুঁকি মারছিল। এবার তারাও কয়েকজন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে ফেরত দেওয়াই উচিত। অত ছোট ছেলেকে দিয়ে খেলা দেখাতে তাদেরও খারাপ লাগে।"

এরপর সব ব্যাপারটাই সহজ হয়ে গেল। ওরাই বুনোকে ধরে-ধরে এনে তুলে দিল গাড়িতে। সে কখনও ঝিমোচ্ছে। কী ঘটছে তা বুঝতেই পারছে না। আফিম খাওয়ানোর কথাটা তা হলে সত্যি।

সে রাত্রেই ফিরে আসা হল গ্বালিয়র হোটেলে।

সকালেও বুনোর ঘুম ভাঙতে চায় না। সন্তু আর জোজো ঠেলা দিয়ে দিয়ে তাকে জাগাল।

সে চোখ মেলে অবাকভাবে দেখতে লাগল হোটেলের ঘর। ওদের দু'জনকে। বোঝা গেল, চিনতে পেরেছে, খুশিও হয়েছে। কিন্তু মুখে কোনও কথা নেই।

জোজো বলল, "আইসক্রিম খাবি? কলকাতায় যাবি?"

সন্তু বলল, "কলকাতায় প্রথম শহর দেখবে। অত বড় বড় বাড়ি। ও কতটা ঘাবড়ে যাবে কে জানে!"

জোজো বলল, "তার আগে তো প্লেনে চাপবে। আকাশে উড়বে। ওর কেমন লাগবে?"

জোজো বুনোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, প্লেনে চাপবি? এই দ্যাখ, এইভাবে...!"

দু'হাত মেলে জোজো প্লেন ওড়ার ভঙ্গি করে ঘুরতে লাগল ঘরময়।

কাকাবাবুও তৈরি হয়ে নিয়েছেন। ফোনে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে।

এইসময় বেজে উঠল সন্তুর মোবাইল ফোন। কর্নেলের গলা।

তিনি বললেন, "সন্তু, কনগ্র্যাচুলেশন! 'অপারেশন চিত্রকূট' সাকসেসফুল। আমি কাল রাত্তিরেই খবর পেয়ে গিয়েছি। আমার ঠিক মনে হয়েছিল, তোমার কাকাবাবু এরকম খবর শুনে স্থির থাকতে পারবেন না। ঠিক ছুটে আসবেন।"

কাকাবাবু ঠিক তখনই হোটেলের অফিসঘরে গিয়েছেন।

কর্নেল বললেন, "ঠিক আছে, ওঁর সঙ্গে আমি পরে কথা বলব। তোমাদের আর-একটা কথা বলি। সেই বাঘিনিটাকে এখন গ্বালিয়ার চিড়িয়াখানায় ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওখানে একটা খাঁচা খালি ছিল। তোমরা বুনোকে যদি কলকাতায় নিয়ে যাও, তা হলে যাওয়ার আগে একবার বাঘিনিটাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো।"

কাকাবাবু সেকথা শুনে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। একদম তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব, এয়ারপোর্ট যাওয়্যার পথে ঘুরে যাব চিড়িয়াখানা। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।"

সকাল সাড়ে ন'টায় চিড়িয়াখানা সবেমাত্র খুলেছে, এর মধ্যেই এসে

গিয়েছে বেশ কিছু মানুষ। ওঁরা তিনজন ভিতরে ঢোকার পরই বুনো সোজা ছুটে গেল বাঘের খাঁচাগুলোর দিকে। কী করে ও চিনল কে জানে।

পর পর তিনটে বাঘের খাঁচা। যে-খাঁচাটায় বাঘিনিটা আছে, বুনো গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানকার তারের জালে।

তারপর একটা অত্যাশ্চর্য কাণ্ড শুরু হল। বাঘিনিটা জাল ধরে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁক হাঁক করে ডাকতে লাগল, আর বুনোও চ্যাঁচাতে লাগল তারস্বরে।

সব লোক ছুটে এল সেই দৃশ্য দেখতে। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারও এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

কাকাবাবু তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এ ঘটনা শুনেছি বটে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন মা আর ছেলে, তাই না?"

মিনিট দশেক এরকম চলার পরই বাঘিনিটা হঠাৎ ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। আর নড়াচড়া নেই।

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "এ কী, মরে গেল নাকি? আমরা এলাম, আর আজই মরে গেল?"

ম্যানেজার বললেন, "না, মরেনি। আগেও এরকম কয়েকবার হয়েছে। বাঘিনিটা খুবই অসুস্থ, বেশি উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না, কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে যায়।"

বাঘিনিটা নিস্তব্ধ, বুনোও সেখানে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়।

কাছেই চেয়ার-টেবিল পাতা, কাকাবাবু সেখানে বসলেন, কফি খাওয়ালেন ম্যানেজারবাবু। এরকমভাবে কেটে গেল আধঘণ্টা।

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, "আর তো দেরি করা যাবে না। আজকের ফ্লাইট ছেড়ে দেবে। এবার বুনোকে ডাক।"

সন্তু জোজোর কাছে এসে বলল, "চল বুনো, এবার আমাদের যেতে হবে।"

বুনো শক্ত করে চেপে ধরে রইল জালটা।

জোজো বলল, "কী রে, বাড়ি যাবি না আমাদের সঙ্গে?"

বুনো মুখও ফেরাল না। কয়েকবার টানাটানি করেও তাকে জাল থেকে ছাড়ানো গেল না।

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "ও যদি যেতে না চায়, আমি জোর করে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী নই। যতদিন বাঘিনিটা বেঁচে থাকবে, ও হয়তো এখানেই থাকতে চাইবে।"

ম্যানেজার বললেন, "থাকতে চায়, থাক। না, না, ওকে দিয়ে কাজ করাব না। এমনি থাকবে।"

কাকাবাবু জোজোদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে চল, আর তো কিছু করার নেই! গাড়ির দিকে এগোনো যাক।"

একেবারে গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখা গেল, ছুটতে ছুটতে আসছে বুনো। সন্তুর পাশে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমি!" একটু থেমে বলল, "বাড়ি।" আবার বলল, "যাবে।" একসঙ্গে বলল, "আমি বাড়ি যাবে! আমি বাড়ি যাবে!" সেই সঙ্গে কাঁদতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "ও কথা বলছে! তার চেয়েও বড় কথা, ও কাঁদছে। ঠিক মানুষের মতো!"
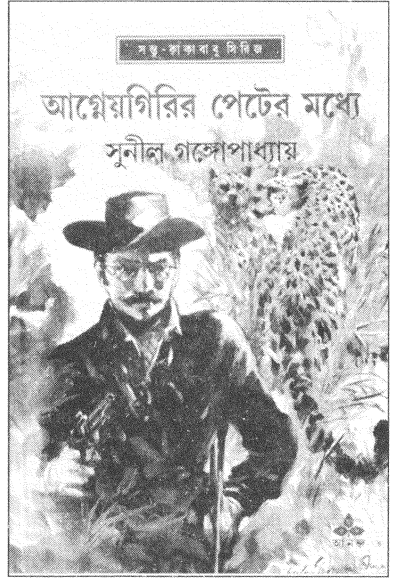
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে

এবারে প্রথম থেকেই নানারকম বাধা পড়তে লাগল। কাকাবাবু কোনও একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেললে আর ধৈর্য ধরতে পারেন না।

কলকাতা থেকেই প্লেন ছাড়তে দেরি হল প্রায় দেড়ঘণ্টা। না, একঘণ্টা চল্লিশমিনিট। কাকাবাবু ছটফট করছিলেন। আবার এ-কথাও ভাবছিলেন, মানুষের জীবনে দেড়ঘণ্টা কী এমন সময়, চুপচাপ বসে থাকলেই তো হয়। তবু তিনি ছটফট করছিলেন।

কলকাতা থেকে মুম্বই গিয়ে কাকাবাবুকে আবার বিদেশের প্লেন ধরতে হবে। মাঝখানে মাত্র তিনঘণ্টার ব্যবধান। তার মধ্যে থেকে একঘণ্টা চল্লিশমিনিট তো খরচ হয়েই গেল। মুম্বইয়ে আবার এক এয়ারপোর্ট থেকে যেতে হবে অন্য এয়ারপোর্টে, সেখানে দেরি হলে বিদেশের প্লেনটা ছেড়ে চলে যাবে।

রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। প্লেনটা কলকাতার আকাশে ওড়ার পর ঘোষণায় বলা হল, দেরির জন্য আমরা দুঃখিত। ব্যস! শুধু 'দুঃখিত' বলেই ওদের দায় সারা হয়ে গেল। এদিকে যে এজন্য কত মানুষের কত ক্ষতি হয়, তার দাম কে দেবে?

কাকাবাবু মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, যদি তিনি বিদেশে যাওয়ার প্লেন ধরতে না পারেন, তা হলে এই বিমান কোম্পানির নামে অভিযোগ জানাবেন।

দুপুরবেলা। জানলার বাইরে ঝকঝক করছে রোদ আর নীল আকাশ, একফোঁটাও মেঘ নেই। কাকাবাবু জানলার ধারেই বসা পছন্দ করেন। বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকালে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। মনটা ভাল হয়ে যায় তাতে।

কাকাবাবু এবার বিদেশে পড়বার জন্য রাজশেখর বসুর 'রামায়ণ' আর 'মহাভারত' এই বই দু'খানা নিয়ে এসেছেন। প্লেনে সবাই ইংরেজি বই পড়ে। রামায়ণ-মহাভারত বারবার পড়তেও খুব ভাল লাগে কাকাবাবুর।

আগেকার দিনে প্লেনে উঠলে যাত্রীদের কতরকম খাতির-যত্ন করা হত। এখন আর সেসব কিছু নেই। অনেক প্লেনে খাবারও দেয় না। কিনে খেতে হয় স্যান্ডুইচ ফ্যান্ডুইচ। কাকাবাবু মন দিয়ে মহাভারত পড়তে লাগলেন, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

হঠাৎ একসময় প্লেনটা বেশ জোরে দুলে উঠল।

কাকাবাবু বই থেকে চোখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, এর মধ্যে আকাশ ভরে গিয়েছে কালো মেঘে। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ।

এ দৃশ্যও দেখতে বেশ ভাল লাগে। মাটি থেকে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই বিদ্যুৎ। এখানে বিদ্যুতের ঝলক একেবারে পাশে পাশে। বজ্রের গর্জন অবশ্য ঠিক শোনা যায় না বিমানের আওয়াজের জন্য।

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শোনা গেল, "সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন, অনুগ্রহ করে যে-যার নিজের জায়গায় বসে পড়ুন।"

কাকাবাবুর পাশে বসে আছেন একজন মাঝবয়সি মহিলা আর একটি একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে। খুব সম্ভবত মা আর মেয়ে।

ভদ্রমহিলার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। মনে হয় ভয় পেয়েছেন। বিমানটা রীতিমতো দুলছে। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন নেমে যাচ্ছে অনেক নীচে, ধপাস করে পড়ে যাবে মাটিতে। আবার উঠে যাচ্ছে উপরে।

বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রমহিলার বেশি বিমানে চাপার অভ্যেস নেই কিংবা এরকম আবহাওয়ায় কখনও পড়েননি। পাশের মেয়েটির কিন্তু মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলছেন।

একবার মহিলাটি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, "এখন কী হবে?"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "বেশি চিন্তা করবেন না। খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, তাই প্লেনটা এত দুলছে। একটু পরে দেখবেন, প্লেনটা আরও উপরে উঠে যাবে। সেখানে মেঘটেঘ কিছু থাকবে না, সব শান্ত হয়ে যাবে।"

মেয়েটি বলল, "থার্টি থাউজ্যান্ড ফিটের উপর আর মেঘ থাকে না।"

মহিলাটি বললেন, "এই আমার মেয়ে, পুনেতে একটা ভাল চাকরি

পেয়েছে, সেইজন্য যাচ্ছি। এখন তো মনে হচ্ছে, কলকাতার চাকরিই ভাল ছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “না না, আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে যাবে না কেন? আজকাল কত মেয়ে তো বিদেশেও একা একা পড়তে কিংবা কাজ করতে যাচ্ছে। আপনার মেয়ে তো ভয় পায়নি।”

ভদ্রমহিলা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

একটু পরেই বিমানটি উপরে উঠে গেলে দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। কাকাবাবু জানলা দিয়ে দেখলেন, এখন বিদ্যুৎ-চমক দেখা যাচ্ছে অনেক নীচে।

আরও কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন আবার ঘোষণা করলেন, “আমরা মুম্বইয়ের কাছে এসে পড়েছি। কিন্তু নামার একটু অসুবিধে হচ্ছে, এখানকার আবহাওয়া বেশ খারাপ।”

আবার শুরু হল দুলুনি, আবার প্লেনটা উঠে যাচ্ছে উপরে। বোঝাই যাচ্ছে, মুম্বইয়ের আকাশে সেটা ঘুরছে।

কাকাবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। ঝড়-বৃষ্টিতে ভয়ের কিছু নেই, তিনি জানেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে। কিন্তু আবার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিদেশের বিমানটা কি আর ধরা যাবে?

তবে, এরকম খারাপ আবহাওয়া থাকলে সেই প্লেনটাও ছাড়তে নিশ্চয়ই দেরি হবে।

কলকাতার আকাশ দেখে বোঝাই যায়নি যে, মুম্বইয়ের আবহাওয়া এত খারাপ হবে! এত বড় দেশে এরকমই হয়। এক জায়গায় যখন বরফ পড়ে, তখন অন্য কোনও জায়গায় গরমে গা জ্বলে যায়।

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট প্লেনটা আকাশে চক্কর দেওয়ার পর পাইলট খুব সাহস করে নামিয়ে দিলেন রানওয়েতে। ঝড় একটু কমলেও সমান তোড়ে পড়ছে বৃষ্টি। রানওয়েতে জল জমে গিয়েছে, এর মধ্যে চাকা স্লিপ করে যাওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল।

হাতে আর একঘণ্টারও কম সময়, কাকাবাবুকে এক্ষুনি ছুটতে হবে অন্য এয়ারপোর্টে। আগে নিতে হবে তাঁর সুটকেস।

সেখানে এসে কাকাবাবু শুনতে পেলেন ঘোষণা, এক-একটা ফ্লাইট ক্যানসেলড হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থামার পর রানওয়ে থেকে জল না নেমে গেলে আজ আর কোনও প্লেন উড়বে না।

কাকাবাবু একটু অপেক্ষা করেই শুনলেন, তাঁর বিদেশের ফ্লাইটও

ক্যানসেলড হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল কখন যাবে, তা জানানো হবে পরে।

কাকাবাবু নিরাশ হয়ে আপনমনেই বললেন, "যাঃ!"

ফ্লাইট ক্যানসেল্‌ড হলে কতরকম ঝঞ্ঝাট হয়! বিদেশের এয়ারপোর্টে যারা কাকাবাবুকে নিতে আসবে, তারা ফিরে যাবে। হোটেলে বুক করা আছে, তারাও যদি ক্যানসেল করে দেয়?

কিন্তু প্রকৃতির উপর তো রাগ করা যায় না। এমন ঝড়-বৃষ্টিকে সব প্লেন কোম্পানিই ভয় পায়। বৃষ্টিও থামছেই না।

আজ রাত্তিরে মুম্বইয়ে থেকে যেতে হবে। কোথায় থাকা যায়?

এ শহরে কাকাবাবুদের অনেক চেনা মানুষ আছে। তাদের কারও বাড়িতে থাকতে চাইলে সবাই খুশি হবে। কিন্তু আগে থেকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এই দুর্যোগের মধ্যে কারও বাড়িতে যাওয়া যায়? প্রথমেই মনে পড়ে মঞ্জু আর অমলের কথা। ওরা অনেকবার নেমন্তন্ন করেছে। কিন্তু ওদের বাড়ি অনেক দূরে। এত বৃষ্টির মধ্যে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।

ইচ্ছে করলে এই এয়ারপোর্টেই থেকে যাওয়া যায়। অনেক লোক এর মধ্যেই নানান জায়গায় বসে পড়েছে। কাকাবাবুও এক কোণের দিকে পেয়ে গেলেন একটা চেয়ার। অনেক লোক কথা বলছে একসঙ্গে, বাচ্চারা কাঁদছে। এত ভিড়ের মধ্যে সেই মহিলা আর তাঁর মেয়েকে দেখা গেল না। এর মধ্যে দু'-একজনকে বলতে শোনা গেল, সব রেস্টুরেন্টের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে, বাইরেও যাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে, সারারাত এই চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলেও খাবার জুটবে না কিছু। কাকাবাবু মন থেকে এসব চিন্তা মুছে দিয়ে মহাভারত বইখানা খুললেন। পড়তে পড়তে তিনি চলে গেলেন সেই তখনকার আমলে। পাশা খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরছে, তিনিও মনে মনে ঘুরতে লাগলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁর আর খিদেটিদের কথা মনেই রইল না।

বৃষ্টি থামল ভোররাত্রে।

কাকাবাবু নিজের সুটকেসটা টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এসে পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। অনেক রাস্তায় জল জমে আছে, তারই মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে কোনওরকমে পৌঁছে গেলেন অন্য এয়ারপোর্টে। এখানেও একই রকম ভিড়। এত ভোরেও অনেকেই জেগে আছে।

ভিতরে ঢুকে কাকাবাবু খবর নিলেন। তাঁর প্লেন ছাড়বে দুপুর আড়াইটের

সময়। আগের দিন অত দুর্যোগের মধ্যে বিদেশের প্লেনটা মুম্বইয়ে নামতেই পারেনি, চলে গিয়েছে করাচিতে।

তার মানে এখনও অনেকটা সময় কাটাতে হবে! এই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছেই কয়েকটা হোটেল আছে। হেঁটেই যাওয়া যায়। কাকাবাবু ঠিক করলেন, কোনও একটা হোটেলেই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে।

চাকা লাগানো সুটকেসটা টানতে টানতে তিনি হাঁটতে লাগলেন। দু'বগলে ক্রাচ থাকলে তার সঙ্গে সুটকেস টানতে বেশ অসুবিধে হয়। সন্তু সঙ্গে থাকলে সে-ই সাহায্য করে। এবার সন্তুকে সঙ্গে আনা হয়নি।

প্রথম হোটেলটায় একটাও ঘর খালি নেই। পাশের হোটেলটাতেও সেই একই অবস্থা। তবে, ঠিক তখনই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী নেমে এলেন চেক আউট করার জন্য। কাউন্টারের ক্লার্কটি বলল, "স্যার, আপনি যদি আধঘণ্টা অপেক্ষা করেন, তা হলে আপনাকে ওই ঘরটা দিতে পারি। পরিষ্কার করার জন্য একটু সময় লাগবে।"

কাকাবাবু তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। ঘুমে তাঁর চোখ ঢুলে আসছে। বসলেন গিয়ে লবিতে।

খানিক পরে পাঁচতলার উপরে ঘরটায় ঢুকে কাকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর পাতা, সেই বিছানাটা তাঁকে টানছে।

এখন মোটে পৌনে ছ'টা বাজে। ঘণ্টা দু'-তিন ঘুমিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। জুতোটুতো খুলে কাকাবাবু ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়।

ঘুম ভাঙল ন'টার সময়।

মুখটুখ ধোওয়ার পর তিনি ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন। কাল দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। কাকাবাবু চাইলেন ফ্রুট জুস, দুটো ক্রোয়াসঁ, অমলেট আর চা।

দরজার তলা দিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে গিয়েছে। খাবার আসবার আগে কাকাবাবু পড়তে লাগলেন কাগজ। কালকের দারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে মুম্বই শহরের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে পড়েছে তিনখানা বাড়ি, আর অনেক গাছ, অনেক দোকানের সাইনবোর্ড আর হোর্ডিং লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে, বাজ পড়েছে দু'জনের মাথায়। এরই মধ্যে আগুন লেগে গিয়েছিল টিভি স্টেশনে।

কলকাতার কোনও খবরই নেই। তার মানে কলকাতায় কোনও গন্ডগোল হয়নি, ঝড়-বৃষ্টিও হয়নি।

খাবার শেষ করে চায়ে চুমুক দেওয়ার পর কাকাবাবু ফোন করলেন কলকাতায়।

সন্তুই ফোন ধরল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, এখনও বেরোসনি?"

সন্তু বলল, "এই তো তৈরি হচ্ছি, আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই বেরোব। তুমি পৌঁছে গিয়েছ আফ্রিকায়?"

কাকাবাবু বললেন, "না রে, এখনও মুম্বই শহরই ছেড়ে যেতে পারলাম না।"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে কী, কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল এমন ঝড়-বৃষ্টি যে, আমাদের প্লেনটা আর-একটু হলেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেত। কলকাতায় কীরকম গরম?"

সন্তু বলল, "খুব গরম। কাল ছিল থার্টি নাইন ডিগ্রি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর এখানে যখন ভোরবেলা বেরিয়েছি, তখন রীতিমতো শীত শীত করছিল।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি যাব না? আমি নিজেই চলে যেতে পারব। বাবা টিকিটের দাম দিয়ে দেবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "টিকিটের দাম থাকলেই তো হল না। ভিসা নিতে হবে, ইয়েলো ফিভারের ইঞ্জেকশন, অনেক ঝামেলা। দাঁড়া, আমি তো আগে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে যদি দরকার হয়, তোকে জানাব। আর দেরি করিস না, বেরিয়ে পড়।"

স্নানটান করে নিয়ে কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ কাগজ পড়লেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন বারোটার আগেই।

এয়ারপোর্টের অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিমান ছাড়ছে একটার পর-একটা। কাকাবাবু নিজের কাউন্টারে গিয়ে মালপত্র জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এখন শুধু কাঁধে ছোট্ট একটা ব্যাগ।

এবার তিনি ফোন বুথে গিয়ে একটা ফোন করার চেষ্টা করলেন আফ্রিকার নাইরোবি শহরে। কিছুতেই কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। বারবার শোনা গেল, লাইন আউট অফ অর্ডার। কাকাবাবু এখনও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। এখন মনে হচ্ছে, একটা ওরকম ফোন থাকলে ভাল হত।

এবারেও কাকাবাবু জানলার ধারে একটা সিট পেয়েছেন। তবে একেবারে পিছনের দিকে। আজ আকাশ পরিষ্কার। এখন আফ্রিকার আকাশে ঝড়-বৃষ্টি না হলেই হয়।

কাকাবাবুর মনের মধ্যে শুধু একটা চিন্তা খচখচ করছে। পৌঁছোবার কথা ছিল গতকাল, তা হল না। মি. লোহিয়াকে খবরও দেওয়া গেল না। এয়ারপোর্টে কেউ নিতে আসবে না তাঁকে। আগেরবার অমল আর মঞ্জু খবর পেয়ে চলে এসেছিল, এখন তারা আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মুম্বইয়ে থাকে। সেবার কাকাবাবুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল হিলটন হোটেলে। এবার মি. লোহিয়া জানিয়েছিলেন যে, তিনি একটা নতুন বাড়ি কিনেছেন, কাকাবাবু সেখানেই থাকতে পারবেন। কাকাবাবু অবশ্য কারও বাড়িতে থাকতে অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি কোনও হোটেলেই উঠতে চান, হিলটন হোটেলের নামও জানিয়েছিলেন। সেখানে বুকিং আছে কি না কে জানে?

যাই হোক, দেখা যাক! পৌঁছোবার পর কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

একটু পর একজন লোক টয়লেটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি রাজা রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

এবার লোকটি বাংলায় বলল, "আপনাকে তো আমি ফোটোয় দেখেছি। আপনি স্যার কোথায় যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "নাইরোবি।"

লোকটি বেশ লম্বা, মাঝারি বয়স, মাথাভরতি কালো চুল আর থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, "নাইরোবিতে আপনি কোনও কাজে যাচ্ছেন, না বেড়াতে?"

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "বেড়াতে।"

লোকটি বলল, "প্রত্যেকবার তো আপনার সঙ্গে সন্তু নামের ছেলেটি থাকে, এবার সে নেই? একা যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এবার সন্তু আসতে পারেনি, তার অসুবিধে আছে।"

লোকটি বলল, "আমার নাম অরুণকান্তি বিশ্বাস। আমি তো নাইরোবিতে থাকি। আপনাকে একদিন আমার বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নাইরোবিতে কী করেন?"

লোকটি বলল, "আমি চাকরি করি। একটা কাগজ কোম্পানির ম্যানেজার।

মাঝে মাঝে ইন্ডিয়া যেতে হয়। এই নিন আমার কার্ড।”

কার্ড দিয়ে তিনি টয়লেটে চলে গেলেন।

একটু পরে ফেরার সময় অরুণকান্তি আবার থেমে বললেন, “এয়ারপোর্টে আপনাকে কেউ নিতে আসবে? না হলে, আমার জন্য গাড়ি থাকবে, আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “একজনের আসবার কথা ছিল, কিন্তু কালকের ফ্লাইট মিস করেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ হল, ভালই হল।”

লোকটি চলে গেল নিজের জায়গায়।

কাকাবাবুর পাশে বসে আছেন দু'জন আফ্রিকান। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, দু'জনেই সাহেবি পোশাক পরা। এতক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিল। এবার তাদের একজন কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, “এক্সকিউজ় মি, আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?”

কাকাবাবু বললেন, “অবশ্যই।”

লোকটি বলল, “আপনারা দু'জনে যে ভাষায় কথা বললেন, সেটা কী ভাষা?”

কাকাবাবু বললেন, “বাংলা। আপনারা এই ভাষার নাম শুনেছেন?”

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, “না, আমরা সোমালিয়ার লোক। সেখানে এ ভাষা শুনিনি।”

কাকাবাবু বললেন, “বাঙালিরা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। সোমালিয়াতেও আছে নিশ্চয়ই। হয়তো তাদের সংখ্যা কম। আপনারা ইন্ডিয়ার কোথায় কোথায় ঘুরেছেন?”

সে বলল, “আমরা ইন্ডিয়ায় থাকিনি। আমরা দু'জনেই ফিলিপিন্সে পড়াশুনো করি। মুম্বইয়ে এসেছি এই ফ্লাইট ধরেই। ইন্ডিয়ার অনেক লোকই কালো লোকদের খুব অপছন্দ করে, তাই না?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমিও তো কালো। সাহেবদের চোখে সব ইন্ডিয়ানই কালো। আমাদের দেশে কিছু লোক আছে, যাদের গায়ের রং একটু পাতলা, আমরা বলি ফরসা। কিন্তু সেই ফরসা রংও সাহেবদের মতন নয়। যাই হোক, সেই ফরসা আর আমার মতন কালো লোকের তো কোনও তফাত নেই আমাদের দেশে। শুধু বিয়ের সময় কিছু লোক ফরসা মেয়ে খোঁজে।”

অন্য ছেলেটি এবার জিজ্ঞেস করল, “কেন, বিয়ের সময় ফরসা মেয়ে খোঁজে কেন?”

কাকাবাবু বললেন, "তারা মনে করে, ফরসা মেয়ে বিয়ে করলে ছেলে-মেয়েরাও ফরসা হবে। তা কিন্তু সব সময় হয় না। আমার মা খুব ফরসা ছিলেন, অথচ আমার গায়ের রং আমার বাবার মতন কালো!"

ছেলেটি খানিকটা পশ্চিমের সুরে বলল, "তা আবার হয় নাকি? ফরসা মেয়ের কালো ছেলে?"

কাকাবাবু বললেন, "হবে না কেন, অনেক হয়। আর-একটা ব্যাপার, আমাদের দেশে মেয়েদের রং ফরসা হলে তাদের সুন্দরী বলে, কিন্তু ছেলেরা বেশি ফরসা হলে তাদের লোকে খ্যাপায় অনেক সময়। স্কুলে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত, সে খুব ফরসা। আমরা তাকে 'রাঙামুলো, রাঙামুলো' বলে খ্যাপাতুম, আর সে খুব রেগে যেত।"

ছেলেটি তবু ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দেশে কিছু লোক কালো, কিছু লোক ফরসা হয় কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, বহু জাতের মানুষ তো নানা দেশ থেকে এখানে এসে তারপর থেকে গিয়েছে। তারা কেউ ফরসা, কেউ কালো, কেউ বাদামি। সবাই মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। তাই কেউ খুব কালো, কেউ কম কালো, কেউ একটু ফরসা, কেউ বেশি ফরসা, এই সবরকমই আছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে একটা জাতির মধ্যে এতরকম চামড়ার রঙের মানুষ দেখা যায় না। সেই জন্যই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, হেথায় আর্য, হেথা অনার্য!"

তাঁকে হঠাৎ রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়ে অন্য ছেলেটি বলল, "এনাফ! নাউ স্টপ টকিং। কিপ কোয়ায়েট!"

কাকাবাবু বেশ অবাক হলেন। এ কী ব্যাপার! বেশ গল্প করছিল, হঠাৎ অভদ্রের মতন কেউ 'স্টপ টকিং' বলে নাকি? তাও একজন বয়স্ক লোককে? ওরা নিজেরাই তো কথা শুরু করেছিল।

ওরা দু'জনেই ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। কাকাবাবু আবার বই পড়ায় মন দিলেন। এখনও অন্তত ঘণ্টাদেড়েক দেরি আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ঘোষণা শুরু হল। সেটা একটু শুনেই কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন।

ক্যাপটেন বলছেন, "আপনারা যে-যার সিটে বসে থাকুন। প্যানিক করবেন না। আমি এই বিমানের গতিপথ বদলাতে বাধ্য হচ্ছি। আমার ঘাড়ের কাছে একজন রিভলভার ধরে আছে। তার নির্দেশ মতন আমি বিমানটিকে

নাইরোবির বদলে কাম্‌পালায় নামাব। এরা বলছে, আপনারা যদি শান্ত হয়ে হয়ে বসে থাকেন, তা হলে কারও কোনও ক্ষতি করা হবে না।"

কাকাবাবুর পাশ থেকে ছেলে দুটি তড়াক করে উঠে গিয়ে একটু দূরে দূরে দাঁড়াল। এর মধ্যে তারা মুখে কালো কাপড়ের মুখোশ পরে ফেলেছে। কোমর থেকে বার করল দুটো লাল রঙের দড়ি। সেই দড়ি তারা চাবুকের মতন হাওয়ায় শপাং শপাং শব্দ করতে লাগল।

হাইজ্যাকিং!

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, 'যাঃ! আবার দেরি! আজও বোধহয় নাইরোবি পৌঁছোনো যাবে না।'

তাঁর পাশে বসা ছেলে দুটো একবার একটু অভদ্র ব্যবহার করলেও এমনিতে তো নিরীহই মনে হয়েছিল। অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, শুধু দু' টুকরো দড়ি দিয়ে ভয় দেখাবে? ওই দড়ি দিয়ে মারলে বেশ লাগবে ঠিকই, কিন্তু দু'-তিনজন মিলে তো কেড়ে নেওয়াও যায়!

এবার সামনের বাথরুম থেকে আর-একজন কালো মানুষ বেরিয়ে এল, তারও মুখে মুখোশ আর হাতে একটা এ কে ফর্টি সেভেন বন্দুক।

সে সেটা তুলে কর্কশভাবে বলল, "কেউ জায়গা ছেড়ে উঠবে না। কেউ একটাও কথা বলবে না।"

দু'-তিনজন মহিলা ভয়ের শব্দ করে উঠল। কেঁদে উঠল একটা শিশু।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "বাচ্চাটার কান্না বন্ধ করো।"

বাচ্চার কান্না কী করে বন্ধ করা যায়? বোধহয় মা তার মুখে হাত চাপা দিলেন। তবু একটু একটু শোনা যেতে লাগল তার কান্না।

কাকাবাবু ভাবলেন, এরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্লেনে উঠল কী করে? আমেরিকায় একসঙ্গে চারটে প্লেন হাইজ্যাকিং হওয়ার পর (যাকে সবাই বলে নাইন/ইলেভেনের ঘটনা) সারা পৃথিবীতেই নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি। সুটকেস, ব্যাগ এক্স-রে হয়, সারাগায়ে হাত বুলিয়ে দেখে। কোনও অস্ত্র লুকিয়ে আনবার তো উপায়ই নেই।

তবু তো একজনের হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র দেখা যাচ্ছে। আর-একজন পাইলটের ঘাড়ে রিভলবার চেপে ধরে আছে।

এক হতে পারে, এয়ারপোর্টে যেসব কর্মী আগে থেকে বিমানে উঠে সাফটাফ করে, তাদেরই কাউকে টাকা খাইয়েছে। সে গোপনে অস্ত্র নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছে। এর ফলে দেশের যে কত ক্ষতি হতে পারে,

কত মানুষের প্রাণ যেতে পারে, তা সে ভাবল না? অনেকেই দেশের কথা কিংবা অন্য মানুষের কথা ভাবে না। টাকার লোভে সব কিছু করতে পারে। নিশ্চয়ই বহু টাকা দিয়েছে।

কাকাবাবু ঠিক ভয় পাননি। এর আগে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন, তাই ভয়কে জয় করে ফেলেছেন। কিন্তু এর পরে কী হবে, সেই কৌতূহলেই তিনি ছটফট করছেন। এই হাইজ্যাকাররা অল্পবয়সি ছেলে, এরা নিজের জীবনের পরোয়া করে না। এদের দাবি না মিটলে এরা পুরো প্লেনটাই উড়িয়ে দিতে পারে। তাতে আর সবাই মরবে, নিজেরাও মরবে!

কাকাবাবু আপনমনে একবার মাথা নাড়লেন। নাঃ, এতবার এত বিপদ থেকেও তিনি বেঁচে গিয়েছেন। এখন এই আকাশ-দস্যুদের জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হবে? এটা ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না।

সবাই চুপচাপ, হঠাৎ একজন বয়স্ক যাত্রী উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন হাইজ্যাকার ধমক দিয়ে বলল, "সিট ডাউন! সিট ডাউন!"

লোকটি বলল, "আমি একবার টয়লেটে যাব!"

হাইজ্যাকারটি বলল, "না, এখন যাওয়া চলবে না। বোসো! বোসো!"

লোকটি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "আমার খুব বাথরুম পেয়েছে। এক্ষুনি একবার যেতেই হবে!"

লোকটির মুখ দেখে অন্য সময় হাসি পেয়ে যেত। কিন্তু এখন লোকটির উপর মায়াই হচ্ছে।

হাইজ্যাকারটি ভেংচি কেটে বলল, "খুব বাথরুম পেয়েছে? পাক! এখন কিছুতেই যাওয়া যাবে না।"

লোকটি বেপরোয়া হয়ে তবু দু'-এক পা এগিয়ে গেল।

হাইজ্যাকারটি এগিয়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "মরতে চাস? না হলে চুপ করে বোস!"

সে হাতের দড়িটি দিয়ে লোকটির পিঠে ভীষণ জোরে একটা চাবুক কষাল।

লোকটি এবার বসে পড়ল নিজের সিটে। নিচু করল মাথাটা। কোনও কোনও বুড়ো মানুষের একটা রোগ থাকে। টয়লেট পেলে বেশিক্ষণ সামলাতে পারে না। ওকে টয়লেটে যেতে দিলে কী এমন ক্ষতি হত?

এখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। উলটে অপমান সহ্য করতে হবে?

সবাই একেবারে চুপচাপ। শুধু সেই বাচ্চাটার মুখ বন্ধ করে কান্না শোনা যাচ্ছে।

সময় যেন কাটতেই চায় না। প্লেনটা যেন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

এর মধ্যে একজন হাইজ্যাকার ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল।

আজকাল সব প্লেনে ধূমপান খুব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাথরুমে গিয়ে কেউ সিগারেট ধরালেও ধরা পড়ে যায়। হাইজ্যাকাররা কোনও নিয়মকানুন মানছে না।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, ওকে একবার চেঁচিয়ে বললে কেমন হয় যে, 'অ্যাই, তুমি প্লেনে সিগারেট খাচ্ছ। তোমার পাঁচশো ডলার ফাইন হবে।'

কাকাবাবু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন। এখন রসিকতার সময় নয়, এরা রসিকতা বুঝবেও না। হয়তো দুম করে গুলি চালিয়ে দেবে।

এরকম অবস্থায় বই পড়তেও মন বসে না।

কাকাবাবু মনটাকে অন্য দিকে ফেরাবার জন্য মনে মনে কবিতা বলতে চাইলেন। কোন কবিতা? রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাকাবাবুর খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সুকুমার রায়ের লেখা।

মানুষের মন অতি বিচিত্র। কখন যে কোনটা মনে পড়ে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

কোনও কবিতার বদলে তাঁর মনে পড়ল, সুকুমার রায়েরই লেখা একটা গান। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের। কাকাবাবু নিজে স্কুলে পড়ার সময় এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তাই অনেক গান তাঁর এখনও মনে আছে। একটা গান এইরকম:

'অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্ঠির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো।
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরই চাচা খুড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো!'

মনে মনে এইটুকু গাইতেই কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল, 'যষ্ঠি' মানে তো লাঠি। রাবণ কি হাতে লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন? রাবণের তো

অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র থাকার কথা? ছেলেবেলায় থিয়েটার করার সময় এ কথাটা তো মনে আসেনি!

আর-একটা গান:

> 'শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
> আগে হতে পষ্ট বলে রাখি।
> তুই ব্যাটা জানোয়ার নিষ্কর্মার অবতার
> কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি!'

কাকাবাবু নিজে জাম্বুবানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জাম্বুবানের কি কোনও গান ছিল? না বোধহয়! আর-একটা গান ছিল বিভীষণের...। এইসব ভাবতে ভাবতেই কিছুটা সময় কেটে গেল।

এবার ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শোনা গেল, "সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন। আমরা কাম্পালা বিমান বন্দরে অবতরণ করছি। কেউ ব্যস্ত হবেন না, আগে থেকে উঠে দাঁড়াবেন না...।"

॥ ২ ॥

কাম্পালা বিমানবন্দরটি উগান্ডা রাজ্যে। ওর পাশেই কেনিয়া। এই উগান্ডাতেই আছে বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' এখানকারই একটা পাহাড় নিয়ে লেখা। বিভূতিভূষণ অবশ্য কখনও আফ্রিকায় আসেননি। বই পড়ে লিখেছেন, কিন্তু কী চমৎকার লিখেছেন!

কাকাবাবু যখন আগেরবার কেনিয়ায় এসেছিলেন, তখন এখানকার চাঁদের পাহাড় দেখে যাওয়ারও খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন এখানে মারামারি, কাটাকাটি চলছিল খুব, তাই আসা সম্ভব ছিল না। তারপর তো কেনিয়াতেই এমন কাণ্ড হল...!

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি স্পর্শ করার পর কাকাবাবু খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক, তবু তো আকাশে থাকতে-থাকতেই কোনও দুর্ঘটনা হয়নি। যতই মানুষ প্লেনে চেপে এদেশে-ওদেশে যাক, তবু মাটির সঙ্গেই মানুষের আসল সম্পর্ক।

বন্দুকধারী হাইজ্যাকারটি হুকুম করল, "কিপ কোয়ায়েট। সিট টাইট। যে-যার জায়গায় বসে থাকো।"

এক ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, "এখন আমার বাচ্চাকে কি একবার টয়লেটে নিয়ে যেতে পারি?"

হাইজ্যাকারটি একটু চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে, যাও!"

তারপর সে বুড়ো ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বলল, "হেই, তুমিও এবার যেতে পারো।"

লোকটি উঠল না। দু'হাতে মাথা চেপে, মুখ নিচু করে বসে রইল। তার পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বোধহয় কাঁদছে।

কাকাবাবু ভাবলেন, নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটি আর চেপে রাখতে না পেরে প্যান্টেই টয়লেট করে ফেলেছে। বাচ্চারা যেমন করে, তেমন বুড়ো মানুষদেরও এরকম হতে পারে। বাচ্চারা লজ্জা পায় না, বুড়ো মানুষদের তো লজ্জা হবেই। সেই লজ্জাতেই কাঁদছে। ইস!

আর-একজন লোক হাত তুলে বলল, "একটু খাবার জল পেতে পারি?"

হাইজ্যাকারটি বলল, "নাঃ!"

লোকটি বলল, "খুব তেষ্টা পেয়েছে!"

এদের একজন কাছে গিয়ে সেই লোকটির মুখে একবার চাবুকের মতো দড়ি দিয়ে মারল।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমাদের দেশে অনেক লোক সারাদিন জল না খেয়েও থাকতে পারে। সাত মাইল হেঁটে গিয়ে জল আনতে হয়।"

এই প্লেনে দুশোর বেশি যাত্রী। আর হাইজ্যাকাররা মাত্র চারজন। তবু ওদের কথা না শুনে উপায় নেই। ওদের কাছে আছে মারাত্মক অস্ত্র। ওরা কাউকেই দয়ামায়া করে না। যে-কোনও সময়, যাকে-তাকে মেরে ফেলতে পারে।

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। কতক্ষণ ঠায় বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। এই হাইজ্যাকারদের নিশ্চয়ই কিছু দাবি আছে, তাই নিয়ে এখানকার সরকারের সঙ্গে দরাদরি করবে। কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে, কিংবা একদিন-দু'দিনও কেটে যেতে পারে। তার মধ্যে খাবার পাওয়া যাবে না, জলও পাওয়া যাবে না। অন্যরা সহ্য করতে পারলেও কয়েকটা বাচ্চা আছে। তারা কী করে সহ্য করবে?

খবরের কাগজে কাকাবাবু অনেক হাইজ্যাকিং-এর ঘটনা পড়েছেন। কিন্তু নিজের কখনও এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।

তিনি বুঝতে পারছেন, এখানে প্রতিবাদ জানাবার উপায় নেই। মুখ বুজেই থাকতে হবে। দেখা যাক, এর পর কী হয়!

কাকাবাবু আবার মহাভারত খুললেন। খানিক পর খেয়াল হল, তিনি বইয়ের দিকে তাকিয়েই আছেন শুধু, পড়ছেন না। এই সময় কি বইয়ে মন বসানো যায়?

জানলা দিয়ে দেখলেন, মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা। প্লেনটাকে ঘিরে ফেলেছে। ইচ্ছে করলে ওরা প্লেনটাকেই ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু তাতে এত যাত্রীরও প্রাণ যাবে। এই যাত্রীদের প্রাণ নিয়েই দরাদরি চলছে।

এই হাইজ্যাকাররা যে কী চায়, সেটাই তো জানা যাচ্ছে না। সাধারণত ওরা ওদের দলের কিছু বন্দির মুক্তি চায়। তারপর প্লেনটা নিয়ে উড়ে যেতে চায় অন্য দেশে।

কেটে গেল প্রায় একঘণ্টা। কেউ ফিসফিস করেও কথা বলছে না।

আবার একটি লোক উঠে দাঁড়াল। লোকটি বেশ লম্বা আছে, সুন্দর চেহারা।

মাথা নাড়তে নাড়তে সে পাগলের মতো বলতে লাগল, "আমি আর পারছি না। সহ্য করতে পারছি না। আমাকে নামতেই হবে। নামতে দাও!"

বন্দুকধারী ধমক দিয়ে বলল, "সিট ডাউন! সিট ডাউন!"

লোকটি তবু বলল, "না, বসব না। বসে থাকতে পারছি না। আই মাস্ট গো!"

বন্দুকধারী এবারে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তুমি যাবেই। বেশ, তোমাকে যাওয়াচ্ছি।"

কাছে এগিয়ে এসে সে লোকটির বুকে বন্দুকটি ঠেকিয়ে বলল, "একটা গুলি! তাতেই তোমার প্রাণপাখিটা বেরিয়ে যাবে। তারপর উড়ে উড়ে বাইরে চলে যেয়ো!"

লোকটি বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "তাই করো। আমাকে গুলি করো। তবু আমি বসে থাকব না!"

বোঝাই যাচ্ছে, দুশ্চিন্তায় লোকটির মাথার গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে।

অন্য একজন হাইজ্যাকার ওর পিছনে এসে নিজের দড়িটা দিয়ে চট করে ওই লোকটির গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর প্যাঁচাতে লাগল দড়িটা।

লোকটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

হাইজ্যাকারটি দড়ির প্যাঁচ যত শক্ত করতে লাগল, ততই লোকটির চিৎকারও বাড়তে লাগল। তারপর একসময় ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়।

মরে গেল? কিংবা অজ্ঞানও হতে পারে।

এই দৃশ্য দেখে রাগে কাকাবাবুর শরীর জ্বলছে। তিনি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, অতি কষ্টে দমন করলেন নিজেকে। প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকেও ওরকমভাবে মারবে।

তিনজন এয়ার হোস্টেস দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। বোধহয় তাদের চোখের পাতাও পড়ছে না একবারও।

একটু পর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন পাইলট আর কো-পাইলট। তাঁদের পিছনে রিভলবার উঁচিয়ে একজন হাইজ্যাকার।

এবার প্লেনের দরজা খুলে গেল, পাইলট দু'জনকে নামিয়ে দেওয়া হল সিঁড়ি দিয়ে। দরজাটা খোলাই রইল।

কী ব্যাপার হল, বোঝাই যাচ্ছে না। বাচ্চা দুটো কেঁদেই চলেছে, নিশ্চয়ই ওদের খিদে পেয়েছে। আজকাল প্লেনে জলের বোতল নিয়ে ওঠা যায় না। এখানেও জল দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে?

দড়ি হাতে হাইজ্যাকার দুটো সিগারেট টেনেই চলেছে। আর যার হাতে এ কে ফর্টি সেভেনের মতো মারাত্মক বন্দুক, সে তার অস্ত্রটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে অনবরত। যেন যে-কোনও মুহূর্তে সে যাকে-তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে।

একসময় দড়িধারীদের একজনের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। সে কী সব কথা বলল দু'-তিন মিনিট ধরে। তারপর সে ফোনটা নিয়ে গেল অস্ত্রধারীর কানের কাছে। সে-ও একটুক্ষণ শোনার পর বলল, "ওকে, ওকে!"

এবার সে চেঁচিয়ে যাত্রীদের উদ্দেশে বলল, "হিয়ার ইজ অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট। সবাই মন দিয়ে শোনো। এখন আমরা যাত্রীদের মধ্যে থেকে কুড়িজনের মতো ব্যাচকে ছেড়ে দেব। আমরা যাদের বেছে নেব, তারা ছাড়া আর কেউ সিট ছেড়ে উঠবে না। কেউ কোনও কথা বলবে না! যাদের নামিয়ে দেব, তারাও লাইন বেঁধে যাবে, কেউ দৌড়োবে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা গুলি চালাব। ক্লিয়ার?"

এবার সে এলোপাথাড়িভাবে এক-একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল, "ইউ গেট আপ! ইউ! ইউ!"

একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার ওয়াইফ, সে যাবে না?"

অস্ত্রধারী বলল, "শাট আপ! নো ওয়াইফ!"

স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে একজন থাকলে আর-একজন যাবে, তা কি হয় নাকি? কিন্তু এরা যে কোনও কথাই শুনবে না।

কাকাবাবু আশা করলেন, বাচ্চার মা দু'জনকে নিশ্চয়ই এরা ছেড়ে দেবে! কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মা দু'জনের দিকে অস্ত্রধারী আঙুল দেখাল না, নম্বর গুনতে গুনতে কুড়ি নম্বরে এসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যান্ড ইউ! কাম!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খুবই বিনীতভাবে বললেন, "আপনাদের একটা অনুরোধ করতে পারি? আমার বদলে যদি ওই বাচ্চাদের মায়েদের ছেড়ে দেন, খুব ভাল হয়। ওরা কষ্ট পাচ্ছে। আমি আরও অপেক্ষা করতে পারি, আমার কোনও অসুবিধে নেই।"

লোকটি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "শাট আপ! বলেছি না, কেউ কোনও কথা বলবে না!"

কাকাবাবু তবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

দড়ি হাতে যে-দু'জন কাকাবাবুর পাশে বসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "কেন সময় নষ্ট করছিস! বেরিয়ে আয়!"

কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো পাশে রাখা ছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রাচ দুটো নেওয়ার চেষ্টা করতেই সে আবার দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "নো! ওসব নেওয়া চলবে না। কেউ হ্যান্ডব্যাগও নিতে পারবে না। লাইনে এসে দাঁড়াও!"

কাকাবাবু এগিয়ে যেতে লাগলেন দরজার দিকে।

কয়েকটা রো পরেই অরুণকান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। তাঁর মুখে একটা দারুণ অসহায় ভাব। কাকাবাবু আর বাকি উনিশজন যেন লটারি জিতেছেন। বাকি যাত্রীদের ভাগ্যে যে কী আছে, কে জানে!

কথা বলার উপায় নেই, কাকাবাবুকে সামনের দিকে যেতেই হল।

অস্ত্রধারী আগে নামল, তার পিছনে পিছনে অন্য সবাই। কাকাবাবু সকলের শেষে। তিনি দরজার কাছে এসে দেখলেন, অস্ত্রধারীটি সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদের গুনে গুনে নামাচ্ছে।

ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে খুব অসুবিধে হয়। তিনি একটা পাশ ধরে বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর দু'পায়ে দু'রকম জুতো। খারাপ পা-টায় একটা স্পেশ্যাল অর্ডারি জুতো

পরতে হয়, অন্য পায়ে সাধারণ জুতো। কয়েকটা সিঁড়ি নামার পর কাকাবাবুর সেই সাধারণ জুতোটা হঠাৎ খুলে গেল।

সেটা আবার ঠিকমতো পরে নেওয়ার জন্য কাকাবাবু একটু থামলেন।

অমনি সেই অস্ত্রধারীটা কাছে এসে কাকাবাবুর গোঁফটা ধরে কয়েকবার জোরে টানাটানি করে মুখ ভেংচে বলল, "এই বুড়ো, তুই ইচ্ছে করে দেরি করছিস, তাই না? তুই মহাবদমাশ। নাম।"

সে একটা লাথিও কষাল কাকাবাবুর পিছনে।

যাদের গোঁফ থাকে, তাদের গোঁফ ধরে টানা মানে তাদের চূড়ান্ত অপমান করা। এই অস্ত্রধারীটা নিশ্চয়ই তা জানে। সেজন্যই এ কাজটি করে সে হাসতে লাগল।

কাকাবাবু আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সেই লোকটির দিকে। তাঁর এরকম হিংস্র মুখ কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর চোখ দুটি যেন বাঘের মতো জ্বলছে।

তিনি প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি মারলেন লোকটির চোখে।

খোঁড়া মানুষের হাতে যে কত শক্তি থাকে তা অনেকেই জানে না। এই অবস্থায় কাকাবাবু যে মারতে পারেন, তা ওই লোকটি ভাবতেও পারেনি।

ওই ঘুসি খেয়ে সে 'আঃ' চিৎকার করে উলটে পড়ে গেল। গড়াতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। চোখের যন্ত্রণায় সে এক হাতে চোখ চাপা দিতেই তার অন্য হাত থেকে ভারী অস্ত্রটা খসে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'জন যাত্রী লাথি মেরে সেই অস্ত্রটা সরিয়ে দিল। যেসব সৈন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ছুটে এল এদিকে। তাদের গুলিতে আহত হয়ে সেই লোকটি কাতরাতে লাগল।

বিমান বন্দরের নানা দিকের ছাদেও পাহারা দিচ্ছে সৈন্যরা। তারা দূরবিন দিয়ে দেখছেও সব কিছু। তক্ষুনি মাইক্রোফোনে ঘোষণা হল, "সবাই শুয়ে পড়ুন, মাটিতে শুয়ে পড়ুন।"

পাইলট দু'জন আগেই শুয়ে পড়েছেন টারমাকে। তাঁদের কাছে রিভলবার নিয়ে যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঠিক বুঝতে পারল না কী ঘটছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেই গুলি খেয়ে ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে।

বাকি রইল প্লেনের মধ্যে দু'জন, যাদের কাছে দড়ি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এবার তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হল। সেই দু'জনকে

কাবু করতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। রাগের চোটে অনেকে মিলে তাদের এমন পেটাতে শুরু করল যে, আর কিছুক্ষণ দেরি হলে তারা মরেই যেত। এর মধ্যেই কয়েকজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়ে সেই দু'জনকে যাত্রীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে গ্রেফতার করল।

কাকাবাবু স্থিরভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়িতে। তাঁর পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে যাত্রীরা। কাকাবাবুর জন্যেই যে তারা মুক্তি পেয়েছে, তা কেউ এখনও জানে না।

সৈন্যরা সবই দেখেছে। দু'জন বড় অফিসার এবার কাকাবাবুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনার কোথাও লাগেনি তো? আপনি আজ যে সাহস দেখালেন...।"

কাকাবাবু তক্ষুনি কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। লোকটিকে ঘুসি মারার এক মুহূর্ত আগেও তিনি মারার কথা ভাবেননি। তাঁর শরীরের মধ্যে যত রাগ জমা হচ্ছিল, সব যেন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এসেছে।

সেনাবাহিনীর অফিসাররা কাকাবাবুর প্রশংসা করে যাচ্ছেন নানাভাবে, কাকাবাবু তা কিছুই শুনছেন না। একটু পরে তিনি শান্তভাবে বললেন, "আপনারা কেউ দয়া করে প্লেনের ভিতর থেকে আমার ক্রাচটা এনে দেবেন? না হলে আমার হাঁটতে অসুবিধে হয়।"

অরুণকান্তি বিশ্বাস এর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন কাকাবাবুর পাশে। এর মধ্যে একজনকে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল ক্রাচ দুটো আনার জন্য। অরুণকান্তি সেনাবাহিনীর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, "ইনি কে জানেন? হি ইজ আ গ্রেট ম্যান। ইন্ডিয়ায় ইনি খুব ফেমাস।"

একজন অফিসার বললেন, "এঁর অসাধারণ সাহস। এঁর জন্যই আজ এত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এখন কোথাও গিয়ে একটু বসতে চাই। আমার খুব জলতেষ্টা পেয়েছে।"

কাম্পালা বিমানবন্দরটি খুব আধুনিক। মস্ত বড় লাউঞ্জ। উদ্ধার পাওয়া যাত্রীদের বসানো হয়েছে সেখানে। কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল আলাদা একটা ঘরে। জল ছাড়াও, শরবত ও নানারকম খাবারদাবার আসতে লাগল।

এর মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। হাইজ্যাকাররা সোমালিয়ার লোক। তাদের কী একটা দল আছে, সেই দলের এগারোজন

সদস্য বন্দি হয়ে আছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। তাদের মুক্তির দাবিতেই প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। তবে হাইজ্যাকার হিসেবে এরা তেমন পাকা নয়। নইলে এত সহজে ব্যাপারটা শেষ হত না। সেই চারজনের কেউ অবশ্য প্রাণে মরেনি। গুরুতর আহত। কড়া পাহারায় তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

রাজা রায়চৌধুরী নামে একজন যাত্রীর জন্যই যে এত মানুষের বিপদ থেকে মুক্তি ঘটেছে, তাও জেনে গিয়েছে সবাই। দলে দলে লোক আসছে কাকাবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কাকাবাবু অত কিছু শুনতে চান না, তিনি বিব্রত বোধ করছেন, তাই একসময় বলে দিলেন দরজা বন্ধ করে দিতে।

তবু একসময় জোর করে সেই দরজা খুলিয়ে ঢুকে এলেন এক মহিলা। তাঁর কোলে একটি শিশু আর পিছনে তাঁর স্বামী। দৌড়ে কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বাংলায় বললেন, "আপনি কাকাবাবু! আপনার কথা কত শুনেছি। আমার দেওর বাপি, সে সন্তুর সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে। সন্তু এসেছে আমাদের কেয়াতলার বাড়িতে। আপনি আমাদের বাঁচালেন। আমার ছেলেটা, একটুও জল দেওয়া যায়নি, তেষ্টায় ওর গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, হেঁচকি তুলছিল, আর বেশি দেরি হলে...!"

মহিলা এসব কথা বলেই চলেছেন, কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ছিঃ, ওরকম পায়ের কাছে বসতে নেই। আমার পাশে এসে বোসো। আমি এমন কিছু করিনি। অন্যায় দেখলে সবাই কিছু না-কিছু প্রতিবাদ করে।"

মহিলাটি উঠে পাশের চেয়ারে বসার পরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "শোনো, আমার একটা কথা আগে শোনো। তুমি গান জানো?"

মহিলাটি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "গান? হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি একজন গায়িকা। একটা গান শোনাও না! এইসব সময় একটা গান শুনলে মনটা জুড়িয়ে যায়। হাইজ্যাকিং-এর একঘেয়ে কথা আর কত শুনব!"

মহিলাটির স্বামী বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও খুব ভাল গান জানে। সুচিত্রা মিত্রের ছাত্রী ছিল। আপনি ঠিক ধরেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "শোনাও, একটা রবীন্দ্রসংগীত শোনাও!"

মহিলাটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার বুক এখনও

ধড়ফড় করছে। একটা অল্পবয়সি হাইজ্যাকার যখন আপনার চুলের মুঠি ধরল, তখন আমার এমন কষ্ট হয়েছিল। আপনি তো নাইরোবি যাচ্ছেন, ওখানে আমাদের বাড়িতে একদিন আসতেই হবে। তখন আপনাকে গান শোনাব। এখন গলা দিয়ে সুর বেরোবে না।"

ওঁর নাম হেমন্তিকা, স্বামীর নাম বিনায়ক ঘোষ। স্বামীটি কাকাবাবুকে নিজের একটি কার্ড দিলেন।

কাকাবাবু এবার গলা তুলে এখানকার একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের প্লেনটা আবার কখন যাবে? একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন না!"

॥ ৩ ॥

প্লেনটা আবার আকাশে উড়ল তিনঘণ্টা পরে।

এবার কাকাবাবুর পাশে বসেছেন অরুণকান্তি। তিনি বললেন, "আমি বয়সে আপনার চেয়ে তেমন কিছু ছোট নই। তবু অনেকেই আপনাকে 'কাকাবাবু' বলে, আমিও 'কাকাবাবু' বলে ডাকতে পারি?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, পারেন নিশ্চয়ই। কাকাবাবুটাই এখন আমার ডাকনাম হয়ে গিয়েছে। অনেকে আসল নামই মনে রাখে না।"

অরুণকান্তি বললেন, "তা হলে আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি যে একজন হাইজ্যাকারকে ঘুসি মারলেন, তখন একটুও ভয় করেনি? ওর হাতে অমন মারাত্মক অস্ত্র ছিল, আপনার ঘুসিটা যদি ওর চোখে ঠিকমতো না লাগত, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে আপনাকে মেরে ফেলত। সেকথা একবারও ভাবেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সেকথা মনে পড়েনি। তখন এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল, সে সময় আর কোনও কিছু মনে পড়ে না। তবে মরতে তো একদিন হবেই, বিছানায় শুয়ে অসুখে ভুগে ভুগে মরার চেয়ে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি মরতে হয়, সেটাই ভাল মনে হয় আমার কাছে।"

অরুণকান্তি আরও কিছু বলতে গেলেন, তা আর শোনা গেল না।

প্লেনের সামনের দিকে দশ-বারোজন লোক একসঙ্গে একটা গান গেয়ে উঠল। তারা সবাই আফ্রিকান। সে গানের ভাষা বোঝা যায় না।

প্লেনে সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে কিংবা পাশের লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলে। এরকমভাবে কোরাস গান আগে কখনও শোনা যায়নি। আসলে এত বড় একটা বিপদ কেটে গিয়েছে বলে সকলেরই এত ফুর্তি হয়েছে যে, তা আর চেপে রাখতে পারছে না।

গানের সুরটায় বেশ দুলুনি আছে, শুনতে ভাল লাগে।

অরুণকান্তি বললেন, "কাকাবাবু, আপনি গানের কথা কিছু বুঝতে পারছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না। এটা কি সোয়াহিলি ভাষা? আমি বুঝব কী করে?"

অরুণকান্তি বললেন, "আমি একটু একটু বুঝি। আমাকে প্রায়ই কেনিয়ার নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই সোয়াহিলি ভাষা খানিকটা শিখতে হয়েছে। ওই যে মাঝে মাঝেই বলছে, 'হাকুনা মাটাটা, হাকুনা মাটাটা', তার মানে হচ্ছে, আর কোনও সমস্যা নেই!"

কাকাবাবুও দু'বার বললেন, "হাকুনা মাটাটা, হাকুনা মাটাটা! আমিও মুখস্ত করে রাখি, যদি পরে কাজে লাগে।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি কি এখানে বিশেষ কোনও কাজে যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, কোনও কাজে নয়, এমনিই বেড়াতে এসেছি। আমি আগে একবার কেনিয়ায় এসেছিলাম, তখন অনেক কিছুই দেখা হয়নি। নাইরোবিতে পি আর লোহিয়া নামে একজন ব্যবসায়ী আছেন, তিনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। তিনি আমাকে অনেক জায়গায় বেড়াবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। আফ্রিকা আমার খুব ভাল লাগে।"

অরুণকান্তি বললেন, "ওরে বাবা, পি আর লোহিয়া তো খুব নামী লোক। তাঁর অনেকরকম ব্যাবসা, অনেক ক্ষমতা। তবে তিনি অনেককে নানারকম সাহায্যও করেন। তা ছাড়া, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মি. লোহিয়া জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের অকারণে হত্যা করার ঘোর বিরোধী। এখানে অনেক চোরাশিকারি আছে। তাদের এক পাণ্ডার নাম স্যাম নিন্‌জানে। দু'মাস

আগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সব কাগজেই সে খবর বড় করে ছাপা হয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, এ খবর আমিও শুনেছি। লোহিয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। বিশেষ করে কোথাও কোনও হাতি মারা পড়লে, সেকথা শুনেই তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনি খুব হাতির ভক্ত।”

অরুণকান্তি বললেন, “কিন্তু আপনি কি এ খবর শুনেছেন, দিনদশেক আগে ওই স্যাম নিন্‌জানে জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছে?”

একথা শুনে কাকাবাবু খুব অবাক হলেন না। তিনি বললেন, “চোরাশিকারিদেরও অনেক টাকা। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কিছু লোককে ঘুষটুস খাইয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসে। এরকম তো অনেক দেশেই হয়। তবে আবার ধরা পড়বে নিশ্চয়ই।”

অরুণকান্তি বললেন, “আপনি আসছেন তো, ইচ্ছে করলেই ওই নিন্‌জানেকে আবার ধরিয়ে দিতে পারবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “না না। আমার সেরকম ক্ষমতাই নেই। আমি বিদেশি, কোনও অপরাধীর পিছু ধাওয়া করব কী করে? সেটা আমার কাজই নয়। আমি ওসব ব্যাপারে মাথাই গলাব না। আমি শুধু নিশ্চিন্তে বেড়াতে চাই।”

আকাশ পরিষ্কার। ঝড়-ঝাপটা নেই। আর কোনও ঝামেলা হল না, বিমানটি পৌঁছে গেল নাইরোবি বিমানবন্দরে।

নীচে নেমে আসার পর হেমন্তিকা নামের সেই মহিলা কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, “আমাদের বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু! আপনি কথা দিয়েছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, যাব। আচ্ছা বলো তো, রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ‘নাই রবি’ আছে?”

মহিলা বেশ অবাক হয়ে বললেন, “রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন? রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন?”

কাকাবাবু বললেন, “রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন কি না, তা জানি না। রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন, তাও বলিনি। আমি বলছি, রবীন্দ্রনাথের কোন গানে ‘নাই রবি’ আছে?”

হেমন্তিকা বললেন, “তা তো জানি না।”

কাকাবাবু বললেন, “খুঁজে দ্যাখো। যেদিন তোমাদের বাড়ি যাব, সেদিন এই গানটা শুনতে চাই।”

বাইরে আসার পর অরুণকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে কেউ নিতে এসেছে?"

কাকাবাবু সামনের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাঃ, কে আর আসবে? সবই তো উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "তা হলে আপনি কী করে যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোনও হোটেলে উঠব। তারপর লোহিয়ার খোঁজ করব। ওঁর বাড়ির ফোনটা বোধহয় খারাপ, অনেকবার চেষ্টা করেও লাইন পাইনি।"

অরুণকান্তি বললেন, "আমি একটা অনুরোধ করব? আমি কাম্পালা থেকেই ফোন করে আমার অফিসকে সব খবর জানিয়েছি। অফিস থেকে গাড়ি পাঠাচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার বাড়িতে গিয়ে আজকের রাত্তিরটা বিশ্রাম নিন। কাল সকালে লোহিয়ার খোঁজ নেওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ তো ভালই প্রস্তাব। কিন্তু আমি গেলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

অরুণকান্তি বললেন, "অসুবিধে আবার কী? আপনি গেলে আমি ধন্য হব। আপনি যেভাবে আমাদের সবাইকে বাঁচালেন...!"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওকথা থাক। আমি তো কোনও বিরাট বীরপুরুষের মতো কিছু করিনি। ওটা হঠাৎ ঘটে গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "আমার তো অসুবিধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। কোম্পানি আমাকে বড় বাড়ি দিয়েছে, অনেক ঘর। তিনজন কাজের লোক। আমার স্ত্রী অবশ্য এখানে নেই, দেশে গিয়েছেন। তবে রান্নাবান্নার লোক আছে। আপনি যা খেতে ভালবাসেন, তাই-ই বানিয়ে দেবে।"

অরুণকান্তি কাকাবাবুকে সুটকেসও টানতে দিলেন না, নিজেই নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললেন। বিরাট এসি গাড়ি, ড্রাইভারের সাদা পোশাক, মাথায় টুপি। বোঝাই যাচ্ছে, অরুণকান্তি বেশ বড় চাকরি করেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল তাঁর বাড়ি পৌঁছোতে।

নিরিবিলিতে ছিমছাম একটা দোতলা বাড়ি। সামনে অনেকখানি বাগান। অনেক বড় বড় গাছে ম্যাগনোলিয়া ফুল ফুটে আছে।

একতলাতেই অতিথিদের জন্য সাজানো একটা ঘর। কাকাবাবুকে আর সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে হল না। এ ঘরেই টিভি, ফোন সবই আছে।

সংলগ্ন বাথরুম। কোনও অসুবিধে নেই। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। কাকাবাবু স্নান সেরে নিলেন। কাম্পালায় অনেক কিছু খাইয়েছে, এখন আর বিশেষ কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই। তবু অরুণকান্তির অনুরোধে খানিকটা মুরগির ঝোল আর ভাত খেতে হল।

খাওয়ার পর অরুণকান্তি বললেন, "আপনি এবার বিশ্রাম নিন। কাল সকালে কথা হবে।"

"গুড নাইট," বলে তিনি উপরে চলে গেলেন।

গতকাল থেকে খুব ধকল গিয়েছে। কাকাবাবু ভেবেছিলেন, খাওয়ার পরেই ঘুমে চোখ টেনে আসবে। কিন্তু বিছানায় শুয়েও তাঁর ঘুম এল না।

খুব সন্তুর কথা মনে পড়ছে।

প্রত্যেকবারই বাইরে কোথাও গেলে সন্তু সঙ্গে থাকে। গতবারেও সন্তু এসেছিল কেনিয়ায়। এখন সন্তুর পরীক্ষা চলছে। কয়েকটা দিন পিছিয়েও দেওয়া গেল না। কারণ, লোহিয়া জানিয়েছিলেন, এই সময়েই তাঁর সুবিধে। সামনের সপ্তাহেই তাঁকে অনেক দিনের জন্য চলে যেতে হবে আমেরিকায়।

কাল সকালে সন্তুকে ফোন করে জানতে হবে, পরীক্ষা কেমন হচ্ছে? জোজোও পরীক্ষা দিচ্ছে একই সঙ্গে।

ঘুম আসছে না কিছুতেই।

বই পড়লে ঘুম আসতে পারে, কাকাবাবু তাই বিছানার পাশের আলো জ্বেলে মহাভারত খুললেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কর্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তুমি তো আসলে কুন্তীরই ছেলে। পাণ্ডবদের ভাই। তুমি দুর্যোধনকে ছেড়ে এসে আমাদের পক্ষে যোগ দাও!'

কাকাবাবু পড়েই চলেছেন, ঘুমের নামগন্ধও নেই।

খানিক পর তিনি শুনতে পেলেন দরজায় ঠুকঠুক শব্দ।

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। এত রাত্রে আবার কে আসবে?

অরুণকান্তি উপরে চলে গিয়েছেন। সব দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে বলেছেন, নইলে অনেক রকম পোকামাকড় আসতে পারে। চোরের উপদ্রবও আছে।

আরও একবার সেই শব্দ হতে কাকাবাবু বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

অরুণকান্তিরই গলা পাওয়া গেল। তিনি বললেন, "সরি কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমি ডিসটার্ব করছি। একটা ব্যাপার ঘটেছে...!"

কাকাবাবু দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার?"

অরুণকান্তি ভিতরে ঢুকে এসে বললেন, "আপনি টিভি দেখেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "টিভি? আমার তো টিভি দেখার তেমন অভ্যেস নেই।"

অরুণকান্তি বললেন, "রোজ রাতে কিছুক্ষণ টিভি না দেখলে আমার ঘুম আসতে চায় না। খবরটবর দেখি...!"

অরুণকান্তি এ ঘরের টিভিটা চালিয়ে দিলেন। তাতে ইংল্যান্ডের ফুটবল খেলা দেখাচ্ছে।

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে অরুণকান্তির দিকে তাকালেন।

অরুণকান্তি বললেন, "দাঁড়ান, আবার নিশ্চয়ই দেখাবে।"

কয়েকমিনিট পরে শুরু হল বিজ্ঞাপন।

তারপরই দেখাল, বিশেষ সংবাদ, যাকে বলে ব্রেকিং নিউজ। তাতে লেখা ফুটে উঠল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পি আর লোহিয়ার বিশাল বাড়ি আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। আগুন কীভাবে লাগল, পুলিশ তা অনুসন্ধান করে দেখছে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে, এটা তাঁর শত্রুপক্ষের কাজ। পি আর লোহিয়াকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আগুনে পুড়ে মারা যাননি, এটা নিশ্চিত। ধ্বংসস্তূপে তাঁর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

মি. লোহিয়া বাইরে যাওয়ার সময় একটা মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখেন। সেটা আধপোড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। সুতরাং তিনি নিজে কোথাও চলে গিয়েছেন কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

মি. লোহিয়ার কেউ সন্ধান দিতে পারলে তাঁকে পাঁচ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

খবরটা দেখার পর দু'জনেই একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর অরুণকান্তি বললেন, "এরকম ঘটনা এখানে আগেও কয়েকবার ঘটেছে। কারও সঙ্গে শত্রুতা থাকলে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। লোহিয়া অত বড় ব্যবসায়ী, তাঁর তো অনেক শত্রু থাকবেই। বিশেষত, 'রয়াল পাওয়ার' নামে একটা ব্রিটিশ কোম্পানির মালিক অ্যান্ড্রু লয়েড নামে এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া ও মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। আমার তো মনে হয়, লোহিয়ার ব্যাবসার ক্ষতি করার জন্য ওই ব্রিটিশ কোম্পানিই গুন্ডা লাগিয়ে এ কাজ করেছে। এ কাজের জন্য এখানে গুন্ডা ভাড়া পাওয়া যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু লোহিয়া গেলেন কোথায়? তিনি কি আগুন

লাগার সময় পালিয়ে গিয়েছেন? কিংবা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?"

অরুণকান্তি বললেন, "সেটা কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে। যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, নিশ্চয়ই মুক্তিপণ দাবি করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঁচ লাখ ডলারের পুরস্কার তো ঘোষণা করা হয়েই গিয়েছে।"

অরুণকান্তি বললেন, "কাকাবাবু, পাঁচ লাখ ডলার আমাদের দেশের টাকার হিসেবে অনেক টাকা, কিন্তু এখানে বড় ব্যবসায়ীদের পাঁচ লাখ ডলার কিছুই নয়। এদের কোটি কোটি ডলারের কারবার। মি. লোহিয়ার যে বাড়িখানা ধ্বংস হয়ে গেল, সেটার দামই তো অন্তত দু'-তিন কোটি ডলার।"

কাকাবাবু বললেন, "আগুন লেগেছে কাল রাত্তিরে। লোহিয়া আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। আমি ঠিক সময় পৌঁছোলে হয়তো আগুন লাগার সময় ওই বাড়িতেই থাকতাম।"

অরুণকান্তি বললেন, "আপনি থাকলে হয়তো আগুন লাগতই না। আপনি কোনও না-কোনওভাবে ঠিক লোকগুলোকে ধরে ফেলতেন। আপনার যা ক্ষমতা দেখছি!"

কাকাবাবু বললেন, "ধ্যাত। আমার সেরকম ক্ষমতাই নেই। আগুন লাগলে হয়তো আমি পুড়েই মরতাম। আমার তো দৌড়ে পালাবার ক্ষমতা নেই।"

একটু পরে অরুণকান্তি বললেন, "অবশ্য আপনি এসে পড়েছেন, আপনার বেড়াবার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি কয়েকদিন ছুটি নেব, আপনাকে আশপাশের কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনব।"

কাকাবাবু বললেন, "লোহিয়া আমার বন্ধু মানুষ। তিনি আমাকে এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছেন, তাঁর এত বড় বিপদের সময় আমার কি আর বেড়াতে ভাল লাগবে? তাঁর কী হল, কোথায় গেলেন, সেটাই আগে জানা দরকার।"

অরুণকান্তি চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। লোহিয়ার কথাই ভাবতে লাগলেন। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে উঠলেন বেশ ভোরে।

বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরলেন তিনি। একটু শীত শীত লাগছে। এখন কলকাতায় খুব গরম, এখানে সোয়েটার কিংবা চাদর গায়ে দিলে ভাল হয়।

কাকাবাবুর মনটা বেশ অস্থির হয়ে আছে। কোনও কবিতা কিংবা গান ভাববার চেষ্টা করেও পারছেন না।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অরুণকান্তি বললেন, "আমার একবার বিকেলের দিকে অফিসে গেলেই চলবে। সকালে কোথায় বেড়াতে যাবেন বলুন?"

কাকাবাবু বললেন, "বেড়াবার বদলে আমি একবার লোহিয়ার আগুন-লাগা বাড়িটা দেখে আসতে চাই। তুমি চেনো সেই বাড়িটা?"

অরুণকান্তি বললেন, "সেটা এ শহরের একটা বিখ্যাত বাড়ি ছিল। ওটা আগে ছিল একজন ইংরেজের বাড়ি। লোহিয়া সেটা কিনে নিয়ে আরও অনেক বাড়িয়ে ছিলেন। চতুর্দিকে বারান্দা, আর সব বারান্দা ঝুলন্ত ফুলের টব দিয়ে সাজানো। চলুন, সেদিকেই যাই।"

নাইরোবি শহরটার পশ্চিম দিকটাতেই ছিল বেশিরভাগ ইংরেজদের বাড়ি।

গাড়ি চালাতে চালাতে অরুণকান্তি বললেন, "আমাদের কলকাতা শহরটার মতো নাইরোবি শহরও অনেকটা ইংরেজ সাহেবরাই বানিয়েছে। কলকাতায় সাহেবরা যেমন থাকত চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে, এখানেও সাহেবরা থাকত নানগাটা, হাইরিজ এইসব পাড়ায়। এখনও কিছু কিছু সাহেব রয়ে গিয়েছে। তবে, একসময় ওসব পাড়ায় সাদা চামড়ার লোকরা ছাড়া কালো মানুষদের থাকার কোনও অধিকারই ছিল না। এখন কিছু কিছু কেনিয়ান, ভারতীয়, চিনারাও বাড়ি কিনে নিয়েছে।"

পাড়াগুলো বেশ সুন্দর, পরিষ্কার, ছিমছাম।

গাড়িটা উঠতে লাগল খানিকটা উঁচুমতো একটা টিলার দিকে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, ঝকঝক করছে রোদ। এই রোদে গরম লাগে না।

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "আরে! আগে শহরের এদিকটায় আসিনি। এখান থেকে কিলিমাঞ্জারো পাহাড় দেখা যায়?"

অরুণকান্তি বললেন, "হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে। রোজ দেখা যায় না, শুধু পরিষ্কার দিনেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস, আমাদের কলকাতা থেকে যদি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত, কী ভাল হত! পাহাড় দেখতে হলে আমাদের অনেক দূরে যেতে হয়!"

অরুণকান্তি বললেন, "আমাদের এখানে তো চতুর্দিকেই পাহাড় আর জঙ্গল।"

একটু যেতে না-যেতেই দেখা গেল কিছু লোক দৌড়োদৌড়ি করছে রাস্তা দিয়ে। তারা কোনও কারণে ভয় পেয়েছে মনে হয়!

লোকগুলো কাকাবাবুদের গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কী যেন বলে গেল, তার মানে বোঝা গেল না।

তারপরই দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে একজোড়া চিতাবাঘ!

অরুণকান্তি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে বললেন, "কাকাবাবু, কাচ তুলে দিন। চিতাবাঘ খুবই হিংস্র। কিন্তু কাচ বন্ধ থাকলে কিছু করতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "চিতাবাঘ একেবারে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল কী করে? জঙ্গলের দিকে জাল ঘেরা আছে না?"

অরুণকান্তি বললেন, "কী হয়েছে বুঝতে পেরেছি। সিংহ কখনও কখনও ঢুকে পড়ে শুনেছি, কিন্তু চিতাবাঘ কখনও শহরে আসে না। মি. লোহিয়ার বাড়িতে বেশ কিছু জন্তু-জানোয়ার ছিল। ওঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানা। জন্তুগুলো ওঁর প্রায় পোষাই ছিল বলতে গেলে। বাড়িতে আগুন লাগার ফলে সেই জন্তুগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে।"

চিতাবাঘ দুটো বসে পড়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে।

কাকাবাবু বললেন, "কী সুন্দর দেখতে! আমাদের নর্থ বেঙ্গলেও লেপার্ড বা চিতাবাঘ আছে বটে, কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট। আফ্রিকার চিতা অনেক বড়।"

অরুণকান্তি বললেন, "এরা সাংঘাতিক হিংস্র আর সব প্রাণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে জোরে দৌড়োতে পারে।"

পিছনে আরও দু'-তিনটে গাড়ি এসে গিয়েছে। তারা হর্ন দিতে লাগল। অরুণকান্তিও বাজাতে লাগলেন হর্ন। চিতা দুটো সেই আওয়াজে যেন বেশ বিরক্ত হয়ে ঢুকে গেল রাস্তার পাশের একটা ঝোপে।

অরুণকান্তি গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে বললেন, "এ শহরের লোকেরা জানে যে, চিতারা আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনও হাতি এসে পড়ত, সহজে সরে যেত না। মি. লোহিয়ার চিড়িয়াখানায় হাতিও ছিল নিশ্চয়ই।"

টিলাটার উপরের দিকে বেশ কিছু মানুষের ভিড় রয়েছে। এখানেই ছিল সেই বিখ্যাত বাড়ি। এখনও কয়েক জায়গায় ধিকিধিকি করে জ্বলছে আগুন। দু'খানা দমকলের গাড়ি জলের ফোয়ারা ছিটিয়েই চলেছে। উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সরিয়ে খুঁজছে, কেউ চাপা পড়ে আছে কি না।

একপাশে একজন ব্যক্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরা। অরুণকান্তি গাড়ি থেকে নেমে বললেন, "চলুন, ওই দিকে যাই। ওই ভদ্রলোককে চিনি, উনি চমনলাল দেওয়ান, মি. লোহিয়ার

ব্যাবসার একজন পার্টনার। লোহিয়ার কীরকম আত্মীয়ও যেন হন। ইনি আবার একজন নামি সাঁতারু!”

লোহিয়ার সঙ্গে এই ব্যক্তিটির চেহারার অনেক তফাত। লোহিয়া রোগা-পাতলা, শান্ত ধরনের মানুষ। কথা বললে বোঝাই যায় না, তিনি এত বড় একজন ব্যবসায়ী, অঢেল টাকার মালিক। আর এই ব্যক্তিটি লম্বা-চওড়া, দশাসই পুরুষ, মস্তবড় গোঁফ। গলার আওয়াজটাও বাজখাঁই।

তাঁর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে সবদিক দেখতে লাগলেন। এমন আশ্চর্য সুন্দর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল! তাঁর এ বাড়িতেই থাকার কথা ছিল। নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগত!

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চমনলাল বললেন, “না, এখনও মি. লোহিয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কেউ তাঁর মুক্তিপণ দাবিও করেনি। আগুন লেগেছিল মধ্য রাত্তিরে, তখন তিনি এ বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। আমরা সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুন লাগার পর অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে। আমরা সবাই ছুটোছুটি করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাইনি।”

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, “উনি কি একলা একলা বাড়ির বাইরে যান?”

চমনলাল বললেন, “না, কখনও কোথাও একলা যান না। আমাকে না জানিয়েও কোথাও যাবেন না। সেইজন্যই তো ব্যাপারটা আরও রহস্যময় লাগছে।”

আর-একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, “এই বাড়ির এতখানি অংশ পুড়ে গেল, নিশ্চয়ই অনেকটা সময় লেগেছে। তার মধ্যে আগুন নেভানো গেল না? নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা ছিল।”

চমনলাল বললেন, “ব্যবস্থা তো সবই আছে। কিন্তু অত রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ব্যাপারটা বুঝতেই খানিকটা সময় লাগে। তা ছাড়া, আমাদের শত্রুপক্ষ আগে অনেকখানি জায়গায় পেট্রল ছড়িয়ে দিয়েছিল। চারজন আর্মড গার্ড আছে, তারা কিছুই টের পায়নি। ঘুমোচ্ছিল বোধহয়। কেউ কেউ নাকি দুটো বোমার আওয়াজও শুনেছে।”

এবার দু’-তিনজন সাংবাদিক একসঙ্গে বলে উঠল, “শত্রুপক্ষ? আপনি জানেন যে শত্রুপক্ষই আগুন লাগিয়েছে? শত্রুপক্ষ বলতে কারা, তাও আপনি জানেন?”

চমনলাল বললেন, "অবশ্যই জানি। দেখুন, আমি রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারি না। আমাদের প্রধান শত্রুপক্ষ হচ্ছে 'হাইল্যান্ড ওভারসি'জ কোম্পানি'। ওদের মালিক জোসেফ এনক্রুমার সঙ্গে গত সপ্তাহেই আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল। সে আমাকে শাসিয়ে ছিল যে, এ দেশ থেকে আমাদের ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য করবে। সে-ই এ বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ নেবই। ওই জোসেফ এনক্রুমাকেই আমি এ দেশ ছাড়া করব।"

কাকাবাবুর এসব শুনতে ভাল লাগছে না। তিনি অরুণকান্তির দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "চলো, এবার ফিরে যাই।"

অরুণকান্তি বললেন, "আর-একটু দাঁড়ান।"

তিনি হাত তুলে চমনলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "দেওয়ানজি, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে একজন এসেছেন, তিনি লোহিয়াজির বন্ধু ছিলেন।"

চমনলাল শুকনোভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এখন অনেকেই দেখা করতে আসছে। কিন্তু আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

অরুণকান্তি আবার বললেন, "লোহিয়াজি ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ওঁর এই বাড়িতেই ওঠার কথা ছিল।"

চমনলাল বললেন, "বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন। এখন তো আমি ওঁকে এখানে থাকার জায়গা দিতে পারব না।"

অরুণকান্তি বললেন, "না না, থাকার জায়গার সমস্যা নেই। উনি আমার কাছে থাকবেন। উনি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন। ওঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী, খুব বিখ্যাত মানুষ। উনি অনেক বড় বড় কেসে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। উনি লোহিয়াজির সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।"

চমনলাল একবার কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখে খানিকটা বিদ্রূপের সুরে বললেন, "আমার তো কারও সাহায্যের দরকার নেই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নমস্কার। আর কেউ কোনও প্রশ্ন করবেন?"

কাকাবাবু এর মধ্যে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন। অরুণকান্তি তাঁর কাছে এসে বললেন, "লোকটা কীরকম অভদ্র দেখলেন? আমার কথা ভাল করে শুনলই না।"

কাকাবাবু বেশ বিরক্ত হয়েছেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার

ওরকমভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। এর পর থেকে তুমি কোথাও আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বিখ্যাত লোক, আমি হ্যানো করেছি, ত্যানো করেছি, এসব কিচ্ছু বলবে না। এখানে আমাকে কেউ চেনে না। আমি সেরকমভাবেই থাকতে চাই।"

॥ ৪ ॥

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "সব ক'টা লিখেছিস?"

জোজো বলল, "তোর এত দেরি হল কেন? আমি তো অনেক আগেই সব শেষ করে বসে আছি।"

সন্তু বলল, "আজ তো এক্ষুনি বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। এখন কী করা হবে, ভেবে রেখেছিস?"

জোজো বলল, "আগে এখান থেকে পালা! শিগ্‌গির!"

সন্তু একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন, পালাতে হবে কেন?"

জোজো সন্তুর হাত টেনে ধরে বলল, "অন্য বন্ধুরা ধরবে! পরীক্ষা শেষ হলে সবাই দলবেঁধে সিনেমা দেখতে যায়! একেবারে টিপিক্যাল। যেন আমরা অন্য সময় সিনেমা দেখি না। রাহুল, অনিন্দ্যরা আমাকে সিনেমা দেখার কথা বলেও রেখেছে। আমাদের নতুন কিছু করতে হবে।"

প্রায় দৌড়েই ওরা রাস্তা পেরিয়ে চলে এল খানিকটা দূরে একটা পার্কের কাছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে নতুন কী করবি?"

জোজো বলল, "তুই মনুমেন্টের উপরে কখনও উঠেছিস?"

সন্তু বলল, "মনুমেন্ট! না। ওঠা যায় বুঝি?"

জোজো বলল, "কেন যাবে না? ভিতরে সিঁড়ি আছে। আজ আমরা মনুমেন্টের মাথায় উঠব। উঠে চিৎকার করে বলব। শোনো বন্ধু, শোনো! আজ আমাদের পরীক্ষা শেষ হল! আজ আমরা স্বাধীন! তা ধিন তা ধিন তা ধিন!"

সন্তু হাসতে হাসতে বলল, "স্বাধীন কী রে? পরীক্ষা শেষ হল, তা বলে তো পড়াশুনো শেষ হয়নি! এখনও আরও তিন বছর...!"

জোজো বলল, "তুই পড়বি! তুই তো ফিজিক্স পড়তে চাস। আমি আর এসব লাইনে নেই। আমি আর্ট কলেজে ভরতি হব।"

সন্তু বলল, "তুই আর্ট কলেজে চান্স পাবি?"

জোজো দুই ভুরু তুলে বলল, "আমি চান্স পাব না? আমি জোজোমাস্টার, মাত্র আঠারো সেকেন্ডে যে-কোনও মানুষের মুখ এঁকে দিতে পারি। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হচ্ছে সতেরো সেকেন্ড। পিকাসো পারতেন, আমার এক সেকেন্ড বেশি লাগে।"

সন্তু বলল, "তুই যদি এতই ভাল পারিস, তা হলে তোর আর্ট কলেজে আর শেখার দরকার কী?"

জোজো বলল, "ঠিক বলেছিস। এটা ভেবে দেখতে হবে। চল, এখন মনুমেন্টে যাই।"

পরীক্ষার শেষদিন বলে ওদের দু'জনেরই বাড়ি থেকে একশো টাকা করে হাতখরচ দেওয়া হয়েছিল। একটা ট্যাক্সি ধরে ওরা চলে এল ময়দানে মনুমেন্টের কাছে। যেখান দিয়ে মনুমেন্টে ঢুকতে হয়, সেখানে একটা লোহার দরজায় দুটো মোটা মোটা তালা ঝুলছে।

সন্তু হতাশভাবে বলল, "যাঃ!"

জোজো বলল, "ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চাবি ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। আর চাবি যদি না পাই, তা হলে তালা দুটো ভেঙে ফেললেই হবে।"

সন্তু বলল, "সে কী রে, তালা ভাঙবি কী? তা হলে আমাদের পুলিশে ধরবে না? ওই দ্যাখ, একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।"

কাছেই একজন কনস্টেবল এক আলুকাবলিওয়ালার কাছ থেকে আলুকাবলি খাচ্ছে।

জোজো তার কাছে গিয়ে বলল, "অফিসার সাহেব, আপনার কাছে কি এই গেটটার চাবি আছে?"

কনস্টেবলটি হাসিহাসি মুখে বলল, "আমি অফিসারও নই, সাহেবও নই। এই চাবিও আমার কাছে নেই। এই চাবি থাকে লালবাজারে।"

জোজো বলল, "আপনি অফিসার নন, চাবিও আপনার কাছে নেই। তা হলে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

কনস্টেবলটি জোজোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলল, "কেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার আপত্তি আছে নাকি?"

জোজো বলল, "না, আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চান তো থাকুন। আমরা এই

গেটের তালা দুটো ভাঙলে আপনি সেদিকে তাকাবেন না!"

কনস্টেবলটি বলল, "তালা ভাঙবে? তাই নাকি? তা হলে তো তোমাকে অ্যারেস্ট করতেই হবে! সোজা নিয়ে গিয়ে লকআপে পুরে দেব। বেশি তেড়িবেড়ি করলে ডান্ডা বেড়ি খেতে হবে।"

জোজো বলল, "তেড়িবেড়ি মানে কী? ডান্ডা বেড়ি মানেই বা কী?"

কনস্টেবলটি বলল, "সে যখন হবে, তখন বুঝবে!"

জোজো এবার বেশ তেজের সঙ্গে বলল, "আমাকে লকআপে পুরবেন? জানেন আমি কে? পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তী আমার মামা! আমি জোজো, তাঁর ভাগনে। আমার গায়ে হাত ছোঁয়াবার সাহস হবে আপনার? পরশুই তো গৌতমমামা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমপোড়া শরবত খেতে। আমার মায়ের হাতের লাউ-চিংড়ি খেতেও উনি খুব ভালবাসেন।"

কনস্টেবলটি এবার আলুকাবলিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, "গত সপ্তাহেই একটা পাগল এসেছিল, তুমি তো দেখেছিলে, তাই না? এইখানে ডিগবাজি খাচ্ছিল। আর বারবার বলছিল, পুলিশ কমিশনার তার মামা। একবার বলেনি, অন্তত দশবার।"

সে এবার জোজোর দিকে ফিরে বলল, "সেও ভাগনে, তুমিও ভাগনে, তা হলে সেই পাগলটি কি তোমার ভাই?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই! দুনিয়ার সব পাগলই আমার ভাই! আর পুলিশ কমিশনারদের অনেক ভাগনে থাকে।"

সন্তু কাছে এসে জোজোর হাত ধরে টেনে বলল, "অ্যাই, চল! এখানে সুবিধে হবে না। অন্য কোথাও যাই।"

জোজো বলল, "আমার মনুমেন্টে চড়তে ইচ্ছে করছে। অন্য কোথাও যাব কেন? কোথায় যাব?"

সন্তু বলল, "গঙ্গার ধারে গিয়ে বরং একটা স্টিমারে উঠে পড়ি।"

এই সময় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল। প্যাঁ পোঁ আওয়াজ করে তিন-চারখানা পুলিশের গাড়ি এসে থামল কাছেই। ঝটপট করে কয়েকজন পুলিশ সেই সব গাড়ি থেকে নেমে সারবেঁধে দাঁড়াল। আর-একটা সাদা রঙের গাড়ি থেকে নামলেন একজন বেশ লম্বামতো মানুষ, তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা। একজন মহিলা আর দুটি বাচ্চাও নামল সেই গাড়ি থেকে।

সন্তু বলল, "চল জোজো, কেটে পড়ি। এখানে আর আমাদের দাঁড়াতে দেবে না।"

জোজো বলল, "আর-একটু দাঁড়া না, দেখি। এই ভদ্রলোক কে রে? পুলিশ এত খাতির করছে?"

সন্তু বলল, "ইনি তো আমাদের রাজ্যপাল, গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। কাগজে ফোটো দেখিসনি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, সেইজন্যই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।"

পুলিশরা রাজ্যপালকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে কেউ কাছে না যায়। জোজো হঠাৎ এক পুলিশের বগলের তলা দিয়ে গলে দৌড়ে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে হাজির হল। তারপর বলল, "স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই!"

একজন পুলিশ অফিসার জোজোর কাঁধ ধরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, রাজ্যপাল তাকে বারণ করলেন।

তিনি বাংলা শিখেছেন, বাংলাতেই মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাকে কী বলতে চাইছিলে, বলো!"

জোজো বলল, "স্যার, আমি আর আমার বন্ধু, ওই যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আজ আমাদের পার্ট-টু পরীক্ষা শেষ হল। আমরা এই মনুমেন্টের উপরে আজ উঠে দেখতে চাই। পুলিশরা আমাদের উঠতে দিচ্ছে না।"

রাজ্যপাল বললেন, "ও, এই কথা! আমিও তো আজ এর উপরে উঠব বলেই এসেছি। এটার ভিতরের অবস্থাটা কেমন, তাও দেখতে হবে। তোমরা দু'জনেও এসো আমার সঙ্গে। পুলিশ কিছু বলবে না।"

জোজো এবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে পিছন ফিরে বলল, "অ্যাই সন্তু, চলে আয়। আমরা মনুমেন্টের উপরে উঠব। তোকে বলেছিলুম না...!"

প্রথম দেখা কনস্টেবলটির দিকেও হাত নেড়ে দিয়ে জোজো বলল, "টা টা।"

সে বেচারি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

মনুমেন্টের ভিতরে ঘোরানো সিঁড়ি, অন্ধকার অন্ধকার। বোঝাই যায়, রাজ্যপাল আসবেন বলে আজ কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটুখানি ওঠার পর হঠাৎ ফরফর শব্দ হতেই জোজো ভয় পেয়ে থেমে গেল।

সন্তু বলল, "ভয়ের কিচ্ছু নেই। ওগুলো চামচিকে।"

জোজো বলল, "ভয় পাইনি। বিচ্ছিরি গন্ধ।"

সন্তু বলল, "এখানে অনেকদিন মানুষ ঢোকেনি মনে হচ্ছে। তাই কীরকম যেন ভ্যাপসা গন্ধ। চামচিকে ছাড়া বাদুড়ও থাকতে পারে।"

জোজো বলল, "বাদুড়? তা হলে আমি উঠব না।"

বাদুড় অবশ্য দেখা গেল না। রাজ্যপাল আস্তে আস্তে উঠছেন, ওরা দু'জন আগে উঠে গেল তরতরিয়ে। সবচেয়ে উঁচুতে। এখানে হু হু করছে হাওয়া। মনে হয়, পুরো কলকাতা শহরটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। খানিক পরে রাজ্যপাল এসে প্রথমে জানতে চাইলেন, ওরা দু'জন কোথায় থাকে, কী পড়ে।

জোজো বলল, "এটার গেট তালাবন্ধ থাকে কেন? সবাই এসে কেন দেখতে পারে না?"

রাজ্যপাল বললেন, "পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছি সেকথা। আগে প্রতি রোববার দর্শকদের জন্য খোলা থাকত। স্কুলগুলো থেকে দলবেঁধে আসত ছেলেমেয়েরা। এখন পুলিশ বলছে, এটা খুব পুরনো হয়ে গিয়েছে তো, বেশি লোক এলে যদি ভেঙেটেঙে পড়ে, তাই আর গেট খোলা হয় না।"

জোজো বলল, "পুরনো হয়েছে, সারিয়ে নিলেই পারে।"

রাজ্যপাল বললেন, "ঠিক। বলব সেকথা। তবে কী জানো, এটা যখন তৈরি হয় তখন তো কলকাতা শহরে এর চেয়ে বড় কিছু ছিল না। চারদিকটা অনেক ফাঁকা ছিল। তখন নাকি এখান থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত দেখা যেত। এখন তো প্রায় সবদিকেই উঁচু উঁচু বাড়ি। হরাইজন, হরাইজন-এর বাংলা কী যেন?"

সন্তু বলল, "দিগন্ত।"

রাজ্যপাল বললেন, "ইয়েস, দিগন্ত। দিগন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছে।"

উলটো দিকে ফিরে তিনি বললেন, "এই দিকটা তবু ফাঁকা আছে। গঙ্গা নদী। অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে।"

জোজো বলল, "জাহাজ দেখলেই আমার ইচ্ছে করে উঠে পড়ে কোনও দূর দেশে চলে যাই।"

রাজ্যপাল বললেন, "আমারও ছেলেবেলায় সেরকম ইচ্ছে হত। সব বালকই বোধহয় দূরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমি বন্দরে গিয়ে বসে থাকতাম। আমার কোথায় যেতে ইচ্ছে করত জানো? সাউথ আফ্রিকায়। ওখানে আমার গ্র্যান্ডফাদার, মানে ঠাকুরদা থাকতেন তো একসময়।"

সন্তু বলল, "মহাত্মা গাঁধী। তখন উনি ব্যারিস্টার ছিলেন।"

রাজ্যপাল মাথা নাড়লেন।

জোজো বলল, "আমাদেরও খুব আফ্রিকায় যেতে ইচ্ছে করে। কেনিয়ায়।"

রাজ্যপাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেনিয়ায়? সেখানে কেন? সেখানে তোমাদের চেনাশুনো কেউ থাকে?"

জোজো বলল, "থাকেন না, আমাদের কাকাবাবু সেখানেই গিয়েছেন। অনেকবার কাকাবাবু যেখানে যান, আমাকে আর আমার এই বন্ধু সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যান। এবারে তিনি আমাদের না নিয়ে একাই চলে গিয়েছেন।"

রাজ্যপাল জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে তোমাদের সঙ্গে নেননি কেন?"

জোজো বলল, "আমাদের তো পরীক্ষা চলছিল। আজই শেষ হয়ে গেল। কাকাবাবু যদি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেন, তা হলে আমরাও যেতে পারতাম! জানেন, আমাদের কাকাবাবু খুব বিখ্যাত মানুষ, তিনি...!"

সন্তু জোজোর পিঠে একটা চিমটি কাটল।

কাকাবাবু অন্যদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। বারণ করে দিয়েছেন। জোজোর মনে থাকে না। সন্তুর চিমটি খেয়ে সে থেমে গেল। রাজ্যপালও এই সময় মুখ ফিরিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

রাজ্যপাল আবার এদিকে তাকাতেই জোজো বলল, "স্যার, আপনি একটু ব্যবস্থা করে দিন না। একটা জাহাজ কোম্পানিকে বলে দিন, আমাদের কেনিয়া নিয়ে যাবে।"

রাজ্যপাল হেসে বললেন, "তুমি তো ভারী দুষ্টু ছেলে? ভেবেছ, রাজ্যপালকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেওয়া যায়? জাহাজ কোম্পানি আমার কথা শুনবে কেন? তা ছাড়া কাকাবাবু তোমাদের নিয়ে যাননি, ভালই করেছেন। পরীক্ষা শেষ হলেও তোমাদের পড়াশুনো তো শেষ হয়নি। এই বয়সটায় স্বপ্ন দেখবে, বড় হয়ে সত্যি সত্যি বেড়াতে যাবে দূর দূর দেশে।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ছেলেটি বেশ শান্ত। ভাল ছেলে।"

জোজো বলল, "ভাল ছেলে? আপনি জানেন না, ও কীরকম রিভলবারে গুলি চালাতে পারে!"

রাজ্যপাল চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ? গুলি চালায়?"

সন্তু বলল, "মোটেই আমি গুলি চালাই না। আমার কাকাবাবু আমাকে

রিভলবার চালানো শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে খুব বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা করতে পারি।"

রাজ্যপাল বললেন, "গুড। আশা করি, সেরকম বিপদে তোমাকে কখনও পড়তে হবে না।"

রাজ্যপালকে তাঁর স্ত্রী ডাকতেই তিনি ওদের বললেন, "এবার তো আমায় চলে যেতে হচ্ছে।"

রাজ্যপাল নেমে যাওয়ার পর পুলিশও আর ওদের থাকতে দিল না।

নীচে নেমে এসে সন্তু বলল, ''আয়, এবার ফুচকা খাই।"

জোজো নাক কুঁচকোল।

সন্তু এসব ভালবাসে, জোজো রাস্তার খাবার একেবারে পছন্দ করে না। দোকানের কচুরি-তরকারি তার ভাল লাগে।

সন্তু বলল, "কচুরি-তরকারি পরে খাব। ওই যে ফুচকা পাওয়া যাচ্ছে।"

জোজো অগত্যা রাজি হল। জোজো একদম ঝাল খেতে পারে না, সন্তুর আবার ঝাল চাই। জোজো কোনওরকমে খেল দুটো ফুচকা, সন্তু খেল দশটা।

মুখটুখ মুছে জোজো বলল, "এবার আমি একটা সিগারেট খাব!"

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "সিগারেট? তুই খাস নাকি?"

জোজো বলল, "খাইনি কখনও। পরীক্ষা শেষ হলে খেতে হয়। তুই খাবি না?"

সন্তু বলল, "না! আমার গন্ধটা ভাল লাগে না।"

জোজো চোখ নাচিয়ে বলল, "গন্ধটা ভাল লাগে না? নাকি ভয় পাচ্ছিস? বাড়িতে বকবে। মুখে গন্ধ পাবে।"

সন্তু বলল, "ভয়ের কী আছে? আমার বাবা একসময় খুব সিগারেট খেতেন, এখন অবশ্য ছেড়ে দিয়েছেন। কাকাবাবুও তো আগে চুরুট খেতেন খুব। ঠিক আছে, চল, একটা টেনে দেখি।"

জোজো একটা দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনল। দোকানদারের কাছ থেকেই চেয়ে আনল দেশলাই।

প্রথম সিগারেট ধরানো মোটেই সহজ নয়। সাত-আটটা কাঠি খরচ করে ফেলল জোজো। ধোঁয়া বেরোতেই টান মারল দুই বন্ধু।

দু'বার টানার পরই দু'জনেই কাশতে লাগল খকখক করে।

আর-একবার টেনে সন্তু অর্ধেক সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল,

"ধুত, আমার পোষাবে না। লোকে কেন খায় এটা এত কষ্ট করে?"

জোজোও আর টানতে পারল না। সে-ও ফেলে দিল। তবু বীরের মতো বলল, "আমি পরে আবার প্র্যাকটিস করব। বড় আর্টিস্ট হতে গেলে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে রাখতে হয়। ফোটোয় দেখিসনি?"

সন্তু বলল, "তা হলে তোকে দাড়িও রাখতে হবে।"

জোজো বলল, "তা তো রাখবই। নতুন স্টাইলের দাড়ি। ফ্রেঞ্চকাটও নয়, রবীন্দ্রনাথের মতোও নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

জোজো বলল, "দেখলি, মনুমেন্টে চড়ব বলেছিলুম, ঠিক চড়া হয়ে গেল!"

সন্তু বলল, "সত্যি, তুই পারিসও বটে! রাজ্যপালের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেললি?"

জোজো বলল, "চল, এবার খিদিরপুরে যাব। ওই যে কয়েকটা জাহাজ দেখা গেল, ওর মধ্যে একটা ফরেন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলব, আমাদের আফ্রিকা পৌঁছে দিতে।"

সন্তু বলল, "পাগল নাকি? বিদেশি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললেই আমাদের নিয়ে যাবে? টিকিটের পয়সা লাগবে না?"

জোজো বলল, "তুই কিচ্ছু জানিস না। আজকাল এইসব জাহাজে যাত্রী নেয়ই না। শুধু মালপত্র নিয়ে যায়। আমরা যাব ক্যাপ্টেনের গেস্ট হয়ে। সুতরাং টিকিট লাগার প্রশ্নই নেই। তুই নানাবতীর নাম শুনেছিস?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

জোজো বলল, "আর পি নানাবতী আমার কাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা ডাকতাম 'নানুকাকু'। উনি ছিলেন ইন্ডিয়ান নেভির চিফ। পৃথিবীর সমস্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন ওঁর নাম জানেন আর খুব সম্মান করেন। আমি গিয়ে নানুকাকুর নাম বলব, আর দেখবি ক্যাপ্টেনরা আমাদের কত খাতির করবেন।"

সন্তু বলল, "আজ থাক। আমি এখন বাড়ি যাই।"

জোজো এক ধমক দিয়ে বলল, "ধ্যাত! এখন সন্ধেও হয়নি, তুই এর মধ্যেই বাড়ি বাড়ি করছিস? পরীক্ষার শেষদিনে রাত আটটার আগে বাড়ি ফেরার নিয়ম নেই। বাড়ির লোকরাই এখন আমাদের ফিরতে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। আটটার জায়গায় ন'টায় ফিরলে ক্ষতি নেই!"

সন্তু বলল, "আজই আফ্রিকায় গেলে আটটা-ন'টার মধ্যে ফিরব কী করে?"

জোজো বলল, "যদি জাহাজ পাওয়া যায়, তা হলে আর ফিরবই না। বাড়িতেও কোনও খবর দেব না। বাড়ির লোক চিন্তা করবেন ভাবছিস তো? চিন্তা করুন না। মাঝে মাঝে চিন্তা ভাল। আমরা জাহাজে ভেসে পড়ব, বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে থানায় খবর দেবেন, হাসপাতালে ছুটবেন। কোথাও আমাদের পাত্তা না পেয়ে কাঁদতে শুরু করবেন। আমরা কাল ভোরে মাঝসমুদ্র থেকে ফোনে আমাদের খবর জানিয়ে দেব। আজকাল টেলিফোনের কতরকম সুবিধে হয়ে গিয়েছে। মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া থেকেও ফোন করা যায়। তারপর কাকাবাবুর কাছে পৌঁছে গেলে তো আর কোনও কথাই নেই। সে খবর জানার পর বাড়ির লোকদের কান্না একেবারে থেমে গিয়ে মুখে হাসি ফুটবে। আমরা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠাব।"

সন্তুর সারামুখে হাসি ঝলমল করছে।

জোজো অবাক হয়ে বলল, "হাসছিস যে বড়? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? চল, খিদিরপুরে চল, দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কথা মেলে কি না।"

সন্তু বলল, "মিলতে তো পারেই তোর কথা। আমি বলি কী, খিদিরপুরে যাওয়ার আগে এদিককার গঙ্গার ঘাটে আগে যাই। ফেরিঘাটে একটা স্টিমারে চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে নিই। সমুদ্রে যাওয়ার আগে একবার গঙ্গায় ঘুরে বেড়ানো ভাল নয়?

॥ ৫ ॥

পরের দিনের কাগজেও অনেকখানি লেখা বেরিয়েছে লোহিয়া সম্পর্কে। এখনও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, কেউ তাঁর জন্য মুক্তিপণও দাবি করেনি। পুলিশ সব জায়গায় তাঁর খোঁজ করছে। এর মধ্যে একজন লোক নিজের নাম না জানিয়ে পুলিশের বড়কর্তাকে একটা ফোন করেছিল। সে জানিয়েছে যে, সে বিখ্যাত ব্যবসায়ী লোহিয়াকে দেখতে পেয়েছে মোম্বাসা শহরে। সেখানে একটা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল একটা ধূপের ধোঁয়া রঙের গলাবন্ধ কোট আর সাদা রঙের প্যান্ট। এই লোকটি লোহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু লোহিয়া কোনও

উত্তর না দিয়ে উঠে চলে যান। আর তাঁকে দেখা যায়নি।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে মোম্বাসায় খবর পাঠিয়ে সেখানকার পুলিশ দিয়ে অনেক তল্লাশি করে। কিন্তু কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি। সেখানকার পুলিশের ধারণা, যে-লোকটি ফোন করেছিল, সে একটা ধাপ্পা দিয়েছে। নিশ্চয়ই তার কোনও মতলব আছে।

কাকাবাবু ব্রেকফাস্ট টেবিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর পড়লেন।

অরুণকান্তির আগেই কাগজ পড়া হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, "লোহিয়াজি হঠাৎ মোম্বাসা চলে যাবেন কেন? তাঁর অমন প্রিয় বাড়ি, সেখানে আগুন লাগলে তিনি তো তাঁর খুব দরকারি জিনিসপত্র উদ্ধার করারই চেষ্টা করবেন। ওই অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার তো কোনও কারণই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো ঠিকই। ওই সময় কোথাও চলে যাওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।"

অরুণকান্তি আবার বললেন, "লোহিয়াজি বাড়িতে আগুন লাগার চেয়েও আরও বড় কোনও বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাই আত্মগোপন করেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও হতে পারে। সেটাই বোধহয় ওঁর লুকিয়ে থাকার আসল কারণ।"

অরুণকান্তি এবার খানিকটা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, "কী ব্যাপার, বলুন তো কাকাবাবু? আমি যা বলছি, তাতেই আপনি সায় দিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি আমার কথা ভাল করে শুনছেন না? এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি নিজে কিছু ভাবছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, শুনব না কেন? তোমার সব কথা শুনছি। তুমি তো ঠিক কথাই বলছ। আমি আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

অরুণকান্তি বললেন, "পুলিশের কাছে যে লোকটা ফোন করেছিল, ওরকম কিছু কিছু লোক থাকে, কিছু একটা ঘটনা ঘটলেই বানিয়ে বানিয়ে নানান কথা বলে। ওতেই ওদের আনন্দ। অনেক সময় পুলিশ ওদের কথা শুনে ভুল পথে চলে যায়। তাতে অনেক সময় নষ্ট হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তবে, ওই লোকটি লোহিয়াজির পোশাকের যা বর্ণনা দিয়েছে, তা কিন্তু মিলে যায়। আমি সব সময় লোহিয়াজিকে একটা হালকা রঙের কোট আর সাদা প্যান্ট পরে থাকতেই দেখেছি। অত ধনী মানুষ, কিন্তু সাজপোশাকের কোনও বাড়াবাড়ি ছিল না।"

"তা হলে আপনি কি মনে করেন লোহিয়াজি মোম্বাসা শহরেই গিয়েছেন কোনও কারণে?"

"সেটাও তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যে লোকটি ফোন করেছিল, সে হয়তো লোহিয়াজিকে চেনে, কিন্তু পার্কে দেখা হওয়াটা সত্যি না-ও হতে পারে।"

"কাকাবাবু, আপনি এখন কী করবেন?"

"দু'-একদিন অপেক্ষা করে দেখি, লোহিয়াজির কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না। যদি নাই-ই পাওয়া যায়; তা হলে, তা হলে আর শুধু শুধু বসে থেকে কী করব? বাড়ি ফিরে যাব!"

"আপনি নিজে থেকে ওঁকে খোঁজার কোনও চেষ্টা করবেন না?"

"আমি কী চেষ্টা করব বলো তো? এটা আমার দেশ নয়। বিশেষত, লোকজনদের চিনি না। কোনও লোক উধাও হয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব পুলিশের। এর মধ্যে আমি নাক গলাতে গেলে এ দেশের পুলিশ তা সহ্য করবে কেন?"

"এ দেশের পুলিশের উপর আমার তেমন ভরসা নেই। লোহিয়াজি লোকটি বড় ভাল। এখানকার ইন্ডিয়ানদের অনেক সাহায্য করতেন।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ।"

ব্রেকফাস্ট শেষ করার পরে অরুণকান্তি বললেন, "আমাকে একবার অফিসে যেতে হবে। বেশিক্ষণ থাকব না। তারপর বিকেলে চলুন, বিনায়ক ঘোষদের বাড়িতে যাই। উনি ফোন করেছিলেন।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, "বিনায়ক ঘোষ কে বলো তো?"

অরুণকান্তি বললেন, "ওই যে প্লেনে দেখা হয়েছিল, এক মহিলার কোলে বাচ্চা ছিল। আপনি তার গান শুনতে চাইলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা হলে চলো, বিকেলে তো কোনও কাজ নেই, ওখানে গিয়ে গান শোনা যাক। তুমি ঘুরে এসো অফিস থেকে।"

অরুণকান্তি উপরে গিয়ে পোশাক পালটে যখন নেমে এলেন, তখনও কাকাবাবু চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, কাগজটা সামনে রয়েছে বটে, কিন্তু তিনি পড়ছেন না।

অরুণকান্তি বললেন, "স্যার। আমার সত্যি খুব অবাক লাগছে। আপনার

সম্পর্কে এত কিছু শুনেছি, অথচ এখানে শুধু চুপচাপ বসে আছেন, এটা যেন ভাবাই যাচ্ছে না!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "চুপচাপ বসে না থেকে তা হলে কি আমি লাফালাফি করব? এই পা নিয়ে তা পারি না যে! তা ছাড়া তুমি আমার সম্পর্কে যা শুনেছ, তা বেশি বেশি শুনেছ। লোকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে।"

অরুণকান্তি বললেন, "বাড়িয়ে বলবে কী, আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম। হাইজ্যাকারদের হাতে অমন সব মারাত্মক অস্ত্র, আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছি, আর আপনি তাদের এক ঘুসি মেরে ঠান্ডা করে দিলেন। সব ক'টা ধরা পড়ে গেল!"

কাকাবাবু আরও জোরে হেসে উঠে বললেন, "আরে, আমি কি ওদের প্ল্যান করে ধরিয়ে দিয়েছি? অত সাহস আমার নেই। আজকাল আমার রাগটা বড্ড বেড়ে গিয়েছে। ওদের একটা ছেলে অকারণে আমাকে অপমান করছিল, আমার গোঁফ ধরে টানল, তাতেই আমার মাথা এত গরম হয়ে গেল যে, পরে কী হবে না-হবে তা না ভেবেই মেরে দিলাম এক ঘুসি। আসলে ওই ছেলেগুলোই একেবারে নভিস, ভাল করে ট্রেনিং নেয়নি, তাই অত সহজে ধরা পড়ে গেল। এতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই।"

অরুণকান্তি বললেন, "সে আমরা ঠিক বুঝে নিয়েছি। যাই হোক, আপনি টিভি দেখুন, আমি অফিস থেকে ঘুরে আসছি।"

কাকাবাবুর টিভি দেখার বিশেষ অভ্যেস নেই। তিনি মহাভারত খুলে বসলেন। কৃষ্ণ ফিরে গিয়েছেন পাণ্ডবদের কাছে। এবার যুদ্ধ লাগবে।

কতবার পড়ছেন এই বই, তবু কিছুদিন অন্তর অন্তর পড়তে ভাল লাগে।

দুপুরে একবার ফোন করলেন কলকাতার বাড়িতে।

সন্তু নেই, বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছে। পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, এখন তো কয়েকটা দিন আড্ডা মারবেই। বউদির সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন কাকাবাবু।

বিকেলের দিকে অরুণকান্তি ফিরে এসে কাকাবাবুকে নিয়ে বেরোলেন।

এখানে সন্ধের আগের রোদটাকে ঠিক সোনালি মনে হয়। আকাশ একেবারে তকতকে নীল। রাস্তার পাশে পাশে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে একটা ফুলের গাছ, খুব সম্ভবত কাঞ্চন ফুল।

গতকাল সারাদিনই শহরের নানান জায়গায় দেখা গিয়েছে লোহিয়াজির নিজস্ব চিড়িয়াখানার ছাড়া পাওয়া জন্তু-জানোয়ার। এখানকার লোকরা

বন্যপ্রাণী দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তাই কেউ কিছু গ্রাহ্য করেনি। শুধু এক জায়গায় একটি বাচ্চা ছেলে হাতি দেখে ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল, আর কোনও ক্ষতি হয়নি কারও।

এর মধ্যে সেই জানোয়াররা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে জেব্রা দেখা যায় যে-কোনও জায়গায়। আমাদের দেশের গাধার মতো। গাধা আর জেব্রা তো প্রায় একই প্রাণী, তবে গাধার গায়ের রং দেখতে ভাল নয়, আর মুখখানা বোকা বোকা। জেব্রাদের গা ডোরাকাটা বলে বেশ সুন্দর দেখায়। গাধার বদলে শুধু জেব্রাদের গা-ই কেন ডোরাকাটা? শুধু তাই-ই নয়, গায়ের ওই ডোরাকাটাগুলো নাকি প্রত্যেক জেব্রার আলাদা!

হেমন্তিকা আর বিনায়ক ঘোষদের বাড়িও নিরিবিলি এলাকায়। আলাদা বাড়ি নয় অবশ্য, তিনতলার উপরে ফ্ল্যাট। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই বয়স বেশি নয়, ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। বেশিদিন আগে আসেননি এদেশে। পাঁচ বছর। বিনায়ক এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হেমন্তিকাও একটা লাইব্রেরিতে চাকরি করতেন। ছোট বাচ্চা আছে বলে এখন চাকরি ছেড়ে বাড়িতেই থাকেন।

ফ্ল্যাটটি বেশ বড়। বসবার ঘরে এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি, অন্য দেওয়ালে নজরুলের। নজরুলের ছবিটা অন্যরকম, ধুতি ও হলুদ পাঞ্জাবি পরা পুরো চেহারা। কাকাবাবু খুব কাছে গিয়ে দেখলেন, ফোটোগ্রাফ বলে মনে হলেও আসলে সেটা আঁকা ছবি।

চা খেতে খেতে শুরু হয়ে গেল সেই প্লেন হাইজ্যাকের গল্প। হেমন্তিকা চোখ বড় বড় করে বলতে লাগলেন, "উঃ বাবা, ভাবলেও এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। এক ভদ্রলোকের গলায় ফাঁস জড়িয়ে কীরকম অত্যাচার করল?"

একটু পরে কাকাবাবু বললেন, "ও গল্প থাক। হেমন্তিকা, তোমার গান শোনাবার কথা ছিল?"

আগে থেকেই একটা হারমোনিয়াম এনে রাখা হয়েছে।

হেমন্তিকা তাঁর সামনে বসে পড়ে বললেন, "আপনি যে বললেন, রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছিলেন, সেটা তো খুঁজে পেলাম না!"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথ নাইরোবি নিয়ে গান লিখেছেন, তা বলিনি। বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের গানে 'নাই রবি' আছে। তুমি এই গানটা জানো, 'সকালবেলার আলোয় বাজে, বিদায় বেলার ভৈরবী'?"

হেমন্তিকা বললেন, "শুনেছি, পুরোটা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরো গানটা হচ্ছে:

'সকালবেলার আলোয় বাজে
বিদায় বেলার ভৈরবী—
আন্ বাঁশি তোর, আয় কবি ৷৷
শিশিরশিহর শরৎপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধ সাথে
গান গেয়ে যাস আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস নাই র'বি।' "

কাকাবাবু শেষ লাইনটা বলতেই সবাই হেসে উঠলেন।

অরুণকান্তি বললেন, "নাইরোবি তো নয়। এর তো অন্য মানে। 'নাই যদি রোস নাই র'বি', এর মানে হচ্ছে, থামতে না চাস, তা হলে থামিস না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সে যাই হোক, যখন সবাই এ গানটা গায়, তখন উচ্চারণ করে নাইরোবি!"

বিনায়ক বললেন, "কেনিয়া কিংবা নাইরোবি নিয়ে বাংলায় কি কোনও বই আছে?"

অরুণকান্তি বললেন, "আমার তো কখনও চোখে পড়েনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা বই পড়েছিলাম, সে বইটা এখন পাওয়া যায় কি না জানি না। বইটার নাম, 'নাইরোবি থেকে রবি'।"

হেমন্তিকা বললেন, "এ আবার কী নাম? এর কোনও মানে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "লেখকের নাম খুব সম্ভবত শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। ভদ্রলোক অনেকদিন আগে এই নাইরোবিতেই থাকতেন। সেকালের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। তখন এই শহরটাই নতুন হয়েছে বলা যায়।"

অরুণকান্তি বললেন, "কেনিয়া দেশটাই তো নতুন। আগে নানা জাতের লোক থাকত, কিন্তু দেশ যাকে বলে, ইংরেজরা এসে সেটা বানিয়েছে। ওরাই একটা পাহাড়ের নাম নিয়ে দেশটার নাম দেয় কেনিয়া।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই বইয়ের প্রথম অংশে দারুণ সব কাহিনি আছে, তার মধ্যে বাড়িতে সিংহ ঢুকে পড়ার কথাও মনে আছে। তারপর সেই ভদ্রলোক একসময় দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ঠিক করলেন। কলকাতায় গিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর কিছু লেখকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। কলকাতা থেকে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেখানেই থেকে যেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ

তখনও বেঁচে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর দেখা হল। সেই জন্য বইয়ের নাম 'নাইরোবি থেকে রবি'।"

বিনায়ক বললেন, "বইটা জোগাড় করার চেষ্টা করব তো!"

কাকাবাবু হেমন্তিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার নামেও তো রবীন্দ্রনাথের গান আছে। তুমি সেই গানটা জানো নিশ্চয়ই?"

হেমন্তিকা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "জানি!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই আগে শোনাও!"

তিনি গাইলেন :

"হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো, আপন আলো..."

মেয়েটি বেশ ভালই গান করেন! কাকাবাবু মুগ্ধ হয়ে শুনে বললেন, "চমৎকার। তুমি আরও একটা গাও!"

বিনায়ক জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, আপনিও নিশ্চয়ই গান জানেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না না, একদম না। আমি অনেক গান মুখস্ত বলতে পারি। কিন্তু গাইতে পারি না। তাই আমি বাথরুম সিঙ্গার।"

হেমন্তিকা বললেন, "আপনার নাম রাজা রায়চৌধুরী। রাজাকে নিয়েও তো রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আছে। সেরকম একটা...!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার নাম নয়, শুধু 'রাজা' বা 'মহারাজ' নিয়ে অনেক গান আছে ঠিকই। কিন্তু সেসব গাইতে হবে না। তুমি এই গানটা গাও: 'আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা!' "

সে গান সবেমাত্র শুরু হতেই সামনের রাস্তায় একটা দারুণ হইহই চিৎকার শোনা গেল।

প্রথমে বিনায়ক উঠে গিয়ে উঁকি দিলেন সামনের বারান্দায়।

সেখানে গিয়ে তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাই, অ্যাই!"

তারপর "ও, মাই গড," বলতে বলতে তিনিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন দুপদুপিয়ে।

একত্রে সবাই দৌড়ে গেলেন বারান্দায়। দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

সামনের রাস্তায় খেলা করছিল আট-দশটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করানো আছে তিনটি গাড়ি।

কয়েকটা লোকের মুখে কালো মুখোশ, তারা সেই তিনটি গাড়িরই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে। বাচ্চারা চ্যাঁচাচ্ছে। কয়েকটি ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে কিছু লোকও চ্যাঁচামেচি করছে, মুখোশধারীরা গ্রাহ্যই করছে না।

বিনায়ক নীচে যেতে যেতেই গাড়ি তিনটি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিনায়ক শুধু শুধু একটা গাড়ির পিছনে কিছুটা দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়।

হেমন্তিকা বললেন, "দেখলেন, দেখলেন! এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি, এ একেবারে দিনের আলোয় ডাকাতি। ইস, গাড়িটা ওর খুব ফেভারিট ছিল।"

অরুণকান্তি ম্লান হেসে বললেন, "আমার গাড়িটাও তো নিয়ে গেল। ওটা অবশ্য আমার নিজস্ব নয়, অফিসের গাড়ি।"

হেমন্তিকা বললেন, "একসঙ্গে তিনটে গাড়ি চুরির ঘটনা আমি আগে কখনও শুনিনি। তাও এত লোকের চোখের সামনে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাচ্চারা ওখানে খেলছে। আমার ভয় করছিল, ওরা গাড়ি নিয়ে হুড়োহুড়ি করে পালাতে গিয়ে কাউকে না চাপা দেয়!"

অরুণকান্তি বললেন, "গাড়ি চুরি এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। এখানে এমন কেউ নেই, যার একটা না-একটা গাড়ি চুরি হয়নি। আজ ইংল্যান্ডের একজন মন্ত্রী এ দেশ সফরে আসছেন। কোনও ভি আই পি এলে সেইসব দিনে কয়েকটা রাস্তা পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ হয়ে যায়। অন্য অনেক রাস্তায় পুলিশ থাকেই না। এইসব দিনে গাড়ি চোরদের দারুণ মজা। ওরা জানে, এইসব রাস্তায় আজ হাজার ডাকলেও পুলিশ আসবে না।"

হেমন্তিকা বললেন, "পুলিশ থাকলেই বা কী হয়? অনেক সময় এরা চুরি করে, পুলিশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এই দেশটা এমনিতে এত ভাল, এত সুন্দর, খাবারদাবারও ভাল পাওয়া যায়, কিন্তু বড্ড চোর-ডাকাতের উৎপাত। সব সময় কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।"

বিনায়ক উপরে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আনবিলিভেব্‌ল। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি তিনটে নিয়ে গেল? আমার গাড়িটা এত পছন্দের, এত ভাল পিক্‌আপ, জোরে ব্রেক কষলেও বিচ্ছিরি শব্দ হয় না!"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়ির ইনশিয়োরেন্স আছে নিশ্চয়ই?"

বিনায়ক বললেন, "তা আছে! কিছু টাকা দেবে। কিন্তু এই গাড়ি তো আর ফিরে পাব না?"

এর পর আর গান জমে না। চেনাশুনো আর কার বাড়িতে কবে কেমন রোমহর্ষক ডাকাতি হয়েছে, সেই গল্পই চলতে লাগল।

হেমন্তিকা অনেক রকম রান্নাবান্না করে রেখেছেন। কিন্তু গাড়ির শোকে কারও বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করল না। কাকাবাবু এমনিতেই রাত্তিরবেলা খুব কম খান।

ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতে হবে, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আজকের রাতটা সাবধানে থাকতে হবে। পুলিশরা সব ইংরেজ মন্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত, চোর-ডাকাতরা বাড়িতেও হানা দিতে পারে।

অরুণকান্তি বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল, কাছেই একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

অরুণকান্তি বললেন, "নিশ্চয়ই এ পাড়ায় কোনও ভি আই পি কিংবা কোনও মন্ত্রীর আত্মীয় এসেছে, তাই পুলিশ এসে পাহারা দিচ্ছে। যাক বাঁচা গেল, আমরাও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব!"

ভিতরে এসে অরুণকান্তি বললেন, "আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব ভাবছি। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার অফিসে একটা মিটিং আছে। আমি দুপুর বেলাতেই ফিরে আসবার চেষ্টা করব। তারপর আমরা বেড়াতে যেতে পারি কোথাও!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো!"

অরুণকান্তি উপরে চলে যাওয়ার পরেই কাকাবাবু ভাবলেন, এবার কলকাতাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। অরুণকান্তির অফিসের বেশ চাপ আছে, বোঝাই যাচ্ছে। তারই মধ্যে মধ্যে ছুটি নিয়ে সে আর কত তাঁকে নিয়ে ঘুরবে? তা ছাড়া বেড়াবারও মন নেই কাকাবাবুর। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, সেটার আর কিছুই করা যাবে না।

কালকেই প্লেনের টিকিটটা বদলাতে হবে।

এক্ষুনি দরকার নেই, তবু কাকাবাবু হ্যান্ডব্যাগে টিকিটটা খুঁজতে লাগলেন। প্রথমেই পেয়ে গেলেন একটা লম্বা খামের চিঠি। লোহিয়াজির লেখা। এই চিঠির উপর নির্ভর করেই তিনি এ দেশে এসেছেন।

এই সময় বেজে উঠল বাইরের দরজার বেল।

এ দেশে রাত্রের দিকে কেউ তো আসে না। টেলিফোন না করে হঠাৎ কারও উপস্থিত হওয়ার কোনও রেওয়াজই নেই। আমাদের দেশের মতো বিনা কারণে আড্ডা দিতে এরা জানেই না।

দরজা খোলারও কেউ নেই। এখানে কাজের লোকের ডিউটি আওয়ার্স আছে। সন্ধের সময় ঠিক সাতটা বাজলেই এরা চলে যায়। যে রান্না করে, সে টেবিলের উপর রেখে যায় খাবারদাবার। নিজেদের গরম করে নিতে হয়।

অরুণকান্তি উপর থেকে নামবার আগেই কাকাবাবু নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরোদস্তুর পোশাক পরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের একজন পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এ বাড়িতে কি রাজা রায়চৌধুরী নামে কেউ থাকেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমিই।"

পুলিশটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েস।"

পুলিশটি বুকপকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে কাকাবাবুর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

কাকাবাবু এবার একটু অবাক হলেন।

পুলিশটি তাঁর ফোটো পেল কোথা থেকে? এ ফোটোটা কোথায় তোলা হয়েছে?

পুলিশটি ফোটোটা আবার পকেটে ভরে বলল, "ঠিক আছে। স্যার, আমরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসছি। আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।"

কাকাবাবু খুব নিরীহভাবে প্রশ্ন করলেন, "এত রাত্তিরে থানায় যেতে হবে? কেন বলুন তো?"

পুলিশটি বলল, "বেশি তো রাত হয়নি। আমাদের বড়সাহেব আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।"

এর মধ্যে চটি ফটফটিয়ে উপর থেকে নেমে এলেন অরুণকান্তি। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?"

পুলিশই জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এটা আপনার বাড়ি? আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

অরুণকান্তি নিজের নাম জানিয়ে বললেন, "আমি এদেশে আছি সতেরো

বছর। আমি 'কেনিয়াট্টা পেপার ওয়ার্কস' নামে একটা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। আপনারা এই কোম্পানির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। জেমো কেনিয়াট্টা নিজে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।"

জেমো কেনিয়াট্টা ছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বীর, এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁর নাম শুনলেই সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

পুলিশটি অবশ্য সেরকম কোনও ভাব দেখাল না। গম্ভীরভাবে বলল, "এই ভদ্রলোক আপনার গেস্ট? এঁকে একবার থানায় যেতে হবে।"

অরুণকান্তিও কাকাবাবুর মতো একই প্রশ্ন করলেন, "এত রাত্রে থানায় যেতে হবে কেন?"

পুলিশটি বলল, "আমাদের বড়সাহেব এঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।"

অরুণকান্তি বললেন, "সকালবেলা কথা বলা যায় না? কী এমন জরুরি কথা আছে?"

পুলিশটি এবার কঠোরভাবে বলল, "আমার উপর যা অর্ডার আছে, আমি তাই-ই পালন করতে এসেছি। শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই।"

অরুণকান্তি কাকাবাবুকে বাংলায় বললেন, "এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এরা বড্ড গোঁয়ার হয়।" তারপর তিনি পুলিশটিকে বললেন, "ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি। আমিও সঙ্গে যাব।"

পুলিশটি বলল, "না, সেরকম অর্ডার নেই। ওঁকে একাই নিয়ে যেতে হবে।"

অরুণকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, "উনি ফিরবেন কী করে? উনি এখানকার রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন না।"

পুলিশটি এবার একটু নরম হয়ে বলল, "আপনি চিন্তা করছেন কেন? বেশিক্ষণ লাগবে না। আমাদের গাড়িই পৌঁছে দিয়ে যাবে। চলুন, চলুন!"

কাকাবাবু অরুণকান্তিকে বললেন, "তুমি চিন্তা কোরো না, এরা তো আমাকে পৌঁছে দেবে বলেছে।"

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার পর সেই পুলিশটি বসল সামনে। আর-একজন বন্দুকধারী পুলিশ এসে বসল কাকাবাবুর পাশে। সারা রাস্তায় কেউ কোনও কথা বলল না।

পুলিশস্টেশনে পৌঁছোবার পর সামনের দিকে কয়েকটি ঘর পেরিয়ে ভিতরের দিকের একটা ছোট ঘরে এসে সেই পুলিশ অফিসারটি একটি চেয়ারে বসল। সে ঘরে আর কোনও চেয়ার নেই। শুধু একটা টুল রয়েছে।

সেটা দেখিয়ে পুলিশটি বলল, "বসুন ওখানে!"

কাকাবাবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু খেয়েটেয়ে এসেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ডিনার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

পুলিশটি বলল, "গুড! আপনাকে এখন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। রাত্তিরটা আপনাকে গারদে কাটাতে হবে।"

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "অ্যারেস্ট করা হবে মানে? আমি কী দোষ করেছি?"

পুলিশটি এবার টেবিলের উপর দু'পা তুলে দিয়ে বলল, "দোষ? ওসব আমি জানি না। আপনাকে গারদে ঢোকাতে বলা হয়েছে, তাই-ই করছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে?"

পুলিশটি অবহেলার সঙ্গে একটা হাত নাড়তে নাড়তে বলল, "ওসব লাগে না। জরুরি অবস্থায় আমরা যাকে-তাকে ধরতে পারি!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যে বলেছিলেন, আপনাদের বড়সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?"

পুলিশটি বলল, "এক্ষুনি শুনলাম, আজ রাত্তিরে তাঁর সময় হবে না। তাঁর যখন মর্জি হবে, তখন কথা বলবেন। কাল হতে পারে, পরশুও হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যাঁর বাড়িতে ছিলাম, তাঁকে একটা খবর দিতে পারি? তা ছাড়া, আমি একজন উকিলও ঠিক করতে চাই!"

লোকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ওসব হবে না। ওসব হবে না। বেশি কথা বলবেন না। আমি বেশি কথা পছন্দ করি না।"

কাকাবাবু এবার একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "আমি যদি গারদে যেতে রাজি না হই? আমি কোনও ক্রাইম করিনি। কেন শুধু-শুধু...!"

পুলিশটি টেবিলে প্রচণ্ড জোরে এক চাপড় মেরে বলল, "রাজি না হই মানে? এখান থেকে পালাবেন নাকি? এতক্ষণ গায়ে হাত দিইনি। এবার...!"

কাকাবাবু মাথা নিচু করলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, 'রাজা রায়চৌধুরী, মাথা গরম কোরো না। পুলিশের সঙ্গে রাগারাগি করলে কোনও লাভ হবে না। ওরা মারতে শুরু করলে তুমি বাধা দিতেও পারবে না!'

মাথা তুলে কাকাবাবু বিনীতভাবে বললেন, "না না, পালাবার কথা

উঠছেই না। আমি খোঁড়া লোক। কেন অ্যারেস্ট করা হল সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন, তাই-ই শুনব।”

পুলিশটি অন্য একজনকে ডাকল।

সেই লোকটি এসে অকারণেই কাকাবাবুকে প্রায় ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলল।

এক জায়গায় কাকাবাবুর পকেট সার্চ করে দেখা হল।

কয়েকশো ডলার আর কিছু কার্ড ছাড়া কিছুই নেই। সেগুলো রেখে দিল লোকটি।

তারপর কাকাবাবুর পোশাক ছাড়িয়ে পরানো হল কয়েদিদের ডোরাকাটা ঢোলা জামা আর পায়জামা।

তারপর একটা লোহার দরজা খুলে কাকাবাবুকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ভিতরে।

ঘরটি বেশ লম্বামতো। এটা ঠিক জেলখানার মতো নয়। থানার গারদে এক ঘরেই অনেকে থাকে।

এই ঘরেও রয়েছে আটজন। বিছানাটিছানা কিছু নেই। সবাই বসে আছে মেঝেতে ছড়িয়ে। কয়েকজনের চেহারা দেখলে রীতিমতো ভয় করে। ঠিক যেন যমদূত। আরও কয়েকজন নিরীহ মতো। একজনকে দেখলেই মনে হয় স্কুলশিক্ষক।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত সবাই দেখল কাকাবাবুকে। তিনি কোনওরকমে একটা ফাঁক খুঁজে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়লেন।

যমদূতের মতন চেহারার একজন হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হে, তুমি কোন কেসে এসেছ? খুন, ডাকাতি, রাহাজানি কিংবা ছিঁচকে চুরি?”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা আমি ঠিক এখনও জানি না!

সবাই একসঙ্গে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

কাকাবাবুও তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, “হাকুনা মাটাটা। হাকুনা মাটাটা।”

এবার অন্যরা আরও জোরে বলতে লাগল।

॥ ৬ ॥

দুপুর ঠিক একটার সময় কাকাবাবুকে আবার সেই লোহার দরজার বাইরে বের করা হল।

সকালে দেওয়া হয়েছিল একমগ ভরতি কফি আর একটা কোয়ার্টার সাইজ পাউরুটি। কাকাবাবু তাই-ই বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছেন। কাকাবাবু যখনই কোনও বিপদের মধ্যে পড়েন, তখনই যে-কোনও খাবার পেলেই খেয়ে নেন। কারণ, পরে আবার কখন কোথায় খাবার পাওয়া যাবে, তার তো ঠিক নেই।

এখানেও তাই হল।

একটার সময় কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েদিদেরও বের করা হল, দুপুরের আহারের জন্য। বাইরে রয়েছে দু'জন গার্ড, হাতে চাবুক।

আগের রাত্তিরে আর আজ সকালে কাকাবাবু কয়েকজন কয়েদির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। এক-একজনের জীবনকাহিনি এক-একরকম। সবাই মোটেই হিংস্র, ভয়ংকর মানুষ নয়। একজন অবশ্য বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেছিল, সে পাঁচটা খুন করেছে! কিন্তু ধরা পড়েছে এই প্রথম। খুন করার জন্য তার কোনও অনুতাপ নেই। কারণ, তার মতে, যাদের সে খুন করেছে, তারা হিংস্র পশুরও অধম।

দু'-একজন অবশ্য কোনও কথাই বলতে চায়নি।

যে-কয়েকজনের যমদূতের মতো চেহারা, তাদের একজনের নাম জোসেফ এন। এখানকার অনেক আদিবাসীই খ্রিস্টান হয়, তাই এই ধরনের নাম। ওর বিশাল চেহারা, লাল ড্যাবডেবে দুটো চোখ দেখলে গা ছমছম করে, কিন্তু মানুষটা বেশ নরম। ও ট্রাক চালায়। ওর দুটো ছেলেমেয়ে, নয় আর এগারো বছরের, তাদের ফোটো ও সঙ্গে রাখে। রাস্তায় ওর ট্রাক থামিয়ে বিনা দোষে পুলিশ ঘুষ চেয়েছিল বলে ও দিতে রাজি হয়নি। তখন পুলিশ ওকে মারতে শুরু করে। জোসেফও একটা পুলিশকে ঘুসি মারে। সেইজন্যই অনেক পুলিশ ওকে ঘিরে ধরে মারতে মারতে এনে এই গারদে ভরে দেয়।

লোকটির প্রতি বেশ মায়া পড়ে গেল কাকাবাবুর। সে শুধু তার ছেলেমেয়ের গল্প করে।

তাই কাকাবাবু তাকে বলেছিলেন, "শোনো জোসেফ, তুমি এখানে পুলিশের সঙ্গে আর গন্ডগোলের মধ্যে যেয়ো না। তোমাকে যে-কেসে ধরে

এনেছে তা পেটিকেস, বড়জোর ছ'মাস কিংবা এক বছরের জেল হবে। তা মেনে নিতেই হবে। তোমার আসল কাজ, ছেলেমেয়ে দুটির লেখাপড়ার সবরকম যত্ন নেওয়া। ওরা যদি উকিল-ব্যারিস্টার কিংবা ডাক্তার হয়, তখন দেখবে, পুলিশ তোমাদের উপর আর কোনও অত্যাচার করতে সাহস করবে না।"

জোসেফ তখন কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কাকাবাবুর একটা হাতে চুম্বন দিয়ে বলল, "আপনি প্রার্থনা করবেন স্যার, আমার ছেলেমেয়ে দুটি যেন মানুষের মতো মানুষ হয়!"

লোহার দরজার বাইরে এনে অন্যদের নিয়ে যাওয়া হল একদিকে, শুধু কাকাবাবুকে অন্যদিকে। জোসেফ ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, পুলিশের সঙ্গে তর্ক কোরো না। আশা করি, আবার দেখা হবে!"

কাকাবাবু ভাবলেন, তাঁকে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল না, তার মানে, তাঁকে নিশ্চয়ই আলাদা জায়গায় বসিয়ে স্পেশ্যাল খাবার দেওয়া হবে।

আবার তাঁকে এনে বসাল সেই ছোট ঘরটায়। আগের পুলিশটি সেখানে নেই। না থাকলেও পুলিশের চেয়ারে বসা উচিত নয় বলে কাকাবাবু বাধ্য হয়ে টুলটায় বসলেন।

যে তাঁকে নিয়ে এসেছিল, সে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। আর তার দেখা নেই। কাকাবাবু বসে রইলেন তো বসেই রইলেন। খিদেয় তাঁর পেট চুঁইচুঁই করছে।

এমনিতে কাকাবাবু দু'-তিনদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি জানা যায়, অন্য একটি ঘরে বাকি কয়েদিরা খেতে বসে গিয়েছে, আর তাঁকে কেউ কিছু দিচ্ছে না, তাতেই খিদেটা খুব বেড়ে যায়।

একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিনঘণ্টা কেটে গেল। খাবারও এল না, কেউ কিছু খবরও দিল না। একেবারে অসহ্য অবস্থা।

কাকাবাবু মেজাজ খারাপ করবেন না ঠিক করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। চিন্তা করতে লাগলেন আকাশ-পাতাল। তাঁকে এখানে কেউ চেনে না, তবু কেন এভাবে আটকে রাখা হচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছেন না কিছুতে।

চারটের পর বাইরে সাড়াশব্দ শোনা গেল। এ ঘরে এসে ঢুকল একজন লোক, পুলিশের পোশাক হলেও বুকের দু'দিকে নানারকম ব্যাজ ও মেডেল

আঁটা দেখে বোঝা যায়, বেশ একজন হোমরাচোমরা কেউ হবেন।

তিনি খালি চেয়ারটায় বসে পড়ার পরেই বললেন, "আরে, মি. রাজা রায়চৌধুরীকে একটা টুলে বসিয়ে রাখা হয়েছে? ছি ছি! এরা সব ইডিয়েট। অ্যাই, কে আছিস, শিগ্‌গির একটা চেয়ার নিয়ে আয় ওঁর জন্য।"

চেয়ার আনবার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মি. রায়চৌধুরী, আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না না। বেশ চমৎকার আরামেই ছিলাম!"

লোকটি বললেন, "আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম আলফ্রেড নিন্‌জানে। আমি এখানকার পুলিশের হেড।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আপনাকে চিনি না ঠিকই। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে? কিংবা আমাকে চেনেন না, শুধু আমার নামটা জেনেছেন।"

নিন্‌জানে বললেন, "হবে, সেসব কথা পরে হবে। আগে একটু চা কিংবা কফি খাওয়া যাক। আপনি খাবেন তো? কোনটা আপনার পছন্দ?"

কাকাবাবু মনে মনে হাসলেন। দুপুরে কিছু খাওয়াই হল না। এখন চা-কফির প্রস্তাব! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, একটু চা পেলে মন্দ হয় না!"

নিন্‌জানে আর কিছু না বলে কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। একটু পরে একজন দু'কাপ চা দিয়ে যাওয়ার পর নিন্‌জানে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, দুটো জানলাও টেনে দিলেন। তারপর বললেন, "মি. রায়চৌধুরী, আপনার খুব কষ্ট হয়েছে জানি। সাধারণ খুনে-গুন্ডাদের সঙ্গে আপনাকে রাত কাটাতে হয়েছে। ইচ্ছে করেই আপনাকে দুপুরে খাবার দেওয়া হয়নি, যাতে মনে হয়, আমরা সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি। আসলে কী জানেন, আমাদের পুলিশের মধ্যেও কিছু কিছু স্পাই আছে, যারা থানার ভিতরের খবর বাইরে চালান করে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এমন কী গুরুত্বপূর্ণ লোক, যাতে আমার খবর বাইরে যাবে?"

নিন্‌জানে বললেন, "সেসব পরে বলছি। এখন শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আপনাকে আমরা ইচ্ছে করে থানায় আটকে রেখেছি। নইলে, বাইরে আপনার জীবন সংশয় ছিল। কাল রাত্তিরেই আপনি যে বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন, সেখানে হামলা হত। খুব সম্ভবত আপনার এই বন্ধুর বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত, আমরা খবর পেয়েছি।"

নিন্‌জানে সঙ্গে একটা মোটা হাতব্যাগ এনেছেন। সেটা খুলে একপ্যাকেট বিস্কুট বের করে বললেন, "নিন, কয়েকটা বিস্কিট খেয়ে নিন চায়ের সঙ্গে, তাতে আপনার খিদে কিছুটা মিটবে।"

কাকাবাবু চা খেতে খেতে ব্যাগ্রভাবে চেয়ে রইলেন নিন্‌জানের মুখের দিকে। কারা তাঁকে মারতে চাইছে? কেন?

নিন্‌জানে এবার একটা পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "মি. লোহিয়ার বাড়িতে আগুন লেগেছে, আপনি পরেরদিন তা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে যে কিছু লোক ছিল, তাদের মধ্যে আমাদের দু'জন স্পাইও মিশে ছিল। আপনি নতুন লোক, তাই ওরা আপনার ফোটো তুলে নিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বুঝতেই পারিনি!"

নিন্‌জানে বললেন, "সেটাই তো স্পাইদের কাজ। এয়ারপোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আপনার নাম। তারপর ইন্টারনেট ঘাঁটতেই পাওয়া গেল আপনার সব পরিচয়।"

কাকাবাবু মনে মনে বললেন, এই হয়েছে এক ইন্টারনেট! আজকাল আর কিছুই গোপন রাখার উপায় নেই!

নিন্‌জানে বললেন, "তখনই বুঝতে পারলাম সব ব্যাপার। মি. রাজা, আপনি নাইরোবিতে এসেছেন একটা মামলায় সাক্ষী দিতে, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বেড়াতেই এসেছি, তবে...!"

নিন্‌জানে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমাদের কাছে আর গোপন করে লাভ নেই। এখানে পুলিশের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে, আমি স্বীকার করছি। কিছু কিছু পুলিশ অফিসার ঘুষ খেয়ে চোর-ডাকাতদেরই সাহায্য করে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা সেইসব ঘুষখোরদের ধরে ধরে শাস্তি দিচ্ছি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছি। হয়তো আরও কিছুটা সময় লাগবে। আপনার পরিচয় জানার পরই বুঝতে পারলাম, আপনার জীবন বিপন্ন। মি. লোহিয়ার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাকে যেমন ধরে নিয়ে গিয়েছে, ওরা আপনাকেও মারবে কিংবা ধরে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন? আমার উপর কার কী রাগ থাকতে পারে?"

নিন্‌জানে বললেন, " মি. রাজা, আপনি এখনও কিছু না জানার ভান করছেন? পুলিশের নামে যতই বদনাম থাক, আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিলিপ কিকুইউকে ধরতে সক্ষম হয়েছি। তার নামে পশুহত্যা, চোরাচালান আর

খুনের অভিযোগ আছে। সে একসময় একটা হোটেলের ম্যানেজার সেজে ছিল। তখন আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। এইসব অপরাধে আমাদের দেশে ফাঁসি হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো জেল থেকে পালিয়েছে শুনেছি।"

নিন্‌জানে বললেন, "মোটেই তা সত্যি নয়, এরকম গুজব রটেছে বটে। পালিয়েছে তার ভাই রবার্ট। ফিলিপকে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়। তার বিরুদ্ধে প্রধান দুই সাক্ষী হলেন আপনি আর মি. লোহিয়া। আগামী কাল কোর্টে ফিলিপের নামে মামলা ওঠার কথা। মি. লোহিয়া নিশ্চয়ই আপনাকে সেকথা জানিয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "লোহিয়া আমাকে বিশেষভাবে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক কাজ আছে, তার মধ্যে এই মামলাটাও একটা।"

নিন্‌জানে বললেন, "বাইরে ফিলিপের একটা দল আছে। তাদের পান্ডা এখন ফিলিপের ভাই রবার্ট। সেও অতি নিষ্ঠুর মানুষ। এর মধ্যেই দু'জন লোক খুন হয়েছে, একজন সেই জঙ্গলের হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আর-একজন বিখ্যাত পরিবেশবিদ লিওপোল্ড আংগামি। এরা দু'জনেই ফিলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে বলে কথা ছিল। এদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি রইলেন আপনি আর লোহিয়া। লোহিয়ার কী হয়েছে জানি না। আপনাকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পক্ষেই খুব দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমি সহজে মরি না।"

নিন্‌জানে বললেন, "এখন আমাদের কী প্ল্যান তাই-ই, শুনুন। আপনাকে আর আমরা দেশের মধ্যে রাখতে সাহস করছি না। জেলের মধ্যেও আপনি নিরাপদ নন। কারণ, যেসব কয়েদি রয়েছে, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ফিলিপের দলের লোক হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। বাইরে থেকে নির্দেশ এলে এখানেই আপনাকে খতম করে দিতে পারে। জেলের মধ্যে এরকম খুনোখুনি আগেও হয়েছে। সুতরাং আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি যে বললেন, কালই ফিলিপের নামে কোর্টে মামলা উঠবে?"

নিন্‌জানে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আমরা জজের কাছে আবেদন করব, মামলাটা আরও কিছুদিন পিছিয়ে দিতে। এর মধ্যে আরও সাক্ষী জোগাড় করতে হবে। এরা এমনই সাংঘাতিক লোক যে, এদের বিরুদ্ধে অনেকেই

সাক্ষী দিতে সাহস করে না। ফিলিপ শয়তানটা আরও কিছুদিন জেলেই থাকুক।”

কাকাবাবু বললেন, “অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, আমি আর এখানে থাকতে পারব না, আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে? বেশ তো, আমি কালই...!”

কাকাবাবুকে বাধা দিয়ে নিন্‌জানে বললেন, “না না। আপনাকে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলিনি। ফিলিপকে ফাঁসানোর জন্য আপনার সাক্ষী দেওয়াটা খুবই জরুরি। আমি শুধু বলছিলাম, আপনি যদি দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন। এ জায়গাটা আপনার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। আপনি আমার একটা সাজেশান শুনবেন?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, শুনব না কেন?”

নিন্‌জানে বললেন, “আপনি কিছুদিনের জন্য আমাদের পাশের দেশ তানজানিয়ায় গিয়ে থাকবেন?”

কাকাবাবু বললেন, “তানজানিয়া? সেখানে কাউকে চিনি না। সেখানে যদি ভাল থাকার জায়গা পাওয়া যায়...!”

নিন্‌জানে বললেন, “সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। ওখানকার পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে। আপনার জন্য চমৎকার বাংলো ঠিক করে দেবে, পুলিশই আপনার সবরকম দেখাশোনা করবে।”

কাকাবাবু তবু মন ঠিক করতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন।

নিন্‌জানে আবার বললেন, “তানজানিয়াও ভারী সুন্দর দেশ। অনেক কিছু দেখার আছে। আর-একটা কারণেও তানজানিয়া আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমরা যতদূর খবর পাচ্ছি, মি. লোহিয়া এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তানজানিয়াতেই লুকিয়ে আছেন!”

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, “লুকিয়ে আছেন? আপনারা পাকা খবর পেয়েছেন?”

নিন্‌জানে বললেন, “এখনও ঠিক কনফার্মড নই। আমরা প্রতিবেশী রাজ্য উগান্ডা, তানজানিয়াতেও পুলিশকে মি. লোহিয়ার খবর জানিয়েছি। এর মধ্যে তানজানিয়ার পুলিশই সাড়া দিয়েছে। ওখানে একজন স্পাই ডেফিনিটলি একবার মি. লোহিয়াকে স্পট করেছে। তারপর তিনি আবার কী করে যেন চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।”

কাকাবাবু বললেন, "মোম্বাসাতেও একজন কেউ নাকি ওঁকে পার্কে বসে থাকতে দেখেছিল। সেটা তো একেবারে উলটো জায়গায়।"

নিন্‌জানে বললেন, "আরে ধুত। সেটা তো ছিল উড়ো খবর। কেউ টেলিফোনে মজা করেছে। আর এটা দিয়েছে তানজানিয়ার পুলিশ। তারা মোটেই একটা বাজে খবর আমাদের জানাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আমি তানজানিয়াতেই যাব।"

নিন্‌জানে এবারে উৎসাহিত হয়ে বললেন, "গুড, গুড, গুড। আমরাই আপনাকে পৌঁছে দেব বর্ডারে। ওদিককার পুলিশ আপনাকে রিসিভ করে নেবে। তারপর থেকে ওদের দায়িত্ব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কিছু জামাকাপড় আর অন্য জিনিসপত্র নিয়ে নিতে হবে।"

নিন্‌জানে বললেন, "তা তো নিতেই হবে। আর আমাদের যেতে হবে গভীর রাত্রে। খুব গোপনে, যেন কেউ টের না পায়। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, এটাই ভাল সময়। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক!"

॥ ৭ ॥

গভীর রাত্রে জিপগাড়িটা চলল গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে।

কাকাবাবু কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছেন অরুণকান্তির বাড়িতে। তাঁকে চলে যেতে হবে শুনে অরুণকান্তি কিছুতেই কাকাবাবুকে একা ছাড়তে চাননি। অফিসের কাজ থাকলেও তিনি সঙ্গে যাবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই সে কথায় রাজি হয়নি। তাতে নানান অসুবিধে আছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে পুলিশের কর্তা নিন্‌জানে আসেননি। একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে সঙ্গে দিয়েছেন। এ ছাড়া গাড়ির পিছনে রয়েছে দু'জন অস্ত্রধারী প্রহরী।

একে তো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, তার উপরে বৃষ্টি। বাইরেটা কিছুই দেখা যায় না। এ দেশে রাত্তিরে গাড়ি চালানো বেশ বিপজ্জনক। প্রায়ই রাস্তার উপর নানান জন্তু-জানোয়ার চলে আসে। গতবার কাকাবাবু একটা জলহস্তী পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। আর যদি হাতির পাল আসে, তা হলে সত্যিই ভয়ের

ব্যাপার হয়। আফ্রিকায় হাতিরা আমাদের দেশের হাতির চেয়েও অনেক বেশি বড়। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই লম্বা লম্বা দাঁত। আমাদের দেশের সব হাতির দাঁত থাকে না।”

এই হাতিরা খেলার ছলে গাড়ি উলটে দিতে পারে। তা যদি না-ও দেয়, রাস্তা থেকে কখন যে সরবে, তা জানার উপায় নেই। হাতিদের তো কোনওক্রমেই তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক জায়গায় সত্যিই জিপ থামিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকতে হল। খানিক দূরে হাতির পাল রাস্তা দিয়ে একধার থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে তাদের ডাক।

বেশ কিছুক্ষণ পর আর কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় জিপটা আস্তে আস্তে এগোল।

বৃষ্টি থামল ভোরের দিকে।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় জিপটা থামল তানজানিয়ার সীমান্তে। এখানে একটা চেকপোস্ট আছে। আগে থেকেই ফোনে জানানো হয়েছে, তাই একজন অফিসার অপেক্ষা করছেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

অন্য দেশে যেতে ভিসা লাগে, সাময়িক ভিসার ব্যবস্থাও হয়ে গেল এখানে।

যে-পুলিশ অফিসারটি সঙ্গে এসেছে, সে বলল, “স্যার, আমাদের তো আর বেশি যাওয়ার পারমিশান নেই। তানজানিয়ার পুলিশ আপনার সবরকম দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। গুড বাই!”

তানজানিয়ার পুলিশ অফিসারটি খুব বিনীতভাবে বলল, “স্যার, আমার নাম বিল্। আর কিছু নেই, শুধুই বিল্। আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আপনি তানজানিয়ায় অতিথি হয়ে এসেছেন, এ জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের মিনিস্টার বলেছেন, আপনার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তা দেখতে। আপনার জন্য আমরা যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছি। তবু আপনার আর যা কিছু লাগবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “ধন্যবাদ! আমার তো বিশেষ কিছু লাগে না। একটু নিরিবিলিতে থাকা, আর শোওয়ার জন্য একটা বিছানা।”

বিল্ বলল, “আপনার জন্য একটা বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে শুধু আপনি থাকবেন। আপনি সারারাত জার্নি করে এসেছেন, এখন আপনার ঘুম দরকার। আপনি এখন বিশ্রাম নিন, বাকি কথা পরে হবে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা লোহিয়ার খোঁজ পেয়েছেন?"

বিল্ বলল, "ইয়েস! সেসব কথা পরে হবে।"

গাড়িটা এসে থামল একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে। চারদিকে অনেকখানি কম্পাউন্ড। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা।

এরকম বাড়ি দেখলেই পছন্দ হয়।

গেটের দু'পাশে দুটি গুমটিতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী। কী যেন একটা পাখি ডাকছে জোর গলায়।

কাকাবাবুকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে বিল্ বিদায় নিল।

একজন আরদালি এনে দিল গরম গরম কফি।

কাকাবাবু সেই কফি পান করে স্নান সেরে নিলেন। তারপর আর ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ খাওয়ার কথা মনেই রইল না, তিনি শুয়ে পড়লেন। ধপধপে নরম বিছানা, শরীরও খুব ক্লান্ত, ঘুম এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘুম ভাঙল সন্ধের কাছাকাছি।

এখন শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। এবার খিদেও পেয়েছে। এই সময় আর ভাত বা রুটি খেতে ইচ্ছে করে না। বেয়ারা এসে খবর নিতেই কাকাবাবু তাকে কয়েকটা টোস্ট আর একটা ডাব্‌ল অমলেটের অর্ডার দিলেন।

খানিক পরে এসে হাজির হল বিল্। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো স্যার?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুমাত্র না। খুব ভাল ঘুমিয়েছি। ঘুমটা খুব দরকার ছিল।"

বিল্ জিজ্ঞেস করল, "রাত্রে কী খাবেন স্যার? যা চাইবেন, বানিয়ে দেবে, সব ব্যবস্থা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "জেব্রার মাংসের কাটলেট কিংবা ফ্লেমিংগো পাখির ঝোল আমার দরকার নেই। যদি মাছ পাওয়া যায়, তা হলে সেই মাছভাজা, ঝোল করতে বারণ করবেন। যদি ডাল পাওয়া যায়, তা হলে একটু ডাল আর ছোট্ট একবাটি ভাত।"

বিল্ বলল, "এ সবই হয়ে যাবে স্যার।"

কাকাবাবু বললেন, "এবার বলুন, লোহিয়ার কী খবর?"

বিল্ বলল, " মি. লোহিয়ার ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। তাঁকে এ দেশে দেখা গিয়েছে অন্তত তিনবার। আমাদের একজন এজেন্ট তাঁর ফোটোও তুলেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ফোটো তুলেছে? একবার দেখতে পারি?"

বিল্ একটু ইতস্তত করে বলল, "সেটা তো সঙ্গে আনিনি। পরে আপনাকে দেখিয়ে দেব। তাঁর অন্য ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, কোনও ভুল নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের যে এজেন্ট তাঁকে দেখেছে, সে কি তাঁকে একা দেখেছে?"

বিল্ বলল, "প্রত্যেকবারই একা।"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ তাঁকে জোর করে ধরে রাখেনি। তিনি নিজেই লুকিয়ে রয়েছেন।"

বিল্ বলল, "ঠিক তাই। তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই জন্যই এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকছেন না। তিনি জানেন, তাঁর জীবনের ভয় আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "শেষবার তাঁকে কোথায় দেখা গিয়েছে?"

বিল্ নিজের চেয়ারটা একটু এগিয়ে এনে নিচু গলায় বলল, "এইবারেই আসল কথা। আমাদের ধারণা, তিনি এখন এমন এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন, যেখানে কেউ তাঁকে খুঁজে পাবে না। আমি নিজে তাঁকে সেখানে খুঁজতে যাব ভাবছি। তিনি আমাদের দেশের অতিথি। অত বড় ব্যবসায়ী। তাঁকে আমরা সবরকম সাহায্য করতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "সে জায়গাটা কোথায়, তা জানতে পারি?"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ, পারেন। আমরা সঠিক খবর পেয়েছি, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এন গোরোংগোরোর পেটের মধ্যে!"

কাকাবাবু দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "গোরোংগোরো! আগ্নেয়গিরি?"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ। আমরা বলি, 'এন গোরোংগোরো'। বাইরের লোক শুধু 'গোরোংগোরো'ই বলে। আপনি কি জানেন, সেই আগ্নেয়গিরির তলায় এখন অনেক কিছু আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "জানব না মানে? সবই জানি। গোরোংগোরো তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! এই আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে যেন রয়েছে আর-একটা মিনি পৃথিবী। সেখানে ঘন বন আছে, অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। এমনকী, সিংহ পর্যন্ত। আবার কিছু কিছু মানুষও। তাই না?"

বিল্ বলল, "ঠিক বলেছেন। সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে টুরিস্ট দেখতে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও তো অনেক দিনের ইচ্ছে গোরোংগোরো দেখতে যাওয়ার। গতবার কেনিয়ায় এসেও আর এদিকে আসা হয়নি।"

বিল্ বলল, "জানি। আপনি সেরেংগেটি জঙ্গলে এসে খুব বিপদে পড়েছিলেন। আপনি বিদেশ থেকে এসে আমাদের এ অঞ্চলের বন্যপ্রাণীদের বাঁচাবার জন্য কত সব কাজ করেছেন, তার জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।"

কাকাবাবু বললেন, "সে এমন কিছু না। লোহিয়া ওই গোরোংগোরোর জঙ্গলের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে, এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত?"

বিল্ বলল, "প্রায় নিশ্চিত বলা যায়। একেবারে চাক্ষুষ করার জন্যই কাল সেখানে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান?"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "অবশ্যই! লোহিয়াকে খুঁজে বের করতে চাই তো বটেই। তা ছাড়াও ওই বিখ্যাত জায়গাটা আমার দেখা হয়ে যাবে।"

বিল্ বলল, "ভালই হল, আমরা দু'জনে একসঙ্গে যাব। কাল খুব ভোরে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তৈরি হয়ে থাকব।"

বিল্ বলল, "রাত্তিরটায় আপনি বিশ্রাম নিন। তবে স্যার, একটা বিশেষ অনুরোধ, আপনি সন্ধের পর আর এই কম্পাউন্ডের বাইরে কোথাও যাবেন না। আপনার জীবনের অনেক দাম। কে কোথা থেকে আক্রমণ করবে, তার তো ঠিক নেই। তবে, এই কম্পাউন্ডের মধ্যে কেউ ঢুকতে পারবে না।"

বিল্ বিদায় নেওয়ার পর কাকাবাবু একই জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন।

কী করে একটার পর-একটা ঘটনা গড়িয়ে যাচ্ছে!

পরশু রাত্রে ছিলেন থানার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে, বিছানাও ছিল না, দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে পুরো রাত কাটিয়ে দিতে হয়েছে। কাল রাতটা প্রায় কেটেছে গাড়িতে। আজ আবার এমন চমৎকার আরামের বিছানায়।

কাল আবার যাওয়া হবে গোরোংগোরো। এখানকার লোকেরা বলে উল্ল্ল্ গোরোংগোরো, সেরকম উচ্চারণ করা খুব শক্ত। গোরোংগোরোই ভাল। পুরনো আগ্নেয়গিরি! বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, এই আগ্নেয়গিরি জ্যান্ত হয়ে আগুন আর লাভা বের করেছিল সেই বহু কাল আগে, প্রায় তিরিশ লাখ

বছর আগে, যখন এই পৃথিবী সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে।

গোরোংগোরো ছিল খুব উঁচু পাহাড়, বিস্ফোরণে এর শিখরের অনেকটা উড়ে গিয়েছিল, তৈরি হয়েছিল বিশাল খোঁদল। তার তলাটা অনেকখানি চওড়া। সে জায়গা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গিয়ে গাছপালা জন্মেছে। এত বছরের মধ্যে আর অগ্ন্যুৎপাত হয় না। তবে, এই আগ্নেয়গিরিকে একেবারে মৃত বলা যায় না। এখানে আছে মোট ন'টা চূড়া, তার মধ্যে একটার নাম ওলডোনিয়ো লেঙ্গাল, সেই চূড়া থেকে মাঝে মাঝেই ধোঁয়া আর গরম ছাই বেরিয়ে আসে। তবে মূল গোরোংগোরোর আশ্চর্য সুন্দর গহ্বর দেখার জন্য ছুটে আসে পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ।

কাকাবাবু ভাবলেন, ইস, সন্তু আর জোজোকে এবার নিয়ে আসা গেল না! ওরা দেখতে পেল না!

খানিক পর শুয়ে পড়ে তিনি ঘুমের মধ্যেও গোরোংগোরোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

পরদিন ভোরবেলা যাত্রা। বৃষ্টি পড়ছে খুব।

আরুশা শহর থেকে যেতে হবে পঁচাত্তর মাইল। এমন কিছু নয়। যেতে যেতেই বিল্ বলল, "উপরে গিয়ে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে নামার জন্য একটা কাঁচা রাস্তা আছে। খুব সাবধানে নামতে হয়। আপনি তো নামতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "পারব না? সে কী? তা হলে যাচ্ছি কেন? হ্যাঁ, ঠিক পারব!"

বিল্ বলল, "ক্রাচ নিয়ে নামা খুব রিস্কি। একরকম ব্যবস্থা আছে। খাড়া রাস্তা ধরে নামতে হয় তো, তাই স্পেশ্যাল, বড় বড় চাকাওয়ালা গাড়ি। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে এই বৃষ্টি কমে যাবে। বৃষ্টির মধ্যে ভিতরে নামা খুব মুশকিল।"

কিন্তু বৃষ্টি থামল না। বরং আরও জোরে হয়ে গেল। শিখরের উপরে উঠে পাওয়া গেল দুঃসংবাদ।

মাসাই জাতির কয়েকটি মহিলা ও বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা চালার নীচে। বাচ্চাদের হাতে ফুলের মালা, আর মহিলারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "ফোটো?"

এরা টুরিস্টদের সঙ্গে ফোটো তুলিয়ে কিছু পয়সা পায়। বিল্ তাদের সঙ্গে কথা বলে জানল, আজ গাড়ি চলছে না, রাস্তা বন্ধ। এক জায়গায় এত বৃষ্টিতে

ধস নেমে গিয়েছে। সেখানে রাস্তা সারাতে দু'-তিনদিন লেগে যাবে। তাই আজ আর টুরিস্ট আসেনি।

সে খবর শুনে কাকাবাবু দারুণ হতাশভাবে বললেন, "যাঃ! যাওয়া হবে না?"

বিল্ বলল, "কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে। রাস্তা ভাঙা।"

কাকাবাবু বললেন, "রাস্তা ভাঙা হলেও পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে নিশ্চয়ই। ক্রাচ নিয়েও আমি খুব সাবধানে নামতে পারব।"

বিল্ বলল, "ইম্পসিবল। আপনি ভি আই পি লোক, আপনার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে বা কোনও ক্ষতি হলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।!"

কাকাবাবু ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এতদূর এসেও ফিরে যেতে কিছুতেই তাঁর মন চাইছে না। তিন-চারদিনের মধ্যে আবার কী ঘটে যাবে কে জানে? হয়তো আর গোরোংগোরো দেখাই হবে না।

বিল্ একটু দূরে গিয়ে মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল।

বৃষ্টি প্রায় থেমে গিয়েছে, এখনও একটু একটু ঝিরঝির করে পড়ছে। বেশ শীত শীত ভাব।

মিনিটদশেক পর ফোন থামিয়ে বিল্ কাছে এসে বলল, "একটু আশা আছে। আমি কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। দুবাই-এর রাজা, তাঁর দুই রানি আর সঙ্গে আরও তিনজন বেড়াতে এসেছেন। ওঁদেরও আজ গোরোংগোরোর তলায় যাওয়ার কথা। আমরা বলি কিং, আসলে তো ওঁরা আরবের শেখ, ওঁদের প্রচুর টাকা। রাস্তা বন্ধ বলে তো দু'-তিনদিন অপেক্ষা করবেন না, না দেখে ফিরেও যাবেন না। সেইজন্য ওঁরা একটা বেলুন ভাড়া নিয়েছেন, সেই বেলুনে চেপে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে যাবেন। সেই বেলুনে প্রায় দশজন ধরে, আমাদের দু'জনকেও নিতে পারেন। কিন্তু...!"

কিন্তু বলে সে থেমে গেল।

কাকাবাবু আবার অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ব্যগ্রভাবে বললেন, "তা হলে আবার কিন্তু কী? আমরা ওই বেলুনেই যাব।"

বিল্ বলল, "যেতে তো পারি, কিন্তু বেলুন কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে বলল, রাজা গোটা বেলুনটা ভাড়া নিয়েছেন, অন্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবেন না। আমি বড়জোর অনুরোধ করতে পারি যে, এঁরা আমার

নিজের লোক। তাতে রাজি হতে পারেন। তার জন্য আমাদের দু'জনকেও ভাড়ার টাকা দিতে হবে। টাকা তিনি ছাড়বেন না। স্যার, আমার সঙ্গে বেশি টাকা নেই!"

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সেজন্য চিন্তা করতে হবে না। আমার কাছে ট্রাভেলার্স চেক আছে। টাকা যা লাগে, আমি দিয়ে দেব।"

বিল্ কাঁচুমাচুভাবে বলল, "স্যার, আপনি আমাদের অতিথি। আপনার থেকে টাকা নেওয়া মোটেই উচিত নয়। আমি সেই কথাই ভাবছি।"

কাকাবাবু তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "বিল্, ও নিয়ে কিছু বোলো না, প্লিজ! আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, এই আগ্নেয়গিরির তলায় যাওয়ার। এরকম সুযোগ তো মানুষের জীবনে দু'বার আসে না। তা ছাড়া, লোহিয়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে যদি খুঁজে পাই...!"

বিল্ বলল, "তা হলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই বেলুন এসে যাবে রাজার। আপনার বেলুনে চাপার অভ্যেস আছে তো?"

কাকাবাবু এবার হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, "অভ্যেস মানে, জীবনে আগে কখনও বেলুনে চাপিইনি। ফোটোয় দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি। আমাদের দেশে তো এখন আর বেলুন চলেই না। প্লেন কিংবা হেলিকপ্টার।"

বিল্ বলল, "এই গোরোংগোরোর মধ্যে প্লেন কিংবা হেলিকপ্টার তো চলে না। বেলুনই সবচেয়ে সুবিধে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বেলুনে চাপা কি প্র্যাকটিস করতে হয়?"

বিল্ বলল, "না, তার ততটা দরকার নেই। নার্ভাস না হলেই হল। খুব হাওয়া না দিলে ভয়ের কিছু নেই। এই ক্রেটারের মধ্যে তেমন হাওয়া নেই। যত নীচে নামবে, ততই ঠান্ডাটা কমে যাবে।"

এরপর শুরু হল প্রতীক্ষা। কাকাবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখানে আকাশে সব সময়ই নানারকম পাখি দেখা যায়।

ঝাঁক-বাঁধা ফ্লেমিঙ্গো তো আছেই। কাকাবাবু অনেক পাখির নাম জানেন না। সেইরকম পাখিদের মধ্যে থেকেই একসময় একটা ছোট্টমতো দেখা গেল বেলুনটাকে। ক্রমশ বড় হতে লাগল সেটা। তারপর একসময় এসে পড়ল একেবারে কাছে। সাদার উপরে লাল ডোরা। আগ্নেয়গিরির মুখের একটু উপরে এসে থেমে গেল বেলুনটা। দুলতে লাগল। সেখান থেকে নেমে এল একটা দড়ির সিঁড়ি।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বিলের হাতে দিয়ে দিব্যি তরতর করে উঠে গেলেন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে।

বিল্‌ও উঠে আসার পর বেলুনটা আবার দুলতে দুলতে নামতে লাগল গহ্বরের মধ্যে।

দুবাইয়ের কিং বেশ ভদ্র। তিনি কাকাবাবুকে দেখে বললেন, "গুড মর্নিং, সেলাম আলেকুম।"

কাকাবাবু বললেন, "গুড মর্নিং। আলাইকুম আস্‌সালাম।"

বেলুনচালক অনুরোধ করল, "প্লিজ, এখানে কেউ এখন কথা বলবেন না।"

তখন সবাই চুপ। কাকাবাবুও মনে মনে ধারণা করেছিলেন; আগ্নেয়গিরির ভিতরটা বোধহয় অন্ধকার। মোটেই তা নয়। উপরের মুখটা অনেকটা চওড়া। যথেষ্ট রোদ্দুর ঢোকে। খানিক নামবার পর তলাটাও দেখা যায়।

কাকাবাবুর আবার মনে পড়ল সন্তু আর জোজোর কথা। নীচে নামার অভিজ্ঞতায় তাঁরই উত্তেজনা হচ্ছে, আর ওদের মতো বয়সে নিশ্চয়ই দারুণ রোমাঞ্চ হত। ফিরে গিয়ে ওদের কাছে গল্প শোনালে ওরা নিশ্চয়ই আফশোস করবে।

কিন্তু ওদের পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে অপেক্ষা করা গেল না। লোহিয়া কেন এত তাড়া দিচ্ছিলেন ঠিক এই সময় আমার জন্য, তা এখানে এসে তিনি বুঝতে পেরেছেন। ওই ফিলিপ কিকুইউ-এর মামলাটায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। এর মাঝখানে ঘটে গেল কত কিছু!

আগ্নেয়গিরির ভিতরটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। তলার জায়গাটা প্রায় সমতল। এদিক-ওদিক অনেক দূর দেখা জায়গাটা যে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে, তা বোঝাই যায় না। সব দিকে শুধু ঘাসের মতোই দেখা যায়, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ছোট নদী।

বেলুন থেকে নামার পর বিল্‌ কাকাবাবুকে বলল, এক জায়গায় দাঁড়াতে। কাকাবাবুর কাছ থেকে চেক নিয়ে সে গেল বেলুনচালককে ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে।

খানিক পর ফিরে এসে বলল, "শুনুন স্যার। রাজাটাজাদের ব্যাপার! সব সময় ব্যস্ত। তাঁরা মাত্র দু'ঘণ্টা পরেই বেলুন নিয়ে ফিরে যেতে চান। কিন্তু মাত্র দু'ঘণ্টায় আমরা কী দেখব? তাই আমরা যদি দু'ঘণ্টা পরে না ফিরি, আজকের রাতটা এখানেই থেকে যেতে চাই। তাতে আপনার আপত্তি আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই আপত্তি নেই। আমিও এত তাড়াতাড়ি ফিরতে রাজি নই।"

বিল্ বলল, "রাত্রে থাকার ব্যবস্থা আছে। হয়তো আপনার বেশ অসুবিধে হবে। বিছানাটিছানা বোধহয় পাবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওসব কিছু দরকার নেই। কোনওরকমে একটা মাথা গোঁজার জায়গা পেলেই হল। আমি তিন-চারদিনও থেকে যেতে রাজি আছি।"

বিল্ বলল, "তার বোধহয় দরকার হবে না। চলুন!"

বেলুনের নামার জায়গাটা চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে কটেজও রয়েছে। একদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু আর বিল্।

একটা সরু রাস্তার দু'পাশে ফসলের খেত। বিল্ সব বুঝিয়ে দিল, "ওগুলো কোনও ফসল নয়, এক রকমের ঘাস। এই অঞ্চলটা মাসাই জাতির লোকদের জন্য সংরক্ষিত। তারা এখানে মোষ আর ভেড়া চরায়। ঘাস ওইসব পশুদের খুব পছন্দ। আবার হাতিরাও এই ঘাস ভালবাসে। তা হাতিও আসে অনেক।

"এই জায়গাটা আগ্নেয়গিরির তলায় হলেও পুরোটাই পাথরে ঢাকা নয়। মাঝে মাঝে খোলা জায়গা আছে। সেখান দিয়েও মানুষ কি জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে, বেরিয়েও যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেসব জন্তু-জানোয়ার এখানে একবার ঢুকে পড়েছে, তারা আর বেরিয়ে যেতে পারে না। এখানেই তারা জন্মায়, আবার এখানেই মরে। কেন যে এই জায়গাটা তাদের পছন্দ, তা বলা মুশকিল।" রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বিল্ কাকাবাবুকে এইসব কথা শোনাতে লাগল।

মাঝে মাঝে দু'-একজন মাসাইকে চোখে পড়ল। তারা প্রত্যেকেই ছ'ফুটের মতো লম্বা, হাতে বর্শা আর গলায় নানারকম পুঁতির মালা।

এক এক জায়গায় রয়েছে তাঁবুর রেস্তরাঁ। সব চেয়ার ফাঁকা। আজ আর কোনও টুরিস্ট আসেনি। রেস্তরাঁর লোকজন ডাকাডাকি করতে লাগল কাকাবাবুদের।

এক জায়গায় ওঁরা দু'জনে বসলেন।

দু'কাপ কফির অর্ডার দেওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির ভিতরে বসে আছি!"

বিল্ বলল, "আমারও ইচ্ছে আছে, একদিন আপনাদের দেশে গিয়ে তাজমহল দেখে আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "চলে এসো একবার। দিল্লিতে আমার চেনাশুনো আছে, আমি বলে দেব, তোমাকে সাহায্য করবে।"

বিল্ হেসে বলল, "দাঁড়ান, আগে টাকাপয়সা জোগাড় করি। স্যার, আপনি কফির সঙ্গে কিছু খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কিছু একটা খেয়ে নিলেও হয়। কী পাওয়া যাবে?"

বিল্ বলল, "স্যান্ডুইচ আছে, অনেক রকম মাংসের রোস্ট, ডিমের অমলেট।"

কাকাবাবু বললেন, "কী মাংস, তার তো কোনও ঠিক নেই। আমি সবই খাই, গোরু-শূকর, সাপ-ব্যাং, কোনওটাতেই আপত্তি নেই, যদি খেতে ভাল হয়। একবার এখানে মুরগির ঝোল বলে ফ্লেমিংগো পাখির ঝোল দিয়েছিল। মুরগির চেয়ে ফ্লেমিংগো সস্তা। ওরে বাবা, সে এমন শক্ত যে দু' হাত দিয়ে টেনেও ছিঁড়তে পারলাম না। আর ওয়াইল্ড বিস্টের মাংসের কাটলেট, এমনই দরকচা ধরনের যে, কিছুই চিবোতে পারি না। গন্ধটাও কীরকম যেন। মনে হয়েছিল ওই মাংস খেতে হলে সিংহের মতো দাঁত দরকার!"

বিল্ বলল, "ওয়াইল্ড বিস্ট তো এখানে সিংহও খায়, মানুষও। ওই জন্তুগুলো এত বেশি পাওয়া যায়!"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওসব দরকার নেই। বরং কয়েকটা ভেজিটেব্‌ল স্যান্ডুইচ বলে দাও, আপাতত তাই-ই খেয়ে নেব।"

দু'প্লেট স্যান্ডুইচ অর্ডার দেওয়ার পর বিল্ জিজ্ঞেস করল, "কলকাতায় সাধারণত আপনারা কী খান?"

কাকাবাবু বললেন, "ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল। চিকেন, মাটনও খাই। আমাদের মাটন মানে কিন্তু ভেড়ার মাংস নয়, গোট মিট। গোট কাকে বলে তা তোমরা জানোই না।"

বিল্ বলল, "কলকাতায় গিয়ে একবার বাঙালি খাবার খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "কলকাতা পর্যন্ত যদি আসতে পারো, তা হলে আমাদের কাছে থাকবে। আমার বড়ভাইয়ের স্ত্রী অনেক রকম রান্না জানেন। শুধু খাওয়া নয়, কলকাতায় গেলে আমি তোমাকে সুন্দরবনে ঘুরিয়ে আনব। দেখবে, সে একেবারে অন্যরকম ফরেস্ট। সেখানে আছে রয়ালবেঙ্গল টাইগার। তোমাদের গোটা আফ্রিকাতেই তা নেই। অত বড় বাঘ তোমরা চোখেই দ্যাখোনি।"

বিল্ বলল, "ফোটোয় দেখেছি।"

গল্পে গল্পে খানিকটা সময় কেটে গেল।

উঠে কাকাবাবু দাম দিতে গেলেন। বিল্ বলল, "না না, স্যার। এটা আপনি নয়, আমাকে দিতে দিন। আপনি আমাদের দেশের অতিথি। আমি গরিব হলেও এইটুকু তো দিতেই পারি। আমি কলকাতায় গেলে আপনি আমাকে খাওয়াবেন।"

কাকাবাবু কয়েকবার আপত্তি করলেন, তবু বিল্ শুনল না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি এ জায়গাটা দেখতে এসেছি সেটা ঠিক কথা। কিন্তু লোহিয়ারও তো খোঁজ করতে হবে? সে যে এখানেই আছে, সে ধারণা তোমাদের কী করে হল?"

বিল্ বলল, "আমাদের ইনফর্মার যা খবর দিয়েছে তা যদি সত্যি হয়, তবে এখানেই তিনি লুকিয়ে আছেন। লুকোবার পক্ষে এটা আদর্শ জায়গা। এখানে বহু বিদেশি টুরিস্ট আসে বলে পুলিশের নজরদারি খুব কড়া। চোর-ডাকাত এখানে আসতেই পারে না। আর-একটু দূরে একটা লেক আছে, তার নাম লেক মিগাই। তার ধারে কয়েকটি ছোট ছোট টুরিস্ট লজ নতুন হয়েছে। সেখানে যদি মি. লোহিয়া গেস্ট হয়ে থাকেন, কেউ তাঁর খোঁজ পাবে না। চলুন স্যার, আগে আমরা সেই জায়গাটা দেখি। পারবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব পারব। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে আমার অসুবিধে হয়। কিন্তু প্লেন রাস্তা দিয়ে আমি অনেকদূর যেতে পারি।"

একটু দূর যেতে না-যেতেই সরু রাস্তাটা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে লাগল একপাল হরিণ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা।

কাকাবাবু বললেন, "এগুলোকে বলে টমসন্‌স গ্যাজেল্‌স, তাই না? তিড়িংতিড়িং করে লাফাতে পারে।"

বিল্ বলল, "হ্যাঁ। হরিণ এখানে নানারকম আছে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখুন, একটা গন্ডার দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা দূরে। আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওরকম গন্ডার আগে দেখেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আগে দেখিনি, তবে জানি। কালো গন্ডার। এদের সংখ্যা খুবই কমে এসেছে। ও আমাদের দিকে তেড়ে আসবে না?"

বিল্ বলল, "গন্ডার অকারণে মানুষকে তাড়া করে না। ওরা তো মানুষের মাংস খায় না!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম শক্তপোক্ত প্রাণী শুধু ঘাসপাতা খেয়ে

বেঁচে থাকে, আশ্চর্য না? হাতিও তাই। এখানে নানান রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। কিন্তু কারও ক্ষতি করে না। ঠিক যেমন আমাদের তপোবনের কথা শুনেছি...!"

বিল্ বলল, "কিন্তু খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক তো থাকবেই। এত হরিণ, ওয়াইল্ড বিস্ট, বুনো মোষ আছে বলেই তাদের খাওয়ার জন্য সিংহ, চিতা, হায়েনাও আছে। অনবরতই এ ওকে...!"

কাকাবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ। হিংসে, মারামারি তো থাকবেই। সারা পৃথিবীতেই চলছে, তো এখানকার মানুষরা কী করে? তারা জন্তু-জানোয়ার মারে না?"

বিল্ বলল,"আপনাকে তো আগেই বলেছি, পুলিশের নজরদারি এখানে খুব কড়া! একটা স্থায়ী পুলিশক্যাম্প আছে। তবু দু'-একটা চোরাশিকারি মাঝে এসে পড়তেই পারে। পুলিশকে ঘুষ খাওয়ায়। কোথায় পুলিশ ঘুষ খায় না বলুন?"

কাকাবাবু বললেন, "থাক ও কথা। এখন ওসব খারাপ জিনিস ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। বিকেল শেষ হয়ে আসছে, কী চমৎকার লাগছে চতুর্দিক। রোদ্দুর নেই, চাপা আলো। একদিকে দেখতে পাচ্ছি, আগ্নেয়গিরির ভিতরের দেওয়াল উঠে গিয়েছে ওদিকে। কতরকম পাখি ডাকছে...!"

বিল্ বলল, "স্যার, একটু সাবধান। আমরা লেকের কাছে এসে গিয়েছি। বেশি ধারে যাবেন না। হঠাৎ কোনও জলহস্তী উঠে আসতে পারে।"

অনেকটা হেঁটে এসেছেন বলে কাকাবাবু একবার থামলেন।

এখানে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে কয়েকটা তাঁবুর কটেজ। একেবারেই জনমানবশূন্য। বোঝাই যাচ্ছে, আজ কোনও টুরিস্ট আসতে পারেনি। টুরিস্টদেরও কী এতদূর হেঁটে আসতে হয়? নাকি আর কোনও রাস্তা আছে? থাকবে নিশ্চয়ই। সবাই এতটা হাঁটবে কী করে? হয়তো গাড়িও চলে।"

কাকাবাবু ভাবলেন, আজ লোকজন আসেনি বলে গাড়িও চলেনি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এখানকার সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে লাগলেন।

বিল্ বলল, "এর পিছন দিকের একটা তাঁবুতে আমার চেনা একজন লোক আছে। চলুন, তার কাছে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। আমাদের থাকার ব্যবস্থাও করতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর বেরোনোই যাবে না!"

কয়েকটা তাঁবুর পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে লাগলেন বিলের সঙ্গে।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। একটা বেশ বড় তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল বিল্। কারও নাম ধরে ডাকার বদলে দু'বার শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একজন দীর্ঘকায় কালো মানুষ।

দু'জনে একটুক্ষণ কথা বলার পর বিল্ কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আসুন, আগে একটু ভিতরে বসি। আপনি বিয়ার খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি বিয়ারটিয়ার খাই না। চা কিংবা কফি খেতে পারি।"

ভিতরে একটা ঘর সোফাটোফা দিয়ে বসবার ঘরের মতন সাজানো। কাকাবাবু একটা সোফায় বসলেন।

এবার ভিতর থেকে এল আরও দু'জন কালো মানুষ। তাদের একজন সোজাসুজি এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো সরিয়ে নিল। আর কাকাবাবু কিছু বলার আগেই অন্য দু'জন শক্ত করে চেপে ধরল তাঁর দুটো হাত। তারপর দড়ি দিয়ে তাঁর সারা শরীর পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারগুলো ঘটল যে, কাকাবাবু কোনওরকম বাধা দেওয়ারই সুযোগ পেলেন না।

অবশ্য চেষ্টা করলেও তিনি এই তিনজন ষণ্ডাগুন্ডা চেহারার লোকের সঙ্গে লড়াই করতে পারতেন না।

বিল্ একপাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। অর্থাৎ এটা বিলেরই কীর্তি? কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একজন মানুষের এমন দু'রকম রূপ থাকতে পারে? কাল থেকে দেখছেন, ছেলেটাকে খুবই বিনীত আর ভদ্র মনে হয়েছে। কতরকম গল্প হল, তার কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার কথাও হল। সে আসলে তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে কারও কাছে ধরিয়ে দিতে! কাকাবাবু তাকে একটুও সন্দেহ করেননি।

বিল্ এবার ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "সরি, মি., আমার খুব টাকার দরকার। আপনাকে এখানে পৌঁছে দিলে তিরিশ হাজার ডলার দেবে। সেই টাকাটা আমার খুব দরকার ছিল!" একটু থেমে সে আবার বলল, "আপনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাকে আরও অনেকদিন বাঁচতে হবে। ওই টাকাটা পেলে সুবিধে হবে। তাই না!"

কাকাবাবু অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিল্‌ আবার জিজ্ঞেস করল, "আমি কি ভুল বলছি?"

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "না, ভুল হবে কেন? টাকার লোভে কেউ কেউ তো নিজের বাবা-মাকেও খুন করে?"

বিল্‌ এবার চটে উঠে বলল, "খবরদার, আমার মা-বাবা নিয়ে কিছু বলবে না। তুমি একটা ইন্ডিয়ান। তুমি বাঁচলে বা মরলে আমার কিছু যায়-আসে না। তোমার সঙ্গে আমার বাবা-মায়ের তুলনা?"

কাকাবাবু বললেন, "যে লোক অন্য মানুষদের ঘৃণা করে, সে নিজের বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে কাউকেই ভালবাসতে পারে না।"

বিল্‌ বলল, "শাট আপ! তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "তোমাকে আর একটা উপদেশ দিতে পারি। তুমি এখানে কাজ না করে সিনেমায় নামার চেষ্টা করতে পারো। তাতেও অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। তুমি তো চমৎকার অভিনয় করতে পারো!"

তখনই আর-একজন লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। দেখলেই বোঝা যায়, এই লোকটিই এদের নেতা। যেমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনই একটা ঝলমলে আলখাল্লা পরা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল একটা হলুদ ফিতে দিয়ে বাঁধা। চোখ দুটো টকটকে লাল, দেখলেই মনে হয় নেশাখোর।

কোমরে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি বলল, "এই সেই ইন্ডিয়ান? এ তো দেখছি একটা খোঁড়া লোক। এরই এত তেজ?"

বিল্‌ বলল, "হ্যাঁ স্যার। খুব ডেঞ্জারাস ম্যান। খালি হাতেই কয়েকজন সোমালিয়ার হাইজ্যাকারকে জব্দ করেছে। আমি ওকে খুব তোয়াজ করে নিয়ে এসেছি। কিছুই বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।"

সেই লোকটি বলল, "আমি আজ গাড়ির রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছি, তাতে তোমার সুবিধে হয়েছে বলো?"

বিল্‌ বলল, "নিশ্চয়ই। আজ একটা বেলুন নামবে, আমি জানতাম। ওর সঙ্গে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আজ আর কোনও টুরিস্ট আসেনি, তাই সব দিক থেকেই আমরা ফ্রি।"

লোকটি কাকাবাবুর কাছে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "জন্তু-জানোয়ারদের প্রতি তোমার খুব দরদ, তাই না? সব জন্তু-জানোয়ারকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি কে? আপনার পরিচয় তো জানি না। আপনার সম্পর্কে কিছু না জেনে আপনার কথার উত্তর দেব কেন?"

লোকটি আচমকা কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, "এইজন্য উত্তর দেবে। না হলে আরও মার খাবে।"

কাকাবাবু একবার চোখ বুজলেন। তাঁর মেজাজ শান্ত রাখতে হবে। তিনি বললেন, "নাঃ, আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই আমার।"

লোকটি এবার কাকাবাবুর চুলের মুঠি চেপে ধরল।

কাকাবাবু জানেন, যেরকম শক্তভাবে এরা তাঁকে বেঁধেছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। কোনওরকমে দড়ি খুলে ফেললেও, এত লোকের সঙ্গে তিনি গায়ের জোরে পারবেন না।

তবে, এদের বেশি বেশি রাগিয়ে দিলে এরা কিছু না-কিছু ভুল করে ফেলতে পারে। তাই তিনি নাক কুঁচকে বললেন, "এঃ, তোমার গায়ে বিশ্রী গন্ধ! তুমি অনেকদিন স্নান করো না বুঝি?"

লোকটি কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে টানতেই বিল্ বলল, "মি. রাজা, তুমি এঁকে চেনো না। ইনি সাংঘাতিক লোক। ইনি ইচ্ছে করলে এক্ষুনি তোমাকে খতম করে দিতে পারেন। ওঁর নাম রবার্ট কিকুইউ, ইনি ফিলিপ কিকুইউ-এর ভাই। বড় বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রী, পুলিশও এই দুই ভাইকে ভয় পায়।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, এই দুই ভাই মিলেই চোরাশিকার, পশুচালানের কাজ করে বহু পশু মেরেছে, মানুষও খুন করেছে। হ্যারি ওটাংগোর মতো বিখ্যাত মানুষকে এরাই মেরেছে।"

রবার্ট কাকাবাবুর চুল ছেড়ে দিয়ে উলটো দিকের সোফায় বসল। সামনের পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমরা জন্তু-জানোয়ার মারি, বেশ করি। সিংহ, হাতি, গন্ডার, এরা মানুষের কী উপকার করে? পৃথিবী থেকে এদের শেষ করে দেওয়াই উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা মানুষ, পৃথিবীর একটা প্রাণী। এখানে আরও কতরকম প্রাণী আছে। আমরা যেমন বাঁচতে চাই, তেমনি ওদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।"

রবার্ট ধমক দিয়ে বলল, "মোটেই না। অন্য সব হিংস্র প্রাণীকে শেষ করে দিতে হবে। ওরা মানুষের ক্ষতি করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের বিরক্ত না করলে ওরা মানুষের ধারেকাছে আসে না। অন্য সব প্রাণীকে ধ্বংস করে দিলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। মানুষও বাঁচবে না।"

রবার্ট বলল, "যত সব বাজে কথা। ওসব খবরের কাগজে লেখে। মুরগি, হাঁস, ভেড়া, গোরু, শূকরদের যে প্রতিদিন কত মারা হচ্ছে? মানুষ এদের খায়। তা বুঝি দয়ামায়ার প্রশ্ন নেই? সিংহ আর গন্ডারের মাংস যদি আমরা খেতাম, ওদেরও বাঁচিয়ে রাখতাম। অত বড় বড় হাতি বাঁচিয়ে রাখার কী দরকার? শুধু গাছ ধ্বংস করে? বরং ওদের দাঁতগুলো মানুষের কাজে লাগে। সিংহের চামড়া দিয়ে ভাল জুতো হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ ক্রমশ নিরামিষাশী হয়ে যাবে। খাওয়ার জন্য কোনও প্রাণীকেই মারবে না। আমাদের ইন্ডিয়ার অনেক লোক নিরামিষ খায়।"

রবার্ট বলল, "যাক গে ওসব কথা। আসল কথাটা হল, আমার ভাই ফিলিপ এখন জেলে। লোহিয়া নামে ব্যবসায়ীটা অনেক টাকা খরচ করে ওর বিরুদ্ধে উকিল-ব্যারিস্টার লাগিয়েছে। সে নিজেও একজন প্রধান সাক্ষী। আর-একজন তুমি। তোমরা দু'জন মিলে ওকে ফাঁসি দিতে চাও? অপরাধ প্রমাণ হলে ওর নির্ঘাত ফাঁসি!"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি ফিলিপের ফাঁসি চাই না। কারওই ফাঁসি চাই না। যদিও সে আমার ভাইপোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছিল। আমরা কোনওক্রমে বেঁচেছি। সে একজন অতি নিকৃষ্ট অপরাধী। তার অবশ্যই কিছু শাস্তি হওয়া উচিত।"

রবার্ট ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "শাস্তি হবে না ছাই! আমরা আছি কী করতে? আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী দু'জন, লোহিয়া আর তুমি। খতম হবে। আর-একটা মেয়ে আছে, তার স্বামীটা আমাদের দলে ছিল। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা পড়ায় তার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বউটা যাতে সাক্ষী দিতে না পারে, তাই তাকেও গুম করার ব্যবস্থা করেছি। ব্যস, কোনও সাক্ষী না পেলে শাস্তি হবে কী করে? জজসাহেবকেও ঘুষ খাওয়াব, বড়ভাই বেকসুর খালাস হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "সবটাই এত সোজা?"

রবার্ট বলল, "তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও সোজা।"

বিল্ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে বলল, "মাস্টার, এবার আমার টাকাটা দিয়ে দাও। আমি চলে যাই।"

রবার্ট বলল, "ও হ্যাঁ, তোমার টাকা? কত যেন ঠিক হয়েছিল?"

বিল্ বলল, "তিরিশ হাজার ডলার।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জীবনের দাম মাত্র তিরিশ হাজার ডলার? অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল!"

বিল্ আর রবার্ট দু'জনেই কাকাবাবুর দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

রবার্ট বিল্‌কে বলল, "তিরিশ হাজার ঠিক হয়েছিল, তাই না? এখন তোমাকে যদি আমি এক পয়সাও না দিই? মাল তো ডেলিভারি পেয়ে গিয়েছিই। এখন তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলে তুমি কী করবে?"

পকেট থেকে সে একটা রিভলবার বের করল।

বিল্-এর মুখটা পাংশু হয়ে গেল। সে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "সে কী, টাকাটা দেবেন না? আমি এত কষ্ট করে নিয়ে এলাম? আমি গরিব মানুষ!"

রবার্ট বলল, "আমি জিজ্ঞেস করছি, টাকাটা না দিলে তুমি কী করবে?"

বিল্ বলল, "কী আর করব? আমার আর কতটুকু ক্ষমতা?"

রবার্ট বলল, "পাবে। তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না। দামটা বেশিই দেব। এসব কাজ পাঁচ-দশ হাজারেও হয়। ঠিক আছে, তোমাকে কুড়ি দিচ্ছি। বাকি দশ রইল। আবার কখনও যদি তোমাকে কাজে লাগাতে হয়, তখন পাবে।"

একটা ব্যাগ থেকে সে কয়েক তাড়া নোট বের করে ছুড়ে দিল বিলের দিকে।

বিল্ বলল, "অন্তত আরও পাঁচ বেশি দিন স্যার!"

রবার্ট প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "যাও!"

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে ফিরে রিভলবারটা তুলে বলল, "ওহে, আমি তোমাকে কতরকমভাবে মেরে ফেলতে পারি, শুনবে? এক নম্বর: এক্ষুনি দুটি গুলি চালিয়ে দিতে পারি তোমার বুকে। দু'নম্বর: পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে পারি। তিন নম্বর: হাত-পা বেঁধে ফেলে দিতে পারি লেকে। ওখানে হিপোগুলো তোমাকে নিয়ে খেলা করবে। চার নম্বর: তোমাকে নিয়ে...!"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "অত কিছুর দরকার কী? তুমি আর আমি সামনাসামনি লড়াই করি কোনও অস্ত্র না নিয়ে। দেখা যাক কে জেতে?"

বিল্ এখনও যায়নি। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খবরদার স্যার, ওতে রাজি হবেন না। এ লোকটি অতি ধুরন্ধর। নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করবে!"

রবার্ট নীচের ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব কায়দাটায়দা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ইচ্ছে করলে এক্ষুনি খালি হাতে ঘ্যাচাং করে ওর মুন্ডুটা ঘুরিয়ে ওর ঘাড়টা ভেঙে দিতে পারি। কিন্তু আমি কোনও খোঁড়া লোকের সঙ্গে লড়াই করি না।" তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমায় আমি কী করে মারব জানো? তুমি জন্তু-জানোয়ারদের এত ভালবাসো। সেই জন্তুদের দিয়েই তোমাকে খাওয়াব। লেক মিগাইয়ের উলটো দিকটায় একটা স্পট আছে, তার নাম লায়ন্স ডেন। সেখানে তোমাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে আসব। তুমি পালাতে পারবে না। সিংহরা জল খেতে এসে তোমাকে দেখতে পেলে জলখাবার (স্ন্যাক্স) হিসেবে খেয়ে নেবে। তখন তোমার পশুপ্রেম কোথায় থাকবে?" তারপর সে "জিম জিম," বলে একজনকে ডাকল।

সেই লোকটি এল, হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। কাকাবাবুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে প্যাট করে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে দিল তাঁর বাহুতে।

কাকাবাবুর মনে হল, এটা অজ্ঞান করে দেওয়ার মতন কিছু একটা ওষুধ। তাঁর চোখ টেনে আসছে। সেই অবস্থাতেও তিনি বললেন, "আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু লোহিয়াকে তো পাবে না! সে ঠিক...!"

রবার্ট হা-হা করে হেসে উঠল।

॥ ৮ ॥

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরলেও চোখের সামনে শুধু অন্ধকার দেখতে পেলেন। বুঝতে পারলেন না, কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন। একটু নড়াচড়া করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, দাঁড় করানো অবস্থায় কিছুর সঙ্গে বাঁধা। পা মাটি ছোঁয়নি। কোনও গাছটাছের সঙ্গেই বেঁধে রাখা হয়েছে মনে হয়।

এটাই কি সেই হ্রদের ধারে লায়ন্স ডেন?

এখন কত রাত কে জানে? কোথাও কোনও শব্দ নেই।

নাইলনের দড়ি দিয়ে এত জোর বাঁধা হয়েছে যে, সারাগায়ে জ্বালা করছে। নড়াচড়া করতে গেলে আরও জোরে লাগছে।

একবার তিনি শব্দ করে উঠলেন, "উঃ!"

সঙ্গে সঙ্গে কেউ তার নাম ধরে ডাকল, "রাজা, রাজা!"

কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন।

এ গলার আওয়াজ তো তাঁর চেনা। সত্যি কেউ তাঁকে ডাকল, না স্বপ্ন দেখছেন তিনি?

তবু বললেন, "পওয়ন পওয়ন, তুমি কোথায়?"

এবার পাশ থেকেই উত্তর এল, "আমি তোমার খুব কাছেই আছি। একাই আছি।"

কাকাবাবু খানিকটা নিরাশভাবে বললেন, "তুমিও ধরা পড়েছ? আমি আশা করেছিলাম, তুমি কোথাও লুকিয়ে আছ। ওরা তোমার সন্ধান পাবে না।"

পবনরতন লোহিয়া বললেন, "আমি তো পালাবার সময়ই পেলাম না। আমার একজন খুব বিশ্বস্ত বডিগার্ড ছিল। এখানে তো ঘুষের রাজত্ব চলে। কিন্তু কেউ হাজার হাজার ডলার খাইয়েও তাকে দলে টানতে পারত না। কিন্তু সে দু'দিন অসুস্থ ছিল। আর-একজন ভার নিয়েছিল। অমনি সেই সুযোগে ওরা নতুন লোকটিকে হাত করে ফেলে।"

"তোমার বাড়িতে আগুন লেগেছে, তুমি জানো? অত সুন্দর বাড়িটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে?"

"জানব না কেন? ঘুমের মধ্যে তিন-চারজন আমার মুখ বেঁধে, কাঁধে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। তারপরেই বাড়িটায় আগুন লাগায়।"

"সেই থেকে তুমি এখানেই আছ?"

"হ্যাঁ, রাজা। মাঝে মাঝেই ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। কিছু খেতেও দেয়নি।"

"তোমাকে যে মাঝেমধ্যে অন্য কোথাও একা-একা দেখা গিয়েছিল, সেসব কি এদেরই রটনা?"

"হ্যাঁ, পুলিশকে হাত করে রটিয়েছে নিশ্চয়ই! ঘুষে এখানে কী না হয়? এমনকী, নিজের ভাইকেও অনেক সময় বিশ্বাস করা যায় না। আমার একটা ভাই, আপন ভাই নয়। সেও বোধহয় আমার সম্পত্তির লোভে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তুমি কী করে ধরা পড়লে?"

"পওয়ন, আমি একজন পুলিশকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে ছেলেটির প্রথম থেকেই ভদ্র ব্যবহার, বিশ্বাস না করে উপায়ই ছিল না। আমি একটুও সন্দেহ করিনি।"

"সত্যিই, এক-একজনকে দেখলে একটুও সন্দেহ করা যায় না। রাজা,

তোমার আর দু'দিন আগে আসবার কথা ছিল, তুমি ঠিক সময় এলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতাম। আমাদের ধরা অত সহজ হত না বোধহয়।"

"কী করব, আগে আসা গেল না! নানারকম কাণ্ড হল। সেসব তো পরে বলব!"

"পরে বলবে মানে? কখন? আমরা কি আর এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব? অবশ্য এখন আর কিছু বলা না বলা সমান। আর কতটুকু সময় পাব জানি না!"

"কেন পওয়ন, আমরা কি এত সহজে মরব নাকি? না না। তুমি ওসব ভেবো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবে!"

"এখন আর কী ব্যবস্থা হতে পারে? এই দড়ির বাঁধন ছেঁড়া অসম্ভব।"

"মনে করো, এতদিন পর এই আগ্নেয়গিরি আজই আবার জেগে উঠল। প্রথম প্রথম তো একটু একটু আগুন জ্বলবে। সেই আগুনে আমরা দড়ি পুড়িয়ে ফেলব। তারপর দৌড়োব। ওঃ হো, আমি তো আবার খোঁড়া পায়ে দৌড়োতেও পারব না। সেটা একটা মুশকিল!"

"রাজা, তোমার মাথায় এসবও আসে? আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে আমাদের বাঁচাবে?"

"তুমি যাই বলো পওয়ন, সিংহের পেটে আমি মরব না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তুমি কি জ্যোতিষ ট্যোতিষে বিশ্বাস করো নাকি?"

"না না, সেসব নয়। কিন্তু এত দেশ ঘুরলাম, এতরকম বিপদ কাটিয়ে এলাম, শেষ পর্যন্ত এই গোরোংগোরোর মধ্যে সিংহ আমায় খেয়ে ফেলবে, এ আবার হয় নাকি?"

"সিংহ না খাক, চিতা যদি আসে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিংবা সাপ কামড়াতে পারে।"

"সিংহের চেয়ে বোধহয় সাপ ভাল, তাই না? কষ্ট কম হবে!"

"রাজা, এই সময়েও তুমি হাসছ?"

"মরতে যদি হয়, তবে কাঁদতে কাঁদতে মরার চেয়ে হাসতে-হাসতে মরাই তো ভাল!"

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, অন্ধকারে কথা বলছেন দু'জনে। খানিক পরে কীসের যেন শব্দ হল। নিশ্চয়ই কোনও জন্তু আসছে। দেখা গেল দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। বেশ উঁচুতে। অর্থাৎ কোনও বড় জানোয়ার। দু'জনেই নিশ্বাস

বন্ধ করে চুপ করে রইলেন। জন্তুটা একটু ঘুরে এসে বসে রইল। কয়েক মিনিট পরে পবন লোহিয়া ফিসফিস করে বললেন, "মনে হয় ওটা গন্ডার। তাই কাছে আসছে না।"

কাকাবাবুও ফিসফিস করে বললেন, "না, ওটা সিংহই।"

"তুমি কী করে বুঝলে?"

"চোখের রং দেখে। লাল চোখ। সিংহের চোখে আয়নার মতো একটা ব্যাপার থাকে, তাকে বলে 'টেপটার্ন'। তাতে শুধু লাল রংটাই প্রতিফলিত হয় অন্ধকারে। রাত্তিরে এক-একটা জন্তুর চোখের রং এক-এক রকম। শিয়ালের চোখ সবুজ।"

"তুমি এত সব জানলে কী করে, রাজা?"

"একসময় বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি। তা ছাড়া বইতেও পড়েছি।"

"সিংহ যদি হয়, আমাদের কামড়াতে আসছে না কেন?"

"অন্ধকারে তো বুঝতে পারছি না, ওটা সিংহ না সিংহী। সাধারণত সিংহরা শিকার করে না, তারা বসে থাকে, সিংহীই এসে শিকার করে। এটা যদি সিংহ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সিংহীর জন্য অপেক্ষা করছে!"

"সিংহ এলে সিংহী তো বেশি দূরে থাকবে না। এসে পড়বে এক্ষুনি।"

"আসুক আগে, তারপর দেখা যাবে। এর মধ্যে যদি একটা হরিণ কিংবা জেব্রা এসে পড়ে, তা হলে ওরা সেটাকেই খাবে, আমাদের দিকে আর তাকাবে না।"

"সেজন্য কি ভগবানকে ডাকবে, এদিকে একটা জেব্রা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য?"

"ভগবান এখন ঘুমোচ্ছেন। আমাদের ডাক শুনতে পাবেন না।"

"আমরা কথা বলছি, নিশ্চয়ই শুনতে পাবে সিংহটা।"

"শুনতে না পেলেও গায়ের গন্ধ তো এতক্ষণে পেয়ে যাওয়া উচিত। পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

সিংহ সাধারণত ডাকে না। এই সময় হঠাৎ ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে যত বড় সাহসীই হোক, তারও বুক কাঁপবে। কাকাবাবুরও বুক কেঁপে উঠল। তবু তিনি ভয় কাটিয়ে হালকা গলায় বললেন, "দেখলে, দেখলে তো, চোখ দেখে বুঝেছিলাম, সিংহ!"

পবন লোহিয়া কথাই বলতে পারছেন না আর।

সিংহটা গরগর করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

আর নিস্তার নেই। এবার সিংহটা কার উপর আগে লাফিয়ে পড়বে?

কাকাবাবুর দিকে না এসে সিংহটা গেল পবন লোহিয়ার দিকে।

পবন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "গুড বাই, রাজা। সরি, আমিই তোমায় এবার ডেকে এনেছিলাম। তবে, তোমার এখনও আশা আছে। সিংহটা আমায় খেলে ওর পেট ভরে যাবে, তখন আর তোমাকে খাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এর পর সিংহীটা পেটে খিদে নিয়ে আসবে।"

সিংহটা এসে পড়ল পবন লোহিয়ার খুব কাছে। গর-র গর-র করেই চলেছে।

কাকাবাবু এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তাঁর আগে পবন লোহিয়ার মৃত্যু হবে। তাঁকেই আগে খাওয়া উচিত ছিল। পবনের মৃত্যু-আর্তনাদ তিনি সহ্য করবেন কী করে?

তাঁর চোখে জল এসে গেল।

একটুক্ষণ পরে পবন লোহিয়া মৃত্যু-চিৎকারের বদলে অন্যরকমভাবে চিৎকার করে বলল, "আরে, এ তো সিম্বা!"

কাকাবাবু বুঝতে না পেরে বললেন, "তার মানে?"

পবন বললেন, "এটা তো আমার পোষা সিংহ। আমার নিজস্ব চিড়িয়াখানায় থাকে।"

কাকাবাবু তবু একটু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তোমার চিড়িয়াখানা? আগুন লাগার পর জন্তু-জানোয়াররা পালিয়েছে। কিন্তু মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যে এই সিংহটা তো কেনিয়ার বাড়ি থেকে এত দূরে এই গোরোংগোরোর মধ্যে চলে এল? তা কি সম্ভব?"

পবন বললেন, "না, তা নয়। এই সিম্বাটা খুব ছোট ছিল। যথেষ্ট বড় হওয়ার পর আমি ওকে সেরেংগেটি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি ন'মাস আগে। সেখান থেকে এখানে চলে এসেছে। আমাকে ঠিক মনে রেখেছে। দ্যাখো, আমি ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। গর-র গর-র শব্দটা করছে, সেটা আনন্দের।"

কাকাবাবুর বুক থেকে একটা বিরাট স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসা।

তিনি বললেন, "দ্যাখো পওয়ন, বলেছিলাম কিনা সিংহের পেটে আমার মৃত্যু হবে না?"

পবন বললেন, "সত্যিই, এটা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছে। কিন্তু এই দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি পাব কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা যদি হিন্দি সিনেমা হত, তা হলে তোমার পোষা সিম্বা দাঁত দিয়ে কামড়ে দড়িগুলো সব কেটে দিত। কিন্তু সিম্বা বেচারা তো হিন্দি সিনেমা দেখেনি, ও জানবে কী করে যে দড়িটড়ি কাটতে হবে!"

এবারে পবন লোহিয়াও হেসে ফেলে বললেন, "সিংহটা হিন্দি সিনেমা দেখবে, তোমার মাথাতেও আসে বটে!"

কাকাবাবু বললেন, "একটা সিংহ যখন কামড়ায়নি, তখন অন্য সিংহরাও আমাদের কামড়াবে না ধরে নিতে পারি। ওরা সব জেনে যাবে। এর পর কী হয় দেখা যাক! সিম্বা চলে গিয়েছে?"

"চলে গেল এইমাত্র।"

"যেখানে সিংহ আসে, সেখানে অন্য হিংস্র জানোয়ার সহজে আসে না। হাতি আসতে পারে। হাতির পাল এলে সবাই জায়গা ছেড়ে দেয়।"

"হাতির পাল এলে আমাদের কিছু সুবিধে হতে পারে?"

"হতে পারে। যে গাছের সঙ্গে আমরা বাঁধা, হাতি হয়তো সেই গাছ উপড়ে ফেলে দিতে পারে।"

"তারপর পা দিয়ে আমাদের পিষে দেবে?"

হঠাৎ শোনা গেল গুলির শব্দ। কতটা দূরে তা বোঝা গেল না। পাহাড়ের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হলে সেই শব্দ খুব জোর মনে হয়। পায়রারা উড়ে গেল কয়েকবার। তারপর আবার সব নিঃশব্দ!

পবন জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, কিছু বুঝলে? কী হল ব্যাপারটা?"

কাকাবাবু বললেন, "চোরাশিকারিদের কাণ্ড? কোনও জানোয়ার মারছে? তবে শুনেছিলাম, পুলিশ এখানে খুব কড়া পাহারা দেয়?"

পবন বললেন, "পুলিশের নাকের ডগাতেই এসব হয়। হাতির দাঁত, গন্ডারের শিং, চামড়া, এসবের প্রচুর দাম আছে।"

আবার সব চুপচাপ। কত সময় কেটে যাচ্ছে কে জানে। দু'-একবার শুধু শোনা গেল হায়েনার ডাক।

কাকাবাবু আর পবনের কথা প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। দু'জনেরই ঘুমঘুম চোখ।

একসময় উপরের আকাশে ফুটে উঠল একটু একটু আলো। ডাকতে

লাগল পাখি। একটা পাখির ডাক অনেকটা ময়ূরের মতো জোরালো, কিন্তু ঠিক ময়ূর নয়।

সেই পাখির ডাকেই সজাগ হলেন কাকাবাবু। এবার আবছা সোনালি আলোয় দেখতে পেলেন, পবন সাদা প্যান্ট আর গলাবন্ধ কোট পরা, মুখে কয়েকদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো ঢুকে গিয়েছে। কত বড় বড় কোম্পানির মালিক, কত লোকের উপকার করেন, তাঁর আজ এই অবস্থা!

কোথা থেকে অনেক প্রজাপতি ফরফর করে উড়ে এল। লেকটার ধারে ধারে অজস্র ফুল। কোথাও কোনও হিংসার চিহ্ন নেই। কাকাবাবুর মনে হল, পৃথিবী কী সুন্দর!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল দুমদুম করে শব্দ। এবারে দূরে নয়। গুলির শব্দও নয়। একদিকটা দেখা গেল ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, এগুলো স্মোক বম্ব। এই বোমায় জন্তু-জানোয়ার সব দূরে সরে যায়।

এই বোমা ফাটাতে ফাটাতে কারা আসছে?

নিশ্চয়ই রবার্ট আর তার লোকজন। সিংহের পেটে এই দু'জন গিয়েছে কি না, তাই দেখতে আসছে। যখন দেখবে দু'জনেই বেঁচে আছে, তখন কি এখানেই গুলি করে মারবে, না আবার সেই তাঁবুতে নিয়ে যাবে?

দিনেরবেলা আজ কিছু টুরিস্ট আসতে পারে এখানে, সুতরাং এখানে এই অবস্থায় বেঁধে রেখে যাবে না।

কাকাবাবু দেখতে পেলেন, ধোঁয়া ভেদ করে বেরিয়ে আসছে মানুষ। প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল। প্রথম লোকটিই বিল্, তার লাল শার্ট দেখে চেনা যায়।

বাকি দশ হাজার ডলার পাওয়ার জন্য বিল্ এখন ওদের হয়ে গিয়েছে।

পবন বললেন, "ওই যে ওরা আসছে রাজা, এবার মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। আর ওরা আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিশ্রম করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই বলা যাবে না। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' আশ মানে আশা। দেখা যাক।"

একেবারে কাছে এসে বিল্ বলল, "গুড মর্নিং সার্স! আমি একটা ছুরি দিয়ে আপনাদের বাঁধন কেটে দেব। কিন্তু তারপরই আপনারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। এখন আমি আপনাদের শত্রু হিসেবে আসিনি। বন্ধু হয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? হঠাৎ আবার ডিগবাজি? কাল বিকেল পর্যন্ত আমার বন্ধু ছিলে, তারপর টাকার লোভে আমাকে বিক্রি করে দিলে। এখন আবার বন্ধু সাজতে চাইছ কেন?"

বিল্ বলল, "বুঝিয়ে দিচ্ছি। টাকার লোভেই আপনাকে কাল বিক্রি করেছিলাম। এখন আবার টাকার লোভেই আপনাদের মুক্তি দিতে এসেছি।"

পবন লোহিয়া এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "হেঁয়ালি না করে, আসল কথা বলো! রবার্ট আমার কাছে টাকা চাইছে? এক পয়সাও দেব না।"

বিল্ বলল, "মাপ করবেন স্যার। রবার্ট গুরুতর আহত। টাকা চাইবার মুখ তার আর নেই। টাকা পাব আমরা, আমি আর এই তিনজন পুলিশ।"

ছুরি দিয়ে সে পবন ও কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন কেটে দিল। তারপর বলল, "স্যার, আপনাদের জন্য কফি আর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে রেখেছি। তারপর বেলুনেই ফিরে যাবেন। সোজা নাইরোবি। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ এত খাতির শুরু করলে কেন, ঠিক করে বলো তো?"

বিল্ বলল, "আপনি তো কাল দেখলেন স্যার, রবার্টটা কীরকম নিমকহারাম। তিরিশ হাজার ডলার দেবে বলেছিল, কথার খেলাপ করে দিল কুড়ি হাজার। তখন থেকেই আমি রাগে ফুঁসছিলাম। পুলিশক্যাম্পে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে সেই কথা আলোচনা করেছি। ওদের একজন একটা দারুণ কথা বলল। এই পবন লোহিয়া সম্পর্কে কোনও সংবাদ জানাতে পারলে একটা বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করেছে ওঁর এক ভাই। আমরা যদি পবন লোহিয়াকে রবার্টদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি, তা হলে সেই পুরস্কারের টাকা অনায়াসে আমরা চারজনে ভাগ করে নিতে পারি। সেটা হবে অনেস্ট উপার্জন, তাই না?"

পবন বললেন, "সেটা তো আগেই করতে পারতে?"

বিল্ বলল, "আগে ঠিক জানতাম না আপনাকে কোথায় রেখেছে। কাল রাত্তিরে সব জানলাম। তাই আমরা চারজন প্ল্যান করে শেষ রাত্তিরে আজ রবার্টের ডেরায় গিয়ে হানা দিলাম। ওরা তৈরি ছিল না, আমাদের দেখে প্রথমে কোনও সন্দেহ করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি।"

বিল্ বলল, "ওরা সবক'টা দারুণ আহত। বেঁধে রেখে এসেছি। আপনাদের

খুবই কষ্ট হয়েছে স্যার, সেজন্য আমি ক্ষমা চাই। এর মধ্যেই যে কোনও সিংহ এসে আপনাদের উপর থাবা বসায়নি, সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!"

এতক্ষণ ধরে বেঁধে রাখার জন্য সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কাকাবাবু আর লোহিয়া দু'জনেই দু'হাত ওপরে আর নীচে করলেন কয়েকবার।

বিল্ যাতে বুঝতে না পারে, এজন্য কাকাবাবু হিন্দিতে লোহিয়াকে বললেন, "এই বিল্ নামের লোকটা আমাদের মুক্তি দিল বটে, কিন্তু ওর দিকে তাকাতেই আমার ঘেন্না হচ্ছে।"

লোহিয়া একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা দারুণ অর্থলোভী। ও ন্যায়-নীতি কিছু বোঝে না। শুধু টাকা আর টাকা! আগের দিন কত ভাল ব্যবহার করেছিল আমার সঙ্গে। কী বিনীত ভাব। আমি তখন একটুও বুঝতে পারিনে যে ও লোকটা পুরো ছক কষে আমাকে এখানে টেনে এনেছে রবার্টের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য। কী নির্লজ্জ। রবার্ট ওকে কিছু টাকা কম দিয়েছে বলে এখন আবার রবার্টকে মেরে আমাদের মুক্তি দিতে এসেছে, আরও বেশি টাকা পাবার জন্য। আপনাকে ফেরত পাবার জন্য ভাই অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সেই টাকাটা এই বিল্ পাবে ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে!"

লোহিয়া বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। এদের বিবেক বলে কিচ্ছু নেই। কিন্তু পুরস্কারের টাকা যখন ঘোষণা করা হয়ে গেছে, তখন তো এদের দিতেই হবে। অস্বীকার তো করা যাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। টাকাটা ওকে দেওয়া হোক। তারপর আমি সবার সামনে ওর দু'গালে দুটো থাপ্পাড় কষাব। ও আমাকে অপমান করেছে। আমাকে কেউ অপমান করলে আমি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ি না।"

লোহিয়া বললেন, "এখন অন্তত তোমার রাগটা একটু সামলে রাখো। আগে আমাদের বিশ্রাম নেওয়া দরকার।"

বিল্ কাছে এসে বললেন, "চলুন স্যার। আজই আমরা এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করব।"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে সে বলল, "মি. রায়চৌধুরী, এখান থেকে খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। এদিকে গাড়ি আসে না। আপনার কষ্ট হবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচদুটো থাকলে কোনও অসুবিধে হত না—"

লোহিয়া বললেন, "তাই তো ক্রাচ ছাড়া তুমি হাঁটবে কী করে? দু'জন লোক যদি তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে যায়—"

বিল্ বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা করতে পারি। আমি ডাকছি।"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমার লোক দরকার নেই। আমি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়েই যাব। চলো—"

বিল্ বললেন, "তাড়াতাড়ি এ জায়গাটা পার হতে হবে। কখন আবার সিংহ টিংহ এসে পড়ে।"

ভোরের আলো ভাল করে ফুটো গেছে। আকাশটা যেন বেশি বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

সবাই মিলে হ্রদের ধার দিয়ে লাইন করে এগোতে লাগল। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এগোতে কাকাবাবুর যে কত কষ্ট হচ্ছে, তা অন্য কারুকে তিনি বুঝতে দিলেন না।

মিনিট পাঁচেক যাবার পরই একটা দারুণ কোলাহল শোনা গেল। কারা যেন এই দিকেই ছুটে আসছে।

হয়তো আহত রবার্টসই অন্য লোকজন জোগাড় করে আসছে। বিলের সঙ্গী পুলিশ তিনজন রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল।

দু'-এক মিনিট পরেই দেখা গেল, পুলিশ নয়, একদল মাসাই ছুটে আসছে এদিকে। অন্তত পঁচিশ-তিরিশজন তো হবেই। তাদের সকলেরই হাতে বর্শা আর ঢাল।

দারুণ ভয় পেয়ে বিল্ বলে উঠল, "ওরে বাবা রে! ওরা কেন আসছে!"

একজন পুলিশ বলল, "বোধহয় কোনও সিংহকে তাড়া করেছে।"

কিন্তু কোনও সিংহ কিংবা আর কোনও প্রাণীকে দেখা গেল না। মাসাইরা দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে এসে ঘিরে ফেলল এই দলটাকে।

পুলিশরা বন্দুক চালাতে সাহস করল না। সবাই জানে, একজন মাসাইকে মারলে শত শত মাসাই এসে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

এখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না এরা কী চায়।

মাসাইরা তিনজন পুলিশ আর বিল্‌কে টানতে টানতে এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাল। বিল্ কিছু বলতে যেতেই ওদের যে সর্দার সে বিলের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিল একবার। তারপর সেই সর্দার এসে দাঁড়াল কাকাবাবুর

সামনে। সর্দারটি যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। একটা আলখাল্লা পরা, গলায় অনেক পুঁতির মালা।

সে কাকাবাবুর দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

কাকাবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল একবার। এই বিশাল চেহারার মানুষটি যদি তাঁকে মারতে শুরু করে কিংবা বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দেয়, তিনি আত্মরক্ষা করবেন কী করে?

সর্দারটি কী যেন বলল কাকাবাবুকে। দুর্বোধ্য ভাষা, তিনি কিছুই বুঝলেন না।

তিনি তাকালেন লোহিয়ার দিকে।

লোহিয়া সোয়াহিলি ভাষা জানেন। তিনি এবার সর্দারকে কিছু বললেন।

সর্দার সরে গেল লোহিয়ার দিকে। তারপর দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

হঠাৎ একসময় কথা থামিয়ে সর্দারটি আবার কাকাবাবুর কাছে এসে হাত রাখল তাঁর ঘাড়ে।

কাকাবাবু চমকে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই লোহিয়া বললেন, "নড়বেন না, নড়বেন না।"

সর্দারটি কাকাবাবুর ঘাড়ে দু'বার চাপড় মেরে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে কিছু বলতেই সবাই ফিরতে শুরু করল। সঙ্গে করে নিয়ে গেল বিল্ আর অন্য পুলিশদের।

এক মিনিটের মধ্যে জায়গাটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপারটা হল বলুন তো লোহিয়াজি?"

লোহিয়া হাসিমুখে বললেন, "আমরা মুক্ত! আমাদের আর কেউ বিরক্ত করবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মুক্ত? ফ্রি? কী করে হল?"

লোহিয়া বললেন, "এই জায়গাটায় কোনওরকম গোলাগুলি চালানো নিষেধ। আগ্নেয়গিরির মধ্যে বেশি আওয়াজ হলে পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। শেষ রাতে রবার্ট আর বিলের দলের মধ্যে গুলি চলেছে, সে আওয়াজ তো আমরাও শুনেছি। মাসাইরা এই আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য ওরা বিলের দলকে ধরে নিয়ে গেল, এখন ওদের বিচার আর শাস্তি হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর আমাদের ছেড়ে দিল?"

লোহিয়া বললেন, "আমি সব ঘটনাটা জানালাম। আমাদের তো কোনও

দোষ নেই। আমরা বিদেশি বলে, আমাদের খাতির করে গেল। আপনার কাঁধ চাপড়ানো সেই জন্য! শুধু তাই নয়, আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে বলে ও আমাদের জন্য দুটো ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে বলল। একটু বাদেই ঘোড়া দুটো এসে যাবে!"

কাকাবাবু দু'হাত ছাড়িয়ে বললেন, "আঃ, কী ভাল লাগছে। তার মানে, ওই হতভাগা বিল্‌টাকে আপনার পুরস্কারের টাকা দিতে হবে না?"

লোহিয়া বললেন, "না! আর কেন ও টাকা পাবে? ও তো আমাদের উদ্ধার করে নাইরোবি পৌঁছে দিচ্ছে না। তা ছাড়া, মাসাইদের হাতে ওরা এখন কী শাস্তি পাবে কে জানে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ হয়েছে!"

তারপরই আবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আপনার এই পুরস্কারের টাকাটা এই মাসাইদের দেওয়া উচিত। ওরাই তো আমাদের সম্মানের সঙ্গে মুক্তির ব্যবস্থা করল!"

লোহিয়া বললেন, "আমি ওদের জন্য একটা হাসপাতাল বানিয়ে দেব, আগেই ঠিক করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হাসপাতাল করে দেবেন, তা ভাল কথা। আপনার পুরস্কারের টাকাটাও এই মাসাইয়ের দলটাকে ভাগ করে দেওয়া উচিত।"

লোহিয়া বললেন, "ঠিক আছে। তাও দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার পা খোঁড়া, না হলে এখন একটু নাচতাম।"

পবন লোহিয়া লেকের কাছে গিয়ে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে বললেন, "পৃথিবীতে এত হিংসে, হানাহানি, তবু পৃথিবীটা বড় সুন্দর!"

পাশে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "বেঁচে থাকাটাই বড় সুন্দর। ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল টু বি অ্যালাইভ!"

সমাপ্ত

পুনশ্চ: রবার্ট কিকুইউ-কে খুবই আহত অবস্থায় ভরতি করা হয় হাসপাতালে। সেখানে পরের দিনই তার মৃত্যু হয়। কাকাবাবু আর পবন লোহিয়া নাইরোবিতে পৌঁছোবার পর, দু'দিন পরেই শুরু হয় ফিলিপ কিকুইউ-এর নামে মামলা। ন'দিন বিচার চলে। তারপর তার সারা জীবনের জন্য কারাদণ্ড হয়।

তখন কেউ কেউ সেই দণ্ড শুনে বলেছিলেন, “ও মোটেই সারা জীবন জেলে থাকবে না। নানা জায়গায় ঘুষ দিয়ে ঠিক বেরিয়ে আসবে।” কিন্তু বিচার শেষ হওয়ার পাঁচদিন পরেই সে জেলের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এই দুই দুর্দান্ত অপরাধীর মৃত্যুর পর কেনিয়া-তানজানিয়ায় চোরাশিকার আর পশুচালান প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশও অনেক সংযত হয়েছে।

গ্রন্থপরিচয়

কাকাবাবু ও সিন্দুক-রহস্য। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১৫৬। মূল্য ৭৫.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: ইংল্যান্ড প্রবাসী/শ্রীযুক্ত অর্ক চট্টোপাধ্যায়কে।

এই গ্রন্থের শেষে কিছু ছড়া ও কবিতা রয়েছে। বর্তমান সংকলনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৬।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১২৬। মূল্য ৭৫.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: স্নেহের সাশা-কে।

এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ। প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১৪৮। মূল্য ৮০.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: শ্রীমান অয়ন গাঙ্গুলিকে,/কোনও একদিন সে এই/ কাহিনি পড়বে নিশ্চয়ই।

কাকাবাবুর চোখে জল। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৮।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১০৮। মূল্য ৮০.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: শঙ্খদীপা ঘোষ-কে

কাকাবাবু আর বাঘের গল্প। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৯।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১১২। মূল্য ১০০.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: রিমা ইসলাম-কে।

আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১০।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯। পৃ. ১৩২। মূল্য ৮০.০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ: শ্রীমান দেবদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সমগ্র-র অন্যান্য খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থ

প্রথম খণ্ড

ভয়ংকর সুন্দর • সবুজদ্বীপের রাজা • পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
খালি জাহাজের রহস্য • মিশর রহস্য • কলকাতার জঙ্গলে

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূপাল রহস্য • জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল • জঙ্গলগড়ের চাবি
রাজবাড়ির রহস্য • বিজয়নগরের হিরে • কাকাবাবু ও বজ্রলামা

তৃতীয় খণ্ড

নীলমূর্তি রহস্য • মহাকালের লিখন • উল্কা রহস্য • একটি লাল লঙ্কা
কাকাবাবু হেরে গেলেন? • সাধুবাবার হাত • সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ

চতুর্থ খণ্ড

আগুন পাখির রহস্য • কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি
সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায় • কাকাবাবুর প্রথম অভিযান • জোজো অদৃশ্য

পঞ্চম খণ্ড

কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু • কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী
কাকাবাবু ও শিশু চোরের দল • কাকাবাবু ও মরণফাঁদ
কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার • কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ

বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে কাকাবাবুর একটি পা ভাঙা, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, অনমনীয় তাঁর দৃঢ়তা, অদম্য তাঁর সাহস। একইসঙ্গে প্রখর বিশ্লেষণ শক্তি, প্রচুর পড়াশোনা। কত ধরনের রহস্যের যে জট খুলেছেন তিনি, মোকাবিলা করেছেন কত রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতির, গিয়েছেন কত যে নতুন জায়গায়—তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গে কিশোর সন্তু ওরফে সুনন্দ, যে কিনা প্রতিটি অভিযানের সাক্ষী। ফেলুদার যেমন তোপ্‌সে, অনেকটা সেইরকমই কাকাবাবুর কাহিনিতে সন্তু।

সন্তু আর কাকাবাবুর দুর্ধর্ষ অভিযানের নানান কাহিনি নিয়েই দু’-মলাটের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে ‘কাকাবাবু সমগ্র’। এই ষষ্ঠ খণ্ডে রয়েছে ছ’টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস—কাকাবাবু ও সিন্দুক রহস্য, কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া, এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ, কাকাবাবুর চোখে জল, কাকাবাবু আর বাঘের গল্প এবং আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে।

9 789350 401019